ISSN 1813-0402

গবেষণা পত্রিকা

৩১তম সংখ্যা ■ জুন ২০২১

কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal

Faculty of Arts

University of Rajshahi

গবেষণা পত্রিকা
৩১তম সংখ্যা ■ জুন ২০২১
কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পত্রিকা

৩১তম সংখ্যা ❑ জুন ২০২১

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 31
June 2021

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Greater Road, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 400.00 $ 6

Contact Address
Chief Editor, *A Research Journal* (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

E-mail: dean.arts@ru.ac.bd
www.ru.ac.bd/arts

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Shamima Akter
Chairman
Department of Philosophy

Professor Dr. Mahmuda Khatun
Chairman
Department of History

Rubaida Akhter
Chairman
Department of English

Professor Dr. Sarker Sujit Kumar
Chairman
Department of Bangla

Professor Dr. Mohammad Fayek Uzzaman
Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Dr. Md. Nizam Uddin
Chairman
Department of Arabic

Professor Dr. Muhammad Mahbubur Rahman
Chairman
Department of Islamic Studies

Dr. Dino Bandhu Pal
Chairman
Department of Music

Professor Dr. SM Faruque Hossine
Chairman
Department of Theatre

Professor Dr. Md. Osman Goni
Chairman
Department of Persian Language & Literature

Professor Dr. Juely Biswas
Chairman
Department of Sanskrit

Professor Dr. Md. Ataur Rahman
Chairman
Department of Urdu

Message from the Chief Editor

The 31th volume of *A Research Journal*, Faculty of Arts is being published with as many as 32 research articles contributed by the faculty member and researchers of Philosophy, History, English, Bangla, Islamic History & Culture, Arabic, Islamic Studies, Persian Language & Literature, Sanskrit and Urdu Departments. The articles are of diverse characters and will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts.

The publication of the journal is the result of collective efforts of all the scholar members of the editorial board. They have ungrudgingly helped me in its publication. I am grateful to them for their cooperation. I thank the concerned officers of the Faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

সূচিপত্র

ড. মো. আনিসুজ্জামান	সরদার ফজলুল করিমের রাজনৈতিক চিন্তা: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা	১
ড. সন্ধ্যা মল্লিক	শঙ্করের দর্শনে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ধারণা: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ	১১
ড. মো. জাহিদুল ইসলাম	গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নে শিক্ষার ভূমিকা: জন ডিউঈ অবলম্বনে এর বিশ্লেষণ	২১
সঞ্চিতা সাহা	গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক– প্রেক্ষিত প্রাচীন ভারত	৩৩
ড. নিলুফার আহমেদ	নীতিবিদ্যা সম্পর্কে কারনাপের অভিমতের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ	৪৫
শায়খুল ইসলাম মামুন জিয়াদ	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রচার ও জনমত সৃষ্টির প্রয়াস	৫৭
Mahbuba Hasina	Backwash Effect of the S. S. C. Examination System on Teaching and Learning of English at the Secondary Level in Bangladesh	৭১
ড. সৈয়দ তৌফিক জুহরী	আহমদ ছফার সাহিত্যভাবনা : সমকালীন প্রেক্ষিত	৮৩
এস.এম.সাইদুল আম্বিয়া	হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ	৯১
Dr Dilshad Ara Bulu	Emergence, Sources, and Utilization of Bayt al-Mal in Islam	১০১
ড. মো. ফজলুল হক	আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ	১১১
Dr. Shahnaj Sultana Dr. Md. Harun-Or-Rashid	Contribution and Achievements of Classical and Medieval Islam	১২১
ড. জিয়াউর রহমান খান	মাহমুদ দারবীশের কবিতায় দ্রোহ: একটি পর্যালোচনা	১২৭
ড. মো. মনিরুজ্জামান	আরবি ভাষার সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা: একটি পর্যালোচনা	১৪১
ড. মো. সেতাউর রহমান	কবি মাই যিয়াদাহ ও তাঁর কবিতায় স্বদেশ ভাবনা	১৫৭
ড. মো. কামারুজ্জামান	কুরআনী গল্প: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১৬৩
ড. মো. সাজিদুল হক	জুরজী যায়দানের উপন্যাস *আল 'আব্বাসা*: ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ	১৭১
ড. মুহা. বিলাল হুসাইন	কবি আশ শানফারার জীবনী ও তাঁর কাব্য প্রতিভা	১৮৭
Mohidul Islam	Jihad Versus Terrorism: A Comparative Study	১৯৩
মো. ওবাইদুল্লাহ	ইসলামী শরী'আতে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা	২০৩
ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন: বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন	২১৩
মো. আশরাফুল ইসলাম	ইসলামের আলোকে উশরের বিধান	২৪১
জয়নুল আবেদীন	কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জীবিকা উপার্জন	২৫৯
ড. রিজওয়ানা ইসলাম শাম্মী	বিশ্বজগৎ ও মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে ইকবালের চিন্তা-দর্শন	২৭৭
ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ	খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির কাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেম	২৮৭
ড. তাহমিনা বেগম	আধুনিক ফারসি কাব্যের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য	৩০১
ড. বেবী বিশ্বাস	সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বরান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ: একটি পর্যালোচনা	৩১১
ড. জুয়েলী বিশ্বাস	বেদে দেবভাবনা	৩২৫
ড. জয়শ্রী দাষ	শ্রীমদ্ভগবদগীতার 'কর্মযোগ' এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা	৩৩৭
ড. মোছা. এলিনা আখতার পলি	কালিদাসের রচনায় প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি	৩৪৭
ড. মো. রশিদুল আলম	উর্দু নাটকের উন্নয়নে রওনক বেনারসী : একটি পর্যালোচনা	৩৬১
ড. মো. মোকাররম হোসেন মন্ডল	উর্দু সাহিত্যের ইতিবৃত্ত: একটি ঐতিহাসিক সারসংক্ষেপ	৩৭১

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

সরদার ফজলুল করিমের রাজনৈতিক চিন্তা: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ড. মো. আনিসুজ্জামান*

Abstract: The political thought of Sardar Fazlul Karim is derived from the reality of life. His political thought was developed by every stage of his struggle of life. The temporal context is essential in analyzing the philosophy and thought of a political and social thinker. Sardar Fazlul Karim was born in the British colonial rule and his graduation was completed at the edge of British rule. His professional and political life started in Pakistan period. Sardar breathed the air of sovereign Bangladesh. He was a political leader and activist. Leaving politics he worked at Bangla academy and later worked as a teacher in the department of political science at the University of Dhaka. He translated many of the fundamental books of western philosophy which enriched philosophy of the Bangalee. He was a Marxist Bangalee philosopher. His thinking is similar to that of Epicuras and his philosophy of life as well reflects Stoic philosophy. However, his political thoughts were embedded in the Marxist tradition.

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের অন্যতম চিন্তাবিদ সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪) রাজনীতি করেছেন। রাজনৈতিক কর্মী থেকে নেতায় পরিণত হয়েছেন। রাজনীতির মাঠ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি পরিণত হয়েছেন তাত্ত্বিক নেতায়। পুস্তক অধ্যয়ন করে রাজনীতির মাঠে তিনি সক্রিয় ছিলেন না। প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সন্তান সরদার ফজলুল করিমকে শ্রেণীসংগ্রাম বোঝার জন্যে রাজনৈতিক ক্লাসে যেতে হয়নি। দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবন জগৎ ও রাজনীতি উপলব্ধি করেছেন। স্কুল জীবনে বিপ্লবী সংগঠন আরএসপি'র সংস্পর্শে এসেছিলেন। দাঙ্গার শহরে সরদারের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবন অতিবাহিত হয়েছে। বিশ্বরাজনীতি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। যুদ্ধের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের লাশ দেখেছেন সরদার। খাবার নেই, পড়নের কাপড় নেই, ঔষধ নেই। মানুষ নামের তৃতীয় বিশ্বের মানবেতর প্রাণীর জীবন সংগ্রাম সরদারের রাজনৈতিক দর্শনের প্রথম পাঠ। তিনি দেখেছেন নিরন্ন মানুষের হাহাকার। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রাজপথ লাল হয়ে যাচ্ছে। এ পাড়ার মানুষ ও পাড়ায় যেতে পারছে না। ওরা মানুষ নয়, হিন্দু অথবা মুসলিম। হাতে তাদের খড়্গ, মনে হিংসা। সরদার লিখেছেন:

> ঢাকার দাঙ্গা আমাদের সেকালের ম্যালেরিয়ার মতো আমরা সহ্য করেছি। তা নিয়ে জীবনযাপন করেছি। মহামারী আকারে ঢাকায় কখনো দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েনি। গণহত্যা ঘটেনি। দাঙ্গা বাধলে তার শিকার অবশ্য নিরীহ পথচারীরা হয়েছে। যারা গ্রাম থেকে হঠাৎ শহরে এসেছে। কোনটা প্রধানত হিন্দু পাড়া, কোনটা মুসলমান পাড়া, তা যার জানা নেই।[১]

নিরাপত্তাহীন উদ্বাস্তু উদ্বিগ্ন বাস্তুচ্যুত মানুষের নীরব কান্না সরদার প্রত্যক্ষ করেছেন। নিরন্ন নিরাপত্তাহীন উদ্বিগ্ন মানুষের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে সরদার ছিলেন একাট্টা। মানুষ বাঁচানোর সংগ্রামে তিনি নিশ্চিত জীবনের পথ ছেড়ে সংগ্রামী জীবনের অনিশ্চিত রাস্তায় স্বেচ্ছায় নেমে আসেন। গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্যে আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন বেছে নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে বসবাস করছেন প্রান্তিক চাষিদের সঙ্গে। শ্রমজীবী মানুষের সীমাহীন কষ্টের জীবন-সংগ্রামে যুক্ত হয়েছেন। কখনো গোয়াল ঘরে গরু ছাগলের সঙ্গে রাত্রিযাপন, কখনো ভাত-রুটির পরিবর্তে শুধু কাঁঠাল খেয়ে দিনের পর দিন থাকতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। হতদরিদ্র গ্রামীণ মানুষের ভালোবাসা শোষণহীন সমাজ নির্মাণে সরদারকে অনুপ্রাণিত করেছে। গ্রামের প্রান্তিক চাষি, শ্রমজীবীরা মানসিকভাবে গরিব নয়। বছরের পর বছর শোষণ নির্যাতনে শ্রমজীবী মানুষ পুষ্টিহীন মানুষে পরিণত হয়েছে। এই মানুষগুলো আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা হারায়নি। নেতৃত্ব এবং দিকনির্দেশনার অভাবে শ্রমজীবী শোষিত-বঞ্চিত মানুষ অসংগঠিত। এই মানুষগুলোর সম্মিলিত সামাজিক শক্তি শ্রেণীহীন-শোষণহীন সমাজ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সরদার

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ফজলুল করিম শ্রমজীবী অসংগঠিত মানুষকে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করার উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। পার্টির নির্দেশে গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন এবং পার্টির দায়িত্ব নিয়েছেন। এই বাস্তবতায় তিনি মানুষের শ্রেণীগত অবস্থান উপলব্ধি করে লিখেছেন:

> আমি একটু-আধটু শ্রেণীগত বিশ্লেষণের চেষ্টা করি। অপর কারুর জন্য নয়। নিজে বোঝার জন্য। 'ব্যাপারটা কি?' –এই ধরনের আত্ম-প্রশ্নের আত্ম জবাব হিসেবে। শ্রেণীগত বিশ্লেষণ একেবারে নিরর্থক নয়। আসলে কোনো ব্যক্তিই তো পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন কোনো অস্তিত্ব নয়। একজন ব্যক্তি হয় বড় লোক, নয় গরিব। নয়তো মাঝামাঝি। এই বড় লোক, গরিব আর মাঝামাঝি-এতো কেবল তার সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে নয়। তার সম্পদ আহরিত হয় কোনো মাধ্যমে, কোনো ব্যবস্থায়। এবং সেই মাধ্যম বা ব্যবস্থাই হচ্ছে বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। একেই একটু তাত্ত্বিকভাবে বলা হয় ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থান।[২]

সরদার ফজলুল করিমের রাষ্ট্রচিন্তাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না। জীবন সংগ্রামের ধাপে ধাপে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা গড়ে উঠেছে। সরদার লিখেছেন, "যে কোনো চিন্তানায়কের দর্শন এবং চিন্তার সঠিক মূল্যায়নের জন্য আমাদের স্থান এবং কালের একটি প্রেক্ষিত বোধ থাকা আবশ্যক।"[৩] সরদার ফজলুল করিমের জন্ম ব্রিটিশ উপনিবেশিক ভারতবর্ষে। শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে ব্রিটিশ শাসনের বিদায়লগ্নে। পাকিস্তান উপনিবেশিক রাষ্ট্রে সরদারের কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। স্বাধীন বাংলাদেশে সরদার স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করেছেন।

শিক্ষা জীবনের মার্কসবাদী দর্শনের দীক্ষা সরদার জীবনদর্শনে রূপান্তরিত করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক থেকে কর্মী এবং নেতায় পরিণত হয়েছিলেন তিনি। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জেল-জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন। পার্টির নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিলেন, আবার পার্টির নির্দেশ অমান্য করে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বের হয়েছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ তিনি ত্যাগ করে কোনো সুবিধাবাদী লাইনে আত্মনিয়োগ করেন নি। আত্মসুখ থেকে তিনি বিরত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট সম্পর্কে সরদার বলেছেন:

> আমি তো কমিউনিস্ট পার্টির কেউ ছিলাম না। I was a communist by myself. I was not a communist by membership. এখানে একটা পার্থক্য আছে। আমি মনে করি আগে কমিউনিস্ট হওয়ার ব্যাপার তারপরে আসবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের প্রসঙ্গ। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েও কমিউনিস্ট হওয়ার গ্যারান্টি নাই। আগে conception about humanity, conception about man. এগুলো। পার্টি কর্তৃক চেতনা জাগ্রত করার কথা তুমি বলেছ। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। পার্টি যেটা পারে তাহলো ব্যক্তির মধ্যেকার যে conception সেটাকে প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা। সুতরাং পার্টির ব্যাপারটা আসবে conception'র পরে। যখন মার্কস কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো লেখার জন্য এত পরিশ্রম করেন তখন কি তিনি পার্টির মেম্বার ছিলেন? যারা বিত্তহীন, অসহায় তাদের জন্য মার্কসের যে বোধ সেটাই আগের কথা। বোধ স্পষ্ট না থাকলে পরে একটা সংগঠন যদি ভেঙে যায় তখন সংগঠনের সদস্য মনে করে যে তার আদর্শই ভেঙ্গে গেছে! কতগুলো পার্টি গড়ে উঠল বা ভেঙ্গে পড়ল তার সঙ্গে কমিউনিস্ট থাকা না থাকার ব্যাপারটা জড়িত থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। একজন কমিউনিস্ট তার বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই কমিউনিস্ট।[৪]

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেও তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন। কমিউনিস্ট হিসেবে তাঁর অহঙ্কার উর্ধ্বগামী। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তিনি শুধু পর্যবেক্ষক ছিলেন না; তিনি ছিলেন রাজনীতিবিদের আস্থার প্রতীক। নীতি-আদর্শের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। রাজনৈতিক দল তিনি ছেড়েছেন কিন্তু রাজনীতি তাকে ছাড়েনি। তিনি বলেছেন:

> আমি তো বলছিই যে আমি পর্যবেক্ষণকারী হিসেবেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। তবুও কখনো কখনো দায়িত্ব পেয়েছি। যেমন বরিশালের নলিনদাস আমাকে বক্তৃতা করার জন্য নিয়েছিলেন। এছাড়াও মুসলিম কমরেডরা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেত। আসলে I was much beloved boy of the Communist Party. সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, জ্ঞান চক্রবর্তী, ফনি গুহ কতজনের ভালোবাসার

> কথা আমি বলব। আমার অপার ভাগ্য যে আমি তাদের পেয়েছিলাম। সেজন্যই আমি শাহ আজিজুর রহমান না হয়ে সরদার ফজলুল করিম হয়েছি।[৫]

রাষ্ট্র ও রাজনীতি সরদার ফজলুল করিমের চিন্তার প্রধান কেন্দ্র। রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে তিনি লিখেছেন। রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে তাঁর রয়েছে নিজস্ব চিন্তা। সরদার ফজলুল করিম পাশ্চাত্য রাষ্ট্রতত্ত্বের চিরায়ত কয়েকটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেছেন। রাষ্ট্রতত্ত্বের গ্রিক চিরায়ত গ্রন্থ থেকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। হবস, লক, রুশোর রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনার মধ্যে দিয়ে সরদারের রাষ্ট্রচিন্তা চূড়ান্তরূপে পরিস্ফুটিত। রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থের অনুবাদকের ভূমিকায় সরদার লিখেছেন:

> পণ্ডিত হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) যখন প্রকৃতির রাজ্যের মানুষকে দেখান পরস্পর হিংসাত্মক, পরস্পরকে হত্যাকারী হিসেবে, তখন রুশোর বলতে অসুবিধা হয় না যে, আদিতে সেই প্রকৃতির রাজ্যেও মানুষ মানুষই ছিল : পরস্পরের প্রতি আবেগ, সহানুভূতি, রাগ এবং অনুরাগে পূর্ণ মানুষ। তবে সে মানুষের কেন আবার প্রকৃতির রাজ্যেও অতিরিক্ত বা ‘স্টেট অর নেচারের’ অতিরিক্ত সিভিল বা রাজনৈতিক রাষ্ট্র তৈরি করার প্রয়োজন পড়ল, সে প্রশ্নকে রুশো উপেক্ষা করেনি।[৬]

হবসের মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে জন লক বলেন, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ শান্তিপূর্ণ ছিলো। সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতির রাজ্য ত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে সিভিল সমাজ গঠন করে। প্রকৃতির রাজ্যের প্রকৃতির আইনের উদ্ভাবন ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের নতুন কিছু নয়। লকের উদ্ভাবিত প্রকৃতির আইনের ধারণাটি স্কলাস্টিক দর্শনের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন:

> ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। ব্যক্তি নিয়ে রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্র কি ব্যক্তির হুবহু প্রতিরূপ? রাষ্ট্র কি ব্যক্তির বৃহত্তর আকার মাত্র? সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি মৌল প্রশ্ন। প্লেটো তার *রিপাবলিক* গ্রন্থে রাষ্ট্রের গঠন এবং প্রকৃতি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। একটি রাষ্ট্রকে তার প্রাথমিক সংগঠন থেকে শুরু করে তার শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত তিনি উদ্ঘাটিত করে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। রাষ্ট্র সংগঠনের গোড়ার কথা বলতে গিয়ে প্লেটো সঠিকভাবেই বলেছেন : ব্যক্তির প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। প্রয়োজনের তাগিদে ব্যক্তি ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাষ্ট্র তৈরি করে।[৭]

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ কখনো একা ছিলো না। মানুষ সবসময় ছিলো দলবদ্ধ। দল-উপদলে বিভেদ-দ্বন্দ্ব-সমন্বয় হয়েছে। দল-উপদলে ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছে গোত্রের। খাদ্য এবং নিরাপত্তার জন্যে মানুষের দ্বন্দ্বমান দলগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ শুধু মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলো না। প্রকৃতির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা রুখতে হয়েছে। “ইউরোপের তুষারাবৃত বনভূমি এবং ইন্দোনেশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনোভূমিতে মানুষকে বাঁচার কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছে।”[৮] প্রতিকূল পরিবেশের সাথে মিলাতে গিয়ে মানুষের বিবর্তন হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পথে। শীত, গ্রীস্ম, বর্ষা, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি কোনো কিছুই মানুষের দখলদারি মনোভাব রুখতে পারেনি।

সমাজের বিকশিত রূপ হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্র থেকে সৃষ্টি হয় সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য থেকে পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন দেখেছে মানুষ। যুদ্ধবাজ আলেকজান্ডার, চেঙ্গিশ খান, সুলতান সুলেমান পৃথিবী জয়ের স্বপ্নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। সরদার ফজলুল করিম মনে করেন:

> রাষ্ট্র একটি যৌগিক সংস্থা। এই জটিল যৌগিক সংস্থার চরিত্র সঠিকভাবে বোঝার উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রকে উত্তমরূপে শাসন বা পরিচালনার প্রশ্ন। আদর্শ রাষ্ট্র সংস্থা সকলেরই কাম্য। কিন্তু ন্যায়ের একটি আদর্শ ভাব সামনে রাখাই কি রাষ্ট্রকে উত্তম করার জন্য যথেষ্ট? রাষ্ট্র সংস্থাকে যদি উত্তম করতে হয় তাহলে রাষ্ট্র সংস্থার সঠিক চরিত্রকে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং তাকে অনুধাবন করেত হবে।[৯]

ব্যক্তিকে নিয়ে রাষ্ট্র। বহু ব্যক্তি মিলে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের বিকাশের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কোনো ব্যক্তি ইচ্ছে করলে রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারেন না। দাসদের শ্রম ও সমুদ্র বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে গ্রিসে নগর রাষ্ট্র বিকশিত হয়েছিল। প্লেটোর সময় গ্রিসের নগর রাষ্ট্রের পতন শুরু হয়। অ্যারিস্টটলের সময় নগর-রাষ্ট্র থেকে সাম্রাজ্যের সূচনা পর্ব।

> নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল এথেন্স এবং স্পার্টা। নগর-রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষিকার্য, হস্ত শিল্প, খনির ধাতব পদার্থ নিষ্কাশন এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য। এ অর্থনীতির চালিকাশক্তি ছিল প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহের বন্দি এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যপোতের ওপর আক্রমণ এবং লুণ্ঠনের মাধ্যমে সংগৃহীত দাসকুল।[১০]

গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলোতে দাসদের কোনো অধিকার ছিল না। নারীর নূন্যতম মর্যাদা নগর-রাষ্ট্রে ছিলো না। এথেন্সের চার লক্ষ অধিবাসির মধ্যে আড়াই লক্ষ ছিলো দাস। মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি দাস। গ্রিসে নগর-রাষ্ট্র বিকাশের কয়েক শত বৎসর আগে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষে অনেকগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্র ছিলো। বৈশালী, মগধ শক্তিশালি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। ভদ্রবাহুর *কল্পসূত্র* গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে:

> আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তবাসী ক্ষত্রিয় শাক্য ও লিচ্ছবীদের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই গণতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল। রাজর্ষি জনকের সময় দেশের শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ঘন ঘন বিদ্বৎসভার অনুষ্ঠান তাহার রাজ্যে হইতো, এবং সেই সব সভা, সমিতি ও পরিষদে বক্তৃতা ও বিচার করিবার অধিকার নর-নারী নির্বশেষে সকলেরই ছিল কোনো বাধা ছিল না। সম্ভবত শাসন ব্যবস্থাতেও তিনি জনমতের অনুসরণ করিতেন। সে যাহাই হোক, খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতকে এ দেশে গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[১১]

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগুলো মিলে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিলো। সাম্রাজ্য পরিচালিত হতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সাম্রাজ্যে কোনো একক রাজা ছিলো না। রাজার কথাই আইন প্রাচীন ভারতবর্ষে তা গুরুত্ব পায়নি। মগধের রাজা অজাতশত্রু রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন। ত্রিপিটকের অঙ্গুলিমাল সূত্তে দেখা যায়, ব্যবসায়ি এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে কোশলরাজ প্রসেনজিত ডাকাত অঙ্গুলিমালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচলিনার পূর্বে গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পরামর্শের উদ্দেশ্যে। সে সময় চেটকের সাম্রাজ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো।

> নয়জন মল্লী ও নয়জন লিচ্ছবী (লেচ্ছকী) 'গণ রাজা' (Confederate princes) লইয়া বৈশালীপতি চেটকের সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্য বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, তাহা ছিলনা। সাম্রাজ্য সংক্রান্ত কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিবার সময় চেটক পূর্বোক্ত অষ্টাদশ গণরাজাকে লইয়া পরামর্শ করিতেন এবং সকলের মতে যাহা স্থির হইত তাহাই তিনি মানিয়া চলিতেন। এইভাবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রণালীতেই বৈশালীর রাজকার্য পরিচালিত হইত।[১২]

সরদার ফজলুল করিম রাষ্ট্র বিকাশের নিয়মগুলো সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ইউরোপ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক নীতির উপর তাঁর কোনো আস্থা ছিলো না। শোষণ-নির্যাতন, অত্যাচারী রাষ্ট্রনীতির তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন মানুষের কল্যাণে মানুষ রাষ্ট্র নির্মাণ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্যে মানুষ আইন, রীতি-নীতি সৃষ্টি করেছে। কতিপয় মানুষের সুযোগ-সুবিধা আরাম-আয়েশের জন্যে রাষ্ট্রের আইন নয়। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরিতা-হিংসা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ করার জন্যে নয়। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে শোষণ করার জন্যেও নয়। বাজার অর্থনীতির নামে শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল পরিষ্কার। তিনি লিখেছেন:

> গ্লোবাল রাষ্ট্র আজ বাস্তব সত্য এবং তার মনোমালিক তথা নতুন হিটলার হয়ে দাঁড়িয়েছে বুশ। হাতে আছে তার আমেরিকার অস্ত্র কারখানার অজ্ঞাত সংখ্যক পরমানু-অস্ত্র, মিশাইল, ট্যাংক বিমান আর নৌবাহিনী। সমস্ত পৃথিবীর সর্বত্র ঘাটি বানিয়ে মার্কিন শক্তি এই সমস্ত মরণাস্ত্র মজুত করে বোতাম টেপার অবস্থায় রেখেছে। আদিকাল থেকে অতিক্রান্ত সময়ে কোন দানবীয় শক্তির ঠাণ্ডা মাথায় পৃথিবী ধ্বংসের ব্লুপ্রিন্ট তৈরির এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তবু পক্ষা-পক্ষী ছিল। কালক্রমে এ্যাক্সিস আর মিত্রশক্তি বলে দুটো পক্ষ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই মার্কিন শক্তি নতুনতর ধ্বংসযজ্ঞের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে শুরু করে। '৪৫ সালের যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে পরমানু বোমা নিক্ষেপ করে মার্কিন শক্তি নিমিষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তখনো সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা প্রতি শক্তি হিসেবে অস্তিত্ব ছিল। সেই প্রতি শক্তির পতন ঘটিয়েছে মার্কিন পরাশক্তি ক্রুশ্চেভ থেকে শুরু করে গর্বাচেভ তার ইয়েলেৎসিন পর্যন্ত বিস্তারিত অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র এবং বাইরের মার্কিনী রিগানদের যৌথ ষড়যন্ত্রে। আজ

> মার্কিন শক্তিই এই গ্লোবে একমাত্র পরাশক্তি। এর কোন বিপক্ষ নেই। এই শক্তি যাকে যখন বৈরী এবং বিপক্ষ বলে ঘোষণা করেছে তাকে তখন ধ্বংস করে দিচ্ছে।[১৩]

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর আস্থাশীল সরদার ফজলুল করিম পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। আমেরিকান পুঁজিবাদের আগ্রাসী নীতি তিনি কোনোভাবেই সমর্থন করেননি। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তিনি সমর্থন করতেন। সরদার ফজলুল করিম মনে করেন, "পুঁজিবাদের স্বভাব হচ্ছে পুঁজি সৃষ্টি করা। কম থেকে বেশি। বেশি থেকে আরো বেশি। এজন্য একদিন সে ভূমিদাসকে সামন্ততন্ত্রের বেড়া ভেঙ্গে কলের শিকলে বেঁধে দিয়েছিল। ভেবেছিল তার হুকুম মতোই দু'হাতী প্রাণীগুলো কেবল কলকব্জার নাট বল্টু টাইট করবে আর ভারে ভারে তার শ্রমের ফসল পণ্য দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।"[১৪] প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা থেকে ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। আদিম সাম্যবাদী সমাজে দুর্বলকে সবল শোষণ করেছে। শিকারী মানুষ সবাই শিকারের পশু কিংবা আহরিত ফলমূল ফসলের সমান ভাগ পেয়েছে, এমন ভাবার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। দশ লক্ষ বছর পূর্বে কৃষির উদ্ভবের সময় থেকে ভূমিদাস প্রথার সূচনা হয়। কৃষির উদ্ভাবনে নারীর ভূমিকা থাকলেও ফসলের নিয়ন্ত্রণে ছিলো গোত্র প্রধান। উদ্বৃত্ত ফসল জমা হয় গোত্র প্রধানের গোলায়। উদ্বৃত্ত ফসল থেকে ব্যক্তি মালিকানার সৃষ্টি। শিকারী সংগ্রামী মানুষ যুথবদ্ধ হয়ে শিকার এবং নিরাপত্তার জন্যে একত্রে বসবাস করতো। কিন্তু শিকারী মানুষের গোত্র প্রধান ছিল।

হোমো স্যাপিয়েন্স পুষ্টি সংগ্রহ, বংশ বিস্তার এবং অবসর সময়ে গল্প ও কল্পকাহিনী সৃষ্টি করতো। গল্প করার প্রবনতা থেকে সৃষ্টি হয় শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তি মালিকানা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়ায়। পুঁজিপতিরা বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোকে প্রযুক্তির আবরণে পুঁজি বড় থেকে আরো বড় করে। শ্রমজীবী মানুষ পুঁজির নাটবল্টু ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রমজীবী মানুষ পুঁজির উৎপাদক কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের উপর তাদের কোনো অধিকার নেই। পুঁজি নিরাপত্তার জন্যে নিরাপদ রাষ্ট্র অর্থাৎ প্রথম বিশ্বে চলে যায়। পুঁজি নিজেই নিজের চালিকা শক্তি। সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন:

> মার্কস-এঙ্গেলস দেখালেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমিককে কেমন করে একদিনের প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের বাহন দাস আজ জটিল যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ছে ; আর কেমন করেই বা দাসপ্রভু আজ পুঁজি আর শ্রমিকের একচেটিয়া মালিকে পরিণত হয়েছে। এ বিশ্লেষণ ইতিহাসের বিশ্লেষণ, কল্পনার ফানুস নয়। বঞ্চিতের বেদনা অতীত কালেও বহু সমাজকর্মী ধর্মপ্রাণ মহৎ ব্যক্তি কিংবা দার্শনিক বোধ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের এ বিশ্লেষণ কেবল উনবিংশ শতাব্দীতেই সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তি হিসাবে মার্কস তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং মহৎ মানুষের মন নিয়ে সংখ্যাধিক নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতির মূল কারণটিকে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। শুধু নির্যাতিত মানুষের জন্য নয়, মনুষ্য সমাজের জন্যই তাঁর সে অবদান মানুষের জ্ঞান এবং সমাজের অসঙ্গতি দূরীকরণের মানবিক প্রচেষ্টায় এক অনন্য বিপ্লব সাধন করেছে।[১৫]

সমাজের অসঙ্গতি দূর করার জন্যে গৌতম বুদ্ধ চেষ্টা করেছেন। আদর্শ সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করে কীভাবে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে তার উপায় উপস্থাপন করেছেন। ভারতবর্ষের সপ্তম শতকের দার্শনিক আচার্য শান্তিদেব আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন:

> পৃথিবীতে সুখোৎসব সৃষ্টি করিতে হইলে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা দেশ, নানা জাতি বা নানা জনরূপে না দেখিয়া এক অখণ্ড পৃথিবী বা প্রাণিলোক হিসাবে দেখিতে হইবে। দুঃখকে আমার দুঃখ, তাহার দুঃখ, এ জাতির দুঃখ, এ দেশের দুঃখ এই ভাবে বিচ্ছিন্ন না দেখিয়া এক অখণ্ড দুঃখরূপে দেখিয়াই তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। নচেৎ পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর হইবে না।[১৬]

পৃথিবীর এক স্থানে এক দেশে শেষাণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক শাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সব দেশেই শ্রমজীবী মানুষ শোষিত-বঞ্চিত-নির্যাতিত। কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। পৃথিবীর সব দেশেই শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পক্ষে তাদের অবস্থান। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো একে অপরকে শোষণ করছে। পুঁজির কাছে মানবতা- মানবিকতা-মানবতত্ত্ব অর্থহীন। বাজার অর্থনীতিতে ক্রেতা একমাত্র সত্য। ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্যে

অন্য সবকিছুর আয়োজন। মার্কস-এঙ্গেলস পুঁজিবাদের ত্রুটি সংশোধন করে শোষণ-মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দলিল মানব-সমাজের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সরদার লিখেছেন:

> মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েই মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর গভীর গবেষণার মাধ্যমে এক নতুন দিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৭ সালে মার্কস-এঙ্গেলস্ ব্রুসেলস শহরে সাম্যবাদী দল নামে একটি গোপন শ্রমিক সংস্থা সংগঠিত করেন। এই সংগঠনের দ্বিতীয় কংগ্রেসে দুই বন্ধু 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' বা 'সাম্যবাদের ইশতেহার' (১৮৪৮ সালে) রচনা করেন। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' মার্কসবাদের অন্যতম মৌলিক দলিলবিশেষ। এই ইশতেহারের মধ্যে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তীক্ষ্ণভাবে ইতিহাসের দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের তত্ত্ব বিবৃত করে উনবিংশ শতকের ইউরোপে শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিবাদের গর্ভে নতুন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য শক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১৭]

মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ভাবিত তত্ত্ব বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করে শোষণ-মুক্তির স্বপ্ন দেখে। ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কার্ল মার্কস মানব সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসবাদ কোনো কাল্পনিক মতবাদ নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন। বিজ্ঞান গতিশীল। মার্কসবাদ স্থির কোনো মতবাদ নয়। বিজ্ঞানের মতো মার্কসবাদ বিকাশমান। মার্কস দেখান, সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভব থেকে বিচ্ছিন্নতা সমস্যার শুরু। ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ হলে মানবিক সমাজ গঠন সম্ভব। সরদার লিখেছেন:

> মার্কস এঙ্গেলস বলেছেন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক যে নিয়মে একদিন দাস সমাজ সামন্ত সমাজে এবং সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই নিয়মে অনিবার্যভাবে পুঁজিবাদী সমাজ রূপান্তরিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং একদিন মানুষ তৈরি করবে সাম্যবাদী সমাজ। আজকের সমাজের রূপান্তরের বড় নিয়ামক শ্রমিক শ্রেণী। বস্তুবাদী দর্শন তার জীবন দর্শন।[১৮]

সমাজ নিজে নিজেও রূপান্তিত হয়। সমাজকে কখনো কখনো পরিবর্তন করতে হয়। মানবিক সমাজ অর্থাৎ যে সমাজের প্রতিটি সদস্য সমান সুযোগ সুবিধার মধ্যে বড় হবে, এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে বিপ্লব অনিবার্য। সরদার মনে করেন, "সমাজের পুঁজিবাদী যুগের সবচেয়ে শোষিত এবং সবচেয়ে অগ্রসর বিপ্লবী শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী।"[১৯] বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে মানবিক সমাজ অর্থাৎ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে সরদার ফজলুল করিমের চিন্তা-চেতনা বিকশিত হয়েছে। মার্কসীয় দর্শনে আস্থা রেখে তিনি বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্র নির্মাণের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, "মার্কসবাদ হচ্ছে মানুষের সমাজ এবং জগতকে সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার সর্বাধিক পরিপূর্ণ দর্শন।"[২০] উপনিবেশিক রাষ্ট্রকে সরদার মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মনে করতেন পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাংলার শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। পাকিস্তানের চেয়ে পাকিস্তানিজমের বিরুদ্ধে সরদার ফজলুল করিমের অবস্থান ছিলো পরিষ্কার। সরদার লিখেছেন, "পাকিস্তান সরকার ধর্মীয় গোঁড়ামিকে পুনর্জাগরিত করার অধিকতর সচেতন চেষ্টায় নেমে পড়ল। আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত শক্তি সে নিয়োগ করল বাংলাদেশের মানুষের মনে ধর্মীয় কুসংস্কার সৃষ্টি করতে।"[২১] মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে থেকে পাকিস্তানিজম উপলব্ধি করা কঠিন। রাজনীতির মাঠে পাকিস্তানের শাসকদের বিরোধিতা করেও অনেক রাজনৈতিক নেতা ভেতরে ভেতরে পাকিস্তানিজম লালনপালন করেছেন যত্নের সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও পাকিস্তানিজম বাংলাদেশের রাজনীতিতে হ্রাস পায়নি। সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন:

> পাকিস্তানিজম ব্যাপারটা সীমিত নয়। এটা সুদীর্ঘকালের পরিকল্পনা প্রসূত। ব্লু-প্রিন্ট। ভারতীয় উপমহাদেশে যাতে করে একটা মানবিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে না পারে, যাতে মানুষ কখনো মানুষ হতে না পারে, যাতে মানুষ মানুষকে মারে- এই লক্ষ্য থেকেই পাকিস্তানিজম তৈরি হয়েছে। এটা একদিনে হয় নি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করার পর তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এই বলে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে entire East Bengal has gone red.[২২]

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানিজমের মধ্যে থেকে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি চেয়েছেন। আবুল হাশিম পাকিস্তানিজম থেকে মুক্ত ছিলেন না। মওলানা আজাদ সোবহানীর অনুসারী ছিলেন আবুল হাশিম। আজাদ সোবহানী সম্পর্কে আবুল হাশিম লিখেছেন, "তিনি আমাকে রব্বানী দর্শনে দীক্ষিত করেছিলেন। রব্বানিয়াৎ শব্দটি স্রষ্টার গুণবাচক 'রব' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং বিবর্তক।"[২৩] রব্বানীয় দর্শন থেকে আবুল হাশিমের চিন্তার পরিবর্তন হয় নি। রব্বানীয় দর্শন প্রচারের জন্যে তিনি বাংলাদেশে 'রাব্বানী পার্টি' গঠন করেছিলেন। রব্বানীয় দর্শন আর পাকিস্তানিজমের মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামিক একাডেমির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আবুল হাশিম। সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন:

> পাকিস্তানিজম জিনিসটা কত ভয়ংকর সেটা বড় বড় সব লোকেরাও বুঝতে পারেনি। তাহলে কিভাবে আশা করবো যে স্বাধীনতার তিন চার বছরের মধ্যেই সব একেবারে পাল্টে যাবে! এ হয় না। একটা সমাজ পরিবর্তন করাটা কত বড় ব্যাপার তা অনেকেই বুঝতে পারে না। পাকিস্তানিজম ঠিকমত বুঝতে না পারার কারণে শেখ মুজিব এমনকি নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারটাও সেভাবে করেন নি। অবশ্য ঠিকঠাক নিরাপত্তা নিলেই মুজিব বেঁচে যেতেন এমন নয়। নানান ফোর্স সর্বক্ষণই কাজ করে।[২৪]

পাকিস্তানিজম এবং পাকিস্তান এক নয়। স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানিজমের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ইজম তৈরির কাজ এগোয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানিজমের উপদানগুলো সক্রিয় ছিলো। সরদার লিখেছেন, "Pakistanism কি জিনিস, এটা কি মুজিব যথার্থই বুঝতে পারছিলেন? যেমন পেরেছিলো কম্যুনিস্টরা। বুঝতে পারেন নাই বলেই মুজিব বাংলাদেশ তৈরি করেছে কিন্তু anti-Pakistanism তৈরি করতে পারে নাই।"[২৫] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সরদার ফজলুল করিমের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আন্তরিকতা কোনো অংশে কম ছিলো না। তিনি মনে করেন, "বাংলাদেশের দুর্জয় সংগ্রাম আর সাহসের প্রতীক শেখ মুজিব যেন ব্যক্তি শেখ মুজিবকে অতিক্রম করে গেছে।"[২৬] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সৃষ্টিই হলো পাকিস্তান বিরোধী মতবাদ হিসেবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর পাকিস্তান বিরোধী মতবাদ স্থায়ী রূপ নেয়নি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের পর স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানিজমের দ্রুত প্রসার ঘটে। সরদার ফজলুল করিম মনে করেন, "এই উপমহাদেশকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের যে নীল-নকশা, সেটা মুক্তিযুদ্ধের ফলেও শেষ হয়নি। ব্রিটিশ আমলে এবং পাকিস্তান আমলে বেছে বেছে সেই লোকগুলোকেই নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হয়েছে যারা মানুষের সৌহার্দ্য চায়, সম্প্রীতি চায়। যারা একটা মানবিক সমাজ চায়।"[২৭] বাংলাদেশের সামরিক বেসামরিক স্বৈরশাসকেরা মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানবিক সমাজ নির্মানের অগ্রসৈনিকদের উপর ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলের মতো অত্যাচার-নির্যাতন দমন-পীড়ন অব্যাহত রাখে। স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানিজমের প্রসার ঘটে।

> মানুষের প্রবৃত্তি হচ্ছে যে সে সহজ জবাব চায়। খেয়াল করলে দেখবে যে বাগানের চারপাশ দিয়ে না হেঁটে মানুষ বাগান মাড়িয়ে কোনাকুনি হাঁটে। উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে বলছি যে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হলো কোথায়? সমাজতন্ত্র সবে সফল হতে শুরু করেছে। অথচ তোমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে যে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবকে আমি বলি দ্বিতীয় প্যারিকমিউন। পুঁজিবাদ শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং যেহেতু তাদের শক্তি সেহেতু ১৯৯০ সালে এসে দ্বিতীয় প্যারিকমিউনের রাজনৈতিক পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য তারা ক্রুশ্চেভ, গর্বাচেভ ইত্যাদি তৈরি করেছে। তথাপি সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আজ বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিবাদের মধ্যে আমি নতুন এক প্যারিকমিউনের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। সমাজতন্ত্রের সুদিন দেখতে পাচ্ছি।[২৮]

সরদার ফজলুল করিম ইতিহাসের সত্য জানতেন। ইতিহাসের সত্যের উপর তিনি আস্থা রাখতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়। সরদার ফজলুল করিম মনে করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন মানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পতন নয়। শোষক থাকলে শোষিত থাকবে। শোষক শোষিতের মধ্যে লড়াই থাকবে। শ্রমজীবীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন:

> সমাজতন্ত্র কোন অলৌকিক বা বিরোধহীন, সঙ্কট শূন্য, সংঘর্ষহীন, প্রশ্নহীন, সমস্যাহীন নীরব নিস্তব্ধ চিরশান্তির ব্যবস্থা নয়। সমাজতন্ত্র মানুষকে দেবতায় পরিণত করে না। সমাজতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্ক বদলে দেয়। অবশ্য একথাও ঠিক, অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্কই হচ্ছে মূল ভিত্তি, মূল কাঠামো। তার ওপরে এবং তার অনুসারেই আইন কানুন, নীতিনিয়ম, অপরাধ, দণ্ড, আচারবিচার। কিন্তু মানুষের দ্বিধাবিভক্তির কাল থেকে এই আধুনিকতম পর্যায়ের মূল দ্বন্দ্বের কথা বলতে বলা যায় যে সমাজতন্ত্র মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে এই মূল দ্বন্দ্বের অবসান সূচনা করে।[২৯]

সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যায় না। সামাজিক এবং ব্যক্তি মানুষের সমস্যা সঙ্কট বহুমুখী। মানুষের বহুমুখী আকাঙ্ক্ষা কোনো নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে সমাধান করা সম্ভব নয়। সমাজের বিকাশ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্যে সমস্যাগুলোর সমাধান কিছুটা শিথিল করা সম্ভব। কিন্তু মানুষ জৈবিক জটিল উপাদানের সমন্বয়। কোনো একটি উপাদান দিয়ে সমগ্র মানুষকে বিশ্লেষণ করা হলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে।

সরদার ফজলুল করিম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। হঠকারী বাম রাজনীতির পরিণতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। বাংলাদেশে মানুষ এবং বাংলাদেশ নিয়ে সরদারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তিনি মনে করেন:

> বাংলাদেশ ইতিহাসের নির্যাতিত দেশ। কৃষি প্রধান দেশ। আবহমান কাল থেকে সে অত্যাচারিত হয়ে এসেছে। জমিদারের হাতে। জোতদারদের হাতে। মুক্তি চেয়েছিল সেই মানুষ এই অত্যাচার থেকে। স্বাধীন হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের নিজস্ব শ্রেণী চেতনার ও সংগঠনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামন্তবাদী নেতারা বুঝিয়েছিল : হিন্দুরাই তোমার শত্রু। তোমরা মুসলমান। নির্ভেজাল মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই তোমরা মুক্তি পাবে। বাংলাদেশের মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছিল।[৩০]

সরদার ফজলুল করিম ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলের শেষের দিকে এবং পাকিস্তান আমলে এদেশের রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন বাংলা সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত ছিলো। এখানে জৈন, বৌদ্ধ শাসনের বহু পর হিন্দু এবং মুসলমানের আগমন ঘটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির অংশ হিসেবে এই অঞ্চলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে এদেশে শাসন এবং শোষণ চিরস্থায়ী করাই ছিলো পাকিস্তানি শাসক শ্রেণীর উদ্দেশ্য। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিলো পাকিস্তানী শাসন-শোষণ এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে। সংবিধানের জাতীয় চার নীতি মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গিকারের বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ। জাতীয় চারনীতির বাস্তবায়ন সম্পর্কে সরদার লিখেছেন:

> ধর্মনিরপেক্ষতা দৃঢ়মূল হবে সমাজতন্ত্রের বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়। বিকাশের অবাধ সুযোগ ব্যক্তি আর ব্যক্তিকে শত্রু মনে করবে না। সম্প্রদায় সম্প্রদায়কে নিজের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক বলে বিবেচনা করবে না। অতীতের মোহের মধ্যে নয়, সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের মহৎ স্বপ্ন, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সমগ্র জনশক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে বাঙালি নূতন মানবিক মূল্যে বলিয়ান হয়ে উঠবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নতুন আত্মশক্তির বোধে সে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। ধর্মীয় বিশ্বাস তখন ব্যক্তির মানসিক শক্তির উপায় হিসেবে লালিত হতে পারবে। সে আর শোষণ কিংবা ত্রাসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।[৩১]

সরদার মনে করতেন সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় উন্মাদনা, ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের কল্যাণে সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিকল্প কোনো শাসন ব্যবস্থায় এদেশের মানুষের কল্যাণ হতে পারে না। সরদার মনে করেন, "সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জীবনের সমস্যার বাস্তব সমাধানের উপায়ই সমাজতন্ত্র। সেই সমাধানের নামই সমাজতন্ত্র। কেউ একে ঠেকাবার চেষ্টা করতে পারে। একে পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না।"[৩২] সরদার ফজলুল করিম গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তা, মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্ম নিয়ন্ত্রিত ইউরোপের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সামন্তবাদ এবং ইউরোপীয় উদারনীতিবাদ বিশ্লেষণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশের ন্যায় স্বাধীন কিন্তু অনুন্নত দেশের সম্মুখে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের মহাসড়ক আজ উন্মুক্ত।"[৩৩] বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ কণ্টকমুক্ত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কূটকৌশলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রনায়কেরা নানা মত ও পথে বিভক্ত। ফলে শ্রমজীবী শোষিত- নির্যাতিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস আরো দীর্ঘায়িত হয়েছে। বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে মতভেদ, বিভ্রান্তি এবং আস্থাহীনতার সঙ্কট থাকলেও আদর্শিক বিরোধ সামান্যই। সরদার ফজলুল করিম মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রাষ্ট্র বিকাশের নিয়মগুলো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়।

তথ্যনির্দেশ:

১. সরদার ফজলুল করিম, *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬৯
২ সরদার ফজলুল করিম, *রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৯
৩ সরদার ফজলুল করিম, *সেইসব দার্শনিক*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৪
৪. সরদার ফজলুল করিম, *আমি সরদার বলছি*, অন্বেষা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৭৫
৫ শান্তনু মজুমদার, *জীবন জয়ী হবে*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৪৯
৬ *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, সরদার ফজলুল করিম (অনুদিত), মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৩, ১৪
৭ সরদার ফজলুল করিম, *সেইসব দার্শনিক*, পৃ. ৫৪
৮. Yuval Noah Harari, *Sapiens*, London, Vintage Book, 2014, p. 6
৯ সরদার ফজলুল করিম, *সেইসব দার্শনিক*, পৃ. ৫৬
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১১. ভদ্রবাহু, *কল্পসূত্র*, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (অনুদিত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৬, পৃ. ৮µ0।
১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮W0
১৩ এঙ্গেলস্, *এন্টি-ডুরিং*, সরদার ফজলুল করিম (অনুদিত), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ৭, ৮
১৪. সরদার ফজলুল করিম, *নানাকথা এবং নানাকথার পরের কথা*. প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২৭
১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১৬ আচার্য্য শান্তিদেব, *বোধিচর্যাবতার*, জ্যোতি পাল স্থবির (অনুদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১১
১৭ সরদার ফজলুল করিম, *সেইসব দার্শনিক*, পৃ. ৯১, ৯২
১৮. সরদার ফজলুল করিম, *নানাকথা এবং নানাকথার পরের কথা*. পৃ. ৩০
১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
২২ সরদার ফজলুল করিম, *আমি সরদার বলছি*, পৃ. ২৯৭
২৩ আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী (অনূদিত) নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৩
২৪. সরদার ফজলুল করিম, *আমি সরদার বলছি*, পৃ. ২৯৮, ২৯৯
২৫ প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৬
২৬ সরদার ফজলুল করিম, *নানাকথা এবং নানাকথার পরের কথা*. পৃ. ৯১
২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
২৮. শান্তনু মজুমদার, *জীবন জয়ী হবে*, পৃ. ৭৯
২৯ সরদার ফজলুল করিম, *সঙ্গ প্রসঙ্গের লেখা*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৬২
৩০. সরদার ফজলুল করিম, *নানাকথা এবং নানাকথার পরের কথা*. পৃ. ১০৭
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

শঙ্করের দর্শনে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ধারণা: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

ড. সন্ধ্যা মল্লিক*

Abstract: The article aims to show that in Shankara's philosophy, though God has a pragmatic value, the Brahman is the ultimate reality. At the same time it proves that the conception of God is not a barrier to absolute authority of Brahman. His philosophical view is that only Brahman is true and the world is false. Shankara claims that the visible world false in a special sense. He introduces the Maya theory in which he shows how his whole philosophy has originated from Brahman. God is another important concept in shankara's philosophy. He does not acknowledge its ultimate reality though he recognizes its practical truth. It implies such recognition that keeps the religious and moral life of the common people intact. Comprehending God, on the other hand, does not make any obstacle to the absolute theory of Brahman. Shankara's interpretation on Brahma and God therefore appears more meaningful and logical than that of the previous Acharyas.

শঙ্করাচার্য ৭৮৮* খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন। শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু ও মাতার নাম বিশিষ্টাদেবী। শঙ্করের আবির্ভাবকে ঘিরে বহু অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায়। কিংবদন্তিতুল্য সে সকল ঘটনা দার্শনিক আলোচনায় অকিঞ্চিতকর হলেও বালক শঙ্করের অসামান্য ধীশক্তির কথা স্বীকার করতেই হয়। পাঁচ বছর বয়সকালে শঙ্কর গুরুর নিকট পাঠ গ্রহণ শুরু করেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যেই তিনি সমস্ত বিদ্যা অধিগত করেন। সাত বছর বয়সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আট বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগী হন। পথিমধ্যে নর্মদাতীরস্থ ওঁকারনাথের এক গুহায় আচার্য গোবিন্দপাদের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দপাদ শঙ্করকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে অদ্বৈত-ব্রহ্মাত্মবিদ্যা শিক্ষা দেন। তাই বলা যায় শঙ্করের দর্শন হঠাৎ উত্থিত পারম্পর্যবিহীন কোন বিষয় নয়। শঙ্কর অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নন, তিনি অদ্বৈতবাদের উত্তরসাধক আচার্য। তিনি বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদী ধারার সর্বাধিক শক্তিমান দার্শনিক। গভীর ও বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর লক্ষিত হয় তাঁর রচনায়। গদ্যে ও পদ্যে লিখিত তাঁর গ্রন্থাবলী ভাবমাধুর্যে অনবদ্য। শঙ্করের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে। বহু সংখ্যক স্তোত্রের রচয়িতা তিনি। শঙ্করের স্তোত্রগুলো সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ। পদের লালিত্য ও ভাবের গভীরতা দুই-ই বিস্ময়কর। বিশেষ কোন দেবভক্তি বা পক্ষপাতিত্ব নয়; বরং সকল দেব এক অখণ্ড ব্রহ্মের বহুধা প্রকাশ একথাই তাঁর স্তোত্রের মূল প্রতিপাদ্য। শঙ্করাচার্যের মতবাদের নাম কেবলাদ্বৈতবাদ। নামান্তরে এই মতবাদ বিবর্তবাদ, মায়াবাদ, অনির্বাচ্যবাদ এবং নির্বিশেষবাদ নামেও পরিচিত। শঙ্কর তাঁর দর্শনে সকল প্রকার দ্বৈতবাদ খণ্ডন করে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদী চিন্তার ভিত্তি হলো উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র।

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ভাষ্যে ব্রহ্মের বুৎপত্তিগত অর্থের বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে যা অপেক্ষা বৃহৎ, ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সর্ববৃহৎ তত্ত্ব হওয়ায় কোন বাক্যের দ্বারা এঁকে বর্ণনা করা যায় না। ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত তত্ত্ব। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হওয়ায় ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চস্তরীয়, নিম্নস্তরীয় অথবা সমকক্ষ কোন তত্ত্বেরই অস্তিত্ব যৌক্তিকভাবে স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হওয়ায় ব্রহ্মের সমজাতীয় অন্য আর কোন তত্ত্ব থাকতে পারে না। এ কারণে ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ অসম্ভব। বিজাতীয় ভেদের অর্থ এক বস্তুর সাথে অপরাপর ভিন্ন জাতীয় বস্তুর প্রভেদ। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ববৃহৎ ও অসীম তত্ত্ব হওয়ায় ব্রহ্মাপেক্ষা উচ্চস্তরীয় বা নিম্নস্তরীয় অপর কোন ভিন্ন জাতীয় তত্ত্ব না থাকায় ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ থাকতে পারে না। স্বগত ভেদ বলতে বুঝায় একই সমগ্রের অংশসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক ভেদ। কিন্তু ব্রহ্ম এমন এক সমগ্র যা সাংশ (concrect unity) নয়, বরং এই তত্ত্ব অংশবিহীন (abstract unity)। ফলে ব্রহ্মের স্বগত ভেদ থাকাও সম্ভব

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নয়। ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত সকল প্রকার ভেদহীন। “So, the conclusion is that Brahman has no “Bhedas” at all neither external Sajatiya-Vijatiya, nor internal Svagata. Hence, Brahman is absolutely “Nirvisesa” or without any differences.”[১] অর্থাৎ ব্রহ্ম এক, অখণ্ড ও পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম সমগ্র তত্ত্ব, অংশ-অংশী সম্বন্ধ ব্রহ্মে আরোপ করা চলে না।

শঙ্কর তাঁর ভাষ্য গ্রন্থে নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেন, “অপি চ, আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে প্রিয়াদ্যবয়বত্বেন সবিশেষং ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যম্; নির্ব্বিশেষন্তু ব্রহ্ম বাক্যশেষে শ্রূয়তে, বাঙ্মনসয়োরগোচরত্বাভিধানাৎ-”[২] এর মর্মার্থ হল আনন্দময় ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ। বিশেষ বা গুণ না থাকাতে বাক্য তাঁকে ব্যক্ত করতে পারে না, মন তাকে স্ববৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করতে পারে না। সর্বভেদশূন্য নির্বিশেষ তত্ত্বে কোন গুণ বা বিশেষণ আরোপ করা চলে না। গুণজ ভেদও ব্রহ্ম সম্পর্কে স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মে গুণের অস্তিত্বের স্বীকৃতি ব্রহ্মের অভেদত্বের বাধক। কেননা গুণ স্বয়ং দ্রব্য নয়। ফলে দ্রব্য ও গুণের বিভেদ স্বীকার ভিন্ন ব্রহ্মকে সগুণ বলা যায় না। তাছাড়া ব্রহ্মে গুণ আরোপ করলে আরোপিত গুণ ব্রহ্মকে সীমিত করে। কেননা বিশেষ গুণের উপস্থিতি তার বিপরীত গুণগুলোর অভাব সূচিত করে। কিন্তু পূর্ণতত্ত্বে এইরূপ অভাব থাকা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম নির্বিশেষ বলেই ব্রহ্ম নির্গুণ। “...he is absolutely “Nirguna” or without any attributes-powers. It goes without saying that it follows from the above ‘Nirvisesatva’ or Brahman.”[৩] সর্বভেদশূন্য অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্মে গুণ আরোপ করা যায় না।

নির্গুণ, নির্বিকার, নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোন ক্রিয়ার কর্তা হওয়া সম্ভব নয়। অভাব হেতু কাম্যবস্তু প্রাপ্তির আশাতেই জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম আপ্তকাম ও পূর্ণতত্ত্ব। পূর্ণতত্ত্বে কোন কিছুর অভাব থাকতে পারে না। ব্রহ্মের কোন কিছুরই অভাব নেই, কোন কিছু প্রাপ্তির কামনাও নেই। ফলে ব্রহ্ম কোন কার্যে রত হন না। তাই ব্রহ্ম কোন কর্মের কর্তাও নন, কারণও নন। আবার ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তন ও পরিণাম সাধিত হয়। ব্রহ্ম ক্রিয়াশীল হলে সেই ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম উভয়ই ব্রহ্ম হবেন। কেননা ব্রহ্ম বহির্ভূত অপর কোন কিছুই নেই। ফলে কর্তা ও কর্ম উভয় রূপেই ব্রহ্ম পরিণাম ও পরিবর্তনের অধীন হন। কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপত অপরিণামী, নিত্য, শাশ্বত তত্ত্ব হওয়ায় ব্রহ্মের পক্ষে কোন ক্রিয়ার কর্তা বা কারণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই সৃজন পালনাদি গুণও ব্রহ্মে আরোপ করা চলে না।

ব্রহ্ম স্বরূপের এই ব্যাখ্যা শঙ্করকে যে সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করে তা তিনি প্রকাশ করলেন এভাবে: “ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।”[৪] শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেন। মিথ্যা শব্দটি তাঁর দর্শনে যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার সম্যক উপলব্ধি ব্যতীত শঙ্করের দর্শনে প্রবেশই সম্ভব নয়। ধারণাটি স্পষ্ট হয় তাঁর সত্তার স্তর বিন্যাসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ত্রিকাল অবাধিত নিত্য বর্তমান তত্ত্বই সৎ। “The principle of non-contradiction (abadha) is, in Samkara, the test of truth. Knowldge which is not contradicted is truth.”[৫] শঙ্করের দর্শনে সত্তা ও সত্যের মানদণ্ড একই। এই মানদণ্ডের আলোকে অভিজ্ঞতার জগৎকে বিচার করলে দেখা যায় জগতে আত্যন্তিক সৎ (Absolute Truth) বলে কিছুই নেই। আবার জাগতিক বিষয়গুলো একান্ত অলীকও নয়। সৎ ও অসতের মধ্যবর্তী জগতের সব বিষয়ের মিথ্যাত্বের প্রকৃতিও এক রকম নয়। ফলে শঙ্করের দর্শনে ব্রহ্মের প্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার জগতের সত্তার স্তর বিন্যাস আবশ্যক হয়ে পড়ে। শঙ্করের মতে জীবের সকল অভিজ্ঞতা আত্মার চারটি অবস্থা যথা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তূরীয়– এর মধ্যেই সংঘটিত হয়। স্বপ্নাবস্থা জাগ্রতাবস্থার দ্বারা বাধিত হয়। আবার জাগ্রত অবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বাধিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান কোন কিছুর দ্বারাই বাধিত হয় না। সত্যতার যাচাইকরণ কেবল অভিজ্ঞতার জগতেই সম্ভব। বৃত্তি জ্ঞানে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ বিদ্যমান থাকে। সুষুপ্তি ও তূরীয় অবস্থায় বিষয় অনুপস্থিত থাকে। ফলে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের ভেদ থাকে না। শঙ্করের মতে এই অদ্বয়তার অনুভব এক প্রকার সাক্ষাৎ প্রতীতি। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অনুরূপতা, বাস্তব কার্যকারিতা, সংসক্তি ইত্যাদি প্রয়োগ করে সত্যতা নিরূপণ করা গেলেও ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলো সম্পূর্ণই অকার্যকর।

একমাত্র পরমসৎ ও ত্রিকাল অবাধিত তত্ত্ব ব্রহ্মই পরমসত্তা। ব্রহ্মের সাথে জগৎ বিষয়ক যে কোন জ্ঞানের তুলনা করলে দেখা যায় এদের কোনটিই ব্রহ্মের মতো ত্রিকাল অবাধিত নিত্য বর্তমান নয়। একারণে জাগতিক বিষয়ের পরমার্থও স্বীকার করা যায় না। রাধাকৃষ্ণণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন:

> The test of truth regarding things is their correspondence with the nature of things, Samkara allows that truth and error both have reference to objects. But in the ultimate sense there is only one reality (vastu), Brahman, and no idea corresponds to it, and so all our judgements are imperfect.[৬]

শঙ্কর সত্যের মাত্রাভেদ স্বীকার করেন। অর্থাৎ জগতের সত্যতার মাত্রা ব্রহ্মের সত্যতার মাত্রা অপেক্ষা নিম্নস্তরীয়। *ছান্দোগ্য* উপনিষদে বলা হয়েছে, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমাহথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং... ।"[৭] অর্থাৎ যা ভূমা তাই অমৃত, আর যা অল্প তাই মরণশীল। ব্রহ্ম অমৃত, আর সসীম জগৎ মৃত্যু। ব্রহ্ম ও জগতের সত্যতার মাত্রা এক নয়। আমাদের জীবনের স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে তুলনা করলে উপর্যুক্ত বাক্যের সত্যতা সহজে বোঝা যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে সত্যতার মাত্রাভেদ আছে। যতক্ষণ আমরা অজ্ঞান বা মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন থাকি, ততক্ষণ জগৎ সত্য বলে অনুভব হয়। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়ে জগৎ স্বপ্নের মতো অবাস্তব বলেই প্রতীত হয়।

শঙ্কর ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন তত্ত্বের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না। শঙ্করের দর্শনে জগৎ মিথ্যা বলে বর্ণিত হয়েছে। "The Phenomenal world is generally an object of perception. But the Brahman is not an object of perception. ...For, if to be contradictory is to be false, then all the categories of the phenomenal world like cause, substance etc, are contradictory and so false".[৮] তবে মতবাদটিতে মিথ্যা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মিথ্যা অর্থ অসৎ নয়। মিথ্যা ও অসতের মধ্যে যুক্তিবিদ্যক ও অধিবিদ্যক পার্থক্য বর্তমান। শঙ্করের মতে প্রথমে যা সত্য বলে দৃষ্ট হয়, তা যদি পরবর্তীতে অপর কোন তত্ত্বের দ্বারা বাধিত হয়, তাহলে তাকে মিথ্যা বলে। মিথ্যা এক প্রকার ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ। স্বরূপস্থ রূপ প্রত্যক্ষ না করে অপর কিছু প্রত্যক্ষই মিথ্যা। যেমন স্বল্প আলোতে দড়িকে সাপ রূপে প্রত্যক্ষ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট আলোতে দড়িকে দড়ি বলে প্রত্যক্ষ না করা যায় ততক্ষণ সর্পজ্ঞান স্থায়ী হয়। দড়িকে দড়ি রূপে জানতে পারলে সর্পজ্ঞান বাধিত হয়। শঙ্করের দর্শনে এটাই মিথ্যা। মিথ্যা দুই প্রকারের হতে পারে। প্রথম প্রকারের মিথ্যা সকলের ক্ষেত্রে, সাধারণ ভাবে, দীর্ঘকাল, এমনকি জীবন ব্যাপী সংঘটিত হতে পারে। জন্ম জন্মান্তরেও এর অবসান নাও হতে পারে। এই ভ্রান্তি সহজে দূরীভূত হয় না। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেই এ প্রকারের ভ্রম দূর হয়। একে বলা হয় ব্যবহারিক মিথ্যা। দ্বিতীয় প্রকারের মিথ্যা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের জন্য সংঘটিত হয়। এ প্রকারের ভ্রান্তি সহজেই অপর কোন জাগতিক তত্ত্বের দ্বারা অপসারিত হয়। একে প্রাতিভাসিক মিথ্যা বলে।

প্রথমে সৎ বা সত্য বলে দৃষ্ট বিষয় ব্রহ্ম অথবা অপর কোন জাগতিক তত্ত্বের দ্বারা বাধিত হলে তাকে মিথ্যা বলে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ একে সত্য বলেই অনুভব হয়। এ কারণে অদ্বৈত বেদান্ত এদের এক রকমের সত্তা আছে বলে স্বীকার করে। এভাবে অদ্বৈত বেদান্তে তিন প্রকারের সত্তা স্বীকৃত হয়। প্রথমত: যা কখনই বাধিত হয় না, সেই অবাধিত জ্ঞান স্বরূপ তত্ত্বকে বলা হয় পারমার্থিক সত্তা। দ্বিতীয়ত: যে তত্ত্ব ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সত্য বলে অনুভূত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়ের সাথে সাথে বাধিত হয়ে যায়, তাকে বলা হয় ব্যবহারিক সত্তা। জগৎ ও জাগতিক সকল কিছুরই ব্যবহারিক সত্তা আছে, পারমার্থিক ভাবে এরা সৎ নয়। তৃতীয়ত: যে সকল বিষয় কিছুক্ষণের জন্য সত্য বলে প্রতীত হয় বটে কিন্তু ব্যবহার কালেই জাগতিক অপর তত্ত্বের দ্বারা বাধিত হয়ে যায়, তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলে। জগৎ ও জাগতিক সকল বিষয়ের জ্ঞান ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়ে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এগুলোর পারমার্থিক সত্যতা নেই বটে, কিন্তু এগুলো অলীকও নয়। অলীক অর্থ যা কখনই দৃষ্ট হয় না। অলীক অসৎ। অলীকের স্বীকৃতিতে যৌক্তিক বিরোধ উৎপন্ন হয়। যেমন বন্ধ্যা নারীর পুত্র, অশ্বডিম্ব, আকাশ কুসুম ইত্যাদি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও শব্দগুলো অবাস্তব বিষয় নির্দেশ করতে প্রযুক্ত হয়। অন্যদিকে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক বিষয়গুলোকে সৎ অথবা অসৎ কিছুই বলা যায় না। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দু'য়ের মধ্যে সত্যতার মাত্রার তারতম্য থাকলেও পারমার্থিক বিচারে উভয়েই অসত্তা। সুতরাং বলা যায়, শঙ্করের দর্শনে সত্তার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা– পারমার্থিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক সত্তা। সত্তার মাত্রা বিচারে অলীক কোন স্তর ভূক্ত নয়। কেননা অলীক একান্তই অসৎ। তবে সত্তার স্তর বিন্যাসে অসৎ-এর ধারণা একটি পক্ষ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক স্তরকে বিবেচনা করা যায়। সত্তার দিক থেকে দেখলে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক স্তর মিথ্যা। কিন্তু অসত্তার দিক থেকে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক স্তরের এক প্রকার সত্তা স্বীকৃত হয়। অদ্বৈত বেদান্তের এইরূপ

সিদ্ধান্ত ব্যতীত উপনিষদীয় সিদ্ধান্তের হানি ঘটে। উপনিষদ অনুসারে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় নিত্যতত্ত্ব এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছুরই পারমার্থিক সত্তা নেই।

শঙ্কর তাঁর দর্শনে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করে জগৎকে মিথ্যা বলেছেন। এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে তিনি মূল হাতিয়ার হিসেবে মায়াতত্ত্বের ব্যবহার করেন। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি বিশেষ। পরমসত্তা ব্রহ্ম এক ও অবিকারী তত্ত্ব হয়েও মায়া শক্তির দ্বারা বহু রূপে ব্যক্ত হন। শঙ্করের দর্শনে একত্ব ও বহুত্বের সম্পর্ক মায়ার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। এ কারণে মায়াবাদ শঙ্করাচার্যের দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। শ্রী প্রমথনাথ শর্মা তাঁর গ্রন্থে মায়াবাদ প্রসঙ্গে যা বলেন তা দ্বারা অদ্বৈতবেদান্ত ও শাঙ্করদর্শনে মায়ার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

> মায়াবাদ, বিবর্তবাদ বা অদ্বৈতবাদ একই সিদ্ধান্তের নাম। আচার্য শঙ্কর, এই মতের প্রাধান্য ব্যবস্থাপনা করিয়া ভারতের দর্শন শাস্ত্রকে অন্যান্য সকল দেশের সকল দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে, অতি উচ্চপদে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই মায়াবাদ আমাদের দেশে নতুন নহে, উপনিষদে আমরা মায়াবাদের অঙ্কুর দেখিতে পাই।[৯]

যদিও মায়ার ধারণা উপনিষদীয় যুগ থেকেই বিদ্যমান তবুও শঙ্করের দর্শনেই এর অবস্থান সুস্পষ্ট এবং ব্যাপ্তি প্রসারিত হয়। উপনিষদোক্ত মায়ার ধারণা থেকে শঙ্করের মায়ার ধারণা ভিন্ন এবং এর কার্যও স্বতন্ত্র।

উপনিষদে ব্রহ্মকে জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলা হয়েছে। বেদান্তের এই প্রতিজ্ঞার সত্যতা অক্ষুন্ন রেখে ব্রহ্মকে অপরিণামী তত্ত্ব রূপে প্রতিষ্ঠা করতে হলে শঙ্কর প্রস্তাবিত মায়ার ধারণার কোন বিকল্প নেই। শঙ্করের অদ্বয়তত্ত্ব মায়ার উপস্থিতিতে অধিক যৌক্তিক হয়ে ওঠে এবং এর দ্বারা জগৎবৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। শঙ্কর উপনিষদীয় মায়ার ধারণার বিরোধিতা না করে নিজ দর্শনের অনুকূলে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, প্রভাবানন্দের ভাষায় তা নিম্নোক্ত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে:

> The Upanisads, it is true, appear to consider Brahman the first cause of the universe, both material and efficient. They declare that the universe emanates from, subsists in, and finally merges in the absolute Brahman. Samkara never directly contradicts the Upanisads, although sometimes he appears to interpret them to suit his own views. The universe, he says, is a superimposition upon Brahman. Brahman remains eternally infinite and unchanged. He is not transformed into this universe. He simply appears as this universe to us, in our ignorance. We superimpose the apparent world upon Brahman, just as we sometimes superimpose a snake upon a coil of rope.[১০]

ব্রহ্মের জগতে পরিণত না হয়েও জগৎরূপে প্রতিভাত হওয়া কেবল মায়াতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তত্ত্বটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে চিন্তাশীল মানুষের মননকে উস্কে দেয়। অঘটনঘটনপটীয়সী এই মায়া শক্তিই নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মকে জগৎরূপে অভিব্যক্ত করে। এই শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি বিশেষ হয়েও ব্রহ্মকে আবৃত করে তদস্থলে জগৎকে প্রদর্শন করাতে সক্ষম হয়। মায়ার স্বরূপ উপলব্ধ হলেই জগতের স্বরূপ এবং জগতের স্বরূপ জ্ঞাত হলে জগৎ উৎপত্তির একমাত্র কারণ ব্রহ্মকেও জানা সম্ভব হবে। শঙ্করের মতে, মায়াশক্তিই জগৎ প্রপঞ্চের কারণ। মায়া আবরণী ও বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা এই জাগতিক সকল কিছুর উদ্ভব, বিকাশ ও লয় ঘটাচ্ছে। মায়া অভাব পদার্থ নয়, মায়া ভাবপদার্থ। তাই বলে মায়া সৎ নয়। কেননা ব্রহ্ম ভিন্ন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া মায়া অবাধিত স্বরূপও নয়, মায়া বাধিত হয়। মায়া ভাব পদার্থ হয়েও বাধিত হয় বলে শঙ্কর মায়াকে মিথ্যাই বলেন, মায়া অনির্বচনীয়। মায়া ব্রহ্ম অধিষ্ঠানে জগৎ প্রত্যক্ষ করায়। অধিষ্ঠান মায়া দ্বারা প্রভাবিত নয়। অধিষ্ঠান সত্য, কিন্তু অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত জগৎ মায়িক। ব্রহ্ম কার্য-কারণ সম্বন্ধ অতিক্রান্ত সত্য।

মায়াবাদের উৎসস্থল উপনিষদ হলেও শঙ্কর তাঁর দর্শনে মায়াকে যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন তা উপনিষদীয় তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র। উপনিষদীয় দর্শনে পার্থিব জীবনকে দুঃখ, শোক, কষ্ট জর্জরিত বলে কোথাও উল্লেখ হতে দেখা যায় না। এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত বৈদিক ঐতিহ্যে পরজন্মে বিশ্বাস তৈরী হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও বলবতী হয়নি। ফলে পার্থিব জীবনকে মিথ্যা বা মায়া বলেও অনুভূত হয়নি। এইরূপ প্রেক্ষাপটে মায়ার সূচনা। কিন্তু

গৌড়পাদসহ শঙ্করাচার্যের দর্শনে জগৎকেই মিথ্যা বলা হয়েছে। এই মিথ্যা জগতের সব আকর্ষণ ত্যাগ করে পরমার্থ সত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। শঙ্কর বলেন:

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥
নলিনীদলগত-জলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥[১১]

যদিও উপনিষদে জাগতিক সম্পদ-সম্পত্তি ভোগ ব্যাপারে তেমন কোন বিধি নিষেধ ছিল না। তার পরিবর্তে জাগতিক ভোগ্যবস্তুর কামনায় দৈব সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তথাপি উপনিষদে নির্বিচার ভোগের কথা বলা হয়নি। বরং ত্যাগের সাথে ভোগ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১২] শঙ্করাচার্যের দর্শনে সেই ভোগ্য বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এই নির্দেশের যৌক্তিক ভিত্তিই হলো মায়াতত্ত্ব।

উপনিষদীয় মায়ার ধারণা সর্বপ্রথম গৌড়পাদীয় দর্শনে অধিকতর স্পষ্ট হয়। গৌড়পাদ তাঁর অজাতিবাদ প্রতিষ্ঠায় মায়ার ধারণা প্রয়োগ করেন। তবে মায়ার ধারণা আরও দৃঢ় ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে নিজ দর্শনে প্রয়োগে সমর্থ হন শঙ্করাচার্য। তাঁর দর্শনে এটি একটি স্বতন্ত্র তত্ত্বের মর্যাদা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণণ বলেন:

> The word maya is not used by Gaudapada with any strictness. It is used to indicate (1) the inexplicability of the relation between the Atman and the world; (2) the nature or power of Isvara; (3) the apparent dreamlike character of the world. The first is brought into greater prominence by Samkara, who is indifferent to the third which makes Gaudapada's position more akin to the Samvrtisatya or untruth, of the Madhyamikas rather than to the vyavaharikasatya or parctical truth.[১৩]

সুতরাং একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মায়ার উৎপত্তির উৎস ও প্রেক্ষাপট যা-ই হোক না কেন শঙ্করের দর্শনে এর প্রয়োগে অভিনবত্ব রয়েছে। মায়াতত্ত্বের এই স্বাতন্ত্র্য কেবলাদ্বৈততত্ত্বের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর এবং সমগ্র দর্শনকে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

মায়া উপাধি যুক্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর। শঙ্করের দর্শনে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য তত্ত্ব। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিকার নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণে তার পক্ষে জগতাদি সৃজন, পালন ও সংহার করা সম্ভব নয়। এ কারণে শঙ্করের দর্শনে মায়া গুণযুক্ত অপরব্রহ্ম নামক অন্য একটি তত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এই তত্ত্বটিই ঈশ্বর। অদ্বৈত বেদান্তের ঈশ্বরের ধারণাকে হিরিয়ানা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন:

> We described Maya as the source of the physical universe. But this source, or reasons already assigned, being altogether dependent upon the cosmic saksin, cannot act by itself. In strictness, therefore, the two elements should together be reckoned as giving rise to the world. ... It is the cause of the world in this complex form or spirit together with Maya that is the Isvara of Advaita.[১৪]

মায়ারূপ উপাধি গ্রহণ করে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণরূপে প্রকাশ পায়। শঙ্কর বলেন, "স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম।[১৫] নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্ম প্রাণীগণকে অনুগ্রহ করার জন্য সগুণ হন। অপরব্রহ্ম উপাসকের নিকট উপাস্য ঈশ্বর। উপাসনার জন্য পরব্রহ্মকে করুণাময়, প্রেমময় পরমেশ্বর নামে অভিহিত করা হয়। শঙ্কর বলেন অপরব্রহ্ম ব্যবহারিক জ্ঞানে ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হলে তাঁকেই ঈশ্বর বলা হয়। "The pure consciousness of Brahman, when associated with maya in this sense, is called Isvara,"[১৬] সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। অন্যদিকে স্রষ্টা, পালক, সংহারক প্রভৃতি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বর রূপে প্রতিভাত হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অদ্বৈত বেদান্তে জগৎ স্রষ্টারূপে যে সগুণ ব্রহ্মের রূপ পরিকল্পিত হয়, তিনিই ঈশ্বর। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যারা জগৎকে সত্য বলে মনে করেন, তারা স্রষ্টারূপে ঈশ্বরকেও সত্য বলে মনে করেন। শঙ্কর বলেন, "ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতো যথোক্তবিশেষণমীশ্বরং

মুক্তা অন্যতঃ প্রধানাদচেতনাদ্ অনুভ্যো বা, অভাবাদ্বা, সংসারিণো বা, উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম;" ।[১৭] অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্যতীত এই বৈচিত্র্যময় জগৎ যথা নিয়মে সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। যে রূপে ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সেই রূপে তিনি ঈশ্বর।

শঙ্করের মতে ঈশ্বরের ধারণার সাথে উপাস্য-উপাসক এই ভেদ জ্ঞান জড়িত। শঙ্কর ১/১/১১ সূত্রের ভাষ্যে বলেন, ব্রহ্মের দুই রূপ। যে রূপ বিদ্যার বিষয় তা নির্গুণ ও জ্ঞেয়। আর যা অবিদ্যার বিষয় তা সগুণ ও উপাস্য। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয়। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। শঙ্করের মতে, "তত্রাবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্ব্বো ব্যবহারঃ। তত্র কানিচিৎ ব্রহ্মণ উপাসনান্যভ্যুদয়ার্থানি, কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎ কর্মসমৃদ্ধ্যর্থানি। তেষাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন ভেদঃ।"[১৮]ঈশ্বরের পারমার্থিকতার স্বীকৃতি অদ্বৈতবাদের প্রতিজ্ঞা বিরোধী। অদ্বৈত বেদান্ত মতে ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রাতিভাসিক রূপমাত্র। তবে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে এঁর গুরুত্ব রয়েছে। ঈশ্বর উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির প্রথম সোপান। শঙ্কর ঈশ্বর উপাসনার উপযোগিতা স্বীকার করেন। এতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। আর এইরূপ চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। লক্ষণীয় যে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে, অতঃপর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করতে হয়। শঙ্করের মতে এর অর্থ শমদমাদি অভ্যস্ত হলে মুমুক্ষুর ব্রহ্মকে জানতে তৎপর হওয়া উচিৎ। ঈশ্বর উপাসনার দ্বারা মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। শঙ্কর মনে করেন ভক্তি জ্ঞান লাভে সহায়ক হয়। *বিবেকচূড়ামণি* গ্রন্থে তিনি বলেন, "মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"[১৯] অর্থাৎ মোক্ষলাভের কারণ সমূহের মধ্যে ভক্তির স্থান উচ্চতম। চিত্তের যে বৃত্তিতে জীব ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন বোধ করে তাই ভক্তি। শঙ্কর মনে করেন আত্মানুসন্ধানই ভক্তি। আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

শঙ্কর মনে করেন, ব্রহ্মকে নির্গুণ অথবা সগুণরূপে উপলব্ধির ব্যাপারটি জীবের দৃষ্টিভঙ্গিজাত। মায়ার প্রভাববশত: অবিদ্যাযুক্ত দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে দৃষ্ট হয়। মায়া অপহিত নির্বিকল্প জ্ঞানের দৃষ্টিতে এক ব্রহ্মস্বরূপই প্রকাশিত হয়। দৃষ্টিভঙ্গিজাত একটি ভিন্নতা বর্তমান থাকলেও স্বরূপত কোন ভেদ নেই। লোক ব্যবহার হেতু নির্গুণ, নির্বিকার ব্রহ্ম করুণাময়, ভক্তের ভগবান বলে কথিত হন। ব্যবহার হেতু ব্রহ্মের এই কল্পিত রূপই ঈশ্বর। অলীক বা অসতের দিক থেকে ঈশ্বর সত্য বটে, কিন্তু ব্রহ্মের দিক থেকে বিচার করলে মিথ্যা। ঈশ্বর জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়ে ঈশ্বর জ্ঞানের প্রয়োজন শেষ হয়। ঈশ্বর তত্ত্বের পারমার্থিক সত্যতার অস্বীকার শঙ্করের দর্শনের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি দিক। ঈশ্বরের পরমার্থতার অস্বীকৃতি সাধারণের নিকট অযৌক্তিক ও হৃদয়বিদারক হলেও অদ্বৈতবেদান্তের মূল সিদ্ধান্তের সাথে এটাই সংগতিপূর্ণ। কেননা ঈশ্বর ব্রহ্মের ন্যায় পরমার্থ সত্য হলে অদ্বৈতবাদের মূল প্রতিজ্ঞাই বাধিত হয়। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের সগুণ রূপের বর্ণনা করেছেন। শঙ্করের মতে, এই জগৎ ও জগৎ সৃষ্টিপ্রণালী অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। এই রূপ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে কারণ পদার্থ হতে হয়ে থাকে তিনিই ব্রহ্ম। শঙ্করের মতে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ছাড়া শূন্য বা জড় প্রকৃতি বা পরমাণু কিংবা জন্ম-মৃত্যুর অধীন অন্য কোন সংসারী জীব হতে এই রূপ বৈচিত্র্যময় জগতের যথানিয়মে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হওয়া কোনরূপে সম্ভব হতে পারে না। শঙ্কর বলেন, "ন চ স্বভাবতঃ; বিশিষ্টদেশকালাদিনিমিত্তোপাদানাৎ।"[২০] কার্যের উৎপত্তির জন্য বিশিষ্ট দেশ, কাল ও নিমিত্তের প্রয়োজন রয়েছে। তাই বলা যায়, দেশ-কাল, কার্য-কারণ, গুণ, সম্বন্ধযুক্ত সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন অপরব্রহ্মই ঈশ্বর। পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের তাগিদে ব্রহ্মে ব্যক্তিত্ব আরোপ ব্যবহারিক দিক থেকে মূল্যবান ও সত্য মনে হলেও পারমার্থিক জ্ঞানোদয়ে এর আর কোন মূল্য থাকে না। তখন উপাস্য ও উপাসক উভয়ের সত্যতা অবাধিত ব্রহ্ম স্বরূপে লয় হয়ে একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই বর্তমান থাকে। এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পক্ষে কোন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আবার শঙ্কর একথাও স্বীকার করেন না যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে বর্তমান ছিল। কেননা তিনি পরিণামবাদী নন, তিনি বিবর্তবাদী। ফলে শাঙ্করদর্শনের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যার জন্য মায়া উপাধিযুক্ত ঈশ্বর তত্ত্বের প্রয়োজন ছিল। তাই যে অর্থে ঈশ্বর শব্দটি প্রযোজ্য সেই একই অর্থে ব্রহ্ম শব্দটি প্রযুক্ত হতে পারে না। তবে শঙ্করের পরবর্তীকালে বৈদান্তিক রামানুজ তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরকে অভিন্ন তত্ত্ব বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম পুরুষোত্তম। ব্রহ্ম সকল কল্যাণ গুণের আকর। অর্থাৎ ব্রহ্ম সগুণ, ব্রহ্মই ঈশ্বর। এ প্রসঙ্গে রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদেরও সমালোচনা করেন। শঙ্কর যে মায়ার ধারণার সাহায্যে ঈশ্বর তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেন তার বিরুদ্ধে রামানুজ

সাতটি আপত্তি উত্থাপন করেন। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসেবে শঙ্কর ও পরবর্তীকালে শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদীগণ সে আপত্তি খণ্ডনও করেন। ভক্তিবাদী বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরকে এক মনে করলেও শঙ্কর মনে করেন ব্রহ্মে এইরূপ ব্যক্তিত্ব আরোপের ব্যাপারটি জীবের অজ্ঞতা প্রসূত। এইরূপ ব্যক্তি ঈশ্বর পারমার্থিকভাবে সত্য নয়। শঙ্করের দর্শনে ধর্মের ঈশ্বর এবং পরাবিদ্যার ব্রহ্ম দুইটি ভিন্ন তত্ত্ব। দুইয়ের মর্যাদাও ভিন্ন। বৃটিশ দার্শনিক ব্রাডলিও মনে করেন ঈশ্বর ও পরমসত্তা অভিন্ন হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট উক্তি- ...the Absolute is not God. God for me has no meaning outside of the religious conciousness, and that essentially is parctical.[২১] পরাবিদ্যার পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম। ধর্মের ঈশ্বর ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের উপযোগী ব্রহ্মসাপেক্ষ তত্ত্ব।

শঙ্কর ঈশ্বরের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করেন। শঙ্করের দর্শনে উপাসনাদির কোনই গুরুত্ব নেই এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। ব্যবহারিক স্তরে উপাসনাদির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে শঙ্কর মনে করেন। শঙ্করের বিবেচনায় ঈশ্বরজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে লয় হয়। ব্রহ্মই চূড়ান্ত তত্ত্ব। তত্ত্ববিদ্যক বিচারে ঈশ্বর গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এই ধারণা তত্ত্ববিদ্যার পরিপন্থী নয়। এ প্রসঙ্গে হিরিয়ানা বলেন:

> The Advaitin's criticism of the saguna Brahman should accordingly be understood as showing only the inadequacy of that conception to serve as the goal of philosophy and not as signifying that it is valueless. But its value is restricted to the empirical sphere– a view which is entirely in consonance with the general advaitic position that practical utility need not rest on metaphysical validity.[২২]

শঙ্করের দর্শনে ব্রহ্মের সগুণ রূপের ধারণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জগতের সৃজন-পালনাদির ব্যাখ্যা ঈশ্বর প্রত্যয়ের সাহায্যে করা সম্ভব হয়। তাছাড়া অর্থপূর্ণ নৈতিক জীবন, বদ্ধজীবের ধর্মানুভূতি প্রভৃতি ঈশ্বর প্রত্যয়ের উপস্থিতিতে সম্ভব হয়ে থাকে।

সগুণ ব্রহ্মবাদীগণের মতে ব্রহ্মে ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নেই। নির্গুণ ব্রহ্মবাদী শঙ্কর এঁদের একত্ব স্বীকার করেন না। তবে উভয় ধারণার মধ্যে একটি সমন্বয় স্থাপন করেন। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে সমন্বয় সাধন শাঙ্করদর্শনের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে, দর্শনের দৃষ্টিতে যে তত্ত্ব ব্রহ্ম, ধর্মের দৃষ্টিতে সেই তত্ত্বই ঈশ্বর। দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য তেমন কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ সহজ সমাধান যৌক্তিকভাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। ব্রহ্ম আর ঈশ্বরের পার্থক্য হলো, ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার। অন্যদিকে ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। ঈশ্বর ব্রহ্ম সাপেক্ষ সসীম তত্ত্ব। ব্রহ্ম স্বয়ং সম্পূর্ণ। পূর্ণতা হেতু ব্রহ্মের দ্বারা সৃজনাদি ক্রিয়া সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

জীব ব্যবহারিক বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে জগৎ স্রষ্টা বলে অনুভব করে। জীব ভক্তিতে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করতে চায়। অপর পক্ষে ব্রহ্ম ব্যবহারিক বুদ্ধির অতিক্রান্ত তত্ত্ব। বুদ্ধি, ভক্তি কোনটি ব্রহ্ম স্বরূপকে অবগত করাতে পারে না। জ্ঞানেই কেবল ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে সগুণ ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরের সাথে জড়িত সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতি, ভক্তি, প্রেম। এই রূপেই ঈশ্বর সাধারণের হৃদয়গ্রাহ্য। এখানে জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির প্রাধান্য অধিক। অপরাপর বৈদান্তিকগণ মনে করেন, এক তত্ত্বই দুই রূপে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানীর ব্রহ্মই ভক্তের ঈশ্বর। তাঁরা যে অর্থে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন, শঙ্কর ঠিক সেই অর্থে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না। শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সমস্তরীয় তত্ত্ব নয়। ম্যাক্স মূলর সম্পাদিত একটি গ্রন্থের ভূমিকায় ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করা হলো:

> The Brahman of Sankara is in itself imperesonal, a homogeneous mass of objectless thought, transcending all attributes; a personal God it becomes or ly through its association with the unreal principle of Maya, so that– strictly speaking– Sankara's personal God, his Isvara, is himself something unreal.[২৩]

শঙ্কর উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের দুই রূপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। শঙ্করের মতে স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম নির্গুণ। কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম পারমার্থিক সৎ, সগুণ ব্রহ্ম ব্যবহারিক সৎ। শঙ্কর মনে করেন, এই দুই রূপের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। কিন্তু তাই বলে তত্ত্বদ্বয় অভিন্ন নয়। নির্গুণ রূপে ব্রহ্মকে বলা হয় পরব্রহ্ম। সগুণ রূপে ব্রহ্মকে বলা হয়

অপরব্রহ্ম বা ঈশ্বর। শঙ্করের মতে পূজা-উপাসনাদিরও ব্যবহারিক মূল্য আছে। কিন্তু পারমার্থিক স্তরে বিষয়গুলো মিথ্যা। ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়ে পূজা-অর্চনাদি, শাস্ত্রবচন সমস্তই অসার প্রতিপন্ন হয়। শঙ্করের মতে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর তত্ত্ব সত্য, যতক্ষণ না ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। ঈশ্বর উপাসনার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব শাঙ্করদর্শনে স্বীকৃত হয়। এভাবে শঙ্কর ব্যবহরিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে সত্য বলে গ্রহণ করেন এবং পারমার্থিক স্তরে ব্রহ্ম জ্ঞানোদয়ে এর অসারতা প্রমাণ করে অদ্বৈততত্ত্বের যৌক্তিকতা রক্ষা করেন। বেদান্ত দর্শনের অপর কোন সম্প্রদায় ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের এই রূপ সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়নি।

শঙ্কর পরবর্তী বেদান্ত চিন্তায় শঙ্করের ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বিষয়ক মতবাদ যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন ধারার দার্শনিক চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। শঙ্করের দর্শনের নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা সাধারণের কাছে কোন গ্রাহ্য মতবাদ বলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে এই দর্শনের প্রতিক্রিয়া রূপে ভক্তিবাদের উত্থান ঘটে। দক্ষিণ ভারতেই শঙ্করের অল্প কিছু কাল পরেই বৈদান্তিক রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন। শঙ্করাচার্যের মতের সমালোচনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন, বিবর্তবাদ শঙ্করাচার্যের কল্পিত মতবাদ। শ্রীচৈতন্য মনে করেন ব্যাসদেব পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠা করেন, বিবর্তবাদ নয়। চৈতন্যপন্থীগণ শঙ্করাচার্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলেই গণ্য করতেন। উল্লেখ্য যে, শ্রী ভাস্করাচার্যই প্রথম শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে কটাক্ষ করেন এবং শাঙ্করমত খণ্ডন করে ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উপর শঙ্করের দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার কিয়দংশ প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা হলো: "বাস্তবিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও প্রত্যাভিজ্ঞাবাদী আচার্যগণ শঙ্করের মতবাদে কোনো কোনো অংশে প্রভাবিত হইয়াছেন। রামানুজ জীব ও ঈশ্বরের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ তিরস্কার করিয়া স্বগত ভেদ রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অভিনবের মতে জীব ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নেই, ভেদ অনেকটা পরিমাণে ঔপাধিক, মায়াবশেই ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।"[২৪] মূলত শঙ্করের দর্শনে ব্রহ্মের একত্বের প্রকৃতি ও এই একত্ব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার মায়াতত্ত্বের মধ্যেই তাঁর দর্শনের অনন্যতা লক্ষিত হয়। আর এই দুই তত্ত্বই সকল বৈদান্তিকের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু সব রকম সমালোচনা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, কেবলাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠায় মায়াবাদ অপরিহার্য ও অনন্য তত্ত্ব।

ব্রহ্মের একত্ব প্রসঙ্গে শঙ্কর নিরাপোস। তাঁর মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্যবহারিক জগতের বহুত্বকেও তিনি অস্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন এই জগতেরও এক প্রকার সত্তা আছে। ফলে একত্ব ও বহুত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এদের সত্তার মাত্রা নির্ধারণ করা তাঁর দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। শঙ্কর ব্রহ্মের সঙ্গে মায়াতত্ত্বের সংযোগে ঈশ্বরের ধারণা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরই জীব ও জগতের সৃজন, পালন ও সংহার কর্তা। শঙ্করের মতে জীব ও জগতের ন্যায় ঈশ্বরও পরমার্থ সৎ নয়। তবে ঈশ্বর উপাসনা ব্রহ্মের উপলব্ধিতে সহায়ক হতে পারে। শঙ্কর এক দিকে ধর্মীয় মূল্যবোধকে রক্ষা করেন এবং অন্যদিকে অত্যন্ত কঠোর যুক্তিনিষ্ঠার সাথে দর্শনের ব্রহ্মকে ধর্মের ঈশ্বর থেকে পৃথক করেন। একই সাথে তিনি জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করেন। শঙ্কর ইহজাগতিক ক্রিয়াদি অলীক বলে পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন না, আবার আত্যন্তিক বলে সমাদর করেন না। শঙ্কর নিষ্ক্রিয় হয়ে কর্মে বিরত থাকাকে সন্ন্যাস বলেন না। বরং 'ইহামুত্রফল ভোগ বিরাগ'[২৫] হয়ে ঈশ্বর প্রীতির জন্য লোক কল্যাণকর কাজ নিরলস ভাবে করাকে সন্ন্যাস বলেন। তাঁর অদ্বৈতবাদ উপনিষদোক্ত একত্ববাদী দার্শনিক চিন্তার সর্বাধিক সুসংহত ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা। ভক্তিবাদী সাধারণ মানুষের কাছে শঙ্করের দর্শন সহজবোধ্য না হলেও যুক্তিবাদী মানুষের কাছে এ দর্শনের গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্য অনেক বেশি।

শঙ্করের মতবাদে প্রাচ্যের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞার। তাঁর ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে এক ধরনের ধর্মীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক সহিষ্ণুতার বোধ নিহিত ছিল বলে অনুমান করা যায়। শঙ্কর মনে করেন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সম্যক উপলব্ধিতে মুক্তি তথা মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। এ লক্ষ্য অর্জনে সগুণ ঈশ্বর উপাসনাকে তিনি বাধক বা অত্যাবশ্যক বলেন না। তবে তিনি ঈশ্বর উপাসনাকে ব্রহ্ম প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক বলে মনে করেন। আবার কোন একক বা বিশেষ দেবতার উপসনাকেও তিনি নির্ধারিত করে দেন না। তাঁকে একই সাথে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, গঙ্গা, গোবিন্দ প্রভৃতি দেবতার স্তুতি করতে দেখা যায়। এভাবে অন্ধ গোঁড়ামীর পরিবর্তে এক উদারনৈতিক মনোভাবের অঙ্গীকার তাঁর দর্শনে প্রতিফলিত হয়। উল্লিখিত বক্তব্যের যৌক্তিক সমর্থনে রাধাকৃষ্ণণের নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য:

> Supreme as a philosopher and a dialectician, great as a man of calm judgment and wide toleration, Samkara taught us to love truth, respect reason and realise the purpose of life, ... He destroyed many an old dogma, not by violently attacking it, but by quietly suggesting something more reasonable, which was at the same time more spiritual too. ... He was not a dreaming idealist, but a practical visionary, a philosopher, and at the same time a man of action, what we may call a social idealist on the grand scale.[২৬]

শঙ্কর ক্ষেত্র বিশেষে বেদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছেন। তিনি মীমাংসার যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানের অসারতার কথা তুলে ধরেন। প্রকৃতপক্ষে আচার সর্বস্ব বৈদিক যজ্ঞাদি ও স্মার্ত জীবনচর্যা বৃহত্তর জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। জ্ঞান ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শঙ্কর মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য পূজা-অর্চনাদিসহ স্মার্ত জীবনাচরণের পরিবর্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা বলেন। শঙ্করের এই আদর্শ গোঁড়া বৈদিকগণ পছন্দ করেননি। কিন্তু জাতি ও বর্ণভেদ পীড়িত সমাজের নীচতলার মানুষ শঙ্করের প্রচারিত ধর্মে নিজেদের স্থান খুঁজে পেল। শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের বেদাধিকার না থাকলেও ইতিহাস- পুরাণাদির সাহায্যে তাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সুযোগ রয়েছে বলে শঙ্কর মনে করেন। "আচার্য্য শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য আচার্যগণ অপেক্ষা উদার। ...তিনি একটী কথা বড়ই সুন্দর বলিয়াছেন– "জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ"। জ্ঞান কাহারও এক চেটিয়া সম্পত্তি নহে।"[২৭] একথা সত্য যে শঙ্কর বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন মত প্রচার করেননি। তবে স্মার্তক্রিয়া, ধর্মানুষ্ঠান, জাতি ও বর্ণভেদ ইত্যাদি সকল জাগতিক বিষয়ের পারমার্থিকতার অস্বীকৃতি তার চিন্তার উদারতাই প্রকাশ করে। শঙ্করের দর্শনের এই বিশেষত্ব তাঁর ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিজাত সত্যেরই অভিব্যক্তি।

তথ্যনির্দেশঃ

* শঙ্করচার্যের জন্মসাল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে উক্ত সালটিকে সর্বাধিক মাত্রায় সমর্থিত হতে দেখা যায় বলে এটিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

১. Dr. Roma Chaudhuri, *Ten Schools of The Vadanta*, Part-1 (Calcutta: Rabindra Bharati University, 1973), p.22.

২ *শঙ্করাচার্য*, *শারীরক ভাষ্য*, ১/১/১৯, কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত, পণ্ডিত দূর্গাচারণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থেণ (সম্পা.), *বেদান্ত দর্শনম্* (কলকাতাঃ দেব সাহিত্য কুটির প্রা. লি., ২০১০)।

৩ Dr. Roma Chaudhuri, *Ten Schools of The Vedanta*, Part-I, p. 23.

৪. শঙ্করাচার্য, *ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা*, শ্লোক ২১, শ্রী অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায় (সম্পা.), *শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী*, পৃ. ১৪৪।

৫ S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 2 (Oxford: Oxford University Press: 1989), p.501.

৬ *Ibid*, p. 500-501.

৭ *ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৭/২৪/১।

৮ P. T. Raju, *Idealistic Thought of India* (London: George Alen & Unwin Ltd., 1953), p.102.

৯ শ্রী প্রমথনাথ শর্মা, *মায়াবাদ* (কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৫।

১০. Swami Prabhavananda, With the assistance of Frederick Manchester, *The Spiritual Heritage of India* (London: George Alen & Unwin Ltd., 1962), p.285.

১১. শঙ্করাচার্য, *মোহমুদগর*, ৪-৫ নং শ্লোক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।

১২ দ্রষ্টব্য, *ঈশ উপনিষদ*, ১/১।

১৩ S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 2, *Ibid*, p.461.

১৪. M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy* (London: George Allen & Unwin Ltd. 2nd Impression, 1951), p. 365.

১৫ শঙ্করাচার্য, *শারীরক ভাষ্য* ১/১/২০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪।

১৬ S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol-2, *Ibid,* p.609.

১৭ শঙ্করাচার্য, শারীরক ভাষ্য, ১/১/২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

১৮ *প্রাগুক্ত*, ১/১/১১, পৃ. ১৬৮।

১৯ শঙ্করাচার্য, *বিবেক চূড়ামনি*, গৃহীতঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, *বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস*, পৃ. ২৬৯।

২০. শঙ্করাচার্য, *শারীরক ভাষ্য* ১/১/২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

২১. F.H. Bradley, *Essays on Truth and Reality* (London: Oxford Univeristy Press, 1950), p. 428.

২২ M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy*, p.377.

২৩ F. Max Muller (ed.) *The Sacred Books of The East*, Vol. XXXIV (Delhi: Molilal Banarsidass, 1962), Introduction, p. xxx.

২৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, *বেদান্তদর্শনের ইতিহাস* (কলিকাতাঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ট্রাস্ট, ২য় মুদ্রণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৮২।

২৫ শ্রী শ্রী সদানন্দ যোগীন্দ্রসরস্বতী, *বেদান্তসারঃ*, ব্রঃ অনঘ চৈতন্য (অনু. ও সম্পা.), (দিনাজপুরঃ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৯৯১), পৃ. ১২।

২৬ S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 2, *Ibid*, p. 658.

২৭ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, *বেদান্তদর্শনের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নে শিক্ষার ভূমিকা: জন ডিউঈ অবলম্বনে এর বিশ্লেষণ

ড. মো. জাহিদুল ইসলাম*

Abstract: Democracy provides scopes of expression for the masses. People's interest in democracy grows in the midst of this conventional form of governance, because it provides a direction in which everyone has the opportunity to participate freely/without hindrance. People utilize this opportunity by means of education. Through education, people find ways to implement democratic ideals. In particular, the teaching of love, respect and compassion strengthens the foundation of democracy. So democracy and education complement each other. The success of democracy is not excluded from education, rather proper education depends on the assurance of a proper democratic environment. This issue greatly agitated Dewey's thinking. He looked at democracy because he was born in a democratic society. In this society, one should be equally focused on all without prejudice. Education plays a leading role in this focus because the foundation of democratic ideology matures only after being enlightened in the light of education. That is why he considers education as the key factor in building one's democratic ideology. The purpose of this article is to analyze this issue.

প্রাচীন গ্রীসে গণতন্ত্রের[১] উদ্ভব। যদিও গ্রীক রাষ্ট্র ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রের সমাহার ছিল তবুও ঐতিহাসিক তত্ত্ব উপাত্তের বিশ্লেষণের আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গণতন্ত্রের ভিত গ্রীক নগরেই রচিত হয়। তবে সকলের ভোটাধিকার না থাকায় সেখানে গণতান্ত্রিক চেতনা পরিপূর্ণতা পায়নি। গ্রীক চিন্তাবীদ হিরোডোটাসই গণতন্ত্র শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। গণতন্ত্র অর্থ জনগণের শাসন। যে শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে তাই গণতন্ত্র। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য উল্লেখযোগ্য-

> বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪২২ অব্দে ক্লিয়ান ডেমোক্রেসিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে-That shall be the democratic which shall be the people, for the people. অনেক পরে আব্রাহাম লিঙ্কন তার এক ভাসনের মধ্যে ঠিক এমনই এক জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করেন। আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) November 19, 1863 তারিখে তার দেয়া Pennsylvania state এর গেটিসবার্গ বক্তৃতাতে (Gettysburg Address) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে 'Government of the people, by the people, for the people.' যার অর্থ হলো-গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য। অধ্যাপক গেটেলের মতে, যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগে অংশ নেওয়ার অধিকারী তাই গণতন্ত্র।[২]

গণতন্ত্রে জনগণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা থাকে। ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র পথ হলো জনসমর্থন। এই জনসমর্থন কেউ হারালে ক্ষমতায় থাকা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। এজন্য সরকারকে টিকে থাকার জন্য আরও কৌশলী হয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে কেউ কেউ গণতন্ত্রকে সরকার পরিচালনার পদ্ধতি বলে থাকেন। কিন্তু আধুনিক বিশ্লেষণে গণতন্ত্র শুধু রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পদ্ধতি নয় এটা একটা আদর্শ সমাজব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পূর্বশর্ত হলো সমাজকাঠামো। সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ, সম্মান, মর্যাদা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্বশর্ত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। যে সমাজে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই অংশীদারিত্ব থাকবে সেটাই গণতান্ত্রিক সমাজ। এখানে কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় না বলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী বর্ণ বিরোধের কারণে গণতন্ত্রচর্চা আজ ব্যাহত হচ্ছে। কারণ গণতন্ত্র জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে। কে শেতাঙ্গ আর কে কৃষ্ণাঙ্গ এটা চিন্তা করার প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ যে

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাজে উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, কালো-সাদা, হিন্দু-বৌদ্ধ সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকে সেটাই গণতান্ত্রিক সমাজ। এক কথায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে মানুষের অবাধ অংশগ্রহণের সুযোগ সমানভাবে বন্টিত হওয়াই গণতন্ত্রের আদর্শ। এটা সার্বজনীনতায় বিশ্বাসী। সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ এখানে মূখ্য বিষয়। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করাই গণতান্ত্রিক সরকারের লক্ষ্য।[৩] সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা খুবই জরুরী। সকল বৈষম্যের অবসান করে সার্বিক কল্যাণ আনয়নই গণতন্ত্রের আদর্শিক ভিতকে মজবুত করে। ফলে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের ভাবের উদয় হয়, কারো প্রতি বৈরিতা থাকে না। বরং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। জনগণ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করে। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের চিত্রে দেশপ্রেমের শক্তিই দৃশ্যমান। তাছাড়া রাজনৈতিক চেতনার বহি:প্রকাশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম নিদর্শন। বিশেষ করে দল গঠন, নির্বাচনে অবাধে অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সক্রিয় গঠনমূলক সমালোচনাসহ রাজনৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। সমাজে গণতন্ত্রের বিকাশলাভে এই গুণটি থাকা আবশ্যক। এখানে জনগণের মতামতের প্রাধান্য থাকে বলে ব্যক্তি নিজে সহজেই নিজের অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ গণতান্ত্রিক চেতনার আরেক নাম। অর্থাৎ যে জাতি যত সচ্ছল তাদের কাছে গণতান্ত্রিক চর্চা তত সহজ।[৪] এই প্রক্রিয়ায় জনগণ নায্য পাওনার অধিকার আদায় করে। ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্বশর্ত এবং ব্যক্তিই সমাজ জীবনের একক। ব্যক্তির মেধা ও সৃজনাত্মক কাজ তাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এখানে কেউ কারো অধিকার হরণ করে না। বরং পারস্পরিক সহমর্মিতাই নাগরিক জীবনের ভিত্তিকে আরও মজবুত করে। এভাবে সকলেই যখন সমানভাবে সমাদৃত হবে তখন আইনের শাসন কার্যকর হবে। কেননা সমঅধিকার গণতন্ত্রের মূল চেতনা।

সমাজ বা রাষ্ট্রের অনুকূল পরিবেশ আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিদর্শন। আজকে সামাজিক কাঠামোর অন্তে অন্তে যে অবস্থা বিরাজ করছে তার থেকে উওরণের জন্য গণতান্ত্রিক চেতনা থাকা দরকার। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে গিয়ে গণতন্ত্র আজকে সার্বজনীন চেতনার রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাওয়ার কারণেই গণতন্ত্র শুধু রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। গণতন্ত্র সম্পর্কে ডিউঈ বলেন,

> আমাদের নির্ণায়কের এই দুটি উপাদানই গণতন্ত্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। এর প্রথম উপাদান কেবল অধিকতর সংখ্যক ও অধিকতর বিভিন্ন প্রকারের যৌথ অংশীধারী স্বার্থই জ্ঞাপন করে না, পরন্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপাদানরূপে পারস্পরিক স্বার্থবোধের স্বীকৃতির উপরেও অধিকতর আস্থা জ্ঞাপন করে। দ্বিতীয় উপাদান কেবল বিভিন্ন সামাজিক সমষ্টির (যারা এক সময়ে যথা সম্ভব ইচ্ছামত পৃথক ছিল) অধিকতর স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই জ্ঞাপন করে না, পরন্ত সামাজিক অভ্যাসের পরিবর্তনও জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ নানাবিধ আদান প্রদানের মাধ্যমে যে সকল নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেগুলোর সম্মুখীন হয়ে অভ্যাসের অবিরাম এবং উত্তরোত্তর সমন্বয় বিধানও জ্ঞাপন করে। গণতান্ত্রিকরূপে গঠিত সমাজের বিশিষ্ট গুণ বলতে যা কিছু বোঝায় এই দুটি যথার্থভাবে তারই লক্ষণ।[৫]

গণতন্ত্রকে কায়েম করার জন্য নেতৃত্বের গুণ থাকা দরকার। নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বই সর্বসাধারণের মতামতকে একত্রিত করতে পারে। তাই ডিউঈ বলেন, "A democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint cummunicated experience."[৬]

গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে জনগণের মধ্যে উপরিউক্ত নানা বিষয়ের সচেতনতা থাকা দরকার। আর এই সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তাহলো নাগরিকের শিক্ষা। এই শিক্ষাই গণতন্ত্রের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করতে পারে। পৃথিবীর যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশ আজ উন্নতির শিখরে সে সমস্ত দেশের মূল ভিত শিক্ষা। কারণ যে দেশ যত উন্নত সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তত উন্নত। কাজেই অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিজের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই শিক্ষার দরকার। তাছাড়া অনেক ব্যক্তিই পরামর্শ দিয়েছে, যে জাতির জনগণের মধ্যে শিক্ষার হার উচ্চ তাদের দ্বারা গণতন্ত্র কায়েম হবার সম্ভাবনাও তত বেশী।[৭] এই আদর্শকে সামনে রেখে ডিউঈ তাঁর শিক্ষাভাবনার প্রসারিত রূপ দিয়েছেন। তাঁর ভাবনায় গণতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাচীন গ্রীক সমাজে গণতন্ত্রের প্রাথমিক চর্চা থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ডিউঈ-এর হাত ধরেই পরিপূর্ণতা পায়।

এজন্য ডিউঈ বলেন, "Democracy has many meanings, but if it has a moral meaning, it is found in resolving that the Supreme test of all political institutions and industrial arrangements shall be contribution they make to the all round growth of every member of society."[৮] তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র মাত্র একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাই নয়, সেটি তার থেকে আরও বেশী কিছু দ্যোতিত করে। প্রধানতঃ গণতন্ত্র হল এক রকমের সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা, ও সংযুক্ত আদান-প্রদানমূলক অভিজ্ঞতা।[৯] এই অভিজ্ঞতাই মানুষকে মুক্তচিন্তার দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং শিক্ষা সেখানে আলোর দিশারী হিসাবে কাজ করে। তাই বলা যায়, "শিক্ষা ও মুক্তচিন্তা গণতন্ত্রের পরিপূরক। যে-কোন প্রকারের অন্ধ স্বাজাত্য বা উগ্র জাতীয়তাবোধ, কর্তৃত্ববাদ ও একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রবিরুদ্ধ এবং তা বাস্তবিকভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, মানবকল্যাণ বা জনকল্যাণের জন্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।"[১০]

ডিউঈ মূলত প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ও গণতন্ত্রের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই শিক্ষাই কার্যকারী যা বাস্তব জীবনে প্রয়োজন সিদ্ধ করে এবং শিক্ষার্থীকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এই শিক্ষার মধ্যে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ, সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ফলে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে। সুপরিকল্পিত শিক্ষার অভাব আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তরায়। পৃথিবীর অনেক দেশে এই দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় যেখানে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। বরঞ্চ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে খর্ব করা হয়েছে। দেখা দিয়েছে নানা অনাচার ও অসহিষ্ণু সামাজিক কার্যকলাপ। এথেকে উত্তরণের জায়গা হলো আদর্শ গণতান্ত্রিক শিক্ষার পরিবেশ যেখানে শিক্ষার্থীর স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা থাকবে এবং ব্যক্তির উন্নতির সাথে সাথে সমাজের উন্নয়ন সাধিত হবে। এ প্রসঙ্গে ডিউঈ বলেন, এ রকম একটা সমাজকে অবশ্যই এমন এক ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা রাখতে হবে যা, বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সকলকেই একটা ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ দেয়, নিয়ন্ত্রণ দেয়, এবং এরূপ মানসতা সৃষ্টি করে যে, বিশৃঙ্খলা না এনেও সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।[১১] প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মজবুত করে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্রের মূলনীতি কার্যকর করতে চায়। বিশেষ করে একে অপরের সাথে মেলামেশা, মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা, নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরি করা, সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করাসহ প্রভৃতি গুণের অধিকারী হয়। নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রদ্ধাবোধের জায়গা তৈরি হয়। শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন গড়ার অভ্যাস শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পেয়ে থাকে। এতে একদিক থেকে যেমন তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিক থেকে প্রত্যেকেই সমঅধিকারে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এদিক থেকে বলা যায় শিক্ষার্থীর সুশৃঙ্খল জীবন গঠনের শিক্ষা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনন্য নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে Douglas Kellner বলেন,

> As the twentieth century unfolded, it was John Dewey who developed the most sustained reflections on progressive education, linking education and democracy. Dewey insisted that one could not have a democratic society without education, that everyone should have access to education for democracy to work, and that education was the key to democracy and thus to the good life and good society. Dewey was a proponent of strong democracy, of an egalitarian and participatory democracy, where everyone takes part in social and political life. For Dewey, education was the key to making democracy work since in order to intelligently participate in social and political life, one had to be informed and educated to be able to be a good citizen and competent actor in democratic life.[১২]

গণতন্ত্র যেহেতু প্রত্যেকের মতামতে বিশ্বাসী সেহেতু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্রচর্চা প্রকৃত শিক্ষার নিয়ামক। এখানকার শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যত জীবনের পাথেয় হিসাবে কাজ করে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরিবার থেকে এসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহপাঠীর সাথে একে অপরের চিন্তা / ভাবনা বিনিময় করে থাকে। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করার উত্তম ব্যবস্থা হলো শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংস্পর্শতা। এতে ভালো মানুষ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আজকের শিশুই আগামী দিনে নেতৃত্ব দিবে। এজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ আদর্শ গণতন্ত্র আনয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই ডিউঈ বলেন, যে জাতীয় সামাজিক জীবনের উপলব্ধির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থবোধ পরিব্যাপ্ত থাকে, এবং সেখানেই অগ্রগতি বা পুনঃ-সমন্বয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়, সেখানেই সেটি একটা গণতান্ত্রিক সমাজকে সুচিন্তিত ও সুব্যবস্থিত শিক্ষাব্যবস্থাতে অধিকতর আগ্রহশীল করে।[১৩] গণতন্ত্র তখনই সার্থক হয় জনগণ যখন সহজভাবে তার মনের কথা বলতে পারে। এজন্য শিক্ষালাভে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা

দরকার। অর্থাৎ সার্বজনীন শিক্ষা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। এখানে শিক্ষালাভে কোনো জাতিভেদ থাকবে না। বরং প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার সামর্থ্য ও যোগ্যতা নিয়ে শিক্ষালাভ করবে। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চেতনা নিয়েই তারা গড়ে ওঠবে। একটা শিশুর জন্মের পর থেকে পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যখন স্বাধীনভাবে মতামত দিতে পারবে তখনই তার শিক্ষা সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ আদর্শ গণতন্ত্র আনয়নে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প নেই। এ বিষয়ে বলা হয়, "এই ধরনের শিক্ষা জনগণকে গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাসের উপযোগী করে তোলে এবং এই শিক্ষা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশকে জোরদার করে।"[১৪] শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর সামাজিকতা পরিলক্ষিত হয়। তাই ডিউঈ বলেন, শিক্ষা এমন একটা সামাজিক কৃত্য, যা অপরিণত লোকেরা যে গোষ্ঠীর অন্তর্গত, সেই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাদের নির্দেশ দান ও বিকাশ-সাধন করে, তখন কার্যত: এ কথাই বলা হয় যে, কোন গোষ্ঠীর চলিত জীবনযাত্রা প্রণালীর সাথে তাদের শিক্ষাপ্রণালীও বদলাবে।[১৫] শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলি অর্জন করে যা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। গণতন্ত্রে তাই শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়,

> গণতন্ত্রের যদি একটি নীতিগত বা আদর্শগত অর্থ থাকে, তাহলে সেটি এই যে, সকলের কাছ থেকেই একটা সামাজিক প্রতিদান দাবী করতে হবে, এবং সকলকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামর্থ্যের বিকাশ লাভের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটো লক্ষ্য পৃথক করে রাখা গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক। কৃতিত্বেও সংকীর্ণ অর্থ ধরলে তার মূল সার্থকতাকে বাদ দেওয়া হয়।[১৬]

আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমন একটা সময় ছিল যখন শিক্ষার্থীরা মনের কথা প্রকাশ করতে পারতো না। ফলে এক তরফা শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। আজকে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ শিক্ষার আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ডিউঈ মনে করেন শিক্ষার প্রাণ হলো শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থী আছে বলেই আজকে শিক্ষকসহ অন্যান্য উপাদানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে বলা হয়, একজন শিক্ষাগুরুর কাজ শুধু এটা নয় যে, তাঁর সারা জীবনের অর্জিত জ্ঞান বা তথ্য শিশুদের সরবরাহ করা বরং তাদের এমনভাবে পরিচালনা করবেন যাতে তারা স্বীয় প্রকৃতিগত সামর্থ্য ও গুণের বিকাশ করতে পারে।[১৭] গণতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষক হবেন নির্দেশক ও সমন্বয়ক। তিনি শিক্ষার্থীর ওপর চাপ প্রয়োগ না করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর নিজ আগ্রহের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁর কাজ সম্পর্কে বলা হয়, তাঁর কাজ হচ্ছে বিদ্যালয়ের পরিবেশটাকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে শিশুদের মধ্যে সামাজিক ব্যক্তিত্ববোধ ও দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে।[১৮] স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়ের পরিবেশ যখন ইতিবাচক থাকবে তখন শিক্ষার্থী নিজে থেকেই জ্ঞানলাভের জন্য অগ্রগামী হবে। এছাড়া শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরনীয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ডিউঈ শিক্ষাগুরুর গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁদেরকে দুনিয়াতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করতেন/ভাবতেন।[১৯] তাছাড়া আজকে যারা শিক্ষার্থী আগামী দিনে তারাই শিক্ষক। এজন্য একজন শিক্ষার্থীর জীবন গঠনে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই পরিবেশ আনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক কথায় শিক্ষকই শিক্ষার্থীর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন যার দ্বারা একজন শিক্ষার্থী সমন্বিত কাজের অনুপ্রেরণা, নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা, অন্যের প্রতি মমত্ববোধ এবং গণতান্ত্রিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে শিখবে।[২০] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ শিক্ষার পরিবেশকে বেগবান করে তোলে। এখানে শিক্ষার্থীরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শিক্ষকের আদর্শ শিক্ষার্থীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তাই বলা হয়, একজন শিক্ষক একইভাবে শিল্পী, দার্শনিক এবং বিদ্বানব্যক্তির মতো তখনই তাঁর কাজ সঠিকভাবে করতে পারেন যখন তিনি বাহ্যিক কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত বা পরিচালিত না হয়ে নিজের অভ্যন্তরীণ সৃজনশীল তাড়ণা দ্বারা চালিত হন।[২১] প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষকের আদর্শকে লালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ডিউঈ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদাতার আচার-ব্যবহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে/রূপায়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানকে উপযুক্ত প্রদর্শক হিসেবে সমর্থন করেন।[২২]

পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, ইচ্ছা ও আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা দরকার। এতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ডিউঈ এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে। এজন্য পাঠ্যক্রম বাস্তব অবস্থার আলোকে রচিত হওয়া উচিত।

তাই বলা হয়, শিক্ষা প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদানসমূহ অপরিণত ও অনগ্রসর এবং নির্দিষ্ট সমাজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের মূর্তরূপের মাধ্যমে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়া হলো এই শক্তির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফল। এসব ধারনার মধ্যকার সম্পর্কই শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা।[২৩]আবার পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু যেহেতু মানব জীবনের বাইরে নয় সেহেতু পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হবে না। কারণ মানব জীবনের কোনো কিছুই স্থায়ী ও নিশ্চল নয়। আবার সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে পাঠ্যক্রম সংযোজন-বিয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ পাঠ্যক্রম পূর্বনির্ধারিত ও অনমনীয় না হয়ে নমনীয় হওয়া ভালো যাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও ইচ্ছার পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় করা যায়।[২৪] জীবনকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু পাঠ্যক্রমে লিপিবদ্ধ থাকা দরকার যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্জন করতে পারে। এতে করে তারা নানা মানবীয় গুণে গুণান্বিত হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়ভার বহন করতে সক্ষম হবে। মূলত একজন শিক্ষার্থী গণতান্ত্রিক চেতনার আলোকেই পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় যা ডিউঈ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। এজন্য পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু হবে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনার বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন। এ প্রসঙ্গে ডিউঈ বলেন, উদ্দেশ্য সম্বলিত কোন পরিস্থিতির বিকাশের পথে যে সমস্ত তথ্যকে পর্যবেক্ষণ, স্মরণ, অধ্যয়ন ও আলোচনা করা হয় এবং তার থেকে যে সমস্ত ধারণার ইঙ্গিত আসে, তাই নিয়েই বিষয়-বস্তু গঠিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অর্থাৎ যে সমস্ত পাঠ্য বিষয় নিয়ে পাঠক্রম গঠিত হয় তার সঙ্গে এই উক্তিটিকে যোগ করে, একে আরও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।[২৫]

শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতীতের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো না। যেটুকু অনুসরণ করা হতো তা এককেন্দ্রিক ও পক্ষপাতমূলক। শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। শিক্ষকরা যা নির্দেশনা দিতেন তাই তাদের অনুসরণ করতে হতো। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার দারুন ঘাটতি ছিল। আজকে এই ধ্যান-ধারনার পরিবর্তন হয়েছে। গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, সার্থক শিক্ষা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। ডিউঈ এই চিন্তার সাথে একমত। শিক্ষার্থীর আগ্রহের সাথে সামর্থ্যের সমন্বয় করতে হবে। শিক্ষার্থীর স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ তার সৃজনশীল বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি এই প্রক্রিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই বলা হয়, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের দলীয় কর্মকাণ্ডে সুযোগদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব ও সামাজিক উদ্দীপনা তৈরিতে সাহায্য করে।[২৬] আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে বলে মনের কথা প্রকাশ করার সর্বোচ্চ সুযোগ থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ডিউঈ শিক্ষাবান্ধব বলে মনে করেন। কেননা এখানে সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তাছাড়া প্রত্যেকেই প্রত্যেক থেকে আলাদা। কাজেই কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার আগে তার সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনা করা দরকার। গণতন্ত্র এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয় বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই শিক্ষাব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের জন্যে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে খুব সহজেই আনন্দঘন পরিবেশে নিজের প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে নিতে পারে এবং কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। অথচ গতানুগতিক শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। শুধু পুস্তকের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মুখস্তকরণ প্রক্রিয়াকে বেগবান করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর সহজাত সম্ভাবনা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ক্ষমতাই আলোর পথ দেখাতে পারে। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শিক্ষণ পদ্ধতিই শিক্ষার ভিত্তি যেখানে সমাজবাস্তবতার আলোকে সবকিছু নির্ণীত হয়। বিশেষত এটা কী সত্য যে একটি সমাজ পরিবর্তিত হয় না তবে এর পরিবর্তনের আদর্শ রয়েছে যার উন্নতি ঘটবে, তার নিজস্ব রীতিনীতি স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে একটির কাছ থেকে শিক্ষার বিভিন্ন মান এবং শিক্ষাপদ্ধতি থাকবে। তাই আমাদের নিজস্ব শিক্ষামূলক চর্চায় প্রযোজ্য সাধারণ ধারণাগুলি কার্যকর করার জন্য বর্তমান সমাজ জীবনের প্রকৃতির সাথে আরও নিকটে পৌঁছানো প্রয়োজন।[২৭]

সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার নানা আয়োজন। তাদের সৃজনশীল বিকাশ প্রক্রিয়াকে বেগবান করার জন্য শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষা ও মানসিকতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এই পদ্ধতি শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। কাজেই এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেয়। অর্থাৎ "শিক্ষাকে যুগোপযোগী, উন্নত করার জন্য অনুকূল তথা উপযুক্ত পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম।"[২৮] ডিউঈ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধীতা করে গণতান্ত্রিক পরিবেশের উপর জোর আরোপ করেছেন। কারণ শিক্ষার সফলতা শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে। কাজেই বিদ্যালয়ের এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে যা তাকে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, যাই হোক নি:সন্দেহে

বলা যায় যে, সমসাময়িক সমাজের জোড় দাবী হলো শিক্ষা হবে গণতান্ত্রিক। এই দাবী বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই শিক্ষার সাধারণতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্যই হলো নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক সমাজ চালু রাখার ইচ্ছা জাগ্রত করা। শিক্ষা সংক্রান্ত ও সামাজিকতত্ত্বের মতে, বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচিত গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত হওয়া।[২৯] যুগে যুগে যারা শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করেছেন তারা প্রত্যেকেই শিশুর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে, একে অপরের সাথে মত বিনিময় করবে, নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে কাজ করবে তখনই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে। এজন্য বিদ্যালয় তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা এমন একটা সময় ছিল যখন শিক্ষা শুধু পারিবারিক সদস্যদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। আজকে প্রয়োজনের তাগিদেই বিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডিউঈ বলেন, আমি আপনাদের সামনে স্কুল ও বৃহত্তর সমাজজীবনের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলার চেষ্টা করেছি এবং সমসাময়িক সামাজিক চাহিদাভেদে বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের পদ্ধতিগত ও বস্তুগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আলোকপাত করেছি।[৩০] কারণ যে শিক্ষার্থী সমাজবাস্তবতার আলোকে বেড়ে ওঠবে সেই শিক্ষার্থীর মধ্যে দায়িত্ববোধের চেতনার জন্ম হবে। আর এই দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই জ্ঞান অর্জনের দিকে অগ্রগামী হবে এবং নিজেদের প্রয়োজনেই বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, বিদ্যালয়গুলোকে গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত করা উচিত যা হবে সমবেত জীবন যাপনের উত্তম দৃষ্টান্ত। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সামাজিক পরিবেশে শিশুরা যা শিখবে তাই তাদের নিজের, অপরের এমনকি পুরো সমাজের উন্নতিতে ভূমিকা পালন করবে।[৩১]

শিক্ষা মানেই হলো শিক্ষার্থীর ইতিবাচক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন আসলে তাদের পরস্পরের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। যেমন একের অনুভূতি অন্যকে নাড়া দেয়, একের ভাবনা অন্যকে আন্দোলিত করে, একের হাসি অন্যকে হাসায়, একের কান্না অন্যকে কাঁদায়। এভাবে তারা ভাব বিনিময় করে এবং এতে করে একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসার জন্ম হয়। প্রকৃতপক্ষে ভালোকে গ্রহণ করা এবং মন্দকে বর্জন করাই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। এজন্য বিদ্যালয়ে নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ ও কৌশলী হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এখানকার নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই তাকে লেখাপড়া করতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীর জীবনে গণতন্ত্রচর্চার প্রাথমিক প্রক্রিয়া বিদ্যালয়েই শুরু হয়। বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, গণতান্ত্রিক মনোবল এখন থেকেই শিক্ষার্থী বহন করে যা ভবিষ্যতে জাতিকে আলোর পথ দেখাবে। তাই বলা হয়, বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক চেতনা শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবহারিক উপাদান সরবরাহ করে।[৩২] এজন্য গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য বিদ্যালয় নামক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এ প্রসঙ্গে ডিউঈও মনে করেন, যে নতুন শিক্ষা নতুন সমাজ গঠন করবে, তার বাস্তব রূপায়ণ, শেষ পর্যন্ত উপস্থিত রাজ্যগুলোর ক্রিয়াকলাপের উপরই নির্ভরশীল হবে। ফলে গণতান্ত্রিক ধারণার আন্দোলন অপরিহার্যরূপে সরকার পরিচালিত ও সরকার প্রশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।[৩৩] উপরিউক্ত বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জ্ঞান বিনিময়ের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও বেগবান করে তোলে। তাই শিক্ষালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে বলা হয়, বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজ সচেতনমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। এটা তাদের আচার-আচরণের উন্নতি সাধন এবং সক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য করবে।[৩৪]

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন থাকে যা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। এখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরিবার থেকে আসে এবং নানা বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হয়। এই অনুসরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে শৃঙ্খলার ধারণা জন্ম নেয়। ডিউঈ গতানুগতিক শৃঙ্খলার চরম বিরোধীতা করেছেন। তিনি মনে করেন গণতান্ত্রিক চেতনায় শৃঙ্খলার অর্থ বাধ্যবাধকতা নয়। বরং বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে চলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক চলাফেরার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুনের মধ্য থেকে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নিজের বোধগম্যতার দ্বারা ভাল-মন্দের বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ডিউঈ মনে করেন,

> যে ব্যক্তি তাঁর কাজকর্ম বিচার-বিবেচনা করতে ও সুবিবেচনার সহিত তা হাতে নিতে অভ্যস্ত, তিনিই মাত্রা অনুযায়ী শৃঙ্খলাসম্পন্ন। এই সক্ষমতার সঙ্গে যখন বিক্ষেপ, বিভ্রান্তি ও বাধা-বিঘ্নের মুখে মনোনীত কর্মধারার মধ্যে স্থির চিত্তে নিবিষ্ট থাকার বুদ্ধিবৃত্তি যোগ হয়, তখনই আমরা শৃঙ্খলার সারাংশ দেখতে

> পাই। শৃঙ্খলার অর্থ আয়ত্তীকৃত ক্ষমতা, যে কাজ হাতে নেওয়া তা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রাপ্তব্য সঙ্গতির উপর অধিকার।[৩৫]

গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য যে কোনো কাজে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ জরুরী। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে বাধা-ধরা নিয়ম মেনে নেওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায় এবং মুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রবণতা জাগ্রত হয়। এভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সক্রিয়তার মাধ্যমে কোনো কিছু করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ফলে সকলেই শিক্ষালাভের সুযোগ পায় এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হলো শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। এই বিকাশের সুযোগ গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিদ্যমান থাকে বলেই বাইরে থেকে জোর করে বা বাধ্য করে নিয়ম-কানুন শেখানোর প্রয়োজন পড়ে না। আপনা-আপনি শৃঙ্খলা অর্জন করে। তাই বলা হয়,

> ডিউঈ'র ভাষায় সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। বিদ্যালয়টিই সমাজের একটি প্রাথমিক রূপ। যদি শিশুটি বিদ্যালয়ে সম্মিলিত কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে উৎসাহিত করা হয় তবে সে কেবল বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হবে না, পাশাপাশি সামাজিক জীবনে সম্পাদন করতে হবে এমন অনেক কর্মকাণ্ডের জন্য সে একইসাথে প্রশিক্ষিতও হবে। এভাবে সে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে শৃঙ্খলার নেতৃত্ব দিতে শিখবে।[৩৬]

শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেওয়াই হলো শিক্ষার স্বার্থকতা। অতীতে এই সুযোগ খুবই সংকীর্ণ ছিল। শিক্ষার্থীর মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হতো না বরং জোর করে মনের বিরুদ্ধে কাজ করতে হতো। কখনো শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিবেচনা করে কারিকুলাম লিপিবদ্ধ হতো না। ফলে শিক্ষার্থী কারিকুলামের পাঠ গ্রহণে সক্ষম কিনা তা উহ্য থাকতো। এক কথায় শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার প্রবণতাকে খর্ব করা হয়েছে। এজন্য শিক্ষায় গণতন্ত্রচর্চা অপরিহার্য যা ডিউঈ-এর শিক্ষাচিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর ভাষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার মধ্যেই তাঁর সৃজনশীলতা লুকায়িত থাকে এবং স্বাধীনতা তার জন্মগত অধিকার। মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেলেই সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতাকে আরও শাণিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তাই বলা যায়- শৃঙ্খলার প্রয়োগবাদী ধারনায় স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ এটি ধারণা করা হয় যে, শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক গুণাবলী জাগ্রত করা। এই গণতান্ত্রিক গুণাবলীর মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বাধীনতা।[৩৭]

পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস তথা শ্রদ্ধাবোধ মানুষের জীবনপ্রণালীকে আরও সুশৃঙ্খল করে তোলে। ব্যক্তি নিয়েই যেহেতু সমাজ সেহেতু সমাজের ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য গণতন্ত্রচর্চা থাকা জরুরী যার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। আবার "যেহেতু গণতন্ত্রিক সমাজে কোন অনমনীয় বা পূর্বকল্পিত ধ্যান-ধারণা থাকে না তাই এই সমাজব্যবস্থা আমাদের নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন করে এবং নতুনভাবে সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করে।"[৩৮] প্রকৃতপক্ষে সমাজবদ্ধ মানুষের প্রত্যেকেরই নিজস্বতা আছে যা দিয়ে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ তৈরি হয়। ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার পথ আরও প্রশস্ত হয় এবং একে অপরের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। এভাবে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের ধারণা জন্মে যা গণতন্ত্রের জন্য আবশ্যকীয়। জন ডিউঈ শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে বিশ্বাসী। এজন্য শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ শিশু যখন নিজে নিজে তার সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারবে তখনই তার মধ্যে সমাধান খোঁজার অভিপ্রায় জাগ্রত হবে। শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। অর্থাৎ সমাজবাস্তবতার আলোকেই শিক্ষার কাঠামো নির্ধারণ হওয়া উচিত বলে প্রয়োগবাদীরা মনে করেন। আবার বিদ্যালয় সমাজ কাঠামোর বাইরে নয়। তাই বলা হয়, ডিউঈ প্রগতিমূলক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে প্রগতিশীল শিক্ষার গোড়া পত্তন করেন যার লক্ষ্য ছিল শিশুদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা।"[৩৯] সমাজের নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারাই শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া আরও সহজ হয়। অর্থাৎ বিদ্যালয় এক ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান। কোনভাবেই একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করা যায় না। এজন্য ডিউঈ শিক্ষাকে জীবনের প্রয়োজন মেটানোর হাতিয়ার মনে করেন। সেই শিক্ষাই যথার্থ যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে এবং জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ডিউঈ'র এই বক্তব্যের সাথে আধুনিক দার্শনিক বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল একমত পোষণ করেন। উপযুক্ত শিক্ষাই দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে সৃজনশীল হিসেবে তৈরি করা যাতে সে সৃষ্টিশীল সমাজকে বুঝতে পারে। শিক্ষা ছাড়া

এমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্ভব নয়। ঐ কারণেই ডিউঈসহ অন্যান্য আমেরিকান শিক্ষাবিদের সাথে রাসেলও গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন।[৪০]

গণতন্ত্রের সফলতায় বিশ্ব আজ সুউচ্চ আসনে মহীয়ান। এতো সফলতার মাঝেও ব্যর্থতা এড়ানো যায় না। এর মূল কারণ হলো জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে নানা বৈষম্য ও অরাজকতার হালচিত্র। এর জন্য দায়ী জনগণের মতামতকে প্রাধান্য না দেওয়া। অর্থাৎ গণতন্ত্রের মূল চেতনাকে অস্বীকার করা। তাই অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্বই বিশ্বকে সংকটের জায়গা থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন, ডিউঈ-এর মতে গণতান্ত্রিক সমাজ একটি যা তার সদস্যদের সকলের জন্য সমান শর্তে অংশ নেওয়ার বিধান করে এবং যা সংস্থার জীবনের বিভিন্ন রূপের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠানের নমনীয় পুনর্বিন্যাসকে সুরক্ষিত করে।[৪১] সংঘবদ্ধতা মানুষের ধর্ম। সমাজে সম্মিলিত প্রচেষ্টাই মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। আর শিক্ষা তাকে শানিত করে। সমাজে যখন বৈষম্য থাকবে না তখন সকলেই নিজের অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে না। বরং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের জায়গা থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবে। জীবনের যে কোনো পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে মোকাবেলা করার ক্ষমতা মানুষের আছে। এই শিক্ষার দ্বারা মানুষ নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী অর্জন করে। এজন্য মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়,"অন্যান্য প্রাণীরা যেখানে যে-কোনো পরিস্থিতি মেনে নেয় সেখানে মানুষ নতুনত্ব পেতে চায় এবং জীবনকে গতিশীল করতে চায়। জীবনকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম করে।"[৪২] এই সংগ্রামের ফলে তাদের মনে দৃঢ়চেতা কাজ করে বলে সফলতা অর্জন করে। কাজেই শিক্ষা হতে হবে গণতান্ত্রিক যার ভিত্তি হবে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এ প্রসঙ্গে পেস্টালৎসী একই মত পোষণ করেন,

> সংক্ষেপে পেস্টালজ্জির বড় সাফল্যগুলি হলো: তিনি শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক হতে বাধ্য করেন, তিনি শিক্ষায় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন, তিনি শিক্ষায় পদ্ধতিগুলিতে বিপ্লব ঘটান, তিনি শিক্ষার গবেষণা ও পরীক্ষণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং শিশু পড়াশুনার ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন, জোর দিয়েই শিশুকে জীবন্ত এবং ক্রমবর্ধমান জীব হিসেবে গণ্য হবে, পেস্টালজ্জিকে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে যিনি শিক্ষার বিজ্ঞানের উপাদানগুলির বিশ্লেষণ এবং ব্যবস্থাবদ্ধ করার সত্যতা অর্জন করেছিলেন।[৪৩]

উপরিউক্ত বিশ্লেষণে গণতন্ত্রের জয়গান গাওয়া হয়েছে এবং ডিউঈ শিক্ষাকে গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে ডিউঈ-এর শিক্ষাভাবনা গণতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি দ্বারা প্রভাবিত। কেউ কেউ (যেমন-প্লেটো) গণতন্ত্রকে মূর্খের শাসন বলে অভিহিত করায় এর ভিত্তি দূর্বল হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে T.W. Moore এর অভিমত, Plato, who feared what democracy might do, and with an eye on what democracy had done in his time, thought it a very bad form of government and threw his considerable intellectual weight against it.[৪৪] কেউ কেউ গণতন্ত্রকে সংখ্যা দিয়ে বিবেচনা করার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন লোকও যদি ন্যায় ও সত্য কথা বলে তবুও সেটা যথার্থ ও গ্রহণীয়। বলা হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকলে সকলেই সমান সুযোগ পাবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এর উল্টো নির্দেশনা দিয়ে থাকে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সমান সুবিধা দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবাধ স্বাধীনতায় সৃজনশীলতার কথা বলে বেপরোয়া কাজের স্পৃহাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যকথায় শিক্ষার্থী নিজে থেকেই জ্ঞান অর্জনে অগ্রগামী হবে এবং তার উপর চাপ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। শিক্ষক এখানে তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু বাস্তবতা এতোটাই ভিন্ন যে শিক্ষার্থী স্বপ্রণোদিত হয়ে বিদ্যালয়ের বিধি-বিধান মেনে নেওয়ার নজির নেই। উপর্যুক্ত নেতিবাচক দিক থাকলেও ডিউঈ'র গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, শিক্ষার জন্য যেমন গণতান্ত্রিক পরিবেশের দরকার তেমনি গণতন্ত্রকে কায়েম করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে বলা হয়,

> ডিউঈ-এর দর্শন একটি বড় শক্তির বার্তা দেয়: এই দর্শনের সর্বাধিক মূল্য হলো এটি নমনীয়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতার জন্য ভাতা দেয়, এবং এটি কেবল তার সারগ্রাহী প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে, যা জাতির শিক্ষানীতিগুলির অন্তর্নিহিত নীতি হিসাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি বাস্তব দর্শন। এই মানটি ডিউঈ'র পক্ষে শিক্ষাগত লক্ষ্য, শিক্ষাগত পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, শিক্ষামূলক পরিকল্পনার উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম করে এবং দর্শনের সাথে যুক্ত অন্যান্য সমস্ত শাখাকে শিক্ষা হিসাবে প্রভাবিত করে।[৪৫]

আদর্শিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্র অন্যতম। এ ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল বৈষম্য দূরীভূত হয়ে সমমর্যাদার দাবী সুনিশ্চিত থাকে। কেউ কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে আদর্শ জীবনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। এই প্রক্রিয়ার শক্ত ভিত স্থাপন করার ক্ষেত্রে শিক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্রচর্চা শিক্ষার্থীর জন্য পথপ্রদর্শক। একথা ডিউঈও স্বীকার করেছেন। এজন্য বলা হয়, তাঁর শিক্ষাদর্শন শিক্ষার সামাজিক প্রকৃতি, গণতন্ত্রের সাথে এর নিবিড় এবং একাধিক সম্পর্ক ও এর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে জোর দেয়।[৪৬] তিনি রুটিনভিত্তিক শিক্ষার বিরোধীতা করে সক্রিয়তাকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় হলো শিক্ষার উত্তম জায়গা যেখানে সহপাঠীরা একত্রিত হয়ে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে। ফলে একে অপরের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এখানে সকলেই কথা বলতে পারে বলে বিদ্যালয় গণতন্ত্রচর্চার উত্তম জায়গা। আজকের শিক্ষার্থীই আগামীর কর্ণধার। এই শিক্ষা তাকে ভবিষ্যতে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। বস্তুত শিক্ষার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর হয়ে থাকে। গণতন্ত্র মানে জনমতের প্রাধান্য। এই প্রাধান্যের কারণেই প্রত্যেকের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেরই সমাজ তথা রাষ্ট্র পচিালনায় অংশীদারিত্ব থাকে। এই প্রক্রিয়াই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম পথ এবং শিক্ষার মাধ্যমে এই পথ পরিক্রমা পরিপূর্ণতা পায় বলে ডিউঈ-এর অভিমত।

তথ্যনির্দেশ:

১. বাংলা "গণতন্ত্র" পরিভাষাটি ইংরেজি *ডেমোক্রেসি* ((Democracy) থেকে এসেছে। এই ইংরেজি শব্দটি আবার এসেছে গ্রিক শব্দ δημοκρατία (*দেমোক্রাতিয়া*) থেকে, যার অর্থ জনগণের শাসন। শব্দটির দুটি মূল হচ্ছে δῆμος (দেমোস) "জনগণ" ও κράτος (ক্রাতোস) "ক্ষমতা" থেকে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে অ্যাথেন্স ও অন্যান্য গ্রিক নগররাষ্ট্রে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝাতে শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয়। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কিলসথেনিসের নতুন ধরনের সরকার চালু হয় এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রথম গণতন্ত্র সৃষ্টি হয় গ্রিসের ছোট একটি শহর-রাষ্ট্র এথেন্স। এই শহর রাষ্ট্রটি ছিলো এথেন্স শহর এবং তার আশেপাশের গ্রামাঞ্চল নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপজাতির মধ্য থেকে নেতাদের বেছে নেয়ার যে সনাতনী রীতি চালু ছিলো, ক্লিসথেনিস তার অবসান ঘটান। তার বদলে তিনি মানুষের নতুন জোট তৈরি করেন এবং প্রতিটি জোটকে ডিময় (Demoi) অথবা প্যারিশ (Parish) এ বিভক্ত করেন। প্রতিটি মুক্ত নাগরিককে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ে শহর-রাষ্ট্রের সরকার পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণের অধিকার দেয়া হয়। সাধারণভাবে এই ঘটনাকেই গণতন্ত্রের প্রথম উন্মেষরূপে গণ্য করা হয় যার পরে নাম হয় ডেমক্রিশিয়া (Democratia) যার অর্থ জনগণের (demos) শক্তি (Kratos)। (সূত্র: https//:bn.wikipedia.org/wiki/গণতন্ত্র)

২ https//:bn.wikipedia.org/wiki/গণতন্ত্র

৩ A.V.Dicey, *Introduction to Political Science* (London: Macmillan and Co., 1939), p.324.

৪. S.M. Lipset, *The Political Man* (London: William Heinmann Ltd., 1973), p. 50.

৫ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.) (কলিকাতা: দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লি., ১৯৬১), পৃ. ১১২।

৬ John Dewey, *Democracy and Education* (New York: The Macmillan Company, 1944), p. 87.

৭ S.M. Lipset, *The Political Man,* p. 55.

৮ John Dewey, *Reconstruction in Philosophy* (London: Henry Holt and Company, 1920), p. 186.

৯ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩।

১০. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, "মানবকল্যাণে শিক্ষা", *অন্বেষণ*, ষষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০২, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১।

১১. শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.),পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।

১২ Douglas Kellner, *Toward a Critical Theory of Education*. p. 5 (online at: http://www.gseis.ucla.edu/ faculty/ kelllnery)

১৩ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

১৪. Richard H. Popkin and Avrum Stroll, *Philosophy Made Simple* (London: W.H. Allen), 1969, p. 270.

১৫ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

১৬ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০।

১৭ Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philisophy of Education* (New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1996), p.112.

১৮ *Ibid*. p. 113.

১৯ *Ibid*. p. 113.

২০. *Ibid*, p. 113.

২১. Bertrand Russell, *Unpopular Essays* (London: Unwin Paperbacks, 1976), p. 135.

২২ Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philisophy of Education*, p. 113.

২৩ John Dewey, *The School and Society* (Chicago: The University of Chicago Press, 1932), p. 4.

২৪. Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philisophy of Education*, p. 112.

২৫ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

২৬ Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philisophy of Education*, p. 113.

২৭ John Dewey, *Democracy and Education*, p. 81.

২৮ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, "মানবকল্যাণে শিক্ষা", *অন্বেষণ*, ২০০২, পৃ. ৬।

২৯ T. W. Moore, *Philosophy of Education* (London & New York: Routledge, Vol. 14, 2010), p. 59.

৩০. John Dewey, *The Schoo and the Society*, p. 31.

৩১. Nel Noddings, *Philosophy of Education* (USA: Westview Press, Inc., 1995), pp. 36-37.

৩২ T.W. Moore, *Philosophy of Education*, p. 60.

৩৩ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।

৩৪. Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philisophy of Education*, p. 112.

৩৫ শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, *গণতন্ত্র ও শিক্ষা* (অনু.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।

৩৬ Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philisophy of Education*, p. 114.

৩৭ *Ibid*, p. 128.

৩৮ Richard H. Popkin and Avrum Stroll, *Philosophy Made Simple*, p. 270.

৩৯ Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philisophy of Education*, p. 111.

৪০. *Ibid*, p.118.

৪১. Steven M. Cahn, *The Philosophical Foundations of Education* (New York: Harper & Row, Publishers, Inc., 1970), p. 201.

৪২ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন চৌধুরী, "মানবতা, জীবন ও বাংলাদেশ", হাসান আজিজুল হক (সম্পা.), *বাংলাদেশ দর্শন পত্রিকা*, দ্বিতীয় খন্ড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৯৭।

৪৩ Robert B. Downs, *Heinrich Pestalozzi: Father of Modern Pedagogy*, Edited by Samuel Smith, Ph.D. (Boston: Twayne Publishers, 1975), p. 134.

৪৪. T. W. Moore, *Philosophy of Education,* p. 59.

৪৫ Patrick O. Akinsanya, "Dewey's Pragmatic Education: An Eclectic Philosophy of Note", *Education Practice and Innovation*, Vol. 1, No. 1, 2014, p. 16.

৪৬ Soti Shivendra Chandra and Rajendra K. Sharma, *Philisophy of Education*, p. 110.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক– প্রেক্ষিত প্রাচীন ভারত

সঞ্চিতা সাহা*

Abstract: The article aims to show the relationship between Guru and Shisya in the Gurukul education system. Gurukul is the fundamental part of the education system in the ancient India. Though this education system is guru-centric, its main component is students. Students have the opportunity to develop themselves in the special care of nature and in the colseness of the guru. Guru mentors them in all their activities. The great advantage of this system is creating a very good bond between the guru and the shisya. Guru leads the alround development of the student individually by taking care of both the inner and the outer self. The relation between teacher and students is really sacred and no fees is even charged by the guru. The main aim of the gurukul system is to awake a real human being by purifying the heart, not through desire of earthly enjoyment. The norm of Gurukul education makes the shisya an ideal person and the guru-shisya relationship becomes inseparable.

ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষত্ব হচ্ছে যে,এ দেশ কোন একটি বিশেষ জাতিসত্তা বা সভ্যতার দেশ নয়। বিভিন্ন যুগে নানা জাতি ও সভ্যতা এদেশের ইতিহাস গড়েছে।আর্য, দ্রাবিড়, হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইংরেজদের মিলিত প্রয়াসে এর শিক্ষাক্ষেত্রটিও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ গবেষক মনে করেন যে, বৈদিক শিক্ষা-ই প্রাচীন ভারতের শিক্ষার প্রথম পর্যায় এবং তপোবনের অভ্যন্তরে গুরুকুল একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। গুরু-শিষ্যের অপূর্ব সমন্বয়ে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে গড়ে উঠেছিল তাই গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা।'প্রত্যক্ষ প্রামাণিকতার অভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষার অবকাঠামো সম্পর্কে যথাযথভাবে জানার পরিসর সীমিত'।[১] এই প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহ একালের অনেকেরই রয়েছে।এই পশ্চাৎমুখীনতার অন্যতম কারণ হলো ভারতবর্ষের শিক্ষার যা-কিছু মহৎ উদ্দেশ্য, শ্রেষ্ঠ ও পরম আরাধ্য তার সবই সেই প্রাচীন তপোবন ও গুরুকুল স্মৃতির সাথেই জড়িত। তপোবনের গুরুকুল ঐতিহ্যই ভারতবর্ষের শিক্ষার আপন ঐতিহ্য। সেকালের গুরু ছিলেন মুখ্যত সাধক। আপন তপস্যালব্ধ ঐশ্বর্য্যে শিষ্যকে প্রাণিত করে শিষ্যের সাথে এক আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনই ছিল গুরুর শিক্ষার অন্যতম আদর্শ। বিপরীতে, তপোবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এক গুচ্ছ সজীব প্রাণ তাদের মুক্ত মনের সজীবতায়, জিজ্ঞাসায় ও অন্তহীন কৌতূহলে তাদের মনকে গতিময় করে তোলার পাশাপাশি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেত। গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার সেই আদর্শ আজও স্থূলদর্শীর অলক্ষিতে কালিদাস, রুশো, ফ্রয়েবল, ডিউঈ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের দর্শনে বহমান। সে দিকটি বিবেচনায় রেখে, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার উৎস ও রূপরেখা অন্বেষণ করতে গেলে সেকালের তপোবনের ছত্রছায়ায় 'গুরুকুল' শিক্ষাব্যবস্থার চিত্ররূপ ও 'গুরু-শিষ্যে'র পারস্পরিক সম্পর্কের যথাযথ রূপায়ন একান্ত আবশ্যক। তৎসঙ্গে আবশ্যক বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সেই অতি পুরাতন আদর্শকে সম্মিলিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হওয়া।

গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে সঞ্চালিত হতো তা হলো তপোবন। লোকালয় থেকে দূরে তপোবন ছিল সাধনার সেই স্থান যেখানে ঋষিরা তপস্যা করতেন।নিরন্তন তপস্যার কারণে সেকালের বনগুলো তপোবন হয়ে উঠেছিল অনায়াসে। বনের তরুলতা, পশুপাখি, পর্বতশ্রেণি, নদী-সরোবর, আকাশ-বাতাস সবই যেন তপস্যারত। আর এরূপ তপস্যারত স্থানই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির তপস্যার সাথে ঋষি ও শিষ্যদের তপস্যারও একটা গভীর সংযোগ ছিল।বিশ্বপ্রকৃতির ভেতর দিয়ে এই আলো-বাতাস-অন্ন-জল সমস্তকেই তাঁরা পরম শ্রদ্ধার সাথে, ভক্তির সাথে গ্রহণ করেছিলেন। আর এই বিরাট সংযোগের মধ্য দিয়েই একটা ভাব পরিমণ্ডল, কর্ম পরিমণ্ডল, শিক্ষা পরিমণ্ডল, পারিবারিক পরিমণ্ডল ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করে তপোবন ও গুরুকুল যেন স্বমহিমায় প্রকাশিত হতো।

---

* এম. ফিল. গবেষক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতবর্ষের আর্যঋষিগণই ছিলেন আদিগুরু আর তপোবনের গুরুকুল আশ্রম-ই ছিল আদিবিদ্যালয়। তপোবন ও গুরুকুলের এক বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে রবিঠাকুরের নিম্নোক্ত কবিতাংশটুকুর মধ্যে।

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সাম রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।[২]

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর বক্তব্যেও একই চিন্তার অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন, "বাস্তবিক, তপোবন থেকেই প্রথম ভারতীয় সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল। আর বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তথা অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের এই তপোবন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে বৈদিক উপনিষদ-সমূহ।"[৩] রবিঠাকুর কবি কালিদাসের তপোবন ভাবনার দ্বারা প্রাণিত হয়ে তপোবন সভ্যতার আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছিলেন এবং বাস্তবায়নে গ্রহণ করেছিলেন এক বলিষ্ঠ পদেক্ষপ। তৎকালীন প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে শিক্ষাক্ষেত্রটিকে স্বতন্ত্ররূপে গড়ে তোলেন তাঁর বিশ্বভারতীতে। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও নন্দিত।

গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্ররূপ অঙ্কনে পর্যাপ্ত তথ্যের অপ্রতুলতা যেমন রয়েছে তেমনিপ্রায় চার সহস্র বছর পূর্বের আদি-বৈদিক যুগের ঘটনার পরম্পরার ব্যাপারে মতান্তরও রয়েছে। উপরন্তু, সেকালের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা,মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন না থাকা, সর্বোপরি এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বের সম্যক জ্ঞান না থাকায় সমগ্র ভারতবর্ষের কোথায় কোন্ ঋষি, কখন কোন তত্ত্ব লিখেছেন তার খবরও পাওয়া যেত না। ফলে, ইতিহাসের ধারাবাহিক উপস্থাপনের দিক থেকে সমগ্র ভূ-ভারতের সব রচনার একত্রীকরণ সেই সময়ের প্রেক্ষিতে শুধু কঠিনই নয়, দুঃসাধ্যই ছিল। সন-তারিখ কিংবা বেদ-উপনিষদের ক্রমিক রচনাকাল ও এদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব না হলেও প্রাচীন বৈদিক যুগের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে, 'পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, প্রাচীন সাহিত্য, ঐতিহ্যগত-সূত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক নানা সংগ্রহ প্রাচীন ভারতের সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম সম্পর্কে জানার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন'।[৪] উপরন্তু, সেই সব বিদগ্ধ পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও ইতিহাসবিদদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যাঁরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে যুগ যুগ ধরে কাজ করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে আচার্য শঙ্কর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ঐতিহাসিক রিস ডেভিডস, রমেশচন্দ্র দত্ত, নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, পরমেশ আচার্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিসাধন গোস্বামী, সুনীল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের উপর আস্থা রেখে একথা বলাসমীচীন যে, বৈদিক আর্যরা যখন ভারতবর্ষে ঢোকে তার পূর্ব থেকেই উত্তরভারতে উন্নত সিন্ধু সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর্যরাও ভারতবর্ষে এক উন্নত সভ্যতা বহন করে এনেছিল।

আর্যদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্তিত্বের ব্যাপারে যে সকল সাক্ষ্য পাওয়া যায় তার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাচীন ভারতের তপোবন কেন্দ্রিক জীবনচর্যায় শিক্ষার ক্ষেত্রটি একান্তই ছিল তাদের জীবন-জীবিকা ও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। ভারবর্ষের সপ্ত-সিন্ধু অঞ্চলে (আধুনিক পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে) অরণ্যচারী আর্য ঋষিগণের যখন প্রথম আগমন ঘটে তখন তাঁদের সহজ-সরল জীবন সংগ্রাম, জীবনের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির কামনায় প্রাকৃতিক শক্তির আনুকূল্য লাভের আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে যে তীব্র জীবন জিজ্ঞাসা তা থেকেই মূলত প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সূচনা। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা চিন্তার মূলেই ছিল ভয়, বিস্ময়, কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা ও আধ্যাত্মিকতা। আর্যঋষিগণের গভীর মনন-জাত সত্য উপলব্ধি অর্থাৎ তাঁদের চিন্তাপ্রসূত ধ্যান-ধারণাকে অন্যদের মাঝে সঞ্চারিত করার মাধ্যমে জ্ঞানের স্থায়িত্ব দানের একটা তাগিদ তাঁরা অনুভব করেন। সেই তাগিদ থেকেই মূলত প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার শুরু। বলা যায়, এ শিক্ষাপদ্ধতি আর্য ঋষিদের একান্তই নিজস্ব। আর এ পদ্ধতিতে গুরু-শিষ্য প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতেন। নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন যে, "যে কোন আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই উদ্ভূত হয়। আর আর্য শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক জীবন প্রস্তুত করার মতো উপকরণের অভাব ছিল না।"[৫]

কালের বিবর্তনে বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থাও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। ক্রমান্বয়ে একটি আচার্য সম্প্রদায়ের যেমন উদ্ভব ঘটে তেমনি বিদ্যার্থীর সংখ্যা ও বিদ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি পদ্ধতিগত শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, শিক্ষণের বিষয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বিকশিত হতে থাকে। কালক্রমে তপোবনের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুকূল একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। ঋষি পরিবারই ছিল সে যুগের শিক্ষক পরিবার বা গুরুকুল।"শিক্ষার প্রথম বিকিরণ হয় ঋষিদের প্রজ্ঞার আলোকে। ঋষি-পরিবারেই ইহা প্রথম প্রজ্বলিত হয় এবং পরে পরিব্যাপ্ত হয় দিকে দিকে।"[৬]ঋষি বা গুরু ছিলেন মুখ্যত সাধক। শিক্ষাদান ছিল তাঁর ধর্ম ও কর্ম। বিদ্যা সৃষ্টি ও বিদ্যা বিতরণ ছিল তাঁর সাধনার প্রধান অঙ্গ। এক কথায়, শিক্ষার্থী ব্যতীত গুরুর অর্জিত জ্ঞান যেমন অসম্পূর্ণ ছিল, তেমন গুরু ছাড়াও শিশুমনকে যথাযথভাবে চালনা করা যেতো না।"ঋগ্বেদের ১/১৭৯ সূক্তে গুরু অগস্ত্য, গুরুপত্নী ও শিষ্যের পারস্পরিক কথোপকথন থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, গুরুসান্নিধ্য বা গুরুগৃহ অবলম্বন করে শিক্ষার চর্চা হত। অর্থাৎ গুরুগৃহকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ঋগ্বেদের যুগেই গড়ে উঠেছিল।"[৭] প্রাচীন ভারতের জীবন সাধনার ক্ষেত্রে যে প্রার্থনা ধ্বনিত হতো তা হলো ঃ

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাৎ মৃতং গময়, (বৃহ.উপ. ১/৩/২৮)
আবিরাবির্ম এধি। (ঋগ্ বেদের শান্তিপাঠ)

(অর্থ হল- অসত্য থেকে সত্যে, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। হে প্রকাশ, তুমি আমার নিকটে প্রকাশিত হও।)[৮]

পরম সত্তার কাছে এইরূপ প্রার্থনা নিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন কালের শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণরূপে বেড়ে ওঠার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে তা আমরা ঋগ্বেদের শান্তিপাঠ থেকে জানতে পারি। শিক্ষার্থীরা সেই পরম সত্তার কাছেই নিজেদেরকে নিবেদন করত। এইরূপ নিবেদন ও আরাধনার মধ্য দিয়ে তাদের মনের সকল ক্ষুদ্রতা, দীনতা তথা অজ্ঞানতার আবরণ দূরীভূত করার শিক্ষাই যে 'গুরুকুল' শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষত্ব তা এই ঋগ্বেদের মন্ত্রে সুস্পষ্ট।

এর সূত্র ধরে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বেদচর্চার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছিল এবং ঋগ্বেদ এর তথ্য থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে গুরু-শিষ্যের শিক্ষা-পরম্পরা ব্যাপারটি ছিল। পাশাপাশি, গুরুপরিবারের পারস্পরিক কথোপকথনের তথ্যটিও তপোবনের ঋষি-পরিবারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।অর্থাৎ ঋষিরা তপোবনে কুটির রচনা করে পত্নী, বালক, বালিকা ও শিষ্যদের নিয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকতেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাচর্চায় গুরুর পরিবার ও গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থারও একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। আলোচ্য প্রসঙ্গের পক্ষে নিম্নোক্ত বক্তব্যটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য।

> ঐতিহাসিক রিস ডেভিডসের মতে, পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ। ঋগ্বেদের আবির্ভাব হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০অব্দে। সেই নিরিখে গুরুকুল এর আবির্ভাব যদি কম-বেশি ১০০০ খ্রিস্ট-পূর্বে ও হয়ে থাকে, তাহলেও পাণিনির কালে গুরুকুল পৌঁছেছে কম-বেশি ছ'শ বছর অতিক্রম করে।[৯]

একথা সুস্পষ্ট যে, বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য যুগ তথা তপোবনের গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা কোন কল্পকাহিনী নয়। এইরূপ গুরু-শিষ্য পরম্পরার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় বৈদিক পরবর্তী হাজার বছর পরে প্রাচীন এথেন্সে সক্রেটিস-প্লেটো-এরিস্টটল শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মধ্যে। এথেন্সের ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুকুল শিক্ষার বহু বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর, প্রাচে এই গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ধারা পরবর্তীতেও প্রবাহিত হতে থাকে বৌদ্ধযুগ অতিক্রম করে মধ্যযুগের মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত।

গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা আর্য ঋষিগণ শিক্ষার মূল ধারক ও বাহক হলেও এর মূল উপাদান ছিল শিক্ষার্থী। শিক্ষা কর্মকাণ্ডে গুরু-শিষ্য প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলে উভয়ের মধ্যে একপ্রকার সহজ-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। শিক্ষাদানকে গুরু যেমন নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন, শিক্ষাগ্রহণকেও শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় বিধান বলে মনে করতো। তাই শৈশব অবস্থায় নিজগৃহ ত্যাগপূর্বক গুরুর গৃহে অবস্থান করে পাঠ গ্রহণে মনোনিবেশ করতো। তখন গুরুর গৃহই হয়ে উঠতো

তাদের গৃহ, গুরুর পরিবারই তাদের পরিবার। আর এই বৃহৎ পারিবারিক পরিমণ্ডলে গুরু শুধু শিক্ষকের ভূমিকা-ই পালন করতেন না, তিনি একাধারে হয়ে উঠতেন পিতা, আচার্য, পথপ্রদর্শক, দার্শনিক ও পরম বন্ধু। পাশাপাশি, গুরুর পত্নী, পুত্র, কন্যাও হয়ে উঠতো তাদের গুরুমাতা, গুরুভ্রাতা, গুরুভগ্নী। গুরুকুলের অন্যান্য শিক্ষার্থী পরস্পর পরস্পরের সতীর্থ-সখা-বন্ধু। সকলেই এক বৃহৎ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। সবার অংশগ্রহণে এই বৃহৎ শিক্ষাযজ্ঞ মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়ে উঠতো।

আশ্রমের জীবনচর্যা সহজ-সরল হলেও, সেকালের গুরু অনুধাবন করেছিলেন যে, শুধু নীতিবাক্য ও কড়া শাসন দিয়ে শিষ্যদের জীবন গঠন সম্ভব নয়। গুরুর পক্ষে শিষ্যের মনকে বুঝতে পারাই ছিলশিক্ষার প্রথম ধাপ। অর্থাৎ গুরু, শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষতা সর্বাগ্রে যাচাই করে তাদের মেধা ও প্রকৃতি অনুসারে শিষ্যত্বে বরণ করতেন। বিভিন্ন পরিবেশ থেকে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী গুরুকুলে সমবেত হতো। শিক্ষার্থীর মনকে বুঝে নিয়ে শিক্ষাদান করতেন বলে একদিকে যেমন গুরু তাদের অন্তরে প্রাণসঞ্চার করতে পারতেন, অন্যদিকে তাদের মেধা ও শারীরিক যোগ্যতা অনুসারে কাজবণ্টন ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থাও করতেন। শিক্ষার্থী চয়নের ক্ষেত্রে 'অল্পপ্রজ্ঞা', 'মধ্যমপ্রজ্ঞা', 'উত্তমপ্রজ্ঞা'-এ বিভাজন প্রক্রিয়া প্রাধান্য পেত। তাই বলা যেতে পারে, বৈদিক শিক্ষার শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের গুণ ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে শ্রেণিকরণ ব্যবস্থা প্রথম শুরু হয়েছিল।

> সাধারণতঃ বেদ-বিদ্যা-লাভে সমর্থ ব্রাহ্মণ-ঋষিগণ উত্তম প্রজ্ঞার অধিকারী হইতেন। ইহাদের পরবর্তী স্তর 'মধ্যমপ্রজ্ঞা' এবং সর্বনিম্ন স্তর 'অল্পপ্রজ্ঞা' নামে অভিহিত হইত। সর্বনিম্ন-স্তরের ব্যক্তিগণের জন্য বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত। সে যুগে অনার্যগণই বৃত্তি-শিক্ষায় অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। বৃত্তি-শিক্ষাতেও মানসিক উৎকর্ষের উপযোগিতা নিতান্ত কম ছিল না।[১০]

শিক্ষার সূত্রপাত হতো শিক্ষার্থীর উপনয়ন এর মাধ্যমে। উপনয়নছিল গুরুগৃহে প্রবেশের প্রাক-শর্ত।এর মাধ্যমে শুরু হতো শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় জীবন। এই উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই গুরু-শিষ্যের মধ্যে এক প্রকার সম্পর্কের সূচনা হতো। এ প্রসঙ্গে নলিনীভূষণ বলেছেন,

> উপনয়নের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আচার্যই বিদ্যার্থীকে দ্বিজত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ইহার পরে ব্রহ্মচারীর শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিতেন। স্বীয় তপস্যালব্ধ ঐশ্বর্যে শিষ্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তিনিই শিষ্যকে স্বীয় আত্মার সহিত সংযুক্ত করিতেন। এই আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই আরম্ভ হইত গুরু ও শিষ্যের সমবেত প্রচেষ্টায় শিক্ষার সাধনা।[১১]

সাধারণত, পাঁচ থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যেই শিক্ষার্থীর উপনয়ন হতো। উপনয়নের পরে আরও বহুরকম অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ককে দৃঢ়তর করা হতো। সম্পর্ক বাহির থেকে অন্তর পানে ধাবিত হতো। গুরু ও শিষ্য উভয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা সমবেত হতো এই সম্পর্কের মধ্যে। গুরু শিষ্যের জন্য প্রার্থনা করতেন, আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন পিতার ন্যায়, অভিভাবকের ন্যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নিম্নোক্ত অগ্নি-প্রদক্ষিণ অনুষ্ঠানের কথা। নলিনীভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়-

> 'অগ্নি-প্রদক্ষিণ'-অনুষ্ঠানে আচার্য ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া বাস্তু-দেবতা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হউক, ইহাই প্রার্থনা করিতেন। 'ব্রহ্মচর্যোপদেশ'- অনুষ্ঠানে আচার্য ব্রহ্মচারীকে কর্মফলত্যাগী একটি পূর্ণ মানবে পরিণত হইবার উপদেশ দিতেন। আহার-বিহার, বেশ-বাস প্রভৃতিতে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করার উপদেশও তাঁহাকে দেওয়া হইত। সকল ব্রহ্মচারীকে একত্র বাস করিতে হইত। এক সৌভ্রাত্রসূত্রে বদ্ধ জীবন যাপন করার ফলে পরবর্তী সামাজিক জীবন সুমধুর হইত।[১২]

গুরু, শিক্ষার্থীর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতেন বলে তাঁকেই তাদের আহার-শয়ন-শিক্ষা-চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হতো। লক্ষণীয় যে, আর্যদের 'গুরুকুল' শিক্ষাব্যবস্থাতেই আবাসিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে এবং ধীরে ধীরে তা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তবে, বিলাসমুক্ত, সহজ-সরল জীবনাচরণ ঋষিদের আদর্শ ছিল। শিষ্যদেরকেও সেই আদর্শ অনুসরণ করতে হতো।

তপোবনের নির্জন পরিবেশে 'গুরুকুল' আশ্রমে গুরুর নিবিড় তত্ত্বাবধানে যে শিক্ষাচর্চা শুরু হয়েছিল তা নানা দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। পদ্ধতিগত দিক থেকে, এ শিক্ষা ছিল মৌখিক এবং গুরু-শিষ্য শ্রুতি পরম্পরা। বিষয়বস্তুর দিক

থেকে, এর দুটি দিক ছিল- একটি হলো পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কিত বিদ্যা। অপরটি হলো অপরাবিদ্যা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিদ্যা। শিক্ষার্থীদেরকে গুরুর আবৃত্তি শুনে শুনেই গভীর মনোযোগ সহকারে তা অনুসরণ করা ও স্মৃতিতে ধরে রাখার পাশাপাশি পাঠ্য বিষয়ের অর্থ উপলব্ধি করতে হতো। অর্থ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই তাদের পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতো। কিন্তু তা না করে যদি কেউ কেবল বেদ পাঠ করতো তবে তার শিক্ষা হতো অপূর্ণ।বৈদিক যুগে বেদ পাঠই একমাত্র উপজীব্য ছিল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পরিসরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 'বৈদিক পরবর্তী উপনিষদীয় যুগে ৪টি বেদ, ৬টি বেদাঙ্গ (ছন্দ, ব্যাকরণ, শিক্ষা, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষশাস্ত্র) ও উপনিষদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে, পুরাণ, ইতিহাস, অস্ত্রবিদ্যা, রাশি (গণিত), সর্পবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, শব্দকোষ, একায়ন (নীতিশাস্ত্র), ব্রহ্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ও স্থান পেয়েছিল'।[১৩] 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র অনুসারে কন্যারও 'উপনয়ন' বিধি ছিল আবশ্যক। হরিতা ধর্মসূত্রে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সূত্র বরং পুত্রসন্তান অপেক্ষা কন্যাসন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেয়। পাণিনি যুগেও 'উপাধ্যায়া', 'আচার্যা' শব্দ থেকে অনুমিত হয় যে, নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সে যুগেও ছিল। মনুর অনুশাসনেও তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়'।[১৪] যোযা, অপালা, বাক, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখের নাম বেদ ও উপনিষদেই উল্লেখ আছে। এঁদের অনেকেই মন্ত্রদ্রষ্টা ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন।

বৈদিক যুগে উপনয়নের পরই যেহেতু শিক্ষা ব্যাপারটি শুরু হতো সেহেতু শিশু শিক্ষার্থীকে গুরু কেবল স্মৃতি-শ্রুতির ভারে পর্যুদস্ত না করে তাকে প্রাত্যহিক জীবনচর্যার নানা বিষয়ও শিক্ষা দিতেন।বেদ ও উপনিষদে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের যে সকল ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে বলা যায়, গুরু একজন শিষ্যকে কেবল জ্ঞানের শিক্ষায় আলোকিত করতেন তাই নয়, একই সাথে ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে, স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষাও দিতেন।অপরদিকে, 'ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ'- অর্থাৎ অধ্যয়ন-ই ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা জেনে জ্ঞান লাভ, জ্ঞান সঞ্চয় এবং জ্ঞানকে মনে প্রাণে ধারণ করে, গুরুর আদেশ-নির্দেশ পালন করতে হতো। মহাভারতে কচ, গুরু শুক্রাচার্যের গো-চারণ করে 'ব্রহ্মচর্য-আদিবিদ্যা' শিখেছিল।[১৫] নিম্নোক্ত অংশ উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে তুলে ধরা হলোঃ

> Pupils had to work for their teacher in house and field, attending to his sacred fires, looking after his cattle, and collecting alms for him. The pupil also accompanied his teacher and awaited his command. In the leisure time left from the duties to the performed for the *guru* the Veda was studied.[১৬]

বলা যায়, গুরুর শিক্ষায় স্বাবলম্বন, কর্মদক্ষতা, মনুষ্যত্ববোধ, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও সেবার মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি যে বিধি-নিষেধগুলো অবশ্য পালনীয় ছিল তা পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থীর জন্য কল্যাণ-ই বয়ে আনতো।

এই তপস্যা বা সাধনমার্গে শিক্ষার্থীর জীবনকালকে গুরু চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। প্রত্যেকটি পর্যায়কে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের এক একটি স্তর বা আশ্রম বলা হতো। গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় যে চারপ্রকার আশ্রমের উল্লেখ আছে সেগুলো যথাক্রমে- (১) ব্রহ্মচর্য (২) গার্হস্থ্য (৩) বানপ্রস্থ (৪) যতি বা সন্ন্যাস। জীবনের প্রারম্ভিক শিক্ষাকালকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, সংসার জীবনকে গার্হস্থ্য আশ্রম, সমাজ বা পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করে সাত্ত্বিক-সাধনার কালকে বানপ্রস্থ আশ্রম এবং সর্বশেষ ধাপ হলো যতি বা সন্ন্যাস আশ্রম। 'শিষ্যরা স্নাতককাল পর্যন্ত গুরুগৃহে কঠোর সংযমের মধ্য দিয়ে উদযাপন করত ব্রহ্মচর্য জীবন। ব্রহ্মচর্য পালন শেষে তারা গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যেত। কেবল 'নৈষ্ঠিক' ব্রহ্মচারীরাই সংসার জীবনে ফিরে আসত না। মেগাস্থিনিসের বর্ণনানুসারে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই স্নাতককালে পৌঁছাতে কারো কারো ৩৭ বছর বয়সও লেগে যেত'।[১৭]

গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, সেখানে দান করার দাক্ষিণ্যে দাতা ধন্য আর গ্রহণ করার শক্তিতে গ্রহীতাও ধন্য। আর এ দুইয়ের মধ্যদিয়ে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল মানবজীবনের পরিপূর্ণতা। বৈদিক-উপনিষদীয় যুগে গুরুর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সত্য জিজ্ঞাসার জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পথ তৈরি করে দেওয়া। গুরুর বিবেচনায় শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান-সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলা নয়। সুশিক্ষার দ্বারা মানব মনের সর্বপ্রকার মুক্তিলাভ তথা সমগ্র বিশ্বসত্তার মাঝে নিজেকে একাত্ম করে দেখতে শেখাই প্রকৃত শেখা। বিদ্যার সাধনায় বিষয়বুদ্ধি বা স্বার্থচিন্তা প্রাধান্য পেলে তা স্বভাবতই হয়ে পড়ে সংকীর্ণ। তখন জীবনের উচ্চ আদর্শ বা লক্ষ্য অর্জিত

হয় না।তাই, গুরুর নিবিড় তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি নিষ্ঠা ও শক্তি লাভ করে, যেন তারা অভয় প্রাপ্ত হয় এবং দ্বিধাবর্জিত হয়ে মনুষ্যত্বের শিক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।তবে, ব্যবহারিক জীবনের সব প্রয়োজনের উর্ধ্বে এর স্থান হলেও ব্যবহারিক জীবনকে যুক্ত করেই সে শিক্ষা পরিপূর্ণ। তাই গুরুকুল শিক্ষায় শিক্ষার্থীর জীবনের উচ্চতর আদর্শের দিক ও ব্যবহারিক দিক উভয়ই প্রাধান্য পেত।

উপনিষদীয় শিক্ষায় গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। *ঈশ* উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন ও অতিরিক্ত বিষয়াসক্তি বর্জনের নির্দেশ রয়েছে। *তৈত্তিরীয়* উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের নবম অনুবাকের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, 'অন্ন যাতে বর্ধিত হয় সেইরূপ কর্ম করবে।' সেকালের গুরু জানতেন, গার্হস্থ্য জীবনে ধনের বাস্তব প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা যায় না। যদিও শিক্ষার্থীদের প্রতিপালনের জন্য গুরুর পক্ষে বৃত্তিগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল তবুও আশ্রমে শিষ্যের সব ভার গুরুকেই বহন করতে হতো। অনুরূপভাবে, শিষ্যকেও আশ্রমে গুরুর সেবা করতে হতো। গুরুর জন্য ভিক্ষাও করতে হতো। 'ভিক্ষাবৃত্তির এই বৈষয়িক প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতো তা হলো শিক্ষার্থীর অহমের মোচন ঘটানো। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকেই ভিক্ষাবৃত্তি অনুসরণ করতে হতো। আর এটিই ছিল তপোবনের গুরুর শিক্ষা-আদর্শের অন্যতম দিক। গুরুগৃহ ত্যাগের পর শিক্ষার্থীকে আর ভিক্ষাবৃত্তি অনুসরণ করতে হতো না'।[১৮]

> গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল অর্থ-সম্বন্ধশূন্য, অবিচ্ছেদ্য ও অন্যোন্য। ন্যায় বর্তিকায় সেই সম্পর্ক সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'সম্প্রদায়ো নাম শিষ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধস্য অবিচ্ছেদেন শাস্ত্রপ্রাপ্তিঃ'। সামাজিকভাবে অত্যন্ত মান্য সেই গুরুকুল ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহের দায় নিতেন রাজা। তিনি 'অগ্রহার গ্রাম' দান করতেন আচার্যদের। শুধু রাজাই নয়, গৃহস্থদের বাড়ি থেকেও মাধুকরী সংগ্রহ করতে হতো শিষ্যদের।[১৯]

উপনিষদীয় শিক্ষাব্যবস্থায় 'ব্রহ্মচারী' বলা হতো তাদের যারা উপনয়নের পর সংসার ধর্ম পালনের আগে পর্যন্ত গুরুগৃহে থেকে বিদ্যা চর্চা করতো। গুরু যখন লক্ষ্য করতেন, শিষ্য সংযমী, আদর্শবান ও সমাজের পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে তখন তাকে সংসার জীবনে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এই অনুমতি বা ছাড়পত্রই হলো সমাবর্তন।গুরু, সমাবর্তনের দিনে শিষ্যদের দীর্ঘায়ু কামনার পাশাপাশি যা যা উপদেশ দিতেন তার মাধ্যমে তাদের আগামী দিনের চলার পথকে পরিপূর্ণ করে দিতেন।গুরু বলতেন, "দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে অমনোযোগী হবে না; মাতা, পিতা, অতিথি এবং আচার্যকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করবে। লোকসমাজে যে সকল কর্ম নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয় কখনও তা করবে না। আচার্যগণের যে শোভন আচরণ তারই অনুসরণ করবে।"[২০] গুরু এদিনে শিষ্যদেরকে কর্তব্য কর্মে পর্বতের মতো অচঞ্চল থাকার, কুঠারের মত তীক্ষ্ণধার, এবং স্বর্ণের মতো মূল্যবান হওয়ারও উপদেশ দিতেন।

> বৃহদারণ্যকে উপনিষদে আছে, প্রজাপতি সমাবর্তনের দিনে তিন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'দ দ দ; অর্থাৎ আত্মদমন কর, দান কর, দয়া কর।...'দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম ইতি'। তাই ঋষি বলছেন, এই তিনটি সদ্গুণ অভ্যাস করা উচিত 'তদেতৎ এয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি'।...তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, আচার্য সমাবর্তনের দিনে অন্তেবাসীকে উপদেশ দিচ্ছেন, সত্যকথা বলবে। ধর্ম আচরণ করবে। বেদপাঠ হতে বিরত থাকবে না। আচার্যকে প্রিয় উপহার দেবে। বংশধারাকে অব্যাহত রাখবে।[২১]

সমাবর্তনের দিনে শিষ্যের প্রতি গুরুর এ উপদেশ বাণী তাদের সারা জীবনের পাথেয়। একই সাথে তাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন যে এক মহান আদর্শকে সামনে রেখে শুরু হতো এ ছিল তারই এক নিদর্শন।সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের যে ইতি ঘটতো তা কিন্তু নয়, বরং আমৃত্যু এই সম্পর্ক বজায় থাকত। মহাভারতে এরূপ তপোবনভিত্তিক শিক্ষায়তনের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কেবল প্রাচীন ভারতে নয় পরবর্তীকালের শিক্ষাব্যবস্থাতেও এ আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। এমন কি আধুনিক যুগের শিক্ষাব্যস্থাতেও সমাবর্তনের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস তো পায়নি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদিক যুগের 'গুরুকুল' শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গুরু-শিষ্য শিক্ষা পরম্পরায় তাঁদের আত্মিক সম্পর্কের পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক যেন এক সূত্রে গাঁথা ছিল। উপরন্তু, এ শিক্ষা পদ্ধতিতে, গুরু-শিষ্যের পরস্পর শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যাপারটি কেবল অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল না, এর ভিতরে একটি অন্তরের সম্বন্ধও বিদ্যমান ছিল। সমগ্র সাধন প্রক্রিয়ায়, কঠোর নিয়মনীতি, শাসন-অনুশাসনের বিষয়কে ছাড়িয়ে

উভয়ের মধ্যে গভীর স্নেহ-প্রেম-ভক্তির সম্বন্ধটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতো। সেকালের গুরু কেবল ক্ষুরধার পণ্ডিত-ই ছিলেন না, ছিলেন উচ্চ আদর্শের অধিকারী। বিদ্যাদানে ছিল তাঁর গৌরব ও আনন্দ। গুরুর ব্যক্তিত্বে কঠোর-কোমল গুণের সহাবস্থান লক্ষণীয় ছিল। গুরুর চারিত্রিক দৃঢ়তা শিষ্যদের ব্যক্তিত্বের ভিতকে যেরূপ শক্ত-পোক্ত করতো, পাশাপাশি, তাঁর কোমল আচরণ তাদেরকে দয়া, মায়া, বিনয়, সহানুভূতি, ক্ষমা ইত্যাদি মানবীয় গুণগুলোরও অধিকারী করে তুলতো। এ শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। গুরুর মহিমা সবচেয়ে উঁচুতে থাকায় গুরুর শিক্ষায় পক্ষপাত নিষিদ্ধ বিবেচিত হতো। এক্ষেত্রে গুরুর গভীর অন্তঃকরণ তথা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। গুরুর কাছে উপনীত বিদ্যার্থীর শুধু বিদ্যাদানের ব্যাপরটিই নয় তার যাবতীয় শিক্ষার মাধ্যমে গুরু তাকে নতুন জন্ম দিতেন। তাই শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, গুরুর কাছে শিক্ষার্থী সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পন করতো। গুরুও শিক্ষার্থীকে নিজ সন্তানের মতো গ্রহণ করে তাকে লালন-পালন করতেন। পিতা-মাতার থেকে গুরুকেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হতো। এই কারণে গুরুকে কখনও হতে হতো পিতা, কখনো বন্ধু, কখনো পথপ্রদর্শক, কখনও বা দার্শনিক। এছাড়া গুরু, শিষ্যের রোগশয্যায় পাশে থেকে মায়ের মতো সেবা করতেন। অনুরূপভাবে শিষ্যকেও গুরুর সেবার জন্য নিয়মিত ভিক্ষা করা, জল আনা, কাঠ কাটা, ফল-ফুল সংগ্রহ, গো-পালন, কৃষিকাজে সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে গুরুর পরিবারের একজন সদস্য হয়ে উঠতে হতো।গুরু-শিষ্যের এই করণীয় কর্তব্যের মধ্যে শুধু নিষ্ঠার ব্যাপার ছিল না,অন্তরের সম্বন্ধই প্রবল ছিল। তাই গুরুর কঠোর ন্যায়-নীতি ও দায়িত্ববোধের মধ্যে শিষ্যের প্রতি স্নেহ-দয়া-মায়া-ক্ষমা গুণগুলো একাকার হয়ে পরস্পরের নিবেদনের ডালা পরিপূর্ণ হতো। সেকারণেই গুরু ছিলেন মুখ্যত সাধক। গুরুর গুণের মাহাত্ম্যেই শিষ্যের হৃদয়ে তাঁর আসন ছিল সুদৃঢ়। গুরুর প্রেরণা ও প্রণোদনাই ছিল শিক্ষার্থীর চলার পথের পাথেয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে গুরুকুল শিক্ষার একটি চমৎকার দিকের সন্ধান পাই 'সত্যকাম-জাবালের প্রকৃতিলব্ধ ও মানব-লব্ধ শিক্ষা' নামক অংশে। স্বাধ্যায়ী হয়ে বিদ্যার্জন সম্ভব হলেও গুরুর মাধ্যমে যে জ্ঞান সঞ্চারিত হয় না সে জ্ঞান মর্যাদা প্রাপ্ত হয় না। সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুর জ্ঞান-ই পরমজ্ঞান রূপে মান্য হতো। সত্যকাম প্রকৃতি ও মানুষের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা পূর্বে জ্ঞাত হলেও গুরু সমীপে উপনীত হয়ে পুনরায় ঐ জ্ঞান দানের জন্য গুরুকে বিনীত অনুরোধ জানায়। সত্যকামের সানুনয় আবেদনে অনুরুদ্ধ হয়ে আচার্য গৌতম তাকে ব্রহ্মবিদ্যা সকল নিজ মুখে শ্রবণ করালেন। প্রসঙ্গক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশ উল্লেখ করা হলো-

শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্যদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং
প্রপয়তীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্র হ ন কিংচন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি ॥৩

> সরলার্থ: আপনার মত ব্যক্তিদিগের নিকট শুনিয়াছি যে আচার্যের কাছে বিদ্যা লাভ করিলেই তাহা সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর হয়। তখন আচার্য সত্যকামকে সেই সবই (অর্থাৎ বৃষ, অগ্নি, হংস, এবং মদ্‌গু যে সব উপদেশ দিয়াছিল তাহার সমস্তই) বলিলেন, কিছুই বাদ গেল না।[২২]

উপনিষদীয় আখ্যায়িকায় গুরুর প্রতি শিষ্যের সশ্রদ্ধ আবেগ-ভক্তি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি একইসাথে শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহমণ্ডিত অভিভাবকত্বেরও প্রকাশ ঘটেছে। উপনিষদসহ মহাভারতের বহু উপাখ্যানের মধ্যে গুরু-শিষ্যের এই মধুর সম্পর্কের ছবি বারে বারে দেখা যায়।

গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার এই যে একটা আদর্শ চিত্র পাওয়া গেল তারও কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যেত। আশ্রম বিদ্যালয়ে ব্রতভঙ্গকারী গুরু ও শিষ্যের কদাচিৎ দেখা মিলত। কোন গুরু শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করলে তাকে নিন্দা করা হতো 'উপপাতকী' বা 'বৃত্তিক' বলে। আবার শিক্ষার্থীকেও তুচ্ছার্থে বলা হতো 'ভিক্ষা মানব', 'তীর্থকাক' ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "স্খলন-পতন সে যুগেও ঘটে থাকত আশ্রম বিদ্যালয়ে। হয়তো এই সব কারণেই শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তির কিছু কিছু বিধান যোগ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন মনু। 'তীর্থকাক' কথাটি পাওয়া গেছে মহর্ষি পতঞ্জলির ভাষ্যে। আর পাণিনির মূল 'অষ্টাধ্যায়ীতে'।"[২৩]

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে বৈদিক, উপনিষদীয় যুগের দীর্ঘ সময় পার করে আসে বৌদ্ধযুগ। বৈদিক-উপনিষদীয় যুগে ঋষি-পরিবারে যেভাবে শিক্ষা-দীক্ষা ঘটত, বৌদ্ধ ধর্ম সংঘে স্বাভাবিকভাবেই তেমন পারিবারিক আবহাওয়া সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় তপোবনের যে একটা বিরাট প্রভাব ছিল তাও পরিবর্তিত হয়ে বৌদ্ধ আমলেই শিক্ষার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির সূচনা হয় এবং কালক্রমে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে। এককথায়, শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষকশ্রেণি বৌদ্ধযুগেই প্রথম গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র একজন গুরুর কাছ থেকে সমস্ত বিদ্যার পাঠ নিতে হতো না। মঠ বা সংঘগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন গুরু বা আচার্যের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগ ছিল। বৈদিক পরবর্তী উপনিষদীয় যুগে পুরোহিতদের কঠোর অনুশাসনের ফলে সমাজ ও ধর্ম একদিকে যেমন যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানবহুল কর্মকাণ্ডের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তেমনি অন্যদিকে জাতিভেদ ও বর্ণ-বৈষম্যও বেড়ে যায়। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান হলেও বৌদ্ধমত উপনিষদের বহু তত্ত্বের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল ছিল। বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে চতুর্বেদ পাঠ্যবিষয় হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য, বৌদ্ধযুগেই সর্বপ্রথম শিক্ষা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন রূপ লাভ করে এবং শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্মের বাধা পেরিয়ে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। গৌতমবুদ্ধ দেবভাষার (সংস্কৃত) পরিবর্তে পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করেছেন। প্রত্যেক মানুষের প্রতি তার নির্দেশ ছিল 'অত্তদীপ ভব' অর্থাৎ মানুষের অন্তরের মধ্যে মানুষকেই পরম দীপ প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। সংঘে প্রবেশের পর তাই শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো বিনয় ব্যবহার এবং পঞ্চশীল (জীবহত্যা, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার ও নেশা-আসক্তি থেকে বিরত থাকা) পালনের শিক্ষা দ্বারা।

বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য যেমন ছিল, তেমনি কিছু সাদৃশ্যও ছিল। 'বৈদিক ধর্মের ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের শ্রমণ-জীবন, উপসম্পদা, প্রবজ্যা ইত্যাদির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়'।[২৪] তাছাড়া, বৈদিক-উপনিষদীয় শিক্ষায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল বৌদ্ধযুগেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গুরুর প্রতি ভক্তি, শিষ্যের প্রতি স্নেহ এবং মন্ত্রের প্রতি আস্থা রাখা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। বৌদ্ধ সংঘেও শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চা হতো মুখে মুখে। শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীকে যে বিধিবদ্ধ নিয়মের অধীনে চলতে হতো তা 'বিনয়পিটকে' স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইৎ-সিঙ এর বিবরণ সূত্রে বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বয়সক্রম অনুসারে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম ও বিষয় নির্ধারণের কথা জানা যায়। পড়ুয়া অর্থে 'ছাত্র' কথাটা পাণিনিই প্রথম প্রয়োগ করেছেন। গুরুর ছত্রবিশেষ বলে শিষ্য ছাত্র।[২৫] বৌদ্ধসংঘের ছাত্রসংখ্যা বেশি থাকায় সেখানেই প্রথম শ্রেণি-শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। শুধু তাই-ই নয়, এই শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতির কারণে ভারতীয় সংস্কৃতি সেই সময়েই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা যেমন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল তেমনি শিক্ষার্থী শিক্ষাকালে কোন গর্হিত কাজ করলে দণ্ড বিধানের ব্যবস্থাও ছিল। দণ্ডদানের নাম ছিল 'প্রণামিত' বা 'প্রণাম'।তবে, শিক্ষার্থী দোষ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থী হলে শিক্ষক তা যেমন ক্ষমা করতেন, তেমনি স্নেহও করতেন। এক কথায়, বৌদ্ধ ধর্মসংঘেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো। উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধযুগে নারী শিক্ষারও যথেষ্ট চল ছিল। নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "বৌদ্ধসংঘে নারী-শিক্ষাব্যবস্থা বুদ্ধের সময় থেকেই আরম্ভ হয়। প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধ স্বয়ং মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অনুরোধে নারী-শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[২৬]

বৌদ্ধযুগের অব্যবহিত পরেই, যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ভারতবর্ষে পরিপুষ্টতা লাভ করেছিল তা হল ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা। 'মুসলিম শাসনামলের মক্তব-মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষাধারার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে পাঠশালা এবং টোল-চতুস্পাঠীতে গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষা যে নির্বিঘ্নে চলেছিল মোটের উপর উনিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত-তা টমাস মনরো (১৮২২-১৮২৪), স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন (১৮২৩-১৮২৫) এবং উইলিয়াম অ্যাডাম (১৮৩৫-১৮৩৮) এঁর বিবরণী থেকে জানা যায়'।[২৭] তপোবনের কাল বিগত হলেও, মক্তব-মাদ্রাসাগুলোতে যেহেতু গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার চল অব্যাহত ছিল সেহেতু মুসলিম যুগকেও আলোচনার অন্তর্গত করে আমাদের বক্তব্যের সমাপ্তি টানা যুক্তিসংগত হতো। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, যুগের বিচারে সেটা ছিল মধ্যযুগ। তাই, আলোচনার স্বার্থে আমাদের বক্তব্যকে প্রাচীন যুগের 'গুরুকুল' শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই সীমিত রাখা হলো।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষায় গুরুমুখিনতা, গুরুর শিক্ষাদান প্রণালি, নির্জন প্রকৃতির অনাবিল সান্নিধ্য, সর্বোপরি গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কই ছিল 'গুরুকুল' শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষত্ব। শিষ্যের কাছে গুরু ছিলেন পিতৃতুল্য। অনুরূপভাবে গুরুর কাছেও শিক্ষার্থী সন্তান প্রতিম। শিক্ষার্থীর মনের নানা প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কৌতূহল, বৈপরীত্য, অসঙ্গতি সমাধানের জন্য গুরুর সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল ছিল। গুরুর হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে শিষ্যের প্রতি তাঁর অনুপম স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসার বিস্তারে। 'তৎকালে গুরু তাঁর উপযুক্ত শিষ্যকে সম্মান ও স্নেহ প্রকাশের হেতুতে 'মিত্র' বলে সম্বোধন করতেন'।[২৮] কেবল গুরুর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য নয়, গুরুর পারিবারিক পরিমণ্ডলের প্রভাবও শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। এর থেকে শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য জীবন ও কর্মজীবনের শিক্ষাও লাভ করতো। আর এই প্রকার শিক্ষালাভের জন্য একমাত্র তপোবনই ছিল উপযুক্ত স্থান। তপোবনের তপস্যা অঙ্গীভূত থাকায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ঐতিহ্যে গুরুর কাছে শিক্ষা কখনোই পণ্য হয়ে ওঠেনি। সেকালের গুরু জানতেন শুধু বক্তৃতা বা উপদেশ দিয়ে ছাত্রের চরিত্র গঠন করা সম্ভব নয়, বরং নিজের জীবনকে দৃষ্টান্তরূপে ছাত্রের সামনে তুলে ধরে ছাত্রকে উদ্বোধিত করাই ছিল গুরুর শিক্ষার অন্যতম আদর্শ। সেকালের গুরু-শিষ্যের মাঝে একপ্রকার সত্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। তপোবনের গুরু হতেন ব্রহ্মনিষ্ঠ আর শিক্ষার্থীকেও হয়ে উঠতে হতো জিজ্ঞাসু, শ্রমশীল ও প্রশান্তচিত্ত।

বর্তমানে এই বোধের চরম অবক্ষয়ের কারণে, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে পরিপূর্ণ নিবেদনের পরিবর্তে পুরো প্রক্রিয়াটি যেন নিছক আদান-প্রদানের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কেবল প্রয়োজনের খাতিরেই শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে যাওয়া কিন্তু প্রাচীনকালে শিষ্যের গরজ ছিল গুরুকে লাভ করা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষক আজ দোকানদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ, বিদ্যাদান তাঁর ব্যবসার ধর্ম। তিনি যেন খরিদ্দারের সন্ধানে ফিরছেন এ বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি'।[২৯] বিদ্যা দানের পরিবর্তে তিনি তা বিক্রয়ে রত। আর, এখানেই ছাত্রের সঙ্গে তাঁর সমস্ত আত্মিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। তিনি আজ কেবল বেতনভুক কর্মচারী। অথচ, প্রাচীনকালে এই শিক্ষকই ছিলেন সমাজের উচ্চ সম্মানীয় গুরু, যিনি অন্যদের পথ প্রদর্শক। কিছুকাল পূর্বেও, এই শিক্ষককুল শুধু প্রয়োজনের দাস ছিলেন না। প্রয়োজনের নিমিত্তে ছাত্রের সাথে আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রকৃত শিক্ষকের কাজও নয়, এর দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা সম্ভবও নয়। কিছু শিক্ষক অবশ্য এই কঠিন বাস্তবতার যুগেও এহেন দীনতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তাঁদের ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য গুণে। তাঁরাই যেন শিক্ষকতার মহান পেশাকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করে চিরন্তনতাকে বহন করে চলেছেন যুগ যুগ ধরে। তাঁরা আজও উপলব্ধি করেন যে, তাঁরা যা দান করছেন তা পণ্যদ্রব্য নয়, তা মূল্যের অতীত। আগামী প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষককেই আগে মনে-প্রাণে শিক্ষক হয়ে উঠতে হবে। ধৈর্য, ক্ষমা, সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া, মমতা- এই গুণগুলোর অনুশীলন আজ বড়ো প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবকদের অবশ্যই ভাবতে হবে যে, শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রত যাপনের কাল। শঙ্করাচার্য বলেছেন ঃ "মনসশ্চ ইন্দ্রিয়াণাং চ ঐকাগ্র্যং তপ উচ্যতে"- মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি একত্র সংহত করাকে তপস্ বলা হয়।[৩০] স্কুল-কলেজে প্রবেশের পূর্বে তপস্ বা তপস্যার সংজ্ঞাটি সকল ছাত্র-ছাত্রীর স্মরণে রাখা কর্তব্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের শিক্ষার্থীরা 'তপস্যা' কথাটিকে বিস্মৃত হয়েছে। আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে এক প্রকার, কিন্তু তা জ্ঞানের তপস্যা নয়, বোধের তপস্যা নয়, তা হলো পাঠ্যবিষয়কে মুখস্থ করানোর তপস্যা। যেখানে লেখাপড়াকে আত্মস্থ না করে মস্তিষ্কে বোঝাই করার প্রতিযোগিতাই প্রধান সেখানে লেখাপড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বপ্রকৃতিও যে তৃতীয় শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে সেই উপলব্ধিই আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মীলিত করতে সাহায্য করে। তাই, আজ, অধঃপতনের এই প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে আমাদের সেই 'গুরু'রূপ শিক্ষকের-ই প্রয়োজন এবং সেই 'তপোবন'রূপ শিক্ষায়তনের-ও প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, তাঁর আদর্শ, তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণাবলী যদি শিক্ষার্থীর চিত্তের ঐশ্বর্যকে পরিপূর্ণতা দান করে তবেই শিক্ষা কেবল প্রণালির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না তখন তা শিক্ষাযজ্ঞে পরিণত হয়ে উঠবে। ঠিক এইরূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন লক্ষ্য করা যেত সেকালের গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সেকালের গুরু, শিষ্যদের উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তাদের চারপাশে অগ্নি-বায়ু-জল-স্থল-আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, পিতা-মাতা, গুরু তথা বিশ্বের সকল কিছুকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করে দেখতে শেখাই হলো যথার্থ শেখা। আর, এই শিক্ষালাভের জন্য তপোবনই ছিল উপযুক্ত স্থান। "ভারতবর্ষের যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক

ঋষিরা নন, ভগবান্ বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন ; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।"[৩১]সে কালের গুরু জানতেন, তিনি যা সাধনার দ্বারা লাভ করেছেন তা বিতরণের সুযোগ না পেলে তাঁর সে সাধনাই ব্যর্থ। "বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তি-স্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তা হলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য।"[৩২]

উপরের সমগ্র আলোচনার পরিসমাপ্তিতে একথা বলা যুক্তিযুক্ত যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে সকল বিচ্যুতি লক্ষ্যণীয় সেই বিচ্যুতিগুলো দূর করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবী। বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবক্ষয়, শিক্ষকের কর্তব্যহীনতা, ছাত্রের অনমনীয়তা, উন্নাসিকতা এই সকলকিছুর জন্য একতরফা ছাত্র বা শিক্ষককে দায়ী করাও সমীচীন নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের সার্বিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো। তাই, মেরামতি প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে রাষ্টীয় কাঠামো থেকে শিক্ষার্থী পর্যন্ত। সে লক্ষ্যে বর্তমানের প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার সাথে প্রাচীনকালের গুরুকুল শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হলেই শিক্ষা তার প্রকৃত লক্ষ্য পূরণে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আর এই প্রক্রিয়ায় গুরুকুল শিক্ষার আদর্শ হতে পারে অন্যতম হাতিয়ার।বর্তমান কালের সংকট এড়াতে গুরু-শিষ্যের মধ্যকার সেই সহজ সম্বন্ধ-ই ফিরে পেতে হবে। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা তপস্যাকেই সকল প্রয়াসের চেয়ে বড় করে দেখেছিল। শিক্ষা কেবল পাবার বস্তু নয়, কিংবা যেন-তেন প্রকারে শুধু সার্টিফিকেট অর্জন, চাকরি প্রাপ্তি, ধন সঞ্চয় বা বাড়ি, গাড়ীর মাধ্যমও নয়। নিরন্তর সাধনার মধ্য দিয়েই যে তাকে লাভ করতে হয়- এই বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে বারে বারেই ফিরে তাকাতে হবে প্রাচীন ভারতের 'গুরুকুল' শিক্ষাব্যবস্থার গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক সহজ-স্বচ্ছন্দ সম্পর্কের দিকে।

তথ্য নির্দেশঃ

১. ড. সরওয়ার মুর্শেদ, *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-আদর্শঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, (ঢাকাঃ ঝিনুক প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ১৫।

২ ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, "উপনিষদ ও ভারতীয় মনীষা" অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও মহেশ ঘোষ অনু. ও সম্পা., '*উপনিষদ*' গ্রন্থে সংকলিত, (কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ৪১।

৩ তদেব।

৪. ড. সরওয়ার মুর্শেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

৫ নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, *বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা*, (কলকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫।

৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।

৭. ড. সরওয়ার মুর্শেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

৮: হৃষীকেশ চৌধুরী, *রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা*, (কলিকাতাঃ জীৎরাজ অফসেট, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২।

৯ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় ও আশ্রম*, (কলকাতাঃ এস পি কমিউনিকেশনস, ২০১৫), পৃ. ১২৮।

১০. নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-৯।

১৩ ড. সরওয়ার মুর্শেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১।

১৪. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮।

১৫ কাশিরাম দাশ, *মহাভারত*, (কলকাতাঃ রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৩), পৃ. ৬১।

১৬ গৃহীত, ড. সরওয়ার মুর্শেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

১৭ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

১৮. ড. সরওয়ার মুর্শেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

১৯. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

২০. সন্ধ্যা মল্লিক, 'অরণ্যচারী মানুষের দর্শন ও নৈতিক ভাবনা', এস. এম. আবু বকর ও অন্যান্য (সম্পা.) *অন্বেষণ* (ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন ২০১৪), গ্রন্থে সংকলিত, (রাজশাহীঃ দি বেঙ্গল প্রেস), পৃ. ১১৭।

২১. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উপনিষদের নীতি', *উপনিষদ,প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

২২. ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪/১০/৩২৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩।

২৩. মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮।

২৪. নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

২৫. পরমেশ আচার্য, *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা*, ১ম খণ্ড, (কলকাতাঃ অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ৪৮।

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪।

২৭. ড. সরওয়ার মুর্শেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

২৮. শ্রী ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য, 'শিক্ষার কেন্দ্রে গুরু', *রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন*, গ্রন্থে সংকলিত, (কলকাতাঃ বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা.লি., ১৯৫৭), পৃ. ১৪৫।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষাসমস্যা', *শিক্ষা*, (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৯।

৩০. স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, 'ভূমিকা', *ভগবদ্ গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা*, (কলকাতাঃ উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ, ২০০৫), পৃ. ১৪।

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তপোবন', *শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিশ্বভারতী*, (কলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৯।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

নীতিবিদ্যা সম্পর্কে কারনাপের অভিমতের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

ড. নিলুফার আহমেদ*

Abstract: Rudolf Carnap is one of the most well-known proponents of logical positivism. He explained ethics in two senses, one is descriptive ethics and the other is normative ethics. He thinks that descriptive ethics are part of psychology and sociology, but not part of philosophy. We know psychology and sociology as descriptive but ethics is evaluative. He explains normative ethics through logical analysis of language. He thinks that moral judgments are neither true nor false, and assert nothing and express only a command. So they are meaningless. The ethics which are built upon moral judgments are meaningless as well. In his opinion, moral judgments cannot be justified by any reason. Although he denies value judgments, he still admits its applied side which is the moral evaluation. So it can be concluded that he has contributed to the continuation of ethical progress.

যৌক্তিক দৃষ্টবাদী আন্দোলনের একজন অন্যতম সদস্য হলেন রুডলফ্ কারনাপ। একজন যৌক্তিক দৃষ্টবাদী হিসেবে তাঁর লক্ষ্য ছিল আধুনিক যুক্তিবিদ্যা দিয়ে বিজ্ঞানকে একটি সুনিদিষ্ট দার্শনিক ভিত্তি দেওয়ার মাধ্যমে দর্শনকে ফলপ্রসূ করে তোলা। আর দর্শনকে ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে অন্যান্য যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদের ন্যায় কারনাপও দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। সে হিসেবে নীতিবিদ্যাকেও তিনি বিশ্লেষণ করেন এবং এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *Philosophy and logical syntax* গ্রন্থে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করেন। নীতিবিদ্যা সম্পর্কে কারনাপ বলেন,"কিছু দার্শনিক দর্শনের একটি ভাগকে (division) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেন তা হল মূল্যের দর্শন, যার প্রধান শাখা হলো নীতিদর্শন বা নীতিবিদ্যা।"[১] কারনাপ *Philosophy and logical syntax* গ্রন্থে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন মূলত সে ধারণাগুলিরই বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে একজন যৌক্তিক দৃষ্টবাদী হিসেবে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে কারনাপের চিন্তাধারাকে তুলে ধরা এবং এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করাই হবে বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

কারনাপের নৈতিক ধারণার উৎস

যৌক্তিক দৃষ্টবাদী আন্দোলনের একজন প্রবক্তা হিসেবে দর্শনের গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন দার্শনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করতে গিয়ে কারনাপও অন্যান্য যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদের ন্যায় দর্শনের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানীয় অর্থ নিরূপণের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। নীতিবিদ্যার জ্ঞানীয় অর্থও তিনি ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরূপণ করেন। তাই তাঁর নীতিবিদ্যার ধারণা জ্ঞানতত্ত্বের উপর গড়ে উঠেছে। এই জ্ঞানতত্ত্ব যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা পেয়েছেন হিউম থেকে। হিউম জ্ঞানের বিষয়গুলিকে 'ধারণার সম্বন্ধ' এবং 'তথ্যের বিষয়' হিসেবে বিভক্ত করেন। ধারণার সম্বন্ধকে বিশ্লেষণাত্মক এবং তথ্যের বিষয়কে সংশ্লেষণাত্মক হিসেবে যৌক্তিক দৃষ্টবাদীরা ব্যাখ্যা দেন। কারনাপ একই অভিমত পোষন করেন। কাজেই তাঁর নৈতিক চিন্তার উৎস হিসেবে হিউমের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁর নৈতিক চিন্তার উৎস হিসেবে যৌক্তিক দৃষ্টবাদী যেমন মরিজ শ্লিক, রাইকেনব্যাক প্রমুখের নামও উল্লেখ করা যায়। মরিজ শ্লিক আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে অর্থহীন বললেও তথ্যমূলক বিজ্ঞান হিসেবে নীতিবিদ্যাকে স্বীকার করেছেন।[২] অনুরূপভাবে কারনাপও মনে করেন বর্ণনামূলক বিজ্ঞান হিসেবে প্রাকৃতিক নীতিবিদ্যা সম্ভব কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে নীতিবিদ্যা সম্ভব নয়। আবার মরিজ শ্লিক *Problems of Ethics* গ্রন্থে বলেন, "...নীতিবিদ্যার মৌল প্রশ্নটি কেন মানুষ নৈতিক ভাবে কাজ করে? এর উত্তর কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের দ্বারাই দেওয়া যায়।"[৩] অর্থাৎ তিনি নৈতিক বাক্যকে মনস্তাত্ত্বিক বাক্য থেকে অনুমান করেন। কারনাপও মনস্তাত্ত্বিক বাক্য থেকে নৈতিক বাক্য অনুমানের কথা বলেন। যৌক্তিক দৃষ্টবাদী রাইকেনব্যাক নীতিবিদ্যাকে বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা হিসেবে অভিহিত করেন, যা তাঁর মতে

* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাজবিজ্ঞানের অংশ, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ প্রকৃতির নয়। তিনি মনে করেন জ্ঞানের আধুনিক বিশ্লেষণে জ্ঞানজ নীতিবিদ্যা অসম্ভব।[৪] কারনাপও জ্ঞানীয় দিক থেকে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে অর্থহীন মনে করেন। তবে বলা যায় যৌক্তিক দৃষ্টবাদী চিন্তাধারাই কারনাপের নৈতিক চিন্তার পিছনে মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

দুটি অর্থে নীতিবিদ্যা

কারনাপ তাঁর *Philosophy and Logical Syntax* গ্রন্থে নীতিবিদ্যার অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, "'নীতিবিদ্যা' শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।"[৫] এদের তিনি নাম দেন বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা ও আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা। বর্ণনামূলক অর্থে নীতিবিদ্যা মানবসত্তার আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি মনে করেন এ ক্ষেত্রে নীতিবিদ্যা দর্শনের চেয়ে বরং অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধানের বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় অর্থে নীতিবিদ্যা বলতে কারনাপ বোঝেন, নৈতিক মূল্যের বা নৈতিক আদর্শের দর্শন, যাকে একজন আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা বলতে পারে।[৬] এ অর্থে কারনাপের মতে নীতিবিদ্যা কোন তথ্যের অনুসন্ধান নয়। বরং নীতিবিদ্যা ভাল কী? মন্দ কী? কোন কাজটি করা সঠিক এবং কোন্ কাজটি করা বেঠিক ? এ সকল প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে চায়। এই দুটি অর্থে নীতিবিদ্যার স্বরূপ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে কারনাপের ধারণাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা

বর্ণনামূলক অর্থে নীতিবিদ্যা বলতে কারনাপ অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধানের কথা বলেন, যা মানব আচরণ সম্পর্কীয় মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অনুসন্ধানসমূহকে বোঝায়। তবে তা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলে কারনাপ মনে করেন। কিন্তু এখানে বলা যেতে পারে কারনাপ যে নীতিবিদ্যাকে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান (যাদের তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নাম দেন) এর অন্তর্ভুক্ত করে তথ্যমূলক হিসেবে অর্থপূর্ণ প্রমাণ করতে চান, সেই বিষয়টিকে যথাযথ বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে নোয়েল স্মিথ এবং ডেভিড কপের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। নোয়েল স্মিথ তাঁর *Ethics* গ্রন্থে উল্লেখ করেন নৈতিকতা বা নীতিবিদ্যা শব্দটি এসেছে প্রথা (custom) বা আচরণ (behaviour) থেকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নীতিদার্শনিকরা মানুষের এই প্রথা বা আচরণকে বর্ণনা করে বা ব্যাখ্যা করে। তাঁর মতে এই কাজটি হলো মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, নৃ-তত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, নাট্যকার এবং উপন্যাসিকের। আর নীতিদার্শনিকের কাজ সম্পর্কে বলেন," নীতিদার্শনিক ভিন্ন ধরনের কাজ করেন, প্রথমটি হলো ব্যবহারিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং দ্বিতীয়টি প্রথা বা আচরণের সমালোচনা করা, মূল্যায়ন করা বা মূল্য নিরূপণ করা।"[৭] ডেভিড কপ তাঁর সম্পাদিত *Ethical Theory* গ্রন্থে বলেন,"নৈতিকতার দার্শনিক পাঠ সমাজবিজ্ঞান বা নৃ-বিজ্ঞানের পাঠ থেকে অথবা জীববিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের পাঠের প্রেক্ষিত থেকে বেশ আলাদা।"[৮] এখানে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান বা নৃ-বিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই মূল্যায়নমূলক বিদ্যা হিসেবে নীতিবিদ্যা স্বতন্ত্র এবং তা সামাজিক বিজ্ঞানগুলির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কিন্তু কারনাপ একজন যৌক্তিক দৃষ্টবাদী হিসেবে জ্ঞানকে অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে গিয়ে নীতিবিদ্যার এই বর্ণনামূলক দিকটিকেই নীতিবিদ্যা বলতে চান।

আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা

কারনাপ অন্য অর্থে নীতিবিদ্যাকে আদর্শনিষ্ঠ বলেছেন। তিনি মনে করেন আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার কাজ হলো মানব আচরণের জন্য আদর্শের বিবৃতি দেওয়া অথবা মূল্য সম্পর্কীয় অবধারণ গঠন করা।[৯] একজন যৌক্তিক দৃষ্টবাদী হিসেবে কারনাপ মনে করেন কোন বিষয়ের জ্ঞানকে অর্থপূর্ণ হতে হলে অর্থাৎ জ্ঞানের শাখা হিসেবে বিবেচিত হতে হলে, সেই বিষয়ের জ্ঞান যে ভাষায় প্রকাশিত হয় সে ভাষাকে অর্থপূর্ণ হতে হবে। আর কোন ভাষা অর্থপূর্ণ হবে যদি সেই ভাষার অন্তর্ভুক্ত পদ, অবধারণ অর্থপূর্ণ হয়। কাজেই তিনি ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক অবধারণের স্বরূপ নির্ধারণের মাধ্যমে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রসঙ্গত নীতিবিদ্যা বলতে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকেই বোঝানো হয়। কারনাপের আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক অবধারণের স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক অবধারণের স্বরূপ

কারনাপ ভাষার যৌক্তক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নৈতিক অবধারণের অর্থহীনতা প্রমাণের দ্বারা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকেও অর্থহীন বলেন। তিনি জ্ঞানীয় দিক থেকে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে অর্থহীন বললেও, আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ হিসেবে এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁর মতে নৈতিক অবধারণ বিবৃতিমূলক নয় বরং আদেশমূলক। আর নৈতিক অবধারণগুলি যেহেতু আদেশমূলক সেহেতু এগুলি সত্য বা মিথ্যা অথবা প্রমাণ বা অপ্রমাণযোগ্য নয়। কারনাপের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নৈতিক অবধারণের অর্থহীনতা ব্যাখ্যা করে, নৈতিক অবধারণের আবেগমূলক, আদেশমূলক দিকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিজ্ঞানের স্বরূপ তুলে ধরা হলো।

ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক অবধারণ

নীতিবিদ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কারনাপ ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞানের শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যার অবস্থান নিরূপণ করেন এবং নীতিবিদ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। একজন যৌক্তিক দৃষ্টবাদী হিসেবে তিনি মনে করেন আবধারণ বা উক্তি অর্থপূর্ণ হতে হলে হয় তাকে (i) স্বতঃসত্য বা স্বতঃমিথ্যা (যাকে বিশ্লেষণাত্মক উক্তি বলে) হতে হবে অথবা (ii) সত্য-মিথ্যা হওয়ার যোগ্যতা রাখে এরূপ অভিজ্ঞতামূলক উক্তি হতে হবে।[১০] স্বতঃসত্য বা স্বতঃমিথ্যা উক্তিসমূহ কারনাপের মতে বাস্তবতা সম্পর্কে কিছু বলে না। তাঁর মতে যুক্তিবিদ্যা এবং গণিতের সূত্রসমূহ এই প্রকারের হয়ে থাকে। এরা নিজেরা অভিজ্ঞতামূলক উক্তি নয়, কিন্তু এরা অভিজ্ঞতামূলক উক্তিসমূহকে রূপান্তরের জন্য নিয়ম সরবরাহ করে। আর তাঁর মতে অভিজ্ঞতামূলক উক্তি হলো যা অভিজ্ঞতায় সত্য বা মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু যে সকল উক্তিসমূহ এই ক্যাটিগরিগুলির কোনটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয় না সে উক্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অর্থহীন হয়ে থাকে বলে কারনাপ মনে করেন। তাঁর মতে যে উক্তি স্বতঃসত্য নয় বা স্বতঃমিথ্যাও নয় অথবা অভিজ্ঞতামূলক উক্তিও নয় সে উক্তি ছদ্ম-উক্তি। নৈতিক অবধারণগুলি যদি কারনাপের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিশ্লেষণাত্মক দেখানো যায় তাহলে বলা যাবে নৈতিক অবধারণ অর্থপূর্ণ। গণিত এবং যুক্তিবিদ্যার বচন যেমন স্বতঃপ্রমাণিত অনুরূপভাবে নৈতিক অবধারণকেও প্রিচার্ড এবং রস স্বতঃপ্রমাণিত বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে এইচ.এ.প্রিচার্ড নৈতিক কাজ সম্পর্কে তাঁর, *Does Moral Philosophy Rest on a Mistake*? নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, কাজটি যে ভাল তা কাজটির মধ্যেই নিহিত এবং এর এই অন্তর্নিহিত অর্থে ভালত্বের কারণই হলো কেন এটি করা উচিৎ।[১১] আবার গণিতের বচনের সাথে তুলনা করে নৈতিক অবধারণ যে স্বতঃসত্য সে বিষয়টি স্বীকার করে ডব্লিউ. ডি. রসও মনে করেন কর্তব্যের সাধারণ নীতিগুলি (general principles) স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে থাকে ঠিক যেভাবে গণিতের সূত্রগুলি স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে থাকে।[১২] কাজেই প্রিচার্ড এবং রসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নৈতিক অবধারণ বিশ্লেষণাত্মক বলতে হয়। কিন্তু কারনাপের মতানুযায়ী নৈতিক অবধারণ গণিত বা যুক্তিবিদ্যার বচনের মত আকারগতভাবেই স্বতঃসত্য অথবা স্বতঃমিথ্যা হতে পারে না। তাঁর মতে বিশ্লেষণাত্মক বচনগুলি বাস্তব সম্পর্কে আমাদের কোন তথ্য দেয় না, সেগুলি অমূর্ত। কিন্তু নৈতিক অবধারণ আমাদের বাস্তব সম্পর্কে তথ্য দেয়। উদাহরণস্বরূপ– 'হত্যা করা অন্যায়' নৈতিক অবধারণটি থেকে, হত্যা করলে একটি জীবনের ক্ষতি করা হয়, সেই সাথে একটি পরিবারের ক্ষতি করা হয়, সর্বোপরি সমাজের ক্ষতি হয়। সুতরাং 'হত্যা করা অন্যায়' নৈতিক অবধারণ থেকে কতগুলি বাস্তব তথ্য পাওয়া যায়। কাজেই কারনাপের সাথে একমত হয়ে বলা যায় নৈতিক অবধারণগুলি গণিত বা যুক্তিবিদ্যার বচনের মত অমূর্ত নয়। এ প্রসঙ্গে জ্যাক্স পি.থিরাক্স মনে করেন 'ভাল' পদটি কেবল অমূর্ত অর্থের চেয়ে বরং মানব অভিজ্ঞতা এবং মানব সম্পর্কের প্রসঙ্গ দিয়ে সংজ্ঞায়িত হওয়া উচিৎ।[১৩] প্রকৃতপক্ষে নৈতিক অবধারণগুলি আকারগতভাবেই স্বতঃসত্য বা স্বতঃমিথ্যা হতে পারে না। যেমন, যদি বলা যায়, চাকুরিক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি তুলে দেয়া উচিৎ' এবং 'চাকুরি ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি তুলে দেয়া উচিৎ নয়'– উক্তি দু'টিকে গণিতের উক্তি '২+২=৪' এবং '২+২ ≠৪' উক্তি দু'টির মত স্বতঃসত্য এবং স্বতঃমিথ্যা বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে সিডনি জিঙ্ক মনে করেন নীতিবিদ্যার সিদ্ধান্ত কখনও চূড়ান্ত হতে পারে না। তাঁর মতে গণিতের যুক্তি আশ্রয়বাক্য থেকে যেভাবে সিদ্ধান্ত অনুসৃত (entail) করে, তারা (নীতিবিদ্যা) সেরূপ আবশ্যিকভাবে সিদ্ধান্ত অনুসৃত করে না।[১৪] কাজেই নীতিবিদ্যার পরস্পর বিরোধী উক্তিসমূহকে যুক্তিবিদ্যা বা গণিতের উক্তির মত স্বতঃসত্য অথবা স্বতঃমিথ্যা কোনটিই বলা যায় না। সুতরাং কারনাপ যথার্থই বলেন যে, নৈতিক উক্তিগুলো বিশ্লেষণাত্মক উক্তি হতে পারে না। এ.সি.ইউয়িংও বিশ্লেষণাত্মক বচন থেকে মূল্যায়নমূলক অবধারণের পার্থক্য করেন। তিনি মূল্যায়নমূলক অবধারণ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে এটি যা A=4 থেকে A=2+2 অনুসৃত হয় সেই

যৌক্তিক আবশ্যিকতা থেকে অথবা যা একই জিনিস একই সময়ে সম্পূর্ণ লাল এবং সম্পূর্ণ সবুজ হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করে, সেই আবশ্যিকতা থেকে পৃথক।[১৫] অর্থাৎ এ.সি.ইউয়িংও নৈতিক অবধারণকে গণিত বা যুক্তিবিদ্যার বচনের মত বিশ্লেষণাত্মক বচন হিসেবে স্বীকার করেননি।

সুতরাং বিশ্লেষণাত্মক বচনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কারনাপের মতে নৈতিক অবধারণ বিশ্লেষণাত্মক হতে পারে না। তাই তাঁর মতে নৈতিক অবধারণকে অর্থপূর্ণ হতে হলে তা অভিজ্ঞতামূলক উক্তি হতে হবে অর্থাৎ তাকে অভিজ্ঞতায় যাচাইযোগ্য হতে হবে। নৈতিক শব্দসমূহ অভিজ্ঞতামূলক না হওয়ায় নৈতিক শব্দ নিয়ে গড়ে ওঠা নৈতিক অবধারণগুলোও অর্থহীন হবে। কারনাপের মতে কোন উক্তিকে অর্থপূর্ণ হতে হলে অর্থপূর্ণ শব্দ সমষ্টিই যথেষ্ট নয় বরং সেক্ষেত্রে বাক্য গঠন রীতি ও রূপান্তরের রীতিও মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ ব্যাকরণের নিয়ম এবং যৌক্তিক নিয়ম মেনে চলতে হবে। কারনাপের মতানুযায়ী বলা যায় নৈতিক উক্তিসমূহ যেমন– 'সততা হয় ভাল', 'চুরি করা হয় মন্দ', ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করে না। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী নৈতিক উক্তিগুলোকে সংশ্লেষণাত্মক প্রকৃতির বলে মনে হয়। কিন্তু কারনাপের মতে কোন বিবৃতি অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্য ব্যাকরণ বিধিই যথেষ্ট নয়, যৌক্তিক বিধিও মেনে চলতে হবে। আর যৌক্তিক বিধি বলতে কারনাপ আধুনিক যুক্তিবিদ্যার নিয়মানুযায়ী বাক্য গড়ে তোলার কথা বোঝান। তিনি মনে করেন যুক্তিবিদ্যায় দু'টি বাক্যকে '.', 'V', '$\supset$', '$\equiv$' প্রভৃতি দিয়ে সংযুক্ত করে বাক্যের অর্থপূর্ণতা বা অর্থহীনতা প্রমাণ করা যায়। নৈতিক অবধারণকে এরূপ প্রতীক দিয়ে সংযুক্ত করে বলা যায়-

হয় বর্ণবাদ সমর্থনযোগ্য অথবা বর্ণবাদ সমর্থনযোগ্য নয়

বা, $P \vee \sim P$

কিন্তু এখানে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, হয় বর্ণবাদ সমর্থনযোগ্য হবে অথবা সমর্থনযোগ্য হবে না। কাজেই কারনাপের মতে নৈতিক উক্তিগুলি যৌক্তিক বিধি অনুযায়ী গড়ে ওঠে না। তার মতে এগুলি আকারগত দিক থেকে অভিজ্ঞতামূলক বিবৃতির মত কিন্তু অভিজ্ঞতায় যাচাইযোগ্য নয় বলে অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি ভাষার অর্থপূর্ণতার যে মানদণ্ড দিয়েছেন, তা বাস্তবিক জীবনের ব্যবহৃত ভাষার প্রায়োগিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায় না। কেননা বাস্তব জীবনে স্বাভাবিক যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তা সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অথবা শব্দ প্রয়োগের কঠোর নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধও বলা যায় না। ভাষার কাজ হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করা। যে ভাষা মানব মনের কোন ভাবকে প্রকাশ করে সে ভাষাই অর্থপূর্ণ বলা যায়। নৈতিক ভাষার মাধ্যমে এক শ্রেণীর আচরণকে বাস্তব জীবনে অনুশীলন করা উচিৎ বলে জানানো (convey) হয়, সেহেতু নৈতিক ভাষা অর্থহীন নয়, এর জ্ঞানীয় অর্থ আছে বলা যায়। কাজেই কারনাপের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নৈতিক ভাষাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় রূপান্তর করা যায় না বা অর্থের যাচাইযোগ্যতার মানদণ্ডে অর্থপূর্ণ হিসেবে প্রমাণ করা যায় না বলে নীতিবিদ্যার ভাষা অর্থহীন বিষয়টি স্বীকার করা যায় না।

নৈতিক অবধারণ বিবৃতিমূলক নয় আদেশমূলক

কারনাপ মনে করেন নৈতিক অবধারণ তাৎপর্যতার অভিজ্ঞতামূলক মানদন্ড অনুযায়ী জ্ঞানীয় অর্থ বর্জিত। তিনি মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে তারা (নৈতিক অবধারণ) তাদের সবচেয়ে সঠিক আকার অর্থাৎ অনুজ্ঞামূলক আকার যেমন "নিজ প্রতিবেশীকে ভালবাস", আকারে প্রকাশিত না হয়ে প্রায়ই ব্যাকরণগত বিবৃতিমূলক আকার যেমন, "এটি প্রত্যেকের কর্তব্য তার নিজ প্রতিবেশীকে ভালবাসা", আকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা দার্শনিকদের নৈতিক অবধারণকে বিবৃতিমূলক বা জ্ঞানমূলক বাক্য হিসেবে বিবেচনা করতে বিভ্রান্ত করে।[১৬]তাই কারনাপ বলেন,

> অধিকাংশ দার্শনিক এই আকারের দ্বারা প্রতারিত হয়ে মনে করেন যে একটি মূল্য উক্তি সত্যিকারভাবেই একটি বিবৃতিমূলক বচন এবং অবশ্যই তা সত্য অথবা মিথ্যা হবে। সেহেতু তাঁরা তাঁদের নিজেদের মূল্য উক্তির জন্য যুক্তি দেয় এবং তাদের বিরোধী পক্ষকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করে।[১৭]

কারনাপের মতে কোন একটি পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণ তার সাধারণ মনোভাব এবং চরিত্রের দ্বারাই প্রধানতঃ নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং খুব সামান্যই তারা যে মতবাদে বিশ্বাসী তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই তিনি বলেন,"...বাস্তবিকভাবে একটি মূল্য উক্তি ব্যাকরণগত আকারের বিভ্রান্তিতে একটি আদেশ ছাড়া আর কিছুই না।"[১৮]

অর্থাৎ তাঁর মতে নৈতিক অবধারণগুলি হলো আদেশমূলক, এরা কোন কিছুর বিবৃতি দেয় না। তাই এদের তথ্যমূলক উক্তির মত তাত্ত্বিক বা জ্ঞানীয় অর্থ নেই, সেহেতু নৈতিক অবধারণগুলি জ্ঞানীয় দিক থেকে অর্থহীন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি দিয়ে এরূপ উক্তিগুলি যাচাইযোগ্য নয় প্রমাণ করা যায়। যদি নৈতিক অবধারণ তথ্যমূলক হতো তা হলে তা থেকে ভবিষ্যত অভিজ্ঞতার বচনকে অনুমান করা যেতো। কিন্তু তাঁর মতে 'হত্যা করা হয় মন্দ'-উক্তিটি থেকে কোন ভবিষ্যত অভিজ্ঞতার বচনকে অনুমান করা বা অনুসৃত করা যায় না। তিনি বলেন, "এভাবে এই বচনটি যাচাইযোগ্য নয় এবং এর কোন তাত্ত্বিক অর্থ নেই এবং একই বিষয় অন্য সব নৈতিক উক্তি সম্পর্কেও সত্য।"[১৯] এভাবে কারনাপ প্রমাণের চেষ্টা করেন নৈতিক অবধারণ বিবৃতিমূলক নয় বরং আদেশমূলক।

নৈতিক অবধারণ যে কেবল আদেশমূলক, এর কোন জ্ঞানীয় অর্থ নেই– কারনাপের এই অভিমত সম্পর্কে অব্রাহাম কাপলান মনে করেন, সম্ভবতঃ কোন বিশুদ্ধ অনুজ্ঞা (imperative) বলে কিছু থাকতে পারে না; প্রত্যেক অনুজ্ঞার জ্ঞানমূলক অর্থ অনুসৃত হতে পারে যা কমপক্ষে বোঝায় এটি বক্তার কিছু ইচ্ছা (wishes) বা আদেশ (commands) প্রকাশ করে। তিনি মনে করেন নৈতিক অবধারণ কোনরূপেই সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানিক হতে পারে না।[২০] প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে মূল্য অবধারণ যদি আদেশমূলক হয় তাহলে সে আদেশ শ্রোতার কাছে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই তা তথ্যের আকারে বা জ্ঞানমূলক আকারে প্রকাশিত হতে হবে। তথ্যের আকারে বা জ্ঞানমূলক আকারে আদেশ শ্রোতার নিকট বোধগম্য না হলে কীভাবে শ্রোতা সে আদেশ পালন করবে? আর আদেশ যদি শ্রোতা পালন না করে তাহলে সে আদেশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই বলা যায় নৈতিক অবধারণ কেবল মাত্র আদেশমূলক হতে পারে না। এ.সি.ইউয়িংও মনে করেন সাধারণভাবে স্বীকার করতে হবে যে সব আদেশই নৈতিক অবধারণ হতে পারে না, কেবল আদেশকে (command) যদি অসাধারণভাবে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা নৈতিক অবধারণকেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ইউয়িং বলেন,

> আমার কোন সন্দেহ নেই যে দার্শনিকগণ যাঁরা 'নৈতিক অবধারণ' এবং 'আদেশ' এর মধ্যে সাদৃশ্যকে সমর্থন করেন, তাদের সাধারণভাবে হয় স্বীকার করতে হবে যে তাঁরা 'আদেশ' শব্দটিকে কিছুটা শিথিল অর্থে ব্যবহার করেছেন অথবা বলা যায় যে 'নৈতিক অবধারণ' আদেশ হতে পারে না বরং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কেবল আদেশের মত।[২১]

কারনাপ নৈতিক অবধারণের আদেশসূচক বৈশিষ্ট্যটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ব্যবহার করে বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছেন নৈতিক অবধারণে কেবল আদেশ প্রকাশ পায় কোন জ্ঞানীয় অর্থ বা তথ্য থাকে না। কিন্তু উইনস্টন এইচ.এফ.বার্নেস মনে করেন আশ্চর্যবোধক চিহ্নটি কেবল ঐচ্ছিকই হয় না, অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলকও হয়ে থাকে। অর্থাৎ তিনি বলতে চান আশ্চর্যবোধক চিহ্নটি কোন তথ্য বা জ্ঞান প্রকাশের উদ্দেশ্যে বা কোন কিছু জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। এ সম্বন্ধে বার্নেস একটি দৃষ্টান্ত দেন: যখন কোন জমির মালিক তার জমির ফসল নষ্ট না করার জন্য তার জমি থেকে গরু-ছাগল তাড়ানোর জন্য হেই! (Hey!) করে চিৎকার করে আদেশ দেয়, তখন সে আদেশের একটি উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ হেই! করে চিৎকার করা কেবলমাত্র একটি আদেশ নয়। এখানে জমির মালিকের এই আদেশ উদ্দেশ্যমূলক বা জ্ঞাপনমূলক, তাহলো গরু-ছাগলকে জমি থেকে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আদেশ করা হয়। এখানে কেবল গরু-ছাগলকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে আশ্চর্যবোধক চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়নি বরং এর দ্বারা একটি জ্ঞাপনের কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে বলে বার্নেস মনে করেন।[২২] আর জ্ঞাপন করার অর্থই হলো অবশ্যই তথ্যমূলক কিছু আছে বা এর জ্ঞানীয় অর্থ আছে, নতুবা জ্ঞাপনের প্রশ্নই আসে না। কাজেই কারনাপের অভিমতকে সমর্থন করে বলা যায় না যে, নৈতিক অবধারণ কেবল আদেশমূলক।

কারনাপ মনে করেন নৈতিক অবধারণ কেবল আদেশমূলক। আবার তাঁর মতে, নৈতিক অবধারণ আবেগের প্রকাশ হিসেবে একটি ইচ্ছাকে (wish) প্রকাশ করে। কিন্তু বার্নেস তাঁর 'Ethics Without Proposition' প্রবন্ধে এই বিষয়টির সমালোচনা করেন। কেননা তাঁর মতে আদেশ করা এবং ইচ্ছা প্রকাশ করা দু'টি স্বতন্ত্র বিষয়। তাই তিনি বলেন, "কারনাপ নৈতিক উক্তিসমূহ হলো আদেশ এবং তারা ইচ্ছা প্রকাশ করে বলার মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।"[২৩] তাঁর মতে ইচ্ছা করা অর্থ কেউ কোন কাজ করবে বলে আশা করা আর আদেশ দেওয়ার অর্থ কাউকে দিয়ে বলপূর্বক কোন কাজ করানো। অর্থাৎ আদেশের ক্ষেত্রে ক্ষমতা দেখানো হয় আর ইচ্ছার ক্ষেত্রে কেবল আশা করা

হয়। কাজেই দুটি স্বতন্ত্র বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা না করে বরং একই বিষয়ের উপর অর্থাৎ নৈতিক অবধারণের উপর প্রয়োগ করে কারনাপ অযৌক্তিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন বলা যায়। নীতিবিদ টোলমিনও মনে করেন নৈতিক উক্তি কিছু দিক থেকে আদেশের কাছাকাছি, তবে তা কেবলমাত্র আদেশ হতে পারে না। তাহলে তা কূটাভাসপূর্ণ হবে, কেননা সে ক্ষেত্রে মূল্যায়নমূলক অনুমান সকল যুক্তি আওতার বাইরে চলে যাবে।[২৪] সুতরাং বলা যায় টোলমিন নৈতিক অবধারণের যে একটি আদেশমূলক দিক আছে তা স্বীকার করলেও কেবল আদেশের মধ্যেই নৈতিক অবধারণকে সীমাবদ্ধ করতে চাননি। আর.এম.হেয়ারও মনে করেন নৈতিক অবধারণগুলি পরামর্শমূলক বা আদেশমূলক। হেয়ারের এই আদেশমূলক নৈতিকতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জি.জে.ওয়ারনকও কারনাপের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নৈতিক অবধারণের আদেশমূলক দিকটির সাথে হেয়ারের মতবাদের তুলনা করেন। ওয়ারনকের মতে হেয়ারের মতবাদকে সঠিকভাবে কারনাপের মতবাদের মত বলা যায় না। হেয়ারের মতে নৈতিক অবধারণের এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে কেবল আদেশের মধ্যে যার অভাব রয়েছে। ওয়ারনক বলেন,

> ... হেয়ারের মতবাদে একটি নৈতিক অবধারণ -অথবা যে কোন মূল্যে একটি প্রকৃত, আদর্শ, বিচ্যুতিহীন নৈতিক অবধারণ– একটি আদেশকে অনুসৃত করে। যেমন একটি বচন p অন্য বচন q কে অনুসৃত করে। আমি (সংগতিপূর্ণভাবে) P কে বিবৃত বা গ্রহণ এবং q কে অস্বীকার বা বাতিল করতে পারি না। সুতরাং, হেয়ারের মতবাদে, আমি (সংগতিপূর্ণভাবে) নৈতিক অবধারণ বিবৃত বা গ্রহণ করে 'তোমার টাকা পরিশোধ করা উচিৎ' বলতে এবং 'টাকা পরিশোধ কর' আদেশকে অস্বীকার বা বাতিল করতে পারি না।[২৫]

অর্থাৎ এখানে বলা যায় হেয়ারের মতবাদে নৈতিক অবধারণকে আদেশের সাথে অভিন্ন করা হয়নি বরং নৈতিক অবধারণ যে একটি আদেশকে অনুসৃত করে সে কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক অবধারণের মাধ্যমে শ্রোতাকে বা শিশুদের নৈতিক শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে, সেহেতু নৈতিক অবধারণ আদেশকে অনুসৃত করে সে বিষয়টি যৌক্তিক বলা যায়। কিন্তু তাই বলে নৈতিক অবধারণকে কেবল আদেশের সাথে অভিন্ন করা যায় না। কেননা আদেশের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি বাইরের নিয়ন্ত্রণের চাপে কাজ করে, নিজ বাধ্যতাবোধ থেকে করে না, যাকে যথার্থভাবে নৈতিক আচরণ বলা যায় না। কারনাপ নৈতিক অবধারণকে বিবৃতিমূলক নয় কেবল আদেশমূলক বলতে গিয়ে নৈতিক অবধারণ সম্পর্কে আরো কতগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যেমন– নৈতিক অবধারণ সত্য-মিথ্যা নয়, নৈতিক অবধারণ যুক্তিভিত্তিক নয়।

নৈতিক অবধারণ সত্য-মিথ্যা নয়

নৈতিক অবধারণ কারনাপের মতে সত্যও না মিথাও না। এছাড়া নৈতিক অবধারণ কোন কিছুর বিবৃতি দেয় না এবং নৈতিক অবধারণকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করাও যায় না। তাঁর মতে নৈতিক উক্তি যাচাইযোগ্য না এবং এর কোন তাত্ত্বিক অর্থও নেই।[২৬]ফিলিপ্পা ফুট মনে করেন, তথ্যসম্পর্কীয় উক্তির সত্যতা মিথ্যাত্ব প্রমাণ দিয়ে দেখানো সম্ভব হলেও এবং তথ্য থেকে মূল্যের উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও মূল্যায়নমূলক অবধারণ তথ্যমূলক উক্তির সাথে যৌক্তিকভাবে যুক্ত নয়, সেহেতু মূল্যায়নের সত্যতা মিথ্যাত্ব তথ্যমূলক উক্তির মত প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[২৭] নৈতিক অবধারণের সত্য-মিথ্যা প্রসঙ্গে টোলমিন বলেন, "...সত্যতা, মিথ্যাত্বের এবং বৌদ্ধিক ন্যায্যতার প্রশ্ন (বা যাচাইকরণ, পদটির ব্যাপক অর্থে) অবিরতই নীতিবিদ্যায় উঠে আসে।"[২৮] টোলমিন সেখানে একটি দৃষ্টান্ত দেন, একজন যদি তাঁর সন্তানকে বলেন, 'তোমার উচিৎ জুতা খুলে ড্রইংরুমে প্রবেশ করা'।–এখানে তিনি সন্তানকে এর কারণ হিসেবে যুক্তি দিতে পারেন, কার্পেট নোংরা করলে তাঁর (সন্তানটির) মা রাগ করবেন, কেননা এতে মায়ের অহেতুক কাজ বেড়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে নৈতিক অবধারণের মাধ্যমে সন্তানকে আদেশ দিতে গিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে কতগুলো বাস্তব সত্যতাকেই প্রকাশ করেছেন। কাজেই টোলমিনের মতে নৈতিক অবধারণকে সত্য-মিথ্যা নয় বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক অবধারণের একটি বাস্তব প্রেক্ষিত আছে। যার মধ্যে সত্য বা মিথ্যার ধারণা নিহিত থাকে। তাই তথ্যমূলক বাক্যের মত সংকীর্ণ অর্থে নৈতিক অবধারণের সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও ব্যাপক অর্থে নৈতিক অবধারণের মধ্যে যে সত্য বা মিথ্যার ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে সে দাবী অস্বীকার করা যায় না। যেমন- 'হত্যা করা উচিৎ নয়', 'দুঃস্থের সেবা করা উচিৎ', 'বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করা উচিৎ', 'প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিৎ' প্রভৃতি

নৈতিক অবধারণের প্রতি ব্যক্তির সত্য বিশ্বাস আছে জন্যই ব্যক্তি বাস্তব জীবনে এই নৈতিক বিষয়গুলির অনুশীলন করে।

নৈতিক অবধারণ যুক্তিভিত্তিক নয়

কারনাপের মতে নৈতিক অবধারণ যেহেতু বিবৃতিমূলক নয়, কেবল আদেশমূলক, সেহেতু নৈতিক অবধারণে কোন যুক্তি দেওয়া যায় না। তিনি মনে করেন মূল্যের দর্শন বা নীতিবিদ্যা যা আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞান হিসেবে ধরা হয় এবং যা মনোবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের তথ্যমূলক অনুসন্ধান নয় তাকে ছদ্ম বাক্য বলে। এরূপ বাক্যের কোন যৌক্তিক আধেয় নেই।[২৯] তিনি মনে করেন, অধিকাংশ দার্শনিক নৈতিক অবধারণের ব্যাকরণগত আকার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে নৈতিক অবধারণ বিবৃতমূলক বাক্য বলে মনে করেন যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। তাঁর মতে, সেহেতু তারা তাদের নিজেদের মূল্য উক্তির পক্ষে যুক্তি দেয় এবং তাদের প্রতিপক্ষকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করে।[৩০] অর্থাৎ এর দ্বারা কারনাপ বোঝাতে চান যথার্থভাবে নৈতিক উক্তির পিছনে কোন যুক্তি দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বলা যেতে পারে কারনাপের মতানুযায়ী মূল্যায়নমূলক বা নৈতিক অবধারণ যদি আদেশমূলকও হয় তবুও তার পক্ষে যুক্তি অবশ্যই থাকতে হবে। তা না হলে কিসের ভিত্তিতে শ্রোতা বক্তার আদেশ পালন করবে ? নোয়েল-স্মিথ ও স্বীকার করে নিয়েছেন যে নৈতিক অবেধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই যুক্তি দিতে হবে। তিনি বলেন, "আদেশ ঔচিত্যমূলক বাক্য থেকে আলাদা ধরনের এজন্য যে ব্যক্তি একটি আদেশ দেয় সে আদেশটি কেন পালন করতে হবে সে সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে কোন যুক্তি দিতে বাধ্য নয়। অন্য পক্ষে যদি কোন ব্যক্তি বলে "'তোমার করা উচিৎ' অথবা 'এটি মূল্যবান' (worth)' তাহলে তাকে অবশ্যই (যৌক্তিকভাবে) যুক্তি (reason) দিতে হবে।"[৩১] অনুরূপ ধারণা এ.সি.ইউয়িং এর লেখনীতেও পাওয়া যায়। তিনিও বলেন,

> বিজ্ঞানের যেমন তার নিজ গন্ডির মধ্যে যুক্তি রয়েছে যা বৈধ, তেমনি নীতিবিদ্যারও তার নিজ গন্ডির মধ্যে যুক্তি রয়েছে যা বৈধ। তবে নীতিবিদ্যার এই যুক্তি যৌক্তিকভাবে বা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু তা কাজের (action) অনুকূলে একটি পর্যাপ্ত ন্যায্যতা প্রদান করবে।[৩২]

সুতরাং ইউয়িংও মনে করেন নৈতিক যুক্তির স্বরূপ বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক না হলেও, নৈতিক অবধারণ যুক্তিভিত্তিক।

কারনাপ মনে করেন নৈতিক অবধারণ বিবৃতিমূলক নয় আদেশমূলক, যে কারণে নৈতিক অবধারণে যুক্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এটা বলা যায়, নৈতিক অবধারণ আদেশসূচক বাক্যের সাথে অভিন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক অবধারণে একটি আদেশও অনুসৃত হয়। তবে সে আদেশ অনেকটা শিথিল আকারে যেমন পরামর্শ বা উপদেশের আকারে অনুসৃত হয়ে থাকে। এই পরামর্শ বা উপদেশের মাধ্যমে ব্যক্তি শিশুদের, অন্যদের, এমনকি ব্যক্তি নিজেকেও এক ধরনের শিক্ষা দিয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন ব্যক্তি তাঁর শিশু সন্তানকে নৈতিক বাক্যের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা দেন, যেমন– 'সদা সত্য কথা বলা উচিৎ', 'গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা উচিৎ', 'ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া উচিৎ' ; বাক্যগুলির মধ্য দিয়ে তিনি পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেন, 'সদা সত্য কথা বলবে', 'গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে', 'ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হবে'। কিন্তু কেন শিশু এই সকল আদেশ বা উপদেশসমূহ পালন করবে তা ব্যক্তিকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়। ব্যক্তি নিজেও যখন কোন নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তার মনে প্রশ্ন আসে তার কী করা উচিৎ ? এ প্রশ্নের উত্তর সে যার মধ্যে খুঁজে পায় সেটিই নৈতিক অবধারণের যুক্তি হিসেবে কাজ করে। কাজেই বলা যায় নৈতিক অবধারণ অবশ্যই যুক্তিভিত্তিক হয়ে থাকে যদিও সে যুক্তি তথ্যমূলক যুক্তির মত 'সত্য' বা 'মিথ্যা' হিসেবে প্রমাণ করা যায় না অথবা যুক্তিবিদ্যার যুক্তির মত সবক্ষেত্রে অনিবার্য বা অকাট্যও হয় না। সুতরাং কারনাপ নৈতিক অবধারণে যুক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করে যে নৈতিক অবধারণের যথাযথ স্বরূপ তুলে ধরেছেন তা বলা যায় না।

আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক অবধারণ অর্থহীন

কারনাপের মতে নৈতিক অবধারণ সংশ্লেষণাত্মক নয়, বিশ্লেষণাত্মকও নয়, সত্যও না বা মিথ্যাও না, এরা যুক্তিভিত্তিকও নয়। কাজেই নৈতিক অবধারণ তাঁর মতে অর্থহীন। এছাড়া তিনি মনে করেন নীতিবিদ্যা একটি কঠোর নৈতিক মতবাদ হিসেবে কর্তব্যের এক কঠোর অর্থকে অথবা সম্ভবত কঠোর নিয়মের একটি আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে।[৩৩] অর্থাৎ তাঁর মতে নীতিবিদ্যা আমাদের কর্তব্যকে বা নৈতিক নিয়মকে প্রকাশ করে।–এ অর্থে নীতিবিদ্যা মূলত

প্রকাশমূলক (expressive), আর প্রকাশমূলক বাক্য হিসেবে নৈতিক অবধারণ অর্থহীন বলে তিনি মনে করেন। কারনাপ ভাষার কাজকে দুই ভাগে ভাগ করেন প্রকাশমূলক কাজ (expressive function) এবং উপস্থাপনমূলক কাজ (representative function)। তাঁর মতে ব্যক্তি তার ভাষাগত শব্দের দ্বারা তার কিছু অনুভূতি, বর্তমান মেজাজ, তার স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার প্রতি প্রবণতা এবং এ জাতীয় বিষয়কে প্রকাশ করে। তাঁর মতে এটি হলো ব্যক্তির কার্যকলাপ বা ভাষাগত শব্দের প্রকাশমূলক কাজ। অন্যদিকে তাঁর মতে ভাষাসম্বন্ধীয় বিবৃতির (linguistic utterances) কাজ উপস্থাপনমূলক যা একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কের বিবৃতি দেয়, অর্থাৎ এরা কিছু বিবৃত করে। তিনি মনে করেন কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষার বিবৃতি এবং প্রকাশ উভয় ক্ষেত্র থেকেই একই বিষয় অনুমান করা যায়। যেমন: কেউ যদি হাসে, তাহলে অনুমান করা যায় যে, সে খুশী মেজাজে আছে। আবার কেউ যদি বলে, 'আমি খুশী মেজাজে আছি', তাহলেও ঐ একই বিষয়কেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কারনাপের মতে এই হাসি এবং শব্দের দ্বারা বিবৃত করা আমি এখন খুশী';– এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা ভাষাগত উচ্চারণ কিছু বিবৃত করে যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে।[৩৪] কারনাপের ভাষার এই উপস্থাপনমূলক এবং প্রকাশমূলক কাজের পার্থক্য সম্পর্কে আর.সি.ক্রস মনে করেন এ অর্থে সকল শব্দসমূহই প্রকাশমূলক। এখানে বলা যেতে পারে শব্দসমূহ বা ভাষার আকার ইঙ্গিত প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করা হয় কোনকিছু প্রকাশের জন্যই। ক্রসের মতে ভাষার কাজকে এরূপ উপস্থাপনমূলক এবং প্রকাশমূলক হিসেবে পার্থক্য করা অর্থহীন। কাজেই এখানে বলা যেতে পারে প্রকাশমূলক বাক্য হিসেবে যদি আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক অবধারণ অর্থহীন হয়, তাহলে প্রকাশমূলক বাক্য হিসেবে সকল বিবৃতিমূলক বাক্যও অর্থহীন হয়ে পড়বে। সুতরাং আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক অবধারণকে অর্থহীন বলা যায় না।

নৈতিক বাক্য মনস্তাত্ত্বিক বাক্য থেকে অনুমিত

কারনাপ মনে করেন জ্ঞানমূলক দিক থেকে নীতিবিদ্যার অবধারণ বা বাক্য মনোবিজ্ঞানের বাক্য থেকে অনুমিত হয়। তিনি মনে করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উক্তিসমূহ অভিজ্ঞতামূলক উক্তি এবং সকল অভিজ্ঞতামূলক উক্তি এক অভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় রূপান্তরযোগ্য। কারনাপের মতে মনোবিজ্ঞানের উক্তিগুলোর ক্ষেত্রে একজন তার নিজের মানসিক অবস্থাকে অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে তার বিবৃতি দেয় অথবা দৈহিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে যা অভিজ্ঞতায় পর্যবেক্ষণ করা যায়। আবার অন্যমনেরও দৈহিক প্রণালীর মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে, সেহেতু মনোবিজ্ঞানের উক্তিসমূহ পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় রূপান্তরযোগ্য এবং অর্থপূর্ণ। তাই কারনাপ বলেন,

> যাকে মনোবিজ্ঞানের বাক্য বলা হয়– তা হতে পারে অন্য মনের সম্পর্কীয়, অথবা একজনের অতীত অবস্থার নিজ মন সম্পর্কীয় বাক্য অথবা একজনের নিজ মন সম্পর্কীয় বর্তমান অবস্থার বাক্য, পরিশেষে মন সম্পর্কীয় সাধারণ বাক্যসমূহ– সব সময় পদার্থিক ভাষায় রূপান্তরযোগ্য। বিশেষভাবে, প্রত্যেক মনোবৈজ্ঞানিক বাক্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের দৈহিক প্রশ্নে পদার্থিক ঘটনাসমূহকে নির্দেশ করে। এই সকল ভিত্তিতে, মনোবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক অভিন্ন বিজ্ঞানের পরিমন্ডলের (domain) একটি অংশ বলা যায়।[৩৫]

অর্থাৎ কারনাপের মতে মনোবিজ্ঞানের বাক্যগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরিসরের মধ্যে পড়ে এক অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে তা অর্থপূর্ণ। তাঁর *Philosophy and Logical Syntax* গ্রন্থে তিনি দৃষ্টান্ত দেন, "যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে তার মধ্যে তীব্র অনুশোচনার অনুভূতি হবে।" এ ক্ষেত্রে কারনাপ মনে করেন অনুশোচনার অনুভূতি সম্পর্কীয় বচনটি কোনভাবেই 'হত্যা করা হয় মন্দ'– যা একটি আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক অবধারণ, তা থেকে অনুমিত হতে পারে না। বাক্যটি কেবল ব্যক্তির চরিত্র এবং আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মনোবিজ্ঞানের বাক্য থেকে অনুমতি হতে পারে। তবে বাক্যটি প্রত্যক্ষভাবে অর্থপূর্ণ নয় বরং বাক্যটি মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে অর্থপূর্ণ। এ অর্থে নীতিবিদ্যা দর্শনের শাখা বা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিক বাক্যগুলি যদি মনোবিজ্ঞানের বাক্য থেকে অনুমিত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে নীতিবিদ্যাকে বলতে হয় প্রায়োগিক মনোবিজ্ঞান এরূপ মন্তব্য করেন টোলমিন। অবশ্য কারনাপ মনে করেন, এরূপ নীতিবিদ্যাকে কেউ ইচ্ছা করলে মনোবৈজ্ঞানিক নীতিবিদ্যা বলতে পারে। টোলমিন মনে করেন পদার্থবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক নিয়মের ব্যাখ্যাকে তড়িৎ প্রকৌশলী বা যান্ত্রিক প্রকৌশলীতে ব্যবহার করা হয় এবং রসায়নের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে কেমিক্যাল প্রকৌশলীতে ব্যবহার করা হয়। কাজেই যান্ত্রিক বা তড়িৎ প্রকৌশলীতে যদি সাহায্যকারী (backing) হিসেবে পদার্থবিজ্ঞানকে ব্যবহার

করায় যান্ত্রিক বা তড়িৎ প্রকৌশলকে প্রায়োগিক বা ফলিত পদার্থবিদ্যা বলা যায়, তাহলে মনোবিজ্ঞানও যদি নীতিবিদ্যায় সাহায্যকারী (backing) হিসেবে কাজ করে তাহলে নীতিবিদ্যাকেও প্রায়োগিক বা ফলিত মনোবিজ্ঞান বলা যেতে পারে। টোলমিনের মতে তাহলে মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয় ও আদর্শ অভিন্ন (common property and common ideal) হবে। এক্ষেত্রে তড়িৎ প্রকৌশলী যেমন তার প্রাসঙ্গিক বাস্তব সমস্যাগুলির পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে সমাধান করতে পারেন, অনুরূপভাবে প্রায়োগিক মনোবিজ্ঞানীরাও (applied psychologists) বাস্তব নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন এবং প্রতিটি নৈতিক নীতির (moral principle) প্রতিষঙ্গী একটি করে মনোবিজ্ঞানের নিয়মও থাকবে। তিনি আরো মনে করেন নীতিবিদ্যার প্রশ্ন কেবল কী ধরনের যুক্তি নৈতিক অবধারণের সমর্থনে সঠিকভাবে সমর্থনযোগ্য হবে, তা নয় বরং আমাদের অবশ্যই আরো জিজ্ঞাসা হবে যদি ব্যক্তিকে নৈতিক অবধারণ সম্বন্ধে পূর্ণগঠিত নৈতিক নীতি (moral code) এবং অনুষ্ঠান বা রীতি নীতিকে বিশ্বাস করতে হয় তাহলে তাঁর (ব্যক্তির) মধ্যে কী গুণাবলী থাকতে হবে? কিন্তু টোলমিনের মতে মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিকে যত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণই করুক না কেন, তিনি মানব প্রকৃতিকে এভাবে বোঝার চেষ্টা করেন না, তার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে।[৩৬]প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে কারনাপ যদি মনে করেন নীতিবিদ্যার বাক্য মনোবিজ্ঞানের বাক্য থেকে অনুসৃত হয়, তাহলে টোলমিনের বক্তব্যই যথার্থ হিসেবে ধরে নিতে হয় যে, সেক্ষেত্রে নীতিবিদ্যা মনোবিজ্ঞানের ফলিত দিক এবং মনোবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়েই নীতিবিদ্যার বাস্তব নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব হতো। কিন্তু দেখা যায় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নীতিবিদ্যা থেকে ভিন্ন ধরনের, মনোবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান দেয় আর নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে মিশেল স্লোট (Michael Slote) তাঁর– 'Moral Sentimentalism and Moral Psychology' প্রবন্ধে বলেন, "মানব মনোবিজ্ঞানের তথ্যসমূহ আমাদের বলে দেয় না যে কোন্ বাস্তবিক বা সুপ্ত উদ্দেশ্যগুলি (motives) অন্য উদ্দেশ্যগুলির চেয়ে বেশী নৈতিক।"[৩৭] কাজেই বলা যায় নৈতিক বাক্য মনস্তাত্ত্বিক বাক্য থেকে অনুসৃত বা অনুমিত হতে পারে না।

মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যা উভয়ই আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান, যদিও আচরণ বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে এই দুই বিজ্ঞানের ধারণা ভিন্ন ধরনের। নীতিবিদ্যা তার আচরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চরিত্র, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অনুভূতি প্রভৃতি কতগুলি মানসিক ঘটনা জানতে চায়, যা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। তাই বলা যায়, মনোবিজ্ঞান নীতিবিজ্ঞানকে একটি ভিত্তি দিতে পারে। কিন্তু এ থেকেই বলা যায় না মনোবিজ্ঞানের বাক্য থেকেই নীতিবিদ্যার বাক্য অনুমিত হয়ে থাকে।

নীতিবিদ্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

কারনাপ নীতিবিদ্যা শব্দটিকে বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা ও আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা এই দু'টি অর্থে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একটি অর্থে নীতিবিদ্যা মানব আচরণ সম্পর্কীয় মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত এবং সে কারণে অর্থপূর্ণ। কিন্তু তাঁর মতে এ অর্থে নীতিবিদ্যা কোন জ্ঞানের শাখা নয় বরং জ্ঞানের অনুসন্ধানের বস্তু মাত্র (object of investigation)। এখানে বলা যেতে পারে নীতিবিদ্যা মূল্যায়নমূলক, তাই কোন অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না বরং দার্শনিকীকরণের মাধ্যমেই নীতিবিদ্যার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব। কেননা দর্শনই মূল্যের সাথে জড়িত, বিজ্ঞান নয়। নীতিবিদ্যার অন্য অর্থটি হলো কারনাপের মতে নৈতিক মূল্যের দর্শন বা যাকে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা বলা হয়। তিনি ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন যে আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা হিসেবে নীতিবিদ্যা ব্যক্তির আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ বা আদেশমূলক। সে হিসেবে নৈতিক অবধারণ সংশ্লেষণঅত্মক নয় আবার বিশ্লেষণাত্মকও নয়, সত্যও না বা মিথ্যাও না, এর পক্ষে কোন যুক্তিও দেওয়া যায় না, নৈতিক অবধারণগুলি কেবল অর্থহীন। সে কারণে এই অর্থহীন অবধারণ নিয়ে গড়ে ওঠা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে তিনি অধিবিদ্যার মতই অর্থহীন হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে কারনাপ মূল্যের দর্শন বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে অর্থহীন প্রমাণের চেষ্টা করলেও তাঁর অটোবায়োগ্রাফীতে মূল্যের বাস্তব প্রয়োগ করাকে অর্থাৎ মূল্যায়নকে অস্বীকার করেননি। কারনাপ মনে করেন প্রত্যেক মানুষই জানে তাঁর জীবন সীমিত, সে কারণে সে তার জীবনকে অর্থহীন বা উদ্দেশ্যবিহীন করতে চায় না। তাই সে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে তার দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে মানবতার স্বার্থে কাজ করে যা তাকে সীমিত জীবনের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে।[৩৮] কিন্তু মূল্যকে অস্বীকার করে মূল্যায়নকে কীভাবে স্বীকার করা সম্ভব সে বিষয়টিও সকলের নিকট প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকে।এ ছাড়া কারনাপের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনস্তাত্ত্বিক বাক্য থেকে নৈতিক বাক্য অনুমানের বিষয়টিও স্বীকার করা যায় না।

কারনাপের নীতিবিদ্যার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলা যায় নীতিবিদ্যা জ্ঞানমূলক বিষয়কে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বস্তুতে পরিণত করে এবং আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে অর্থহীন বলে ভুল করলেও মূল্যকে অস্বীকার করলেও মূল্যায়নের বাস্তব প্রয়োগের দিকটি বা নীতিবিদ্যার ব্যবহারিক দিকটি সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন বলা যায়।

মন্তব্য

কারনাপ একজন যৌক্তিক দৃষ্টবাদী হিসেবে বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন গড়ে তুলতে গিয়ে ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দর্শনের পরিসরের মধ্যে যে সকল অর্থহীন বিষয় রয়েছে তা বর্জন করতে চেয়েছেন। এ লক্ষ্যেই তিনি ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নৈতিক পদ, অবধারণের স্বরূপ নিরুপণের প্রচেষ্টা করেন, সেহেতু তাঁকে একজন পরানীতিবিদ বলা যায়। আবার অন্যদিকে নৈতিক অবধারণকে ব্যক্তির আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করায় তাঁকে একজন আবেগবাদী নীতিদার্শনিক বলা যায়। নৈতিক অবধারণের যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কারনাপ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নৈতিক অবধারণগুলি জ্ঞানীয় দিক থেকে অর্থহীন এবং এগুলো মূলত আদেশমূলক। কিন্তু নৈতিক অবধারণকে কেবল আদেশমূলক বাক্যের সাথে অভিন্ন করা যায় না। কেননা আদেশ পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কাজের কোন স্বাধীনতা থাকে না, বাইরের নিয়ন্ত্রণের চাপে সে কাজ করে থাকে। কিন্তু কোন বাইরের নিয়ন্ত্রণের চাপে বা কোন কর্তৃত্বের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে কোন কাজ করলে সে কাজকে যথার্থ নৈতিক কাজ বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে নোয়েল স্মিথ বলেন, "যে বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বাধ্যতাবোধ থেকে নৈতিক বাধ্যতাবোধের পার্থক্য করে তা হলো নৈতিক বাধ্যতাবোধ স্বনিয়ন্ত্রিত;.... ।"[৩৯] তবে কারনাপ নৈতিক অবধারণকে আদেশসূচক বলায় নৈতিক জ্ঞান যে শিক্ষণীয় সে বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পায়। এ কথা সত্য আজকের সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধের জন্য নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানী গর্ডন ডব্লিউ আলপোর্ট মনে করেন মানুষ তার জানা বিষয় থেকে কোন কিছু পছন্দ করে নৈতিক কাজ করে, এজন্য নৈতিক মূল্যের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষভাবে শৈশবেই প্রশিক্ষণের দ্বারা অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত জ্ঞানীয় দিকের সমৃদ্ধি ঘটাতে হবে, যাতে সে তার মনকে অসংখ্য প্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যে পরিচালনার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।[৪০] কাজেই সমাজে নৈতিক মূল্যের প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার যে প্রয়োজন রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। আবার কারনাপের মতানুযায়ী ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে নৈতিক অবধারণ গড়ে ওঠে তাও অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তির মধ্যে আবেগ বা অনুভূতি থাকার কারণেই সে উপলব্ধি করে কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা উচিৎ, কাউকে আঘাত করা উচিৎ নয় প্রভৃতি। কিন্তু এ কথাও সত্য নৈতিক অবধারণ কেবল আবেগ অনুভূতির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এইচ. জে. প্যাটন বলেন, "ভালত্বের অবধারণসমূহ ব্যক্তির অন্ধ আবেগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না।"[৪১] ব্যক্তির মধ্যে কেবল অনুভূতি নেই, তার মধ্যে রয়েছে যুক্তি। যুক্তি দিয়েই সে যথাযর্থরূপে বিচার করে দেখে তার কোন্ কাজটি করা উচিৎ আর কোন্ কাজটি করা উচিৎ নয়। প্রাইসের মতে নীতিবোধ অন্যান্য অনুভূতির মত কেবল মাত্র একটি অনুভূতি হতে পারে না। যে বৃত্তি (faculty) অনুভূতিগুলোকে বিচার করে সে নিজে একটি অনুভূতি হতে পারে না। তাঁর মতে যুক্তিই হলো সেই বৃত্তি যা অনুভূতিগুলোকে বিচার করে।[৪২] কান্টও মনে করেন কেবল অনুভূতি ভাল-মন্দের নির্ধারক হতে পারে না; একজন নিজের অনুভূতি দিয়ে অপরের জন্য কী সঠিক হতে পারে সে সম্পর্কে কোন অবধারণ গঠন করতে পারে না।[৪৩] কারনাপ মূল্যকে অস্বীকার করলেও মূল্যায়নকে অস্বীকার করেননি, কেননা মূল্যায়নকে অভিজ্ঞতায় প্রমাণ করা যায়। তিনি মনে করেন মানবতার কল্যাণে কাজ করাই মানব জীবনের একটি মূল্যবান লক্ষ্য। তাই তিনি আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে জ্ঞানের দিক থেকে অস্বীকার করলেও নৈতিক জীবনের লক্ষ্যকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার ভূমিকাকে স্বীকার করে নিলে, নৈতিক অবধারণের আদেশসূচক বৈশিষ্ট্য বা আবেগ-অনুভূতির সাথে যুক্তির ভূমিকাকেও প্রাধান্য দিলে কারনাপের চিন্তায় নীতিবিদ্যার একটি যথার্থ স্বরূপ পাওয়া যেতো। তবে আদেশমূলক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নৈতিক জ্ঞানের শিক্ষণীয় দিকটি উল্লেখ করে এবং মূল্যের বাস্তব অনুশীলনকে স্বীকারের মাধ্যমে তিনি ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় তথা নৈতিক প্রগতিতে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ:

১. Rudolf Carnap, *Philosophy and Logical Syntax,* (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1935), Pp.22-23.

২ Mortiz Schlick, *Problems of Ethics*, Translated by David Raynin, (New York: Prentice – Hall, Inc., 1939), Pp. 20-22.

৩ Mortiz Schlick, *Problems of Ethics*, Translated by David Raynin, Op. cit., p. 30.

৪. Hans Reichenback, *The Rise of Scientific Philosophy*,(Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1951), Pp. 276-277.

৫ Rudolf Carnap, *Philosophy and Logical Syntax*, Op. cit., p. 23.

৬ Loc. Cit.,

৭ Nowell – Smith, *Ethics*, (Australia: Penguin books Ltd., 1956, First Published 1954), Pp. 11-12.

৮ David Copp, 'Introduction: Metaethics and Normative Ethics', In, *The Oxford Hand book of Ethical Theory*, Edited by David Copp, (New York: Oxford University Press Inc., 2006), p. 5.

৯ Rudolf Carnap, *Philosophy and Logical Syntax*, Op. cit., p. 23.

১০. Rudolf Carnap, 'The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis', in, *Logical Positivism*, Edited by A. J. Ayer (USA: The Free Press Glencoe-1959), p. 76.

১১. H.A.Prichard, In, *Approach to Ethics*, W.T. Jones, Frederick Sontag, et.el, (New- York: Mac. GRAWHILL Company, third Ed.1977), p.380.

১২ W.D.Ross, *The Right And The Good*,(London: Oxford University Press, first Edition-1930),p.32.

১৩ Jacques P. Thiroux, *Ethics, Theory and Practice*, (New York: Macmillan Publishing Company, Third edition, 1986), p. 3.

১৪. Sidney Zink, *The Concepts of Ethics*, (London: Macmillan & Co. Ltd., 1962), p. 40.

১৫ A.C. Ewing, *Second Thoughts In Moral Philosophy*, (London: Routledge & Kegan Paul LTD, First published-1959), p.70.

১৬ Rudolf Carnap, 'Values and Practical Decisions', In, *The Philosophy of Rudolf Carnap*, Edited by Paul Arthur Schilpp (U.S.A: Open Court Publishing Company, First Published 1963), p. 81

১৭ Rudolf Carnap, *Philosophy and Logical Syntax*, Op. cit., Pp. 23-24.

১৮ Ibid., p. 24.

১৯ Ibid., p. 25.

২০. Abraham Kaplan, 'Logical Empricism and Value Judgments', In, *The Philosophy of Rudolf Carnap*, Edited by Paul Arthur Schilpp, Op. cit., p. 834.

২১. A. C. Ewing, *Second Thoughts in Moral Philosophy*, Op. cit., p. 8.

২২ Winston H.F. Barnes, 'Ethics Without Proposition', In *Logical Positivism and Ethics*, Aristotelian Society, Supplementary volume XXII,(London: Harrison And Sony Ltd, 1948), p. 10.

২৩ Ibid, p.14.

২৪. Stephen Edelston Toulmin, *An Examination of The Place of Reason in Ethics*,(U.S.A: Cambridge University Press, First Edition, 1950), p. 53.

২৫ G.J. Warnock, *Contemporary Moral Philosophy*,(London: Macmillan and Co.Ltd., First Published, 1967), p. 32.

২৬ Rudolf Carnap, *Philosophy and Logical Syntax*, Op. cit., Pp. 24-25.

২৭ Ibid, Pp. 83-84.

২৮. Stephen Edelston Toulmin, *An Examination of the Place of Reason in Ethics*, Op. Cit., Pp. 52-53.

২৯ Rudolf Carnap, *Logical Syntax of Language*, Op. cit., p. 278.

৩০ Rudolf Carnap, *Philosophy and Logical Syntax,* Op. cit., p. 24.

৩১ P.H. Nowell – Smith, *Ethics*, Op. cit., p. 168.

৩২ A.C. Ewing, *Second Thoughts in Moral Philosophy*, Op. cit., p. 34.

৩৩ Rudolf Carnap, *Philosophy and Logical Syntax*, Op. cit., p. 30.

৩৪. Ibid, Pp. 27-28.

৩৫ Rudolf Carnap, 'Psychology in Physical Language', In, *Logical Positivism*, Edited by A.J. Ayer (U.S.A: The Free Press, Glencoe, 1959), p.197.

৩৬ Stephen Edelston Toulmin, *An Examination of the Place of Reason in Ethics*, Op. cit., Pp. 174-178.

৩৭. Michael Slote, 'Moral Sentiment and Moral Psychology', In, *The Oxford Hand book of Ethical Theory*, Edited by David Copp. Op. cit., p. 228.

৩৮. Rudolf Carnap, 'Intelectual Autobiography'*, In, The Philosophy of Rudolf Carnap,* Edited by Paul Arthur Schilpp. Op. cit., p. 9.

৩৯ Nowell – Smith, *Ethics*, Op. cit., p. 184-185.

৪০. Gordon W. Allport, 'Social Science and Norms', in, Louis Z. Hammer, *Value and Man Readings in Philosophy* (New York: McGraw Hill Book Company, 1966), p. 306.

৪১. H.J. Paton, 'The Emotive Theory of Ethics'in, *Logical positivism and Ethics*, Aristotelian Society supplementory volume XXII, op.cit., p.112.

৪২ Price, Quoted form D.H. Monro, *Godwin's Moral Philosophy, An Interpretation of William Godwin*, (London: Oxford University Press-1953), p. 41.

৪৩ Kant, in, *Critique of Practical Reason and Other Works on The Theory of Ethics*, Translated by Thomas Kings Mill Abbott (Delhi: Surjeet Publication, Sixth Edition, First Indian Reprinted-1997), p. 61.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রচার ও জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

শায়খুল ইসলাম মামুন জিয়াদ*

Abstract: Swadhin Bangla Betar Kendra was the Radio broadcasting centre during the Bangladesh Liberation War in 1971. During the whole period of Liberation war Swadhin Bangla Betar Kendra successfully carried out its intellectual war like an organized front and aired patriotic songs which greatly inspired the freedom fighters in their fight against the Pakistan occupation forces, and also war news and talk shows to boost up people's spirits. In 1971 radio was the only media reaching to the far ends of Bangladesh. As such, it ran a propaganda campaign throughout the war.

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র[১] ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বার্তা দিয়েছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বেশ কয়েকটি জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ মে কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নং দোতলা বাড়িতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থায়ী কার্যালয় গড়ে উঠে। যুদ্ধকালীন সময়ে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই বেতার কেন্দ্রের নাম হয় বাংলাদেশ বেতার।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি স্বাধীন বাংলার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে আমাদের আবেদন কোন অবস্থাতেই আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। উৎসাহ ও মনোবল অটুট রাখুন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করুন। মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিন থেকে এভাবেই কার্যক্রম শুরু করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ঢাকা ও রাজশাহী বেতার কেন্দ্র দুটি ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। রংপুর, সিলেট, খুলনা বেতারের প্রচার বন্ধ করে দেয়। ২৬ মার্চ সকাল থেকে চট্টগ্রাম বেতারের সকল কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ব্রডকাষ্টিং হাউজের যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখেছিলেন, যাতে পাকিস্তানী বাহিনী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার শুরু করতে না পারে। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রটি পূর্বেও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল।

১) বঙ্গবন্ধুর আহূত অসহযোগ আন্দোলনের সময় তারা রেডিও পাকিস্তান নাম বর্জন করে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র নামে ঘোষণা দেয়।

২) বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র প্রথম ৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭ টায় প্রচার করা হয়েছিল।

৩) অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মমতাজউদ্দিন রচিত গণনাটক 'এবারের সংগ্রাম' এর রেকর্ড ১৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাজানো হয়েছিল।

৪) বেতারের সরকারী কর্মচারীদের কানে বাজত একটি বজ্রকণ্ঠের বাণী : বাঙ্গালীর স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ তোমাদের করতে বলা হলে তোমরা অফিস বন্ধ করে দেবে[২]।

---

* প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পর্যায় ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ ১৯৭১

কালুরঘাট[৩]স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

কালুরঘাট চট্টগ্রাম শহর থেকে দক্ষিণ দিকে ৫/৭ কি.মি. দূরে বহদ্দারহাটের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৯৩০ সালে কালুরঘাটে একটি সেতু নির্মিত হয়। পরবর্তীতে এখানে একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বেতার কেন্দ্রটি কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় বলা যায় বেতার কর্মীরাই স্বেচ্ছাই বা রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাবে কেন্দ্রটি চালু করে। একক প্রচেষ্টায় নয় বরং বেতারের মাইকের সামনের শব্দ নিক্ষেপ এবং শব্দকে ইথারে উৎক্ষেপণ এই দুই এর সমন্বয় সাধন বেতার কর্মী এবং প্রকৌশলী ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী আঘাত হেনেছে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে।

২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু বন্দী হওয়ার পূর্বে তাঁর দেয়া স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রটি চট্টগ্রামে পাঠান। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বার্তাটি ঢাকা ইপিআর ওয়ারলেস ষ্টেশন থেকে সিলিমপুর ওয়ারলেস ষ্টেশনের ইঞ্জিনিয়ার গোলাম রব্বানী ডাকুয়ার হাত দিয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছে। কিছু পরেই পাকিস্তানীরা ইপিআর ওয়ারলেস ধ্বংস করে দেয়। এই বার্তাটি সাইক্লোষ্টাইল মেশিনের সাহায্যে অনেক কপি করা হয়। মাইকে বার্তাটি প্রচার করা হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা।

২৬ মার্চ, ১৯৭১

DECLARATION OF INDEPENCENCE

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."[৪]

চট্টগ্রামের কিছু সংখ্যক দেশ প্রেমিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করতে সাহায্য করেছিলেন।

২৬ মার্চ দুপুরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার আহবান জানানো হয়েছিল। ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্বল্প সময়ের জন্য তিনটি অধিবেশন প্রচারিত হয়েছিল।

১. দুপুর ২ টা ৭ মিনিটে
২. সন্ধ্যা ৭ টা ৩৫ মিনিটে
৩. রাত ১০ টায়

তবে বিক্ষিপ্ত থাকলেও আয়োজন ছিল স্বত:স্ফূর্ত।

২৬ মার্চ ২ টা ৭ মিনিটে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব এম. এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন[৫]। ২৭ মার্চ এই কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন[৬]।

২৮ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঢাকায় টিক্কা খানকে হত্যা করেছে[৭]।

৩০ মার্চ পর্যন্ত বেতার কর্মীরা অনিয়মিত হলেও অনুষ্ঠান প্রচার করেছেন। চট্টগ্রামের বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৫০ জন যোদ্ধা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি চালু রাখতে যে সমস্ত বেতার কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার, ঘোষক, টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারী নিরলসভাবে কোন স্বার্থ ছাড়াই দেশের স্বাধীনতার জন্য বেতারের মাধ্যমে বাংলার জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছেন তারা চিরস্মরণীয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-বেলাল মোহম্মদ, আব্দুল্লাহ আল ফারুক, মোস্তফা আনোয়ার, মীর্জা নাসির, আব্দুস সোবহান, রেজাউল করিম, আমিনুর রহমান, শরফুজ্জামান, হাবিব উদ্দিন আহমেদ, আহমেদ শাকের, রশিদুল হাসান, আবুল কাশেম সন্দীপ, মাহবুব হাসান, মেকানিক শকুর।

৩০ মার্চ প্রভাতী অধিবেশনে প্রথম বারের মত জয় বাংলা বাংলার জয় গানটি প্রচারিত হয়। দুপুরের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর কর্মীরা পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দুপুর ২টা ১০ মিনিটে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বোমারু বিমান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উপর বোমা বর্ষণ করে বেতার কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দেয়।

দ্বিতীয় পর্যায় ৪ এপ্রিল থেকে ২৪ মে, ১৯৭১

১. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের বাগাফায়[৮] গমন।

২. শিলিগুড়ি[৯] থেকে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধে সম্ভবত এটাই ছিল পাকিস্তান বাহিনীর প্রথম বিমান হামলা। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল এবং এ্যান্টেনা অকেজো হয়ে পড়ে। ৩১ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কর্মীরা পুনরায় একত্রিত হয় এবং ট্রান্সমিটার ভবনের এক কিলোওয়াট মোবাইল ট্রান্সমিটারটি নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

বেতার কর্মীগণ ট্রান্সমিটারসহ মাইক্রোবাস যোগে রামগড় (মুক্তাঞ্চল) হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বাগাফায় বেলোনিয়া ফরেস্ট হিল রোডে উপস্থিত হয়[১০]। বেতার কর্মীদের একটি অংশ রামগড়ে থেকে যায় এবং বাকী কয়েকজন বাগাফায় যান, এখানে বিএস এফ এর অস্থায়ী ঘাঁটি ছিল। বি এস এফের ২০০ ওয়াট শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচারের সিদ্ধান্ত হয়। সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ১২ এপ্রিল থেকে ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার দিয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হত।

৪ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন ২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত।

৮ এপ্রিল বাগাফা থেকে আগরতলার অদূরে শালবাগানে বেতার কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয় । এখানে ৪০০ ওয়াট শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। বেতার কর্মীরা আগরতলায় থাকতেন। এখানেই রেকডিং করা হত। বেতারের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল-

১. তথ্য সংগ্রহ করা

২. বাংলা ও ইংরেজী সংবাদ প্রচার

৩. অনুষ্ঠান ঘোষণা

৪. কথিকা

৫. বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন

৬. নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা প্রচার

২০ এপ্রিল থেকে ২৪ মে পর্যন্ত আগরতলা জেল রোডে সিপিআইএম এর এমএলএ অঘোর দেববর্মনের বাড়ীতে বেতারকর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

কালুরঘাট থেকে নেওয়া এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি ২৪ মে থেকে আগরতলার শালবাগানে সংরক্ষিত ছিল ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৯১ নং হেড কোয়ার্টার্সে। স্বাধীনতার পরে এটাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়[১১]।

বেতার কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বেলাল মোহম্মদ, আব্দুল্লাহ আল ফারুক, আবুল কাশেম, সন্দীপ, কাজী হাবিব উদ্দিন, আহমেদ মনি, আমিনুর রহমান, রশিদুল হোসাইন, এ এম. শরফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী, সৈয়দ আব্দুস শাকের, মুস্তফা মনোয়ার[১২]। ২৪ মে এই পর্বের ট্রান্সমিশন বন্ধ করে দেয়া হয়।

২৫ মে মুজিবনগর থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার শুরু হয়। অফিস ছিল কলকাতায়।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সাহায্য লাভের আশায় ১ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ এবং বারিস্টার আমিরুল ইসলাম দিল্লী পৌছেন[১৩]। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিন আহমদ দেখা করেন। মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন, তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করেন[১৪]। দিল্লীতে অবস্থানকালে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় জনগণের উদ্দেশ্যে বেতার মাধ্যমে প্রচারের জন্য ভাষণ রেকর্ড করেন। যা ১০ এপ্রিল রাত ৯.৩০ মিনিটে অল ইন্ডিয়া রেডিও-এর শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে ভাষণটি প্রচারিত হয়। শিলিগুড়ি কেন্দ্রের অতিরিক্ত ট্রান্সমিটার এজন্য ব্যবহার করে ভাষণ শুরুর আগে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নাম দিয়ে বলা হয়েছিল যে এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা দিবেন[১৫]। স্বাধীনতার ঘোষণা এই বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়[১৬]।

১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের দেওয়া রেকর্ড করা ভাষণ ২০ এপ্রিল শিলিগুড়ি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়[১৭]।

শিলিগুড়ি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণ ছাড়াও বিভিন্ন সময় প্রচারিত হয়

১. ভারতীয় শিল্পীদের রেকর্ড করা জনপ্রিয় গান

২. মুক্তিবাহিনীর জোয়ানদের উদ্দেশ্যে উৎসাহকর আহবান

৩. পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর প্রতি নিন্দা

৪. বিভিন্ন ঘোষণা।

তবে বাগাফা আগরতলা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে শিলিগুড়ি স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের কোন সম্পর্ক ছিল না[১৮]।

তৃতীয় পর্যায় : ২৫ মে ১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার গঠনের পর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুজিবনগর সরকার ও বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে একটি শক্তিশালী ট্রান্সমিটার (৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ) প্রদান করে। নজরুল ইসলামের জন্ম বার্ষিকী ২৫ মে তারিখ কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নং দোতলা বাড়িতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থায়ী কার্যালয় গড়ে উঠে।

এপ্রিলের শেষভাগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র সিংহ, ভারতের কেন্দ্রিয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী নন্দিনী সৎপথী এবং ড. ত্রিগুনা সেন এর সাথে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের আলাপ-আলোচনা কালে প্রতিমন্ত্রী জানান মুজিবনগর সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি ৫০ কিলোওয়াট শক্তিশালী মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার সংস্থাপনের কাজ চলছে[১৯]।

ইতিমধ্যে মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিল আব্দুল মান্নান এম. এন. এ.-এর উপর। তিনি বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করে ট্রান্সমিটার সংগ্রহ এবং অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

এইভাবে ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এর উদ্দ্যোগে কাজ শুরু করে। আগরতলার বেতার কর্মীরা কলকাতায় পৌছেন। পূর্বের ন্যায় আবার একত্রিত হন। রাজশাহী বেতার কর্মীদের মধ্যে মেসবাহ আহমেদ, আতাউর রহমান, অনু ইসলাম, শাহজাহান ফারুক, এবং মোহম্মদ মামুন মে মাসের প্রথম দিকে মুজিবনগরে পৌছেন। এছাড়া রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে মে মাসের মাঝামাঝি কয়েকজন অভিজ্ঞ বেতারকর্মী সীমান্ত অতিক্রম করেন। তাদের মধ্যে

ছিলেন আশফাকুর রহমান, টি এইচ শিকদার, তাহের সুলতান, শহিদুল ইসলাম ও আশরাফুল আলম। ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে তারা রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান সঙ্গে আনেন। ফলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে একদল অভিজ্ঞ বেতার কর্মীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়[২০]। লেখক, সংবাদ পাঠক, সাংস্কৃতিক কর্মী সর্বোপরি দক্ষ বেতার কর্মীদের আগমনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আগষ্ট মাসে মুজিবনগর সরকার বেতার কর্মীদের নিয়োগপত্র দেন এবং তা জুন থেকে কার্যকর করা হয় তাদের বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়[২১]।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুজিব নগর সরকারের প্রথম সংস্থা। মুজিব নগর সরকার তথ্য ও প্রচার (Ministry of Information and Broadcasting) বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় আব্দুল মান্নান এম. এ. কে। বেতার কর্মীরা রেডিও পাকিস্তানের সদস্য ছিলেন যারা মুজিব নগরে চলে এসেছিলেন।

ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং মন্ত্রনালয়ের অধীনে ছিল

১. Director of films

২. Director of Publication

৩. Director of Arts and Designs.

ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছিলেন

1. Mr. A. Mannan, MNA
2. Mr. Taheruddin Thakur, MNA

   Incharge, External Publicity Division.
3. Mr. Akhtar, Director, Press and Information.
4. Mr. Qamrul Hasan, Director, Art and Design Division.
5. Mr. A. Jabbar, Director, Film Division.

তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল[২২]

১। মুজিব নগর সরকারের পক্ষে প্রচার ও প্রপাগান্ডার সমন্বয় সাধন ও সার্বিকভাবে যুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২। মুক্তি বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করা;

৩। নিজেদের জনগণের মনোবল বৃদ্ধি করা;

৪। শত্রু সৈন্যের মনোবল খর্ব করা;

৫। পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনোবল ক্ষুন্ন করা এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো;

৬। শত্রু রেডিও ও প্রেসের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার চালানো;

৭। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণকে পক্ষভুক্ত করা;

৮। বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা।

তথ্য ও প্রচার বিভাগ এইভাবে কাজ শুরু করে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নীতি নির্ধারণী বক্তব্য প্রচারের উপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

বেতারে নীতিনির্ধারণী বক্তব্য প্রচারের উপর বিধি নিষেধ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি[২৩]। বাংলাদেশ সরকার, প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ IMMEDIATE Date : 29.099.1971

Defence Secretary & Secretary-In Charge of Information & Broadcasting, Government of the People's Republic of Bangladesh.

As decided by the Prime Minister it may please be circulated that no policy statement be broadcast through Radio Bangladesh without the prior approval of the undersigned.

It may also be informed to all concerned that no script be broadcast from Bangladesh Radio without prior scrutiny by the undersigned.

(A Mannan)

M. N. A. in Charge,

Press, Publicity, Information & Broadcasting

Department, Government of Bangladesh.

মুজিব নগর সরকারের ক্যাবিনেট ডিভিশন ৭ অক্টোবর ১৯৭১ সচিব হিসাবে আনওয়ারুল হক খান কে নিয়োগ দেয়[২৪]।

মুজিব নগর সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯ জুলাই ১৯৭১ প্রচার প্রকাশনা, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের ৬ মাসের খসড়া বাজেট প্রণয়ন করেন[২৫]।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH.
DEPARTMENT OF PRESS, PUBLICITY & INFORMATION BROADCASTING.

1.	Salary,Tapes @ 20 per month	Rs17,770.00
2.	@ Rs. 75/- each.	Rs. 1,500.00
3.	Newspaper subscriptions,	Rs. 100.00
4.	Casual Artists not included in the staff roll	Rs. 1,000.00
5.	Furniture hire	Rs. 250.00
6.	Instrument purchase	Rs. 1,500.00
7.	Stationery	Rs. 300.00
8.	Maintenance/ of Jeep	Rs. 1,500.00
9.	Miscellaneous & emergency Reserve such as third transmission, House rent, Drama production, increase of hour of broadcasting and any other expenditure	Rs. 11,080.00
		Rs. 35,000.00 per month.

For six months expenditure Rs. 35,000.00x 6 months = Rs. 2,10,000.00

(Rupees two lacs and ten thousand only).

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কিত একটি সভার কার্যবিবরণী[২৬]

১০ অক্টোবর, ১৯৭১

MINUTES OF MEETING ON CO-ORDINATION ON PROPAGANDA AND PUBLICITY EFFORTS IN SUPPORT OF WAR ACTIVITY HELD ON 10.10.71

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : 1. A. Samad, 2. Dr. B. Hossain, 3. Mr. Alamgir Kabir, 4.Mr. Shamsul Huda Chowdhury, 5.Mr. Kamal Lohani, 6.Mr. A Rahman, 7.Mr. B. Mahmood

সর্বশেষ মিটিং এর প্রোগ্রেস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়

সিদ্ধান্ত :

১. নতুন রেডিও ভবন নির্মাণ ও স্টাফগণ সেখানে কাজ করবে;

২. সংবাদের কম্পোজিশন Mr. A. Kabir কে দায়িত্ব দেওয়া হয়;

৩. টাইপ রাইটার মেশিন ও পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার এর ব্যবস্থা করা হয়;

৪. স্টাফ বিভিন্ন স্থানে সংবাদ সংগ্রহ করবে, এজন্য তাকে টিএ দেওয়া হবে;

৫. পারিতোষিক যথাসময়ে প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়;

৬. নিরাপত্তার জন্য আইডি কার্ড ইস্যু করা হবে;

৭. যুদ্ধ বিষয়ক গান পরিবেশন করা।

সংযুক্তি

১. Copy forward to Mr. M. A. Mannan

২. Samsul Huda Choudhury

তথ্য ও ব্রডকাস্টিং মন্ত্রণালয় এর কাজ কর্ম ও সংগঠন ছিল-

১. সরকারের প্রচারণা, ২. ব্রডকাস্টিং, ৩.চলচিত্র অনুমোদন ও প্রদর্শনী, ৪.ডকুমেন্টারী তৈরী,
৫.সংবাদপত্রের নিবন্ধন ও পরিসংখ্যান।

সেক্রেটারিয়েট- সেক্রেটারী -১ জন, উপদেষ্টা- ১ জন, সহকারী কেক্রেটারী -৪ জন, নিম্নতর সেক্রেটারী-৮ জন, সেকশন অফিসার-২০ জন।

মন্ত্রণালয় বিষয়গুলো দেখভাল করবে- ব্রডকাস্টিং,পাবলিকেশন,প্রেস ও ফিল্ম,প্রশাসন।

সংযুক্ত অফিস- বেতার কেন্দ্র ও নিউজ সার্ভিস ও অন্যান্য।

অধীনাস্ত অফিস- ফিল্ম ডিভিশন,ফিল্ম সেনশার,গবেষণা,পাঁচ বছর পরিকল্পনা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিদের তালিকা[২৭] : A. NEWS SECTION: Mr. Kamal Lohani- News editor,Contract,Rs. 425/-, Mr. J. U. Ahmed- Sub-Editor,Rs. 300/-, Mr. Subrata Barua- Sub-Editor,Rs. 300/-, Mr. Abul Quasem- Sub-Editor,Rs. 300/-, Mr. Kazi Habibuddin- Sub-Editor,Rs. 300/-, Mr. Mrinal Krishna Roy- Ad-hoc,Rs. 250/-, Mr. Ranajit Pal Choudhury, Ad-hoc,Rs. 250/-, Mr. M. Mamun- S Sub-Editor,Regular

Ex-G., Mrs. Pervin Hossain- News Reader,Rs 300/-, Mrs. Zarin Ahmed- News Reader,Rs. 250/-, Mr. Ali Reza Choudhury, News Reader,Rs. 300/-, Mr. Nurul Islam Sarker- News Reader,Ad-hoc,Rs. 200/-, Mr. Ezaz Hossain- News Monitor,Rs. 200/-, Mr. News Monitor,Rs. 200/-.

B : ENGLISH LANGUACE PROGRAMME AND INTERVIEWS : Md. Alamgir Kabir- English Programme Organiser Rs. 500/-, Mr. Ali Zaker- English Programme Producer Rs. 275/-.

C. ENGINEERING SECTION. Mr. Rashedul Hassan- Technical Asstt.,Regular Ex-G Rs. 300/-, Music Director Regular Rs. 500/-, Mr. Abdul Jabber- Music Producer,Rs. 500/-, Mr. Apel Mahmud- Staff Artist ,Rs. 350/-, Mr. Rathin Roy- Staff Artist,Rs. 300/-, Mr. Arun Goswami- Staff Artist,Rs.300/-, Mr. Pronodit Barua- Staff Composer,Rs. 300/-, Mr. Manna Hoque- Staff Artist,Rs. 300/-, Mr. Hasan Imam- Drama Producer,Rs., Mr. Sadekin- Script-writer,Rs. 300/-, Mr. Shahidul Islam- Announcer,Regular Ex-G,Rs. 300/-, Mr. Motahar Hossain- Announcer ,Rs. 275/-, Mr. Manzoor Kader- Sub-Editor,Regular Ex-G,Rs. 300/-

D. PROGRAMME SECTION: Mr. S. Huda Choudhury- Programme, Organiser,Regular Ex-G,Rs. 400/-, Mr. Ashfaqur Rahman- Programme,Organiser Regular Ex.G,Rs. 280/-, Mr. Mesbahuddin Ahmed- Programme,Organiser Regular Ex.G,Rs. 280/-, Mr. Balal Mohammad- Programme,Organiser Regular Ex.G,Rs. 300/-, Mr. T. H. Sikder- Programme Producer Regular Ex.G,Rs. 300/-, Mr. Taher Sultan- Programme,Producer Regular Ex.G,Rs. 300/-, Mr. Mustafa Anwar- Programme,Producer Regular Ex.G,Rs. 300/-, Mr. Nazrul Islam- Programme,Producer Regular Ex.G,Rs. 300/-, Mr. Abdullah-al-Farook- Programme Producer Regular Ex.G,Rs. 300/-, Mr. Mahmud Farouk- Programme

Producer Regular Ex.G,Rs. 300/-, Mr. Ashraful Alam- Announcer-cum-News Reader Rs. 275/-, Mr. Zahed Siddique- News Reader,Rs. 350/-, Mr. Shahidur Rahmam, News Reader,Rs. 350/-, Mr. Shamsuddin Ahmed- Asstt. cum-Receptionist Regular Ex-G,Rs. 300/-, Mr. M. Ashrafuddin- Stenographer ,Rs. 250/-, Mr. Nowab Zaman Choudhury- Copyist Regular Ex-G,Rs.218/-, Mr. Abul Barkat- Copyist Regular,Rs. 175/-, Mr. Anil Kumar Mitra- Accountant, Mr. Bimal Chandra Neogi- Peon,Rs. 100/-, Mr. Panchu Gopal Ghose- Peon,

E. EEW HANDS : Mr. Ranen Kushari- Drama producer Contract Rs. 400/-, Mrs. Madhuri Chatterijee-Script writer,Rs. 200/-, Mr. Nasim Choudhury- Script writer,Rs. 200/-, Mr. M. Chand- Staff Artist,Rs. 300/-, Mr. Yar Mohammad- Staff Artist,Rs. 300/-, Mr. Anwarul Abedin- Office Asstt. Regular,Rs. 200/-, Mr. Rangalal Deb Choudhury- Libratian Regular,Rs. 200/-, Mr. S. S. Sajjad- Studio-Executivecum Receptionist Rs. 200/-, Mr. Abu Yunus- Announcer,Rs. 200/-.

DEPARTMENT OF INFORMATION, FILM & BROADCASTING

Mr. Ashrafuddin- Stenographer- Rs. 250/-, Md. Nazrul Islam- Programme Producer- Rs., Mr. Rezaul Karim Chy- Technical Operator- Rs., Mr. Manna Hoque- Staff Artist- Rs. 300/-, Mr. Ashraful Alam- Announcer cum News Reader- Rs. 275/-, Mr. Sharfuzzaman- Technical Operator- Rs., Mr. S. A. Rahman- Field Officer (Press Unit)- Rs. 300/-, Mr. Alamgir Kabir- Chief Reporter- Rs. 500/-, Mr. Pronob Ray- Technical Operator- Rs., Mr. Md. Haroon- Driver- Rs. 200/-, Mr. S. K. Dasgupta- Circulation Manager- Rs. 350/-, Abdul Jabbar- Music Producer- Rs. 500/-, Lina Rani Chakraborty- Asstt. for file work & keeping records- Rs., Samar Das- Music Producer- Rs., Mr. A. K. Dutta- Accountant- Rs. 350/-, Mr. Ali Zaker- Eng. rogramme Producer- Rs. 275/-, Mr. Taher Sultan- Programme Producer- Rs. 300/-, Mr. Monjur Kadar- Announcer- Rs. 275/-, Mr. Motahar Hossain- Announcer- Rs. 150/-, Mr. Apel Muhammad- Staff Artist (Vocal)- Rs. 350/-, Mr. S. K. Saddi--do- (Violin)- Rs. 275/-, Mr. Hasan Imam- Producer of Drama & Feature- Rs. 425/-, Mr. Amir Hossain- Chief reporter from 15.7.71- Rs. 400/-(including T. A.), Mr. Md. Safi Alam- Photographer- Rs. 300/-, Mr. Abdul Jabbar Khan- Director of Film., Mr. Kamrul Hassan, Head of Design Centre, EPSIC, Dacca.- Director of Art and Design, Mr. M. R. Akhtar (Mukul)- Director of Press & Publicity.

এই থেকে প্রতীয়মান হয় যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কতটা গৃরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এর জনপ্রিয়তা কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাথে সাথে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুজিবনগর সরকারের মুখপাত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

বেতারে প্রচারিত জনগণের প্রতি নির্দেশাবলী[২৮]:

১। গুজবে কান দেবেন না; গুজব রটনাকারীকে ধরিয়ে দিন।

২। মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনার কথা গোপন রাখুন।

৩। পাক-বাহিনীর গতিবিধির খবর মুক্তিবাহিনীকে জানিয়ে দিন।

৪। শত্রুর সরবরাহ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিন।

৫। বিমান আক্রমনের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।

৬। মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।

-মনে রাখবেন, শত্রুর প্রতিটি বুলেট আপনার পয়সায় কেনা। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে ব্যয়িত আপনার প্রতিটি পয়সা স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ বিষয়ে দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মীর অংশগ্রহণ ও তিনি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেন।

নভেম্বর মাসে জয় বাংলা বাংলার জয় গানটির পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা যা পরবর্তীতে জাতীয় সংঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে প্রচার শুরু হয়।

ভাষণ ও বাণী প্রচার

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বহুবার মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মেদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ প্রচারিত হয়। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বাণী প্রচার করা হয়।

বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ প্রচার।

এছাড়া বিদেশী পত্রপত্রিকায় সম্পাদকীয় অভিমত এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ক. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠান ছিল বাংলা কথিকামালা। উল্লেখযোগ্য ছিল-

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু, ইয়াহিয়া জবাব দাও, রেঁনেসার সূচনা বাংলাদেশ, স্বদেশ সকাল, মুক্তিফৌজের ক্যাম্প, উর্দু কথিকা, ইসলামের দৃষ্টিতে, জল্লাদের দরবার, জনতার আদালত, গ্রাম বাংলা, বিশ্বজনমত, দৃষ্টিপাত, শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন, পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে, দর্পণ, কাঠগড়ার আসামী, বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ, দৃষ্টিকোন, রাজনৈতিক মঞ্চ, জনতার সংগ্রাম, চরমপত্র, বাংলাদেশ গেরিলা, মুক্তিসংগ্রাম ও মহিলা, বাংলার নারী, যুদ্ধই একমাত্র, দেয়ালের লিখন, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, রনাঙ্গন, দখলাকৃত এলাকা ঘুরে এলাম, মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম,

খ. **এছাড়া-** স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উর্দু অনুষ্ঠান, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ধর্মীয় আলোচনা, ইদুল ফিতর উপলক্ষে প্রচারিত অনুষ্ঠান, সাহিত্য অনুষ্ঠান, ইংরেজী প্রতিবেদন মালা, কবিতা পাঠ, সংগীতানুষ্ঠান।

এগুলো সকল অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য উদ্দিপক হিসাবে করে, স্বাধীনতাকামী মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

গ. **বেতারে প্রচারিত সংগীতানুষ্ঠান, উল্লেখযোগ্য ছিল-**সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা,সালাম সালাম হাজার সালাম,কারার ঐ লৌহ কপাট, ও আমার দেশের মাটি, জয় বাংলা বাংলার জয়, জনতার সংগ্রাম চলবেই, জন্ম আমার ধন্য হলো, একটি ফুলকে বাচাবো বলে, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, একট ফুলকে বাচাবো বলে, মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, নোঙ্গর তোল তোল।

কবিতা- আমার স্বর্গের নামে, বাংলাদেশ গান গৌরবে আসে স্বাধীনতা দিন এলো, এহিয়া বধকাব্য। বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদদের নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারিত হত।

ঘ. **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সূচীর অংশ বিশেষ- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন হিসেবে অনুষ্ঠান পরিচালিত হতো।**

২৫ মে ১৯৭১

অনুষ্ঠানসূচী

আজ মঙ্গলবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, ২৫ মে ১৯৭১ সাল।

৭.০০ A. M. : আস্ সালামো আলায়কুম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করছি। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে... মিটারে...কি: সা: এ। অধিবেশনের প্রথমে শুনুন তেলাওয়াতে কালামে পাক ও তার বাংলা তরজমা। ৭.১০ বাঙলা খবর প্রচারিত হবে সকাল সোয়া সাতটায়।

SWADHIN BANGLA BETAR KENDRA

Date : 26.05.1971

৭.০০ : AGNISHIKHA : A Com-posite Programme for the freedom fighters. ৭. ২০ CHARAMPATRA : Counter Programme ৭.৪৫ AGNIBINA : A special programme on

observance of the birth anniversary of post Nazrul Islam. ৮.১৫ Slogans & Sayings of National Leaders.

২৭ মে, ১৯৭১

৭.০০ AGNISHIKHA : A Composite Programme for the freedom fighters. ৭.৩০ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা : Talk in Bengali : Mr. A. Mannan, MNA ৮.০০ Falk Song : Shah Ali Sirker. ৮.০৫ বাঙ্গালী জবাব দাও : Talk in Bengali, ৮.১৫ Patriotic Song, ৮.২০ Biswa Janamat. ৮.২৫ CHARAMPATRA : Counter Programme. ৮.৪০ Close down.

৩১ মে, ১৯৭১, দ্বিতীয় অধিবেশন: ৬.৫৯ সুচকধ্বনি ও উদ্বোধনী ঘোষণা, ৭.০০ অগ্নিশিখা : মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান- ক) দর্পণ : বাংলা কবিতা, খ) জাগৃতি : দেশাত্নবোধক গান, গ) আবৃত্তি, ঘ) রণভেরী : যুদ্ধের খবর, ঙ) বজ্রকণ্ঠ : শেখ মুজিবের বাণী, চ) দেশাত্নবোধক গান। ৮.১৫ বজ্রকণ্ঠ ও দেশাত্নবোধক গান, ৮.২০ চরমপত্র।

১৯ জুন : ১৯৭১ : ৭.০০ উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি, ৭.২৫ বিশ্বজনমত, ৭.৪০ দৃষ্টিপাত : কথিকা- ড. মজহারুল ইসলাম, ৯.০০ জয় বাংলা,

১০ জুলাই, ১৯৭১ : ৭.০০ ক) উদ্বোধনী, খ) কোরান তেলাওয়াত, ৭.৫৩ চরমপত্র, সন্ধ্যা ৭.০০ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি, ৭.২৫ বিশ্বজনমত : আমিনুল হক বাদশা, ৮.২৫ সাম্প্রদায়িকতার উপর উর্দু কথিকা-শহীদুর রহমান,

৮.৫০ বজ্রকণ্ঠ, ৮.৫২ শ্লোগান ও সঙ্গীত।

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তৃতীয় অধিবেশন : সন্ধ্যা ৭.০০ উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি, ৭.৫৫ সংবাদ পর্যালোচনা, ৮.২৫ খবর : উর্দু, ৯.২০ সমাপ্তি।

১৬ অক্টোবর, ১৯৭১ তৃতীয় অধিবেশন : ৭.০০ Udbodhani Ghoshana-O-Anushthan Parichiti, ৮.০০ English Programme,Commentary,World Press Review, Music, News, ৮.২৫ Khabar : Urdu, ৮.৩০ Kathika,Sangeet.

১ নভেম্বর, ১৯৭১ প্রথম অধিবেশন: ৭.০০ Udbodhani, Quran Tillawat-O-Anubad : Anushthan Parichiti, ৭.১০ Khabar : Bangla, ৭.২০ Khabar : English, ৭.৪২ Rabiadra Sangeet.

দ্বিতীয় অধিবেশন: ১.০০ Udbodhani-O-Anushthan Parichiti, ১.০৫ Khabar : Bangal, Khabar : English, ১.৪০ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা : এ সপ্তাহের জয়বাংলা পত্রিকা থেকে, ২.০০ Samapti.

তৃতীয় অধিবেশন: ৭.০০ Udbodhani-O-Anushthan Parichiti, ৭.০৫ Agnishikha : Sangbad Bulletin,Sangeet,Darpan : Ashraful Alam,Sangeet-O-Slogan ,Abritti : Mustafa Anwar, Banglar Mukh : Jibanika : Seript by Kallyan Mitra, Participated by Purnendu Saha & Bulbul Mahalnabish, ৮.০৫ Jibantika : Mirjafarer Rojnamcha: Script by Kallyan Mitra, ৮.১৫ Nazrul Sangeet.

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১ দ্বিতীয় অধিবেশন: ১.৫০ Kothika : Idul Fittr : Talk by Syed Ali Ashan,

২.০৫ Ramjaner-Oi-Rojar Sheshe (Re-broadcast) : Script by Abdul Gaffar Chowdhury.

তৃতীয় অধিবেশন: ৭.০৫ Khabar : Bangla, ৮.৫০ Khabar : English, ৯.০০ Palli Geeti, ৯.৪০ Sangeet, ১০.২০ Samapti.

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রথম অধিবেশন: ৭.১০ Khabar : Bangla, ৭.২০ Khabar : English, ৭.৫০ Kothika : এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ : সাধন কুমার ধর।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রথম অধিবেশন : ৭.০০ Udbodhani,Quran Tilawat-O-Anubad, ৮.৩৫ Jantra Sangeet-O-Abritti from Shamsur Rahman or Sukanta by Mustafa Anwar.

তৃতীয় অধিবেশন: ৭.০৫ Khabar : Bangla, ৭.১৫ Khabar : English, Kothika : বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য : Shamim Chawdhury, তোরা সব জয়ধ্বনি কর : কোরাস গান।

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রথম অধিবেশন: ৭.০০ উদ্বোধনী, কোরান তেলাওয়াত ও অনুষ্ঠান পরিচিতি, ৭.৩০ তোরা সব জয়ধ্বনি কর : বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান, ৭.৪২ এই ঢাকা এই রাজধানী : বিশেষ জীবন্তিকা, ৭.৫২ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ,বিজয় নিশান উড়ছে ওই : বিশেষ সঙ্গীত।

দ্বিতীয় অধিবেশন: ২.৫৩ খবর : বাংলা, ৩.০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন: Sangeet : ও আমার দেশের মাটি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নি:সন্দেহে। মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী ও সমর্থনকারীদের ঐক্যবদ্ধ রাখা ও উজ্জীবিত রাখা এবং মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমানা তৈরী করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুধু একটি নাম নয়-একটি শক্তি, প্রেরণা ও বাঙালীর আত্মবিশ্বাসের স্থান। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে এই বেতার কেন্দ্র মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী মানুষের মনোবলকে উদ্দীপ্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আরো বলা যায় যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত হয়ে জয়ী হওয়ার একটি শক্তিশালী অস্ত্র ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। মনস্তাত্বিক দিকও রয়েছে এই বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালার ভূমিকা, । কারণ মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময় এই বেতার কেন্দ্রই বাংলার জনগন ও মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক শক্তি যোগাতো। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তা অব্যাহত ছিল। যুদ্ধ জয়ে স্বপ্ন দেখিয়েছিল এই বেতারের বহুমুখী কার্যক্রম।

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা ও জনগণকে উজ্জীবিত করেছে। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তন হয়েছে স্বত:স্ফুর্তভাবে বাঙালি জাতির দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভুত ক্ষোভ যখন যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তড়িৎ সংগঠিত হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে তার প্রচার ও জনমত সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখে। প্রচার মাধ্যমে বহুবিধ অসুবিধা সত্বেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দায়িত্বশীলতার ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের অধীন সুশৃঙ্খলভাবে প্রচারনা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরীতে বিশেষ অবদান রাখে।

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধের স্বতস্ফুর্ত সংগঠন হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপনা যোগায়।

২. মাহমুদউল্লাহ (সম্পা.) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১) দ্বিতীয় খন্ড (ঢাকা : বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত)

৩. কালুর ঘাট চট্টগ্রামের একটি স্থানের নাম। চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্রটি কালুরঘাট এ অবস্থিত, যা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র নামে পরিচিত।

৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড, মুজিবনগর : প্রশাসন (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২) পৃ.৩

৫. স্বাধীনতার দলিলপত্র, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬

৬. ঐ, পৃ. ৬৩২

---

৭. ঐ, পৃ. ৬৩২
৮. বাগাফা, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার একটি গ্রাম।
৯. শিলিগুড়ি, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি শহর।
১০. আব্দুল্লাহ আল ফারুক, আমার কিছু কথা, প্রথম আলো বিজয় বিদস সংখ্যা, ২০১৩।
১১. বেলাল মোহাম্মদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩) পৃ. ১৮৭।
১২. সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক) বাংলাপিডিয়া, ১০ম খণ্ড (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩) পৃ. ৩১৫।
১৩. মওদুদ আহমদ বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬) পৃ. ২১৭।
১৪. ঐ
১৫. ঐ, পৃ. ১১৪
১৬. স্বাধীনতার দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
১৭. আব্দুল্লাহ আল ফারুক, ঐ
১৮. বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১৯. ঐ, পৃ. ২৬৭
২০. ড. মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১ (সময়, ঢাকা, ২০০৩), পৃ. ২৬৩
২১. ঐ
২২. স্বাধীনতার দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।
২৩. ঐ
২৪. ঐ, পৃ. ১৭০
২৫. ঐ, পৃ. ৮৪
২৬. স্বাধীনতার দলিলপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৪২
২৭. স্বাধীনতার দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-৪১৬
২৮. স্বাধীনতার দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৪১

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

Backwash Effect of the S. S. C. Examination System on Teaching and Learning of English at the Secondary Level in Bangladesh

Mahbuba Hasina*

Abstract: Testing may exert a powerful influence on teaching and learning, which is known as the backwash effect. Positive backwash effect will have a fruitful influence on the learning and teaching that take place before the test. Negative backwash, in contrast, will produce a detrimental effect and encumber the process of teaching and learning. In the EFL context of Bangladesh, the secondary level learners and teachers are often observed toface negative impacts of the English language testing system. Hence, it is felt, the backwash influences of the S. S. C. examination on teaching and learning of English deserve a thorough study and evaluation. This paper intends to explore the effect of this Standardized National examination, either formative or summative, on the teachers and learners in the present milieu of secondary English edification in Bangladesh. The survey method has been employed for the empirical investigation of this study. This study reveals that the teaching and learning activities at the secondary level are mostly determined by the requirements of the testing system. The current practices of English language teaching and learning are massively and, even, blindly test-oriented.

Keywords: EFL Learners, The Communicative Approach, Testing, Achievement tests, Backwash effect.

1. Introduction

Testing is one of the greatest beneficial forces in changing the directions of language teaching and in encouraging learners to acquire a target language more successfully. A change in the testing system can exercise greater effects on teaching procedures than any other change in the syllabus or textbook. Shohamy (1992) stresses that the true power of tests is that of offering pedagogical benefits, such as promoting beneficial backwash.The Communicative performance-based language tests are expected to have a beneficial backwash effect on teaching. Tests can become feedback devices whereby a student perceives elements of communicative performance that needs improvement. Language tests, then, should be designed to provide feedback and proper motivation.“Language tests”, McNamara (2004) asserts, “play a powerful role in many people’s lives, acting as gateways at important transitional moments in education, in employment, and in moving from one country to another” (p. 4).

Nowadays, the study of modern foreign languages has become an integral part of the secondary education system all over the world. In Bangladesh, a number of foreign languages, such as English, French, Japanese, Arabic, Persian and so on, are taught and learned. But, English holds a very significant position in our educational system as the international language of communication. It is the only foreign language taught and learned as a compulsory subject besides our first language Bengali from the very primary level up to the tertiary (degree) level. Unlike other subjects in the curriculum of the Secondary level, learning English theoretically requires students to practise the four basic skills of English to acquire

* Assistant Professor, Department of English, University of Rajshahi.

communicative competence. But, these are rarely practiced by learners in the classroom or outside the classroom, which consequently produces an adverse effect on their learning. Though insincerity, callousness and effortlessness on the part of students are generally identified as prevalent causes of their unsatisfactory performance in the test, they cannot be wholly blamed for their failure. They are often found to be passive recipients of what their teachers, educational institutions, learning materials, and education and testing systems provide them with or allow them. Particularly, fiasco in learning English may stem from using unsuitable and ineffective system of testing. The whole process of English education could be greatly affected and determined by the testing system, which seems to be far away from the paradigm of foreign language testing upheld by the Communicative Approach since it, it is frequently found, encourages our students to develop the habit of cramming, sometimes, even without understanding just to attain satisfactory grades in the tests. These issues concerned with substandard test performance of the secondary students demand our close attention for remedy to upgrade the standard of English education in Bangladesh. Hence, this paper intends to explore the backwash effects of the testing system on English language teaching and learning systems and procedures at the secondary level.

2. Literature Review

The effect or impact which testing has on teaching and learning is broadly defined as Backwash effect. Backwash effect, to be more specific, concerns the effect of each test item on teachers' teaching and learners' learning in terms of positive and negative aspects. Backwash has been also sometimes referred to as Washback, test impact, measurement driven instruction, curriculum alignment, test feedback and so on. Gates (1995) identifies backwash as "the influence of testing on teaching and learning" (p. 101). Backwash, in the opinion of Brown (1997), refers to "the connections between language testing and learning, and the consequences of those connections" (p. 27). "Washback", Messick (1996) clarifies, "refers to the extent to which the introduction and use of a test influences language teachers and learners to do things they would not otherwise do that promote or inhibit language learning" (p. 241). "Public examinations", Person (1988) observes, "influence the attitudes, behaviours, and motivation of teachers, learners, and parents, and because examinations often come at the end of a course, this influence is seen working in a backward direction-hence the term washback" (Cited in Cheng et al, 2004, p. 7).Testing may exert a gripping influence on teaching and learning. In this connection, Shohamy (1992) elucidates that, "results obtained from tests can have serious consequences for individuals as well as programs, since many crucial decisions are made on the basis of test results. The power and authority of tests enable policymakers to use them as effective tools for controlling educational systems and prescribing the behavior of those who are affected by their results – administrators, teachers and students" (p. 513).

An ideal language testing practice should ensure positive backwash effect of tests on teaching and learning. An effective English language test should ensure "the assessment records are consistent and that the assessment-based interpretations are meaningful, impartial, generalizable, relevant, and sufficient" (Bachman and Palmer, 2010, p. 433).Furthermore, formal examinations usually have a strong negative backwash effect that often hinders the process of good teaching. For instance, in case of Achievement tests teaching is often shaped by the testing because achievement tests are naturally curriculum based and assess the objectives of the curriculum (Hughes, 2003, p. 13).

2.1 Categories of Backwash Effects

Backwash influence of a language test may produce different kinds of effect on the teaching and learning system. ELT Researchers and theorists exploring the area of testing of English as a second or foreign language have made attempts to identify and categorize Backwash effects into several categories on the basis of their attributes and functions in the sphere of education.

Broadly, Wall (1997) has categorized two types of the Backwash effect, which are the micro-backwash and the macro-backwash. The micro-backwash effect, in Wall's opinion, is concerned with the effects of a language test on learners and teachers inside the school or educational institution. Conversely, the macro-backwash effect involves the impacts of a language test on individuals, practices, and policy makers (Cited in Thaidan, 2015).

Moreover, Gates (1995) suggests that backwash effect may vary from strong to weak backwash. A language test may exert either a strong influence or a weak influence on the stakeholders. Weir (1990) upholds that the communicative testing could have a strong backwash effect on communicative language teaching and, in fact, that such a backwash effect would be directly linked to the construct validity of the tests.

Besides, Gates as well as some other ELT theorists like Hughes, Weir, Shohamy, McNamara, and so on outlines two distinctive ways in which backwash may vary, too. Language tests can have either harmful or beneficial effects on the stakeholders in the education system. Positive Backwash effect could brim from the curriculum configuration in terms of modifying the teaching affairs or the mode of trial examination strategy. To accomplish this, Bachman and Palmer (2010) reflect that, "the act of using the assessment will be beneficial to stakeholders who will always be affected by the use of the test takers. They may have either positive or negative perceptions of the process of preparing for the test, of taking it, and of waiting for the results" (p.178). Consequently, the reaction towards the positive washback will contribute directly in terms of accelerating or enhancing the educational process as well as achieving the educational objectives, effectively.

On the contrary, "If a test", Hughes (2003) speculates, "is regarded as important, if the stakes are high, preparation for it can come to dominate all teaching and learning activities. And if the test content and testing techniques are at variance with the objectives of the course, there is likely to be harmful backwash"(p. 53). Moreover, Noble and Smith (1994) explicate that "high-stakes testing could affect teachers directly and negatively, and that teaching test, taking skills and drilling on multiple-choice worksheets, is likely to boost the score but unlikely to promote general understanding" (Cited in Cheng et al, 2004, pp. 9-10). Negative backwash effect of a test can also complicate the implementation of the syllabus and foreign language teaching programme. Thaidan (2015) expounds that language teaching by 'under-skilled' teachers, who can barely meet the criteria of achieving or managing the curriculum items effectively, might boost up negative backwash effect (p. 6).

2.2 Factors Determining Backwash Effects

Test researchers and ELT specialists have attempted to explore the factors which are responsible for generating backwash effect. They observe that positive or negative effects of backwash depend on local conditions in classrooms, the established traditions of teaching, the immediate motivation of learners, the frequently unpredictable ways in which classroom interaction develops and several other related considerations. In this connection, Gates (1995) suggests that the following factors affect the impact of backwash: a) Prestige, b) Accuracy, c) Transparency, d) Utility, e) Monopoly, f) Anxiety, and g) Practicality (pp. 102-103). In the

same line, Alderson and Hamp-Lyons (1996) argue that the amount and type of washback depend on the extent to which: a) The test has status (and level of stakes), b) The test is counter to current teaching practices, and c) Teachers and textbook writers consider appropriate methods of test preparation and are willing and able to innovate (p. 296). Moreover, Shohamy et al (1996) believe that the degree of impact is influenced by: a) Status of the language, b) Low vs. high stakes, c) Purpose of the test, d) Format of the test (more anxiety from facing oral test/ novel instead of familiar format), e) Prospective application of scores, and f) Skills selected to be tested (pp. 299-300, 314-315). Thus, these factors require proper attention and adequate evaluation for devising an effective and suitable English language test.

2.3 Negative Backwash Effect on Teachers and Learners

An EFL test may well enforce negative backwash sways on teaching and learning of a foreign language. Alderson and Hamp-Lyons (1996) observe that unnatural teaching and learning, inappropriate language learning system and language-using strategies are some major negative outcomes of washback. They specified four negative aspects of backwash effect, which are a) narrowing the curriculum, b) losing instructional time, c) reducing emphasis on skills that require complex thinking or problem-solving, and d) test score 'pollution', or increases in test scores without an accompanying rise in ability in the construct being tested (p. 281). Similarly, Shohamy et al (1996) identify several plausible negative effects of a language test on teachers and their teaching process: a) Teachers may stop teaching new material and turn to reviewing material, b) Teachers might replace class textbooks with worksheets that are identical to previous years' tests, c) The classroom activities could be all "test like", d) Review sessions may often be demanded in addition to regular class hours, e) The atmosphere in the class can become tense and so on (p. 301). In addition, Bailey (1996) discusses six detrimental choices that students might make due to washback : a) Practicing items similar in format to those on the test, b) Studying vocabulary and grammar rules, c) Applying test-taking strategies, d) Enrolling in tests-preparation courses, e) Enrolling in, requesting or demanding additional (unscheduled) test-preparation classes or tutorials (in addition to or in lieu of other language classes), f) Skipping language classes to study for the test and so on (pp. 264-265).

3. Research Methodology

The study necessitated empirical investigation of the impact of the current testing system on the present English teaching and learning practices used at the secondary level in Bangladesh. Considering the nature and purpose of this study, the survey method has been chosen for the empirical study. Two major techniques of the survey method – questionnaire survey and interview – have been used for the study. So, the methods of data collection employed for the study are – 1) Students' Questionnaire Survey, 2) Students' Interview, 3) Teachers' Questionnaire Survey, and 4) Teachers' Interview. And for these methods instruments have been carefully designed and administered. The sample of the empirical study consisted of 240 participants. For questionnaire survey, 200 students and 40 teachers of the secondary level were selected from Rajshahi district. Moreover, 18 students and 15 teachers were randomly selected from the same sample for structured interviews. Similar set of questions have been used for the purpose of interviews. Thus, data have been collected from various sources through the use of different methods to corroborate the findings, and to ensure the accuracy, authenticity and reliability of the data.

4. Findings

For this empirical study, data collected from various sources were, ultimately, analyzed and interpreted. In both the students' and teachers' questionnaires a five-point rating scale has been used. Values assigned to the five alternative responses for each statement are: 1 = always, 2 = very often, 3 = sometimes, 4 = rarely and 5 = not at all. The Mean scores range between 1 and 5. Scores between 4 and 5 are considered 'very high'. Scores between 3 and 3.99 are considered 'considerably high'. Scores between 2 and 2.99 are considered 'considerably low' and the scores between 1 and 1.99 are considered 'very low'. On the basis of data analysis and evaluation, i) Results of Students' questionnaire survey and Interview, and ii) Results of Teachers' questionnaire survey and interview are prepared and presented in the following sections:

4.1 Results of Students'Questionnaire Survey and Interview

Table- 1: Results of Students' Questionnaire Survey and Interview

No	Statements	Results					
		Questionnaire Survey		Interview		Overall Results	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
1	You use English while interacting with your teachers and other students in the class	3.46	1.55	3.49	1.56	3.48	1.56
2	You prefer to learn English by memorizing the rules of grammar and vocabulary	1.51	1.15	1.19	0.39	1.35	0.77
3	You learn English to communicate with other people in English in real life situations	3.91	0.84	4.06	0.93	3.99	0.89
4	You decide what and how you learn in the class	4.90	0.30	4.94	0.23	4.92	0.27
5	You prefer to learn English by memorizing the contents of the textbooks and other materials	2.03	1.47	2.28	1.18	2.15	1.33
6	You learn English by doing various language exercises and tasks in the classroom	3.28	0.99	3.57	1.27	3.43	1.13
7	You listen to your teachers in the class and speak only when you are asked	1.60	0.99	2.04	1.27	1.82	1.13

No	Statements	Results					
		Questionnaire Survey		Interview		Overall Results	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
8	You learn English only to meet the requirements of the examination	1.18	0.57	1.10	0.39	1.14	0.48
9	You do not intend to practice and develop the listening skill in English as it is not tested in the examination	1.27	0.66	1.21	0.52	1.24	0.59
10	You concentrate on learning the speaking skill though it is less important in the examination	4.00	1.00	4.17	0.90	4.09	0.95

The overall results of the students' survey and interview show that statements 4 and 10 concerning learners' autonomy in the teaching-learning process and the significance and practice of learning the speaking skill, have 'very high' Mean scores, that is above 4 in the rating scale, which indicates that the students rarely get the opportunity to decide what and how they learn in the class, and that they hardly concentrate on learning the speaking skill as it is not given significant importance in the examination. Statements 1, 3, and 6 on the medium of interaction between students and teacher and among the students in the classroom, on the purpose of learning English at the secondary level and on the use of various exercises and tasks to teach English in the classroom, have 'considerably high' Mean scores, that is between 3 and 3.99, which suggests that our secondary students sometimes use English while interacting with their teachers and with other students in the classroom and they frequently use Bengali as the medium of interaction in the classroom, that they mostly do not learn English to be able to communicate with other people in the language in real life situations, and that they sometimes learn English by doing various language exercises and tasks in the classroom and naturally they can rarely become competent users of English. Statement 5 referring to students' preference and practice of learning English by memorizing the contents has 'considerably low' Mean score, that is between 2 and 2.99, which implies that students mostly prefer to learn English by memorizing the contents of the textbook and other supportive materials. And statements 2, 7, 8 and 9 on the trend of memorizing the rules of grammar and English vocabulary, on the role of the students in the classroom and their attitude to English language learning, on the effect of the testing system on the learning process, and on the significance and practice of learning the listening skill have 'very low' Mean scores, that is below 2 – between 1 and 1.99, which shows that the students usually learn English by memorizing the rules of grammar and English vocabulary, that they most often listen to their teachers in the class and speak only when they are asked to speak, that maximum students learn English merely to meet the requirements of the examination and secure satisfactory grades in English, and that they barely feel the need to practice and develop the listening skill in English as it is not tested in the examination.

4.2 Results of Teachers' Questionnaire Survey and Interview

Table-2: The Results of Teachers' Questionnaire Survey and Interview

No	Statements	Results					
		Questionnaire Survey		Interview		Overall Results	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
1	You use English as the medium of instruction and interaction in the classroom	4.00	1.00	4.17	0.90	4.09	0.95
2	You emphasize learning English by memorizing the rules of grammar and vocabulary	1.73	0.49	1.89	0.55	1.81	0.52
3	You involve your students in various language exercises and tasks in the classroom	3.70	0.86	3.33	1.00	3.52	0.93
4	You follow the English textbook instructions and lesson plans while teaching	3.20	1.08	3.44	0.96	3.32	1.02
5	You speak in the class and your students silently receive instruction and knowledge	1.50	0.72	1.44	0.68	1.47	0.70
6	Your students prefer to learn English by memorizing the contents of the textbook and teaching materials	1.67	0.72	1.72	0.88	1.70	0.80
7	You teach your students to be able to communicate with other people in English in real life situations	4.40	1.17	4.00	1.29	4.20	1.23
8	You decide what your students learn and how they learn	1.23	0.50	1.28	0.45	1.26	0.48
9	You teach your students to meet the requirements of the examination successfully	1.30	0.59	1.28	0.56	1.29	0.58
10	You concentrate on the content of the lessons while teaching	2.30	0.64	2.16	0.83	2.23	0.74
11	You do not feel the need to develop the listening skill of the students in English as it is not tested	1.60	0.99	1.94	1.27	1.77	1.13

No	Statements	Results					
		Questionnaire Survey		Interview		Overall Results	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
12	You focus on teaching the speaking skill though it is less important in the examination	4.07	1.00	4.22	0.92	4.15	0.96

The overall results of the teachers' survey and interview indicate that statements 1, 7 and 12 concerning the medium of instruction and interaction in the classroom, the purpose of teaching English at the secondary level, and the importance and practice of teaching of the speaking skill have 'very high' Mean scores which indicate that the English teachers working at the secondary schools in Bangladesh generally use Bengali as the medium of instruction and interaction in the classroom, that the teachers very rarely teach their students to be able to communicate with other people in English in real life situations, and that they very rarely focus on teaching the speaking skill as it is given insignificant importance in the examination. Statements 3 and 4 on the proper use of the textbook and on the use of various exercises and tasks to teach English in the classroom have 'considerably high' Mean scores, which suggests that the teachers sometimes follow the directions of teaching suggested in the English textbook while teaching in the classroom and that they sometimes engage their students in various language exercises and tasks in the classroom. Statement 10, connected to the technique of teaching English, has 'considerably low' Mean score which indicates that the teachers very often concentrate on the content of the lessons while teaching the language. And statements 2, 5, 6, 8, 9 and 11 concerning the trend of memorizing the rules of grammar and English vocabulary which is related to the traditional method of teaching, the nature of teacher student relationship and interactions in the classroom, the practice of rote-learning among the learners, the role of the teachers, the practice and purpose of teaching English at the secondary level, and on the significance of developing the listening skill of the students and impact of the testing system on it have 'very low' Mean scores which imply that the students usually learn English by memorizing the rules of grammar and vocabulary, that generally the secondary classrooms are teacher-centred where the teachers scarcely interact with their students in English and the students rarely participate actively in the learning process, that most of the students are keen on memorizing the contents of the textbook and other supportive materials to learn English , that the teachers usually decide what the learners learn and how they learn, that the teachers strongly feel the compulsion to prepare their students for performing successfully in the test, and that the teachers very rarely feel the need to develop the listening skill of the students as it is not tested in the examination.

5. Discussion

The result of the empirical investigation signifies that the currently used English language testing system exercises considerable influence on the present teaching practices and procedures as well as the learning activities. It persuades the English language teachers to direct their teaching activities mostly to enable the students to perform satisfactorily in the test.Overlooking the responsibility to develop the four basic language skills of the learners in English they are often found to teach only those elements and skills which the students need to

know and learn to be able to accomplish the tasks set in the test. The backwash effect of the present testing systemlargely determines the effort and techniques of teaching. Thus,the testing system instead of supporting and facilitating the teaching procedures, which it is expected to do, hinders the natural process of English teaching. In this connection, West observes that Departments of education may issue improved syllabus and suggestions to the teachers, but, what the teachers actually do is what the examination demands. Therefore, West (1955) recommends, "The great thing, the really important thing is that the examination should be such as encourages a good teacher to teach well instead of forcing him to teach badly" (Cited in Rahman, 1986, p. 120).

At the same time, English language learning process also suffers from the negative backwash effect of the testing system. It influences students to direct all their learning activities to meet the requirements of the test as successfully as possible. Majority of them dedicate all their efforts in learning English inside the classroom as well as outside the classroom to secure desired grades in the test. Thus, the current testing system derails students from focusing on the practice and cultivation of the requisite skills in English for communicative purposes.

6. Recommendations

"The quickest way to change students' learning is to change the assessment system" (Tang and Biggs, 1996. Cited in Cheng et al, 2004, p. 39). In the same way, in the teaching of English as a second or foreign language "unless the content and format of the examinations change, nothing will change" (Brown, 1997, p. 34). Therefore, we need to consider several measures to constrain negative backwash effect and promote positive backwash effect of the English language test employed to assess competence of the learners in the S.S.C. examination.

The English language tests should reflect the full curriculum not merely a limited aspect of it. The language skills to be tested should not be limited to academic areas but also relate to out-of school tasks. For promoting beneficial backwash we have to ensure that the test measures the abilities of learners whose development weintend to encourage. It would be more beneficial to use direct testing system for assessment of the productive skills of learners. Accordingly, in the English language test, the receptive as well as the productive skills of the secondary students in using English need to be tested properly and adequately. Specifically, Listening comprehension test needs to be included in the present testing system for the proper and accurate measurement of the communicative competence of the secondary students in English. In addition, the speaking skill of the students would be best assessed directly through an Oral test, in which the speaking skill of the students could be tested directly through speaking activities.

Besides, the test designers should try to select and frame samples widely and unpredictably. To be effective, test items should properly sample the skills, sub-skills, grammar and vocabulary specified in the curriculum. Particularly, in testing the writing skill, 'guided' compositions should be more preferred than 'open-ended' compositions where merely a title consisting of one phrase or sentence is given to the students to write on it. Because in writing such traditional compositions, students can easily use memorized contents to accomplish the task instead of writing the composition by themselves.

Furthermore,variety of test formats should be used including written, oral, aural, and practical and appropriate, suitable and operative language tasks should be set in harmony with the objectives of the test. Moreover, in the test questions, tasks, topic or subject of test items

should not be repeated mechanically in the consequent years. The test items should be designed and set in such a way that would actually require the students to develop their skills in English to perform well in the test and, thereby, obtain desired marks.

Additionally, the secondary English teachers are required to play a very significant role in the learning process. They should be motivated and properly trained to use effective teaching techniques and procedures that could promote beneficial backwash effect and constrain harmful backwash effect of the English language test. They must provide proper motivation and adequate feedback to the learners studying at the secondary level to obtain positive backwash effect of the test.

In addition, Examination authorities should work closely with curriculum designers, educational administrators,and the secondary English teachers, who are capable of making positive changes in the education system of the country, to improve the testing system. Test developers need to assure that they are also involved in different phases of the testing process. Besides, initiatives must be taken to collaborate test developers and test takers to have a mutual scope and compromising strategy in terms of aligning the curriculum items effectively. Hence, we need to explore the prospect of utilizing the test powers in terms of advantage in alliance with teachers and test developers.

Similarly, we can promote beneficial backwash by making sure performance of the secondary level learners in the test is properly assessed so that the results must appear believable, credible and fair to test takers and score users.

Above all,predictive validity studies of the S.S.C. Examination, a standardized public examination, should be conducted to cheek whether selected test formats and testing system are fulfilling their purpose or not. Therefore, each examination board in Bangladeshmay incorporate a research capacity particularly to investigate the impact of examinations on English language teaching and learning.

7. Conclusion

In conclusion, I have studied and examined effects of the present English language testing system on the current teaching and learning practices at the secondary level in Bangladesh in this paper. My analysis clearly indicates that the teaching and learning activities are mostly determined by the requirements of the testing system. The current practices of English language teaching and learning are massively and, even, blindly test-oriented. Nonetheless, the testing system must be consistent with the principles and assumptions underlying the Communicative Approach. So, the current testing system should be transformed into a complete test of communicative competence in English with proper attention, balanced distribution of marks and equal importance conferred to the assessment of all the four basic language skills. Thereby, the Communicative language testing system can be made effective, appropriate and suitable as a test of the communicative competence of the secondary level students in English. Changes and improvements in the testing system can greatly contribute to the improvement of the teaching system and proper implementation of the Communicative Approach as well.

References:

Alderson, I. C., & Hamp-Lyons, L. (1996). TOEFL preparation courses: A study of washback. *Language Testing*, 13, 280-297.

Bachman, L. & Palmer, A. (2010). *Language Assessment in Practice*. Oxford:Oxford University Press.

Bailey, K. M. (1996). Working for washback: A review of the washback concept in language testing. *Language Testing*, 13, 257-279.

Brown, J. D.(1997). The washback effect of language tests, *University of Hawaii Working Papers in ESL*, 16(l), 27- 45.

Gates, S. (1995). Exploiting washback from standardized tests. In J. D. Brown,& S. O. Yamashita (eds.), *Language Testing in Japan* (Pp-101-106). Tokyo: Japanese Association for Language Teaching.

Hughes, A. (2003). *Testing for Language Teachers*. UK: Cambridge University Press.

McNamara, T. (2004). *Language Testing*. Oxford: Oxford University Press.

Messick, S. (1996). Validity and washback in language testing. *Language Testing*, 13, 241-256.

Noble & Smith. (1994).Cited in L.Cheng, Y.Watanabe, & A. Curtis.(2004). *Washback in Language Testing*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Association, Inc.

Person (1988). Cited in L.Cheng, Y.Watanabe, & A. Curtis.(2004). *Washback in Language Testing*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Association, Inc.

Shohamy, E. (1992). Beyond performance testing: A diagnostic feedback testing model for assessing foreign language learning. *Modern Language Journal*,76 (4), 513-521.

Shohamy, E., Donitsa-Schmidt, S., & Ferman, I. (1996). Test impact revisited: washback effect over time. *Language Testing*, 13, 298-317.

Tang & Biggs, (1996). Cited in L.Cheng, Y.Watanabe, & A. Curtis. (2004). *Washback in Language Testing*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Association Inc.

Thaidan, R. (2015). Washback in language testing. *Education Journal*. 4(1), 5-8. doi: 10.11648/j.edu.20150401.12. Retrieved on 14.04.2019.

Weir, C. J. (1990). *Communicative Language Testing*. UK: Prentice Hall.

West, M. (1955). *Learning to read a Foreign Language*. Longmans: Green and Co. Ltd. Cited in Rahman, A. (1986).Focus on English in S.S.C. and H.S.C. examinations. In N. Islam, (ed.) *The State of English in Bangladesh Today* (Pp-115-120). Dhaka: English Association of Bangladesh.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

আহমদ ছফার সাহিত্যভাবনা : সমকালীন প্রেক্ষিত

ড. সৈয়দ তৌফিক জুহরী*

Abstract: Bangladeshi writer Ahmad Sofa is a great thinker, novelist and public intellectual. In his various essays, he finds out the failure of the Bangladeshi intellectual, and try to establish a better life and high standards of truthfulness. Also, he is marked as rare brilliance of genius, and a controversial figureduring his lifetime for his bohemian lifestyle. His essays deal with history, sociological issues, contemporary politics, literary and cultural critiques, etc. Almost all the fields of the literary landscape of Bangladesh werecultivated by Ahmad Sofa, by building a veritable powerhouse of infinite passion and creative energy, both in terms of quality and quantity. However, the following essay endeavors to represent a brief idea on Ahmad Sofa and his various essays about Bengali literature.

প্রাবন্ধিক আহমদ ছফার (১৯৪৩-২০০১) স্বাতন্ত্র্য মানসশক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা ও নান্দনিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে অভিযোজনের সামর্থ্যে, যা বৃহত্তর দেশকালের সাথে অনন্বিত। তিনি সমাজ-প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব এবং অনুভবকে পরিব্যপ্ত করেছেন শিল্পরচনার প্রণোদনায়, সুতরাং অনগ্রসর সমাজব্যবস্থা, রক্ষণশীল মানসিকতা, কূপমণ্ডূকতা ও গোঁড়া সমাজ-সংস্কার তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। এর ফলে দেশ-কাল-সমাজ-সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গে তাঁর উচ্চারণ যেমন সময়চারিত্র্য-নির্ণয়ক, ঠিক তেমনই শুভ-উৎসের উত্তরণ-নির্দেশক। রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা স্তর সম্পর্কে সজাগতা অর্জনের প্রয়োজনে তিনি পেয়েছেন আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জ. ১৯৩৬) প্রমুখ প্রাবিন্ধকের জীবনপ্রবাহলগ্ন অনুসন্ধানস্পৃহার বিচ্ছুরিত অনুরঞ্জন। এর ফলে প্রবন্ধ রচনায় হয়েছেন বহুমাত্রিক, বিষয় নির্বাচনে ঐতিহ্যসন্ধানী এবং দেশজতায় প্রত্যাবর্তক। আসলে প্রবন্ধপটে জীবনের রূপচিত্র নির্মাণের নেপথ্যে একদিকে যেমন সক্রিয় ছিল দেশ-কাল-সমাজ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, অন্যদিকে ঠিক তেমনই ছিল সেই উপকরণ সন্ধানের অন্তর্দৃষ্টি। এর ফলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকার পাঠ করলেও এর সত্যাসত্য খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে এক-স্থানে তিনি বলেছেন,'বাংলা-সাহিত্যে যে সম্পদ বেশি পাওয়া যায় তা হচ্ছে আবেগসম্পদ। চিন্তাসম্পদ নয়। এখানে কোন দার্শনিক জন্মায়নি। কোন দর্শনচর্চা হয়নি। ন্যায়, নব্য ন্যায় বলে যা হয়েছে তা খুবই দরিদ্র। মননশীলতা চর্চার জন্য উচিত জ্ঞানের চর্চার কেন্দ্রগুলো যথাসাধ্য চেষ্টায় খোলা রাখা।'[১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দার্শনিক চিত্তভাবহীন বাংলা সাহিত্যের মূলপট অনুসন্ধানে তাঁর কালোত্তীর্ণ দৃষ্টি তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে নিরাসক্ত-বুদ্ধিনির্ভর 'মানুষ' হয়ে ওঠার লক্ষ্যতটে। এতে একপ্রকার নৈর্ব্যক্তিক শিল্পীর নির্মোহ জীবনদৃষ্টি নিয়ে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি গড়েছেন সাহিত্য-শিল্পচর্চার এক গতিশীল ও ছন্দোময় পথনির্দেশ। অতএব সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রশ্ন থেকে তাঁর সৃজনসম্ভার যেমন হয়েছে জীবনমুখী, ঠিক তেমনই সাহিত্যভাবনাও পেয়েছে দর্শনমনস্ক ও আধুনিক অবয়ব।

একদিকে যেমন আত্মানুভব ও কালজিজ্ঞাসায় দেশ-সমাজ-ব্যক্তির ঐতিহাসিক ঘটনাপটে থেকেছেন সচেতন, অন্যদিকে ঠিক তেমনই সাহসী উচ্চারণে সাহিত্যিক ও শিল্পীসমাজের সৃষ্টিভাণ্ডারের ব্যবচ্ছেদে হয়েছে সোচ্চার। তিনি কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীসমাজের এক বিশেষ কূপমণ্ডূকতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, যেখানে তিনি জানিয়েছেন, যদিও শ্রেণিবিভক্ত মানুষের দ্বন্দ্ব-বেদনা-সংক্ষোভকে সাহিত্যিকবৃন্দ লিপিবব্ধ করেন মানবিকতার মানদণ্ডে, তথাপি প্রয়োজনে কোনো প্রতিবাদমঞ্চে একত্রিত হন না। যার ফলে সাহিত্যিক ও পাঠকসমাজের যোগসূত্র হয়ে যায় খণ্ডিত, যা আহমদ ছফা মেনে নিতে পারেননি। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য,'দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, আমাদের সমাজের সব-ধরনের লোকের সংগঠন আছে এমন কি যৌনকর্মীরাও তাদের অধিকার আদায়ের দাবিতে সংগঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত লেখকরা

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ন্যায্য দাবি আদায়ের দাবিতে কখনো সংগঠিতভাবে দাঁড়াতে পেরেছে আমাদের সমাজে তার বিশেষ প্রমাণ নেই।'[২] এই উক্তিতে একজন সময়-সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রতিবাদের ধারাকে সচল রাখতে চেয়েছেন, কারণ প্রাবন্ধিক মনে করতেন, প্রতিবাদের শব্দমালা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত না হলে রুদ্ধ হয়ে যায় সংস্কৃতির বিকাশ।তাঁর চিন্তাতরঙ্গের এমন তাৎপর্যময় আয়ুধ বিশ্লেষণ করেই মুহম্মদ জাফর ইকবাল নিজের সন্তানকে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা সম্পর্কে এক রচনায় বলেছেন,'পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক আছে, সফল সাহিত্যিক আছে, জনপ্রিয় সাহিত্যিক আছে, কিন্তু একেবারে একশো ভাগ খাঁটি সাহিত্যিক খুব কম। তোমার কত বড় সৌভাগ্য যে তুমি আজকে একজনকে দেখতে পেলে।'[৩]

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ ও একাকী, তথাপি সেই অভাব পূরণ হয়েছে প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক এবং শিল্পী এস.এম.সুলতান-এর সান্নিধ্য লাভ করার মাধ্যমে। সেই সান্নিধ্যলাভের বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে *যদ্যপি আমার গুরু* (১৯৯৮) গ্রন্থে বিশদভাবে, যেখানে তিনি চিত্রিত করেছেন নিজের নিষ্কাম জ্ঞান-চর্চার সূত্রমালা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের পথনির্দেশ। আসলে প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক এর সান্নিধ্যে তাঁর ভাবনার পরিমণ্ডল যেমন বিস্তৃত হয়েছে, ঠিক তেমনই মানসজীবন হয়েছে ঋদ্ধ এবং সমৃদ্ধতর। আমরা জানি,শিল্পী এস.এম.সুলতানের প্রভাবে বড় চুল রেখে, হাতে বাঁশি হাতে নিয়ে, শিল্পী হবার বাসনায় ছবি আঁকতেও শুরু করেছিলেন। একজন সমালোচক এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'সুলতানের সঙ্গে আহমদ ছফার চেহারায় অনেকটা মিল থাকায় লম্বা চুল, বাঁশি এবং টিয়াতে তাকে বেশ মানিয়ে যায়। সম্ভবত সুলতানের সংস্পর্শে তার ভেতর শিল্পী হওয়ার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি একদিন ছবি আঁকা শুরু করেন। চলতে থাকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।[৪] আলোচ্য উক্তি থেকে আহমদ ছফার সৃজনশীল চেতনা ও মৌলিক সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই তাঁর ছন্নছাড়া জীবন সম্পর্কেও পাওয়া যায় ধারণা। ব্যক্তিজীবন ছন্নছাড়া হলেও সমাজ-পরিবর্তনের সূত্রে তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ-চিন্তক, এর ফলে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা তাঁকে করে প্রচল-প্রতিষ্ঠিত আইডিয়াবিরোধী। যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মে, বিশেষভাবে প্রবন্ধ রচনায়, তিনি নির্ভয়চিত্তে দেশ-কাল-সমাজ ও সাহিত্যভাবনার বাস্তব প্রতিচ্ছবি চিত্রিত করেন *জাগ্রত বাংলাদেশ* (১৯৭১), *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (১৯৭২), *বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে* (১৯৭৫), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা*(১৯৭৭), *বাঙালি মুসলমানের মন*(১৯৮১), *শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ*(১৯৮৯), *নিকট ও দূরের প্রসঙ্গ*(১৯৯৫), *সংকটের নানান চেহারা*(১৯৯৬), *শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*(১৯৯৭), *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ*(১৯৯৮), *বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র* (২০০১), *উপলক্ষ্যের লেখা*(২০০১),*আমার কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*(২০০২)ইত্যাদি প্রবন্ধগ্রন্থে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা আহমদ ছফার প্রবন্ধে প্রকাশিত সাহিত্য-ভাবনার বহুবিচিত্র পরিসর থেকে কিছু চুম্বক অনুষঙ্গকে কেন্দ্রে রেখে তার তাৎপর্য পরীক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছি।

নান্দনিক বিবেচনায় 'আহমদ ছফা ছিলেন সৃজনশীল, মৌলিক সাহিত্যিক। তাঁর বড় একটি দিক হলো তিনি নিজের মতো করে সময়কে ধরতে পেরেছেন, নিজের মতো তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সার্বজনীন করতে চেয়েছেন এবং নিখুঁতভাবে সেগুলো তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।'[৫] 'বাংলার সাহিত্যাদর্শ' প্রবন্ধে ইংরেজি সাহিত্যের স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও তার অভ্যন্তরে সংগুপ্ত সামাজিক আদর্শকে অনুধাবন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতামত এই যে, ব্রিটিশ রাজত্বের স্পর্শে বাংলার প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর চাঞ্চল্যহীন স্থৈর্য ভেঙ্গে যায় এবং সেই শেকড়-মূল থেকেই উপ্ত হয় একটি নতুন শ্রেণি। যাদের রুচি ভিন্ন, রক্ত সামন্তকেন্দ্রিক নয়, বিজ্ঞানমনস্ক ও বিদেশীস্বার্থে প্রাণিত। এই শ্রেণির তাড়নায় প্রাথমিক বিদ্রোহের উত্তাপ জাগ্রত হয় বাঙালির সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, যার ফলে 'ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের' সূচনা ঘটে। যদিও তারা প্রাতীচী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে প্রাচীন বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করেছিলেন, তথাপি তাদের প্রচেষ্টা রক্ষণশীলতার বিপরীতে এক সত্য এবং প্রীতিময় জ্ঞানতৃষ্ণায়, সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের স্পর্শে আলোকিত হয়েছিল ও পরিশেষে সক্ষম হয়েছিল বাঙালির মানসিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে। প্রাবন্ধিক এই পরিবর্তনের সত্যাসত্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, 'স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইউরোপীয় রেনেসান্স তথা সৃষ্টিচঞ্চল চিত্তদোলার সমস্ত প্রভাময় রশ্মি নিজেদের চেতনার অঙ্গীভূত করেনি শুধু, সীমিত পরিসরে, ক্ষুদ্র হলেও চারিত্র্যের দিক দিয়ে একই রকম আরেকটি সৃজনঋতু প্রাণের ফসলে ভরিয়ে তুলেছে।'[৬]এই কথার প্রমাণস্বরূপ তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৯৭৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে, 'ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন' থেকে

বাংলা সাহিত্যের যে যাত্রা-সূচনা, তা রবীন্দ্র-প্রভাবের বলয় থেকে মুক্তিলাভের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে বের হতে গিয়ে নজরুল-প্রতিভার সহায়তা নিয়েছেন। যদিও নজরুল আবেগ-সম্পদের ওপর নির্ভর করে সাহিত্যচর্চা করেছেন, তথাপি বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর আবির্ভাবকে প্রাবন্ধিক দেখেছেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী সকলের নিকট পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। একজন সমালোচক এই প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে জানিয়েছেন :

> ইটালীয় রেনেসন্সের মতো বঙ্গদেশেও একই সময়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের মতো অনেকগুলো প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিলো। দান্তের তুলনায় মাইকেলের প্রতিভা এবং অর্জন কিছু কম নয়, বেশি ছাড়া। ইটালীয় রেনেসন্সের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিকের জন্ম হয়নি। বহুমুখী প্রতিভা এবং অর্জনের মাপে লিওনার্দোর তুলনায় রবীন্দ্রনাথ কিছুমাত্র কম নন। বস্তুত, বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নাট্যকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার একটাবিস্ফোরণ ঘটেছিলো উনিশ শতকে।[৭]

'সাহিত্যের সুসমাচার' প্রবন্ধে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিশেষ উপলব্ধি ও দূরদর্শী চিন্তা-ভাবনা। মাওলা ব্রাদার্সের উদ্যোগে তরুণ, মেধাবী, প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের পুরস্কার দেয়ার একটি প্রকল্পে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পান, যদিও প্রথমে তিনি এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। একপর্যায়ে কৌতুক করে বলেন,'একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে তুমি গোষ্ঠীসুদ্ধ লেখকদের আমার ঘরে নিয়ে এস। আমি চেহারা, সুরত, আদব-লেহাজ, জামা-কাপড় দেখে যাকে পছন্দ হয় তাকেই পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত করব।'[৮]তবে হঠাৎ একদিন সেই সমস্ত পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য যে নতুন প্রাণশক্তি, কল্পনামনীষা ও আত্মশক্তি নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে, তা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। আর নির্দ্বিধায় বলেন, বাংলা সাহিত্য একটি নতুন যুগে প্রবেশ করতে চলেছে, এমনকি কলকাতার লেখকদের চেয়েও ভাল লেখা প্রকাশিত হচ্ছে এবং এই উপলব্ধিকেই সাহিত্যের সুসমাচার হিসেবে উপর্যুক্ত প্রবন্ধে চিহ্নিত করেছেন প্রাবন্ধিক।

'বাংলা একাডেমীর বইমেলা এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা' প্রবন্ধে বাংলা একাডেমির পরিচালনা পর্ষদকে রাজনীতিমুক্ত দেখতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সেহেতু রাজনীতি-মুক্ত রাখা সম্ভব না হলে, সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ বিঘ্নিত হবে। যদিও ১৯৬৬ সালের বইমেলাকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধটি রচনা করেন, তবুও তাৎপর্য-সন্ধানে এই প্রবন্ধের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। কারণ যুক্তি ও বিবেকের দীপশিখার স্পর্শে তিনি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সাহিত্যচর্চার একটি রাজনীতি-নিরপেক্ষসুশোভন ক্ষেত্রভূমি, যেখানে প্রতিটি শিল্পী-সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার পরিস্রুত নির্যাসটুকুও হবে একইসঙ্গে শেকড়সন্ধানী ও ঊর্ধ্বশাখামুখী। কেবল বাংলা একাডেমি নয়, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চার তুলনামূলক বিশ্লেষণে, ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের উপর কতোটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে সে প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব গ্রহণে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত, সেহেতু ভারতবর্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চলমান রথ বাংলাদেশ থেকে বিচিত্র ও ভিন্নতর। বিশেষভাবে বিভাগ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে তা ভিন্নস্রোতে বহমান, তাছাড়া এসবের মধ্যে প্রবলভাবে উপস্থিত রয়েছে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচ্ছাপ, ব্যক্তি মানুষের জীবনদর্শন এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত আন্দোলন ও আত্মত্যাগের এক রক্তাক্ত ইতিহাস। এর ফলে বাংলা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা, অন্যদিকে পশ্চিমবাংলায় বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা এবং প্রেট্রোনাইজেশন না হওয়ায় সামাজিক-অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই চূড়ান্তভাবে কোণঠাসা। তবে পুস্তকশিল্পে কলকাতা যেহেতু বাংলাদেশ থেকেও অনেক এগিয়ে, সেহেতু কলকাতার বই বিক্রি বন্ধের পক্ষে ছিলেন তিনি। পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্প রক্ষায় ও সাহিত্য-শিল্পচর্চার চেতনা-দীপ্তিকে উজ্জীবিত করতে তিনি বেশকিছু প্রবন্ধ রচনা করেন, যেখানে বাংলাদেশের নিচেষ্ট, নিরুদ্যম অবস্থার প্রতিচিত্রণ যেমন বিস্মিত করেন এবং ঠিক তেমনই দেন সুচিন্তিত পরামর্শ। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাহিত্য ও শিল্পচর্চা নিয়ে বিষাদে, উদ্বেগে, আত্মমুখী যন্ত্রনায় উদ্বেলিত ছফা জীবনবাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধানসূত্র সন্ধানে আত্মমগ্ন হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে 'পশ্চিম বাংলার বই বাংলাদেশে কাদের স্বার্থে' নামক প্রবন্ধে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশের লেখকদের গ্রন্থ-প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন। সেখানে ভারতীয় লেখকদের প্রতি কেবলমাত্র বিরক্তি নয়, বাংলাদেশের প্রকাশনা ব্যবস্থা সম্পর্কেও কিছু সত্য তিনি উন্মোচন করেন। কারণ সমস্ত বইপত্রের দোকান ভারতীয় বই দিয়ে পরিপূর্ণ, এর ফলে বাংলাদেশের লেখকদের মূল্যবান বইগুলি বিক্রি হচ্ছে না। প্রাবন্ধিক বলছেন, 'ঢাকা শহরের কথা ছেড়ে দিন, সুদূর মফস্বলের কোন বইয়ের দোকানে যান দেখবেন, শীর্ষেন্দু, সুনীল, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার পশ্চিম-বঙ্গের এ সমস্ত জনপ্রিয় লেখকের বইয়ে দোকানের শেল্‌ফ ঠাসা। বাংলাদেশের দুই-একজন লেখকের বইও হয়ত আপনি দেখবেন।'[৯] অর্থাৎ বাংলাদেশের দুই-একজন লেখকের গ্রন্থ ব্যতিত আর কারও গ্রন্থ শহর থেকে গ্রাম অব্দি কোথাও সহজলভ্য নয়। অন্যত্র 'কলকাতার বই মেলা : একটি বিশ্লেষণ' প্রবন্ধে এই বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবন্ধের সূচনাতেই প্রাবন্ধিক নিজের অবস্থান পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি আশৈশব লেখক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে বেড়ে উঠেছেন, কারণ লেখকের লেখা পড়ে মানুষ হাসে-কাঁদে এবং অভিভূত হয়। এর ফলে লেখক-জীবনের সুবিপুল দুঃখ-কষ্ট কাঁধে করে বয়ে বেড়াতেও হতে পারে, তা জানতেন। তবুও পিছপা না হয়ে, শুধু লেখকচৈতন্যের লালিত স্বপ্ন বুকে ধারণ করেই বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন বাংলাদেশে একজন লেখকের পক্ষে কেবল পেশা হিসেবে লেখক হয়ে দিনযাপন করা সম্ভব নয়।

তিনি আমাদের জানান, কলকাতার বইমেলা নিয়ে বাংলাদেশেও বেশ শোরগোল চলে, মাঝেমধ্যে থিম-কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সম্মানিত হয় নিঃসন্দেহে, কিন্তু এতে আগামী বছর তো থিম-কান্ট্রি হিসেবে ভারতকে আমন্ত্রণ করতে হবে, যার ফলে বাংলাদেশের মুখরক্ষা হবে। তখন ভারতও তার বিপুল প্রকাশনাসম্ভার নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করবে, আর বাংলাদেশের প্রকাশকরাও বৃহৎ পুঁজির ভারতীয় প্রকাশনা-সংস্থার পার্টনার হয়ে যাবে। এতে আমাদের সাংস্কৃতিক-স্বাতন্ত্র্যে ভয়াবহ আঘাত আসবে। বাস্তবতা বিবেচনায় বলা যায়, তখন ভারতীয় পুস্তক ব্যবসায়ীরাই আমাদের প্রকাশনা-সংস্থাসমূকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকবে। তাছাড়া কলকাতার পাঠকদের নিকট যে বাংলাদেশের লেখকরা অপরিচিত তা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের আনন্দবাজারপন্থী লেখকেরা এই প্রথম কোলকাতার মাটিতে পা দিয়ে একটা শক্তরকম ধাক্কা খেল। দেখা গেল কোলকাতায় তারা সকলে অজ্ঞাত কুলশীল। সেখানকার লোকে তাদের চেনে না এবং পোছে না। নিজেদের হীনতা উপলব্ধি করে যদি তাঁরা চুপচাপ থাকতেন তাহলে ব্যাপারটা তাদের জন্য যথেষ্ট রকম শোভন হত। এখন সকলে সংবাদপত্রের কলামে কোলকাতাকে একচোট দেখে নিচ্ছেন। এই ক্ষোভ আস্ফালনের মধ্যে সারবস্তু বিশেষ নেই।'[১০] তবে কলকাতা বইমেলার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

আবার 'আলো জ্বালানোর কাজ' প্রবন্ধে তিনি লাইব্রেরি প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে গিয়ে বাংলা একাডেমির রাজনীতিমুক্ত পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার মতোই লাইব্রেরিগুলোকেও দলাদলি, কোন্দল ও জটিলতামুক্ত রাখতে চেয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের উক্তি নিম্নরূপ:

> অনেকসময় লাইব্রেরি, ক্লাব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে দলাদলি এবং কোন্দল সৃষ্টি হয়। তাতে লাইব্রেরির মূল উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে প্রদত্ত জ্ঞান মানবসমাজের মনে ঐক্য সৃষ্টি করে। আমি আশা করব মুহম্মদপুর গ্রামের তরুণেরা যে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে তা শুধু তাদের গ্রামকে আলোকিত করবে না, আশেপাশের গ্রামের রুচি এবং সংস্কৃতিচর্চার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করবে।[১১]

প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে, আলোকিত মানুষ হবার জন্য 'বিদ্যালয়', 'শিক্ষক' এবং 'লাইব্রেরি'– এই তিনটি বস্তু আবশ্যিক। তন্মধ্যে নিজের জীবনের উত্তরণপথে বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন তিন শিক্ষক ও গাছবাড়িয়া স্কুলের লাইব্রেরির কথা। স্কুলজীবনের সেই তিন শিক্ষক হলেন যথাক্রমে শ্রী গিরিজা প্রসাদ সেন, মৌলভী মুহম্মদ ইসহাক ও সারদা তালুকদার। অবশ্য 'গ্রন্থকীট কথাটা তাঁর বেলায় প্রযোজ্য নয়, তবে অক্লান্ত-পাঠক বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। একসাথে একাধিক বই তিনি পড়ে যেতেন। আর তাঁর স্মৃতিশক্তিও ছিল বিস্ময়কর।'[১২] আর এই স্মৃতিশক্তির দ্বারা তিনি ছাত্রজীবনে পাঠিত বহু গ্রন্থেরই প্রয়োজনীয় অংশ সম্পূর্ণভাবে মুখস্ত বলতে পারতেন। জীবনোপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ইত্যাদির নির্যাস ও সঞ্চয়ের মাধ্যম লাইব্রেরিকে এই কারণেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন ছফা। আমরা জানি, মানুষের মনন-মগজের অন্ধকার কোটরঘরে আলোকরেখা পৌঁছাতে গ্রন্থাগারের বিকল্প কিছু নেই।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত উপন্যাস *খোয়াবনামা* নিয়ে রচিত 'খোয়াবনামা উপন্যাস' প্রবন্ধে আহমদ ছফা প্রথমে আলোচনা করেছেন উপন্যাসের প্রেক্ষাপট, পরে দেশ-কাল-সমাজ বিবেচনায় লক্ষ করেছেন, ঔপন্যাসিক সুস্পষ্টভাবে বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিত্র ধারণ করেছেন। আমরা জানি, 'রাজনীতি ও ইতিহাস এই উপন্যাসে বড় ভূমিকা পালন করে। দু'শো বছর আগে গোরা সেপাই টেলরের বন্দুকের নলের গুলিতে নিহত মুন্সি বায়তুল্লাহ মৃত্যুর পর উঠে বসে কাৎলাহার বিলের ধারে প্রাচীন পাকুড় গাছটিতে। সেখানে বসেই দু'শো বছরের অতীত ও বর্তমান একাকার হয়ে অখণ্ড কাল হিসেবে অবস্থান করে।'[১৩] এর পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারেও পরিচয় দিয়েছেন দক্ষতার। ভাষা-নির্মাণের ক্ষেত্র পুরাণ-পুঁথির বিষয়-উপাদান-কৌশল ও বয়ানরীতির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। তবে তাঁর দৃষ্টিতে, উপন্যাসে উপস্থাপিতরাজনৈতিক বিষয়সমূহ, উপায়-উপাদান-উপকরণ ও তার বিস্তার-পদ্ধতির নির্মাণ-কৌশলে রয়েছে দুর্বলতা। ছফা রাজনৈতিক ডিসকোর্সে দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছেন, কারণ ইলিয়াস কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিকে স্থাপন করেছেন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের রাজনীতির বিপরীতে। অর্থাৎ এই স্থানে অবজেকটিভিটির পরিবর্তে তিনি স্থান দিয়েছেন ব্যক্তিগত মতামতকে। তবে, এই কথাও ছফা স্বীকার করেছেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রাজনৈতিক ডিসকোর্স নির্মাণের ভিন্নমতে নতুন কোনো মতামত তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এর ফলেই *খোয়াবনামা* উপন্যাসের মহাকাব্যিক সত্যতা স্মরণযোগ্য। এ ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা অবশ্যই একটি মহাকাব্য। এই রচনার ব্যাপ্তি এবং পরিধি সমস্ত বাঙালি জাতির মর্মমূলকে স্পর্শ করেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কী ধরনের মহাকাব্য পরাজয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে কি মহাকাব্য রচনা সম্ভব? সবিনয়ে বলব, অবশ্যই সম্ভব। ইলিয়াসের খোয়াবনামা একটি মহাকাব্য।[১৪]

জীবনানন্দ দাশের সুপরিচিত গ্রন্থ *কবিতার কথা* নামকরণ-প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন কবি এবং কবিতা প্রসঙ্গে নিজের কল্পনা-অনুভব ও তার বহুবর্ণিল চেতনা-প্রবাহের রূপান্তর-প্রক্রিয়ার চিত্রপট প্রকাশে। বিশেষভাবে কাব্যরচনার জন্য কবির করণীয় প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন :

> তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতরে চলে যাবেন– শহরে বন্দরে ঘুরবেন– জনতার স্রোতের ভিতরে ফিরবেন– নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনা-মনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন; আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে করে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর; সেই কোন আদিম জননীর কাছে যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমার নিস্তব্ধ কোনো অদিতির কাছে। তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে; হয়তো কোনো একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয় মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের খেতে বুননের জন্যে।[১৫]

প্রবন্ধের প্রথমে কবিতার ইস্পাত-দৃঢ় বুনন ও পরে শব্দ প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করলেও, সবশেষে জীবনানন্দের সাথেই হয়ে যান একমত। কারণ কবিতা-নির্মাণে কবির ব্যক্তিগত মনন-প্রক্রিয়ায় শব্দগুলোকে জারিত করা প্রয়োজন রয়েছে, আরও প্রয়োজন আছে বৈশ্বিক-ভাবনার সাথে তাকে একীভূত করার প্রচেষ্টা। প্রাবন্ধিক মনে করেন,'তেমনি বিশেষ সময়ে বাস করলেও, সর্বকালকে স্পর্শ না করতে পারলে জানুফাটা সময় থেকে ভাল কিছু বের হওয়া সম্ভব নয়। কবির একক ভাবনার সঙ্গে জাতি কিংবা বৈশ্বিক ভাবনার সংক্রমণ না ঘটলেও তার আলাদা পরিচয় ফুটে ওঠে না, ওঠা সম্ভব নয়।'[১৬] এখানে তাঁরা উভয়েই উপলব্ধি করেছেন, কবির চেতনা ভিন্নধর্মী। সেখানে মননক্রিয়ায়, জ্ঞান নির্দেশনায় যে বিস্ময়মিশ্রিত কল্পনার নির্যাস রয়েছে এবং তার সাথে বস্তুবিশ্বের ঘটনা, মানস ও প্রবৃত্তির সাথে সংযোগের প্রয়োজন রয়েছে। এভাবেই বস্তুবিশ্বে কল্পনার বিমূর্ত জগত নির্মাণ করা সম্ভব, যার মধ্য দিয়ে বিকশিত হবে প্রাণময় কবিতা-কাঠামো। আবার আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)-এর প্রয়াণের পর তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে আহমদ ছফা রচনা করেন 'বিশাল জীবন বিপুল মরণ' প্রবন্ধটি। প্রাবন্ধিক মনে করেন, মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠ-সহায়তায় দেহ-সমর্পণ করে আহমদ শরীফ মৃত্যুকে যেন জীবনের চেয়েও গৌরবময় করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ঘটনাটি সুচিহ্নিত করে *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ* পত্রিকা সম্পাদকীয় রচনা করে নিম্নরূপে :

> খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও গবেষক প্রফেসর আহমদ শরীফের জীবনাবসান ঘটেছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে তার হৃদস্পন্দন চিরদিনের মত থেমে যায়। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুক্তচিন্তার অগ্রপথিক হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সর্বমহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আমরাও তার অংশীদার।[১৭]

সমর্পণ-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলবেলায় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে, প্রাবন্ধিক সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আহমদ শরীফের জন্য শোকার্ত মানুষের ভিড় দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই শোকার্ত-মানুষের ভিড়টি হঠকারীও তো হতে পারে, এ-ক্ষেত্রে তিনি স্মরণ করেছেন কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহিদুল্লাহর প্রসঙ্গ, কারণ একটি বিশেষ শ্রেণি তাঁকে চাকুরি থেকে বের করে দিয়ে মৃত্যুবরণে বাধ্য করেছে এবং প্রয়োজনে তাঁর কবি-ইমেজটি অধিকার করে দলীয় কাজে করেছে ব্যবহার। কিন্তু আহমদ শরীফের দৃঢ় ও অনমনীয় অবস্থান থেকে অনুপ্রাণিত ছফা অনুভব করেছেন মৃত্যু তাঁকে কেড়ে নিতে পারেনি, তাই তো মৃত্যুর পরও তিনি যেন লাখো মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন, জ্বেলেছেন দীপশিখা। আহমদ ছফার বিশ্বাস,'বাচাল অর্বাচীন এবং অনুগ্রহপুষ্ট বাজারি লেখক-বুদ্ধিজীবীদের উৎপাতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলেও একজন সৎ মানুষ ও সৎ বুদ্ধিজীবীর অচঞ্চল সততা একটি নবযুগের দ্বারপ্রান্তে একটি জনগোষ্ঠীকে ধাবিত করতে পারে।'[১৮] সৎ বুদ্ধিজীবীর প্রতিকৃতি আহমদ শরীফ অন্যায়কে ঘৃণা করতে এবং চাপের কাছে নতি স্বীকার না করতে শিখিয়েছেন, আরও শিখিয়েছেন চিন্তার অস্ত্র নিয়ে সম্মুখ সমরে ছুটে যেতে অক্লান্তচিত্তে– যা তাঁর প্রাবন্ধিক চিত্তকেও করেছে শিল্পিত ও সুষম। আসলে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিরা হলেন একটি দেশের প্রাণবীজ, কিন্তু তাঁরা যখন স্বার্থপর হয়ে যান তার পরিণতি ম্লান করে ঐতিহ্যবোধের উজ্জীবন-রেখাকেও। এর সত্যাসত্য চিহ্নিত হয়েছে 'সাহিত্যের জাতীয়করণ' প্রবন্ধে, যেখানে তিনি সাহিত্যিকদের 'অবলা জীব' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কারণ একমাত্র তাঁদের পক্ষেই দেশের প্রকৃত বিজয় সম্ভব। এখানে প্রকৃতপক্ষে তিনি চিহ্নিত করেছেন সুবিধাভোগী, পদলেহনকারী শিল্পী-সাহিত্যিকদেরকে, যাদেরকে প্রতীকী-অর্থে বিশেষায়িত করেছেন 'অবলা জীব' রূপে। এই শ্রেণির সাহিত্যিকদের চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন :

> সাহিত্যিকেরা নিছক সাহিত্যিক। চোর-ডাকাত, রাজনীতিবিদ, সংসদসদস্য, মন্ত্রী পরিষদের কেউ নহেন। নেহায়েত ভদ্র ভাষায় বলতে গেলে 'অবলা জীব'। প্রচণ্ড একটা ঘটাইবার আশায় বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না। অবশ্য সাজানো স্টেজ এবং যাতায়াতের গাড়িভাড়া পাইলে তাঁহারা উহাতে আরোহণ করিয়া কাঁদিয়া কুঁদিয়া হাসিয়া আসর মাত করিয়া আসিতে পারেন।[১৯]

আবার 'সাহিত্যের জাতীয়করণ' প্রবন্ধে জনগণের অধিকার হরণের পাপে সাহিত্যিকদেরকেও তিনি পাপী বলতে চেয়েছেন। একজন সমালোচকের উক্তি এ-ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য, 'বাজারে এখন অগুনতি বুদ্ধিজীবী। খবরের কাগজে যে ছাইপাঁশ লেখে, ঘরে বসে খবর বানায়, সেও বুদ্ধিজীবী। আবার, যে-মানুষটি গভীর ভাবনা-চিন্তা করে একটা স্থির বিশ্বাসের অবস্থান থেকে কিছু লেখে-বলে, সেও বুদ্ধিজীবী।'[২০] অর্থাৎ কে বুদ্ধিজীবী আর কে বুদ্ধিজীবী নয়, তার সন্ধান পাওয়া বেশ কঠিন। এমত পরিস্থিতিতে তাঁর দৃষ্টিতে করণীয়সমূহ হলো, 'সরকারের ন্যায্য সমালোচনার মাধ্যমে কল্যাণবার্তা দান', 'পথনির্দেশ করা' ও 'সৎপথে জনমত গঠনে সচেষ্ট হওয়া'। কেবল বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপীও প্রাবন্ধিকের এই উক্তির সত্যতা মিলছে। সুতরাং ছফা চাইছেন সুবিধাভোগী শ্রেণির মুখোশ উন্মোচিত হোক এবং তাঁরা সত্য আদর্শের জন্য ত্যাগ করুক হীনস্বার্থ এবং সমাজের চেতনা জাগরণের লক্ষ্যে সকলে করুক নিষ্কাম-কর্ম।আর যৌবনময় ন্যায়বুদ্ধি ও সৎসাহসে মূল্যবান হোক প্রতিটি উদ্যোগ। কেউ যেন রাজনৈতিক কর্মীদের চাপে, দলবাজীর মোহে, জাতীয়করণের সুবিধাভোগী শ্রেণির একজন হয়ে হিতাহিত জ্ঞান না হারায় এবং নির্লজ্জভাবে ক্ষমতার তাঁবেদারি করা থেকে সরে আসে।

অতএব, এই সংকটপূর্ণ সময়ে অতিস্ফীত প্রযুক্তি-নির্ভরতার জটাজাল থেকে মুক্তি দিতে পারে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-সাহিত্য, সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির পাঠগ্রহণ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা। তাই তো বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রাবন্ধিকের বাক্যবন্ধনে ঘোষিত হয়েছে প্রকৃত জাতীয় ঐক্য নির্মাণের পাশাপাশি শ্রম-ত্যাগ-নিষ্ঠায় নিবেদিত হওয়া এবং নিঃস্বার্থ হবার প্রত্যয়। প্রকৃতপক্ষে আহমদ ছফার রচনায় রয়েছে সময়-সমকাল-স্বদেশ চেতনার প্রান্ত-স্পর্শের ক্ষুধা, যার ফলে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের নানা দিকের বিচিত্রমুখী অনুধাবন-প্রচেষ্টা ও প্রত্যয়। তিনি বাংলা সাহিত্য, বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, সাহিত্যের জাতীয়করণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেছেন। যার মাধ্যমে তাঁর সাহসী উচ্চারণ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নির্লোভ-নিরাসক্ত জীবনধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। সার্বিকভাবে, তাঁর সাহিত্যবিষয়ক ভাবনার রূপান্তর প্রক্রিয়ার হাত ধরে আগামী প্রজন্ম সহজেই রূপাঙ্কিত করতে সক্ষম হবে সাহিত্য-সংস্কৃতির সময় প্রবাহের বহুবর্ণ-বিবর্তনকে। আশা করা যায়, আহমদ ছফার প্রবন্ধ ইতিহাস-সময়ের হাত ধরে উত্তরপ্রজন্মের নিকট উদ্ভাসিত হবে একনব্যনন্দন সৃজনীক্ষমতার বীজমন্ত্ররূপে।

তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ ছফা, *আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার সমগ্র* (নূরুল আনোয়ার সম্পা.), (ঢাকা : খান ব্রাদার্স, ২০১৫), পৃ.১২১

২ আহমদ ছফা,'সেইসব লেখা', *রচনাবলি-৭* (নূরুল আনোয়ার সম্পা.), (ঢাকা : খান ব্রাদার্স, ২০১৯), পৃ. ৪৪৭

৩ মুহম্মদ জাফর ইকবাল,'আহমদ ছফা এবং বাংলা একাডেমী পুরস্কার', *আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ* (মোরশেদ শফিউল হাসান ও মোহরাব হাসান সম্পা.), (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ.১২১

৪. অসীম সাহা,'ছফা ভাই-অভিমানী বিদায়', *আহমদ ছফা স্মারক* গ্রন্থ , পূর্বোক্ত, পৃ.৮৭

৫ কবীর আলমগীর, *আহমদ ছফার উপন্যাসে জীবন ও সমাজ* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স ২০১৮), পৃ. ২১

৬ আহমদ ছফা,'বাংলার সাহিত্যাদর্শ', *প্রবন্ধ সমগ্র-১* (ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ.১৩৫

৭ গোলাম মুরশিদ, রেনেসন্স : বাংলার রেনেসন্স (ঢাকা : অবসর ২০১৫), পৃ. ১৬৫

৮. আহমদ ছফা, 'সাহিত্যের সুসমাচার', *প্রবন্ধ সমগ্র-১*, পূর্বোক্ত, পৃ.২২৪

৯ আহমদ ছফা, 'পশ্চিমবংলার বই বাংলাদেশে কাদের স্বার্থে', *প্রবন্ধ সমগ্র-২*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩১-২৩২

১০. আহমদ ছফা, 'কোলকাতার বইমেলা : একটি বিশ্লেষণ', *আহমদ ছফা রচনাবলি-৩*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮

১১. আহমদ ছফা, 'আলো জ্বালানোর কাজ', *প্রবন্ধ সমগ্র-২*(ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ২৬৯

১২ মোরশেদ শফিউল হাসান, *ছফা ভাই : আমার দেখা আমার চেনা* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ২৮

১৩ অরুণকুমারমুখোপাধ্যায়, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৪)', *সাহিত্য : এপার বাংলা ওপার বাংলা* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯) পৃ. ২৯৫

১৪. আহমদ ছফা,*আহমদ ছফা রচনাবলি-৪* (নূরুল আনোয়ার সম্পা.) (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৮) পৃ. ১৯৭

১৫. জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা', *কবিতার কথা* (কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ২০১৬) পৃ. ১৭-১৮

১৬ আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা রচনাবলি-৩*(নূরুল আনোয়ার সম্পা.) (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৮) পৃ. ২৪৫

১৭. মাসুদ রহমান, *আহমদ শরীফ : জীবন ও কর্ম* (ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২০১৭) পৃ. ১০১

১৮. আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা রচনাবলি-৪* (নূরুল আনোয়ার সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

১৯ আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা রচনাবলি-৭* (নূরুল আনোয়ার সম্পা.) (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৯) পৃ. ২৪৫

২০. অত্রি মুখোপাধ্যায়, 'সমাজ ও বুদ্ধিজীবী', *অনুষ্টুপ : বুদ্ধিজীবী সংখ্যা* [ত্রৈমাসিক] (অনিল আচার্য সম্পা.) (অনুষ্টুপ : কলকাতা, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সং., ২০১৩) পৃ. ৮৮-৮৯

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধ

এস.এম. সাইদুল আম্বিয়া*

Abstract: Hasan Azizul Haque is a famous short story writer of Bengali literature. He rose to fame in the sixties by writing his first story. His stories depict many experiences of famine, riots, Partition, Pakistani rule, Bengali's own rights movement, Liberation war, four decades of post liberation reality. However, one of the main backgrounds of his story is the liberation war of Bangladesh and the post liberation decline and despair. In this article, the overall form of the short story based on the liberation war experience of the storyteller has been analyzed, where the massacre of the Pakistani army during the war and various tragic incidents at the end of the war have been vividly marrate. The absence of the spirit of the liberation war in the post war independent country is also one of the main themes of his story.

১.

বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বে এবং প্রতিভার বিকিরণে সুদীপ্র আবির্ভাব ঘটে কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের (জ. ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯)। সাধারণত সৃজনশীলতার নিরন্তর সাধনার পথ-পরিক্রমায় একজন লেখক তার নিজস্ব নির্মাণশৈলী তৈরি করেন, হাসান আজিজুল হকের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, তাঁর প্রথম গল্পেই স্বতন্ত্র কথাবস্তু ও অভিনব নির্মাণকৌশল সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে তিনি ভারতবিভাগ পূর্বকালীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি কিংবা বিভাগোত্তর দেশবিভাগজনিত নিঃসহায় মানুষের মর্মযাতনা ও পাকিস্তানশাসিত বাংলাদেশে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, উনিশ শ' একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের নানামাত্রিক অবক্ষয় হাসান আজিজুল হকের গল্পে শিল্পের তুলিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে শচীন দাশ লিখেছেন :

> আসলে হাসান আজিজুল হকের গল্পে আছে তিনটি পর্ব। এই পর্বগুলোকে বলা যায় প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ যখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামের বাসিন্দা। দ্বিতীয় পর্বটি তাঁর মুক্তিযুদ্ধ পর্ব, যে সময়ে হাসান চলে গেছেন ও বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে এবং যেখান থেকে শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পর্ব। আর শেষ পর্বটি তাঁর বর্তমান পর্ব বা উত্তরকাল পর্ব – যে পর্বে এখন তিনি নতুন করে আবার তাঁর আখ্যানশৈলীর ঘুঁটি সাজাচ্ছেন।[১]

বস্তুত,পাকিস্তানরাষ্ট্রে বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রসৃষ্টির প্রাথমিক পর্ব হতেই হাসান আজিজুল হক সজাগ সচেতন প্রত্যক্ষদর্শী কথাশিল্পী কেননা উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে ষোল বছর বয়সে জন্মভূমি থেকে তিনি দেশান্তরী হয়েছেন।[২] পরবর্তীতে দেখা যায়, উনিশ শ' ষাট সালেই তাঁর সুবিখ্যাত গল্প 'শকুন' প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যজীবনে প্রোজ্জ্বল আবির্ভাব। বাংলাদেশরাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের অবক্ষয় ও বন্ধ্যাজীবনের সামগ্রিক চিত্র লেখকের কলমে উঠে আসে তীক্ষ্ণভাবে। 'আসলে আমাদের তিনি একটি দেশের জন্মকথা যেমন শুনিয়েছেন, তেমনিভাবে আবার এনেছেন বন্ধ্যাত্বের কথাও।'[৩] তবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নয়মাসব্যাপী সম্মুখ ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে হাসান আজিজুল হক রচনা করেছেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প যা প্রধানত গ্রথিত হয়ে আছে *নামহীন গোত্রহীন* (১৯৭৫), *আমরা অপেক্ষা করছি* (১৯৮৯), *রোদে যাবো* (১৯৯৫), *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* (২০০৭) নামক গল্পসঙ্কলনে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধপূর্বকালীন উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ গল্প রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, 'মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে তাঁর মত এত অজস্র গল্প আর কেউ লেখেননি। সংখ্যার আধিক্যে ও গহন মাত্রা সৃষ্টিতে তাঁর গল্পই সমধিক জীবনলগ্ন।'[৪] রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বৃহৎ ক্যানভাসে হাসান আজিজুল হক যুদ্ধজীবন ও যুদ্ধপরবর্তী প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিক ছোটগল্প রচনা করেছেন, যা শুধু

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয়ের পরিবর্তনে ভিন্নরূপ ধারণ করেনি, ভাষা ও আঙ্গিকের নিপুণ চিত্রণে সৃষ্টি করেছে ভিন্নমাত্রিক শিল্পশৈলী।তাঁর যুদ্ধভিত্তিক এ গল্পগুলো শুধু সাহিত্যিক মানসের কল্পনার ফসল নয়, এগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযদ্ধের সামাজিক ইতিহাসেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ প্রসঙ্গে গল্পকার তাঁর এক রচনায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে লিখেছেন:

> তৈরি করে গল্প আমি কোনদিনই লিখতে পারি না। আপন ভাবনা চিন্তা উদ্বেগ আশা মিলিয়ে কিছু বক্তব্য থাকলে যেমন কেউ প্রবন্ধ লেখে, আমিও প্রায় একই উদ্দেশ্যে গল্প লিখি। স্বাধীনতার পরে পরে আমার যা মনে হচ্ছিল,আমার যে অভিজ্ঞতা জমেছিল আর যে অভিজ্ঞতা হচ্ছিল আমি তাই মানুষজনসহ মানুষের সংসারের ছবি এঁকে সবাইকে জানাতে চেয়েছিলাম।[৫]

হাসান আজিজুল হকের বিভিন্ন ছোটগল্পগ্রন্থে সংকলিত মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলো বিষয়বৈচিত্র্যানুযায়ী বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায়। উল্লেখ বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটি বিভক্ত হয়েছে নয়মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সংঘটিত প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীনতা-উত্তর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে – কখনো কখনো এ ধরনের গল্পও রচিত হয়েছে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বীজ ও বৃক্ষের সামগ্রিক পরিসর অঙ্কিত হয়েছে অনন্য শৈল্পিক সাফল্যে।

ক. বাংলাদেশে পাকসৈন্যদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও নৃশংসতার প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প–ভূষণের একদিন, কৃষ্ণপক্ষের দিন, নামহীন গোত্রহীন, ঝড়

খ. মুক্তিযুদ্ধের তাত্ত্বিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গল্প–আমরা অপেক্ষা করছি

গ. মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে মিত্রবাহিনীর বিমানবোমা নিক্ষেপের পটভূমিতে রচিত গল্প–আটক, নবজাতক, মাটির তলার মাটি

ঘ. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী হতাশা ও গ্লানির পটভূমিতে রচিত গল্প – ফেরা, ঘরগেরস্থি, কেউ আসেনি

ঙ. দেশবিভাগ থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সামগ্রিক পরিসরে রচিত গল্প–বিধবাদের কথা

উপর্যুক্ত শ্রেণিকরণে হাসান আজিজুল হকের মুক্তিযুদ্ধের মৌলগল্পগুলো বিবেচিত হয়েছে এবং তারই আলোকে গল্প বিশ্লেষিত হবে।

২.

বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ,বর্বরতা ও নৃশংসতার পটভূমিতে হাসান আজিজুল হকের বিভিন্ন গল্প রচিত হয়েছে। *নামহীন গোত্রহীন* গল্পগ্রন্থের 'ভূষণের একদিন', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', 'নামহীন গোত্রহীন' এবং *রোদে যাবো* গল্পগ্রন্থের 'ঝড়' এ প্রেক্ষাপটে উল্লেযোগ্য গল্প। 'ভূষণের একদিন' ছোটগল্প মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি। গল্পে বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা অঞ্চলের প্রত্যন্ত জনপদে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর পৈশাচিক কায়দায় নির্বিচার গণহত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধযুদ্ধের ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুত,এ গল্পের প্রেক্ষাপট লেখকের বাস্তবজীবনাহৃত; এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> দারুণ অভিজ্ঞতার কয়েকটি গল্প লিখেছিলাম এই সময়। কিছুই হয়নি। একজন চাষী ভূষণ হাটে গিয়েছিল ছেলের খোঁজে। পাজি অলস ছেলেটিকে সে পেটাতে পেটাতে বাড়ি নিয়ে আসবে। তার দেখা যখন সে পেল তখন বন্দুক চালু হয়ে গেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে মানুষের প্রাণ। রাগে অন্ধ ভূষণ যখন এগিয়ে যাচ্ছে ছেলের দিকে, ছেলেও এগিয়ে আসছে বাপের দিকে, কিন্তু কেউ কারও কাছে পৌঁছুতে পারে না, ছেলের প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ে বাপের পায়ের কাছে। বাপকেও সইতে হয় না মরণাধিক যন্ত্রণা। আর একটি বুলেট এসে চুরমার করে দেয় তার হৃৎপিণ্ড। ন'মাসের এ'রকম ঘটনা কত ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই।[৬]

পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী দক্ষিণাঞ্চলের নিস্তরঙ্গ গ্রামে-গঞ্জে যেভাবে নির্মম পাশবিক তাণ্ডব চালিয়েছিল, তাতে একজন নিরীহ আজন্ম চাষি ভূষণ, গঞ্জের হাটের সাধারণ মানুষ, শিশুসন্তানসহ জননী কেউই রক্ষা পায়নি পাকসৈন্যদের অতর্কিত-হঠাৎ আক্রমণে, হত্যার শিকার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ যারা,তারা ছিল সম্পূর্ণ নিরপরাধ; তবুও তারা সৈন্যদের

আক্রোশ ও জিঘাংসা থেকে রক্ষা পায়নি। এই আক্রোশ ও আক্রমণের তীব্রতা যেন অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর। জাত চাষি ভূষণ ও তার পুত্র হরিদাস যার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। পাকিস্তানি অপ্রতিরোধ্য সৈন্যদের বাঙালিবধের তীব্রতা তুলে ধরেছেন গল্পকার :

> রোদ তখনো ঝিকমিক করছে বড়ো বড়ো গাছগুলোর মাথায়। আবার একটানা শব্দ উঠল কট কট কট কট। তখন ভূষণ দেখল গোড়া কেটে ফেললে গাছ যেমন তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ে, মানুষ তেমনি করে মাটিতে পড়ছে। এরপরেই সে রক্ত দেখতে পায়। কোনো মানুষের মাথা থেকে, কারো পা থেকে, কারো কাঁধ, বুক বা পেট থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। রক্ত ছোটার কলকল ঝরঝর শব্দটাই যা ভূষণ শুনতে পায় না কিন্তু দলে দলে মানুষ মাটিতে শুয়ে পড়ছে এটা সে দেখতে পায়।[৭]

চরিত্রপ্রধান এই গল্পে বাঙালিদের গণহত্যার বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এপ্রিল মাসের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধযুদ্ধের ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। এই মুক্তিযোদ্ধাগণ তখনও বিদ্যালয়গামী কিশোর, তাঁরা তখনও স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মতো উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠেনি, তবুও তারা গ্রামের সাধারণ মানুষজনসহ চাষি-কৃষকদের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানায় :

> তোমরা ভয় পেলে কোনা কাজই হবে না। তোমাদেরই তো অস্ত্র ধরতে হবে। তোমরাই তো ছ'কোটি মানুষ আছ এ দেশে – এই তোমরা যারা চাষি – জমিজমা চাষবাস করো। আমাদের দেশটা শুষে খেয়ে ফেললে শালারা। ভালো ভালো অস্ত্র দিয়ে ঢাকায় খুলনায় সব জায়গায় আমাদের মেরে মেরে শেষ করে দিলে। অস্ত্র না চালালে এখানেও আসবে ব্যাটারা। লুকিয়ে বাঁচবে ভেবেছ?[৮]

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই গল্প যুদ্ধ প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও আলঙ্কারিক উপাদানেও ঋদ্ধ এবং পরিবেশ-প্রকৃতি ও উপভাষার যথাযথ ব্যবহারে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

'কৃষ্ণপক্ষের দিন' নামক দীর্ঘ গল্পে মুক্তিযুদ্ধের একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে প্রত্যন্ত পল্লী কিংবা বিল-অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী অন্বেষণ তৎপরতাকল্পে গ্রামগঞ্জে অগ্নিসংযোগ করে গণহত্যা চালিয়েছিল তার এক গতিময় বিবরণ গল্পপ্লটে উঠে এসেছে। 'ভূষণের একদিন' গল্পে যেখানে প্রতিরোধযুদ্ধের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পে সেখানে প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাগণ। 'ভূষণের একদিন' গল্পে সময় ছিল এপ্রিল মাস, এ গল্পের সময় দেখা যায় বর্ষাকাল অর্থাৎ সময়ের বিবর্তনে প্রতিরোধযুদ্ধও হয়েছে অনিবার্য ; তাই পাকবাহিনীকে প্রতিরোধকল্পে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পর্যায়ের স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং দিনমজুরগণের সমন্বয়ে যে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল তারই প্রতিচিত্র যেন এই গল্পের জামিল, রহমান, মতিয়ুর, শহিদ এবং একরামদলের মুক্তিবাহিনী। মুক্তিকামী স্বদেশে গণহত্যা প্রতিরোধকল্পেই যেন এদের আবির্ভাব। স্কুল,কলেজ,ইউনিভার্সিটির গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাজীবন পরিত্যাগ করে স্বদেশের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এই মুক্তিযোদ্ধাগণের কঠোর আত্মত্যাগ, নিপুণ যুদ্ধজীবন পরিচালনা ও আত্মরক্ষা,নেতৃত্বের প্রতি সুগভীর আনুগত্য,তাদের মান-অভিমান, সংক্ষোভ,বেদনা-বিহ্বলতা সর্বোপরি যুদ্ধজীবনে খাদ্য-আহার, বসবাস-বাসস্থান,স্বপ্ন ও সম্ভাবনার সকল দিগন্তই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট মুক্তিবাহিনীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা,সুখস্বপ্ন বিনষ্ট হয় পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে হত্যা ও ধৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে। গল্পের অন্তিমে বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

> একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত দূর থেকে প্রথমে গুলি করল রহমানকে। রহমান কোনো শব্দ করল না, কঠিন চোখে সৈন্যটির দিকে চেয়ে সে গড়িয়ে পড়ল। খুব তাড়াতাড়ি স্থির হয়ে গেল তার শরীর। শহীদের মৃত্যুটাও হলো নিঃশব্দে। ভীষণ দাপাদাপি করল মতিয়ুর। গুলির কান ফাটানো আওয়াজটা মিলিয়ে যেতেই ভয়ানক চিৎকার করে উঠল মতিয়ুর। এই একটি মাত্র চিৎকারে জীবনের প্রতি গভীর নেশায়-মাতা ভালোবাসা, অতি রহস্যপূর্ণ মমতা ও মরিয়া,হতাশা বুকভাঙা আকর্ষণকে সে মূর্ত করে তুলল। আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টায় ব্যাকুল আর ফস্কে যাওয়ার ব্যর্থতায় করুণ সেই চিৎকার। মতিয়ুরের বিরাট শরীরটা দাপাদাপি করে গড়িয়ে যেতে থাকল নদীর কিনারা বেয়ে। নদীর জলে তার ভারী দেহটা পড়ে যাবার শব্দ শুনেই জামিল আর দেরি করল না। দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে রাইফেল তুলেছিল সে সৈন্যটি – তার তলপেটে প্রচণ্ড একটা লাথি কষিয়ে তীব্রগতিতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।[৯]

পাকিস্তানি হিংস্র বাহিনী ও বাঙালি স্বাধীনতাকামী প্রতিরোধযোদ্ধাদের পাশাপাশি এদেশীয় পাকবাহিনীর দোসর যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে রাজাকার বাহিনীতে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের গুপ্তচরবৃত্তির নানামাত্রিক ভূমিকা গল্পে স্বল্পপরিসরে ফুটে উঠেছে। গল্পে স্বাধীনতাবিরোধী কোন চরিত্রের নামোল্লেখ হয়নি কিন্তু তাদের কর্মতৎপরতা ও দৈহিক অবয়বের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে খণ্ড খণ্ড চিত্রে।

'নামহীন গোত্রহীন' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন জনৈক নামপরিচয়হীন ব্যক্তির গৃহ-প্রত্যাবর্তনের সূত্র ধরে পাকিস্তানি হিংস্র সৈন্যদের মুক্তিকামী বাংলাদেশে বাঙালি জাতির ওপর উন্মত্ত বর্বরতা ও দানবীয় হত্যাযজ্ঞের নিপুণ শিল্পভাষ্য অঙ্কিত হয়েছে। গল্পে একদিকে পাকসৈন্যদের মুক্তিবাহিনী- অন্বেষণ তৎপরতা অন্যদিকে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশে নেকড়ে হায়েনাদের নরমেধযজ্ঞের বীভৎস চিত্র রূপায়িত হয়েছে ভাষাভঙ্গির অনন্য দৃষ্টান্তে। এ গল্পে স্বাধীনতাকামীজাতির স্বদেশের যুদ্ধাবহ পরিবেশ অজ্ঞাতনামা গল্পনায়কের দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে। নায়কের দেখা বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর ওপর কতটা পাশবিক বর্বরতা চালানো হয়েছিল পাকবাহিনী কর্তৃক গল্পকার তা তুলে ধরেছেন ভিন্নশৈলীর গদ্যে। উঠে এসেছে গল্পনায়কের প্রিয় সুহৃদ,স্ত্রী,ও পুত্র সন্তান হারানোর মর্মন্তুদ বিবরণ। প্রিয়তমা স্ত্রী মমতা ও স্নেহের পুত্র শোভনকে খুঁজে পেতে হয় যাকে মাটি খুঁড়ে। গল্পকার বর্ণনা দিয়েছেন অতুলভঙ্গিতে :

> সে প্রচণ্ড তেজে কোদাল চালাচ্ছে। কখনো কোদাল রেখে জন্তুর মতো নখ দিয়ে আঁচড়ে যাচ্ছে মাটি। দরদর করে ঘাম ছুটছে তার সমস্ত দেহ থেকে – ঠোঁট চেটে নোনা স্বাদ নিচ্ছে সে। খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোট হাত পেয়ে গেল, সেটাকে তুলে আপন মনেই লোকটা বলল, শোভন শাবাশ। তারপর উঠে এল দীর্ঘ চুলের রাশ, কোমল কণ্ঠাস্থি, ছোট ছোট পাঁজরের হাড়, প্রশস্ত নিতম্বের হাড় – তারপর একটি করোটি, ... ফাঁকা মুখগহ্বরের ভিতরে নিঃশব্দে বিকট হাসি হাসল করোটি। মমতা – লোকটা বলল। বলে সেটা পাশে নামিয়ে রেখে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। পৃথিবীর ভিতরটা নাড়িভুঁড়িসুদ্ধ সে বাইরে বের করে আনবে।[১০]

ছোটগল্পের শৈল্পিকসাফল্যের প্রত্যেকটি উপাদানই 'নামহীন গোত্রহীন' গল্পে সার্থকভাবে উপস্থিত হয়েছে। গতিশীল কাহিনী,চরিত্র সংস্থাপন, ঘটনা পরম্পরায় ভাষার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসে গল্পের শিল্পমাত্রা যথার্থভাবে রক্ষিত হয়েছে। এ গল্পের ভাষাস্বাতন্ত্র্যের ভিন্নতা সহজেই দৃশ্যমান। গল্পের ভাষায় প্রায়শই লক্ষ করা যায় নিরলংকার বাক্যগঠন এবং চিত্রধর্মী প্রকরণ যা মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকার খণ্ড খণ্ড রূপ।

'ঝড়' গল্পে প্রকৃতিশাসিত ঝড় এবং পাকিস্তানি শাসকসৃষ্ট নরহত্যা ও নারীধর্ষণকর্মে সাধারণ মানুষের জীবনে ভয়ানক বিপর্যয় সূচিত হতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে,প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমান্তরালে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্বিচার গণহত্যা ও ধর্ষণের ভিন্ন এক দ্যোতনা সঞ্চারিত করেছেন লেখক যা রূপক ও সংকেত আকারে ব্যক্ত হয়ে আছে। গল্পে লেখক উত্তম পুরুষে বর্ণনা করেছেন মূলত দুটো চিত্র – পাকিস্তানি সৈন্যদের বাংলাদেশের গ্রাম ও নগর জীবন অগ্নিদগ্ধ করে লোকালয় বিপন্ন করা, অন্যদিকে সাধারণ নরনারী হত্যা করে পূর্ব বাংলা জনশূন্য করা। গল্পে পাকিস্তানি সৈন্যদের নারী ধর্ষণের ভিন্ন এক লোমহর্ষক চিত্র উপস্থাপন করেছেন লেখক : 'মেয়েটির কোনো যোনি নেই। যোনির জায়গায় বিরাট একটি গহ্বর। সেই জায়গাটিতে রোদ যেতে পারেনি। কালো,ঘন কালো বিরাট গর্ত। অনেক গোলাপ বা অনেক পাথর চাপা দিয়েও গহ্বরটি বোজানো যাবে বলে আমার মনে হয় না।'[১১] পাকিস্তানি সৈন্যদের নারী ধর্ষণ ও হত্যার পাশবিকতা সম্পর্কে লেখক এই গল্পে লোমহর্ষক বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যা যুদ্ধের সময় নারী নির্যাতনেরই প্রকৃত পরিস্থিতির পাশবিক উদাহরণ হিসেবে বিদ্যমান ছিল।

৩.

হাসান আজিজুল হকের 'আমরা অপেক্ষা করছি' তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জীবনদর্শনমূলক ছোটগল্প। গল্পের কথক চরিত্র তারেক স্বয়ং গল্পকার। এ গল্পে বিষয়- বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আঙ্গিকের অভিনব উপস্থাপনরীতির মিশেল লক্ষণীয়। বিষয়গত অবস্থান থেকে দু'টো বিষয় গল্পের উপজীব্য হয়েছে। প্রথমত – মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে বামধারার সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির চড়াই- উৎরাই ও ভাঙনের নামাত্রিক কর্মপন্থার তর্ক-বিতর্কে উপনীত হওয়া। দ্বিতীয়ত – মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কথক তারেক ও তার বন্ধু রুনু ও বুর্জোয়া বিপ্লবী মুকুলের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। এই উভয় ঘটনাই গল্পপ্লটের ভিন্ন দুটি প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেছে। প্রথমত যে ঘটনা ঘটেছে, সেটি সংঘটিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে লেখকের গল্প রচনার সমকালে। অন্যদিকে, দ্বিতীয়ত যে ঘটনা ঘটেছিল সেটি সংঘটিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের

সময়ে, গল্পরচনার আট বছর পূর্বে অর্থাৎ বর্তমান ও অতীত (ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে) ও পুনরায় বর্তমানে ফিরে আসার অনন্য সাধারণ এক নতুন আঙ্গিক উপস্থাপন করেছেন গল্পকার এ গল্পে।

গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাম ও ডান ধারার কিংবা বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক ধারার রাজনৈতিককর্মীদের মতাদর্শগত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত ভিনদেশী পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে উভয় প্লাটফর্মের মুক্তিকামী মানুষ একই ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। স্বদেশ স্বাধীন করেছে। বস্তুত,এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থান যেন কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত পূর্ব বাংলার সকল মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে গণ- মানুষের সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। গল্পে দেখা যায়, বুর্জোয়া রাজনীতিতে বিশ্বাসী জনৈক মুকুলের স্ত্রীকে সীমান্ত অতিক্রম করার উদ্যোগ গ্রহণ করে বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী তারেক ও রুনু। পাকিস্তানি সৈনিকদের পোড়োমাটিনীতিতে আতঙ্কিত হয়ে সাধারণ মানুষের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। সুহৃদ মুক্তিযোদ্ধাদ্বয় তারেক ও রুনু জীবনপণ করে সংশপ্তক মনোভাব নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকারদের হত্যা করে।

'আমরা অপেক্ষা করছি' গল্পে ঘৃণ্য পাকিস্তানিসৈন্য ও পূর্ব বাংলার রাজাকাদের মুক্তিযোদ্ধা- অন্বেষণ ও হত্যার অপ-তৎপরতা লক্ষ করা যায়। নদীমাতৃক পূর্ব বাংলায় গভীর রাত্রিতে লঞ্চযোগে পাকসৈন্যদের গমনাগমনের গোপন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। গভীর রাত্রিতে রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সৈনিকগণ মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লবী রাজনৈতিককর্মী মুকুলের স্ত্রীর অনুজকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনকারী রাজাকারদের নানা ধরনের অপরাধ সংঘটনের দৃষ্টান্ত লেখক সরাসরি বর্ণনা দিয়েছেন :

> রাজাকারবাহিনী তৈরি হচ্ছে। তারা শহরের গলিঘুঁচিতে,গাঁয়ের আনাচে কানাচে ঢুকে পড়েছে। যে কোনো মেয়ে তারা ভোগ করে, যে কোনা খাবার তারা নিয়ে যায়, যে কোনা মানুষ তারা মেরে ফেলে, যে কোনা জিনিশ তারা ছিনিয়ে নেয়। পাকিস্তানিরা তাদের তৈরি করেছে। আমাদের ভিতর থেকে।[১২]

এ- গল্পে মুক্তিযুদ্ধের ত্রিমাত্রিক চিত্র বিভিন্নভাবে খণ্ড খণ্ড রূপে অবস্থান করেছে। পাকসৈনিকদের সুগভীর অপ-তৎপরতা, এদেশীয় পাকিস্তানি দোসরদের মুক্তিযোদ্ধানিধনে অকৃত্রিম সহযোগিতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণপণে প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পরিপূর্ণ চিত্র গল্পে শিল্পমর্যাদা লাভ করেছে।

৪.

মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে মিত্রবাহিনীর বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপের পটভূমিতে রচিত লেখকের গল্পগুলো হল – 'আটক', 'নবজাতক', 'মাটির তলার মাটি' যা পর্যায়ক্রমে *নামহীন গোত্রহীন*, *রোদে যাবো* এবং *আমরা অপেক্ষা করছি* গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভূত হয়েছে। হাসান আজিজুল হক এর 'আটক' গল্পে মুক্তিযুদ্ধ শেষের দিকে মিত্র বাহিনীর বিমানবোমা নিক্ষেপের ফলে যে শুধু পাকসেনাবাহিনী মৃত্যুবরণ করেছে তাই নয়, এতে বাঙালি নিরীহ সন্তানও যে দেয়ালচাপা পড়ে আটক হয়ে নিঃসহায় আত্মদান করেছে, এ বিষয়টিই গল্পকার তুলে ধরেছেন করুণ আলেখ্যে। নিরীহ বাঙালি সন্তানের মৃত্যু যেন গল্পকারের আত্মজিজ্ঞাসা। মূলত গল্পে উঠে এসেছে প্রধানভাবে একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে যৌথবাহিনীর বিমানবোমা আক্রমণে পাকসেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের নানামাত্রিক চিত্র। কখনো সৈন্যবাহিনীর পলায়নচিত্র কখনো বা মিত্রবাহিনীর বিমান আক্রমণে সেনাদের নিরুপায় মৃত্যুদৃশ্য গল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয়। 'নবজাতক' গল্পেও মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে মিত্র-বাহিনীর বিমানবোমা নিক্ষেপে পাকিস্তানি সৈন্যদের কাপুরোষোচিত পরাজিত মনোভাবচিত্র উঠে এসেছে উত্তম পুরুষের বর্ণনাভঙ্গিতে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভয়ানক আবহ যেমন গল্পে ফুটে ওঠে, তেমনি যুদ্ধকালীন নির্মম জীবনবাস্তবতার নিষ্করুণ সাক্ষ্যও গল্পের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। 'আটক' গল্পেও 'নবজাতক' গল্পের অনুরূপ পাকসেনাবাহিনীর শঙ্কিত স্বদেশগামী তৎপরতা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে সাধারণ মানুষের 'দেয়ালচাপা' পড়ে আটক হয়ে মৃত্যু যেন মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দরিদ্র্য-নিরীহ মানুষের আসন্ন দুর্বিষহ-গ্লানিময় জীবনেরই ক্ষীণ ইঙ্গিত বহন করে। অন্যদিকে,'নবজাতক' গল্পে নবজাতক এসেছে স্বাধীন ও মুক্ত স্বদেশের প্রতীক হয়ে। নবজাতকের মাতার প্রসববেদনা ও যন্ত্রণার তীব্রতা ন'মাসের মুক্তিযোদ্ধাদেরই জীবনযন্ত্রণা ও গ্লানির সঙ্গে সমভাবে তুলনীয়। অন্যদিকে, 'মাটির তলার মাটি' গল্পেও উনিশ শ' একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর ওপর মিত্রবাহিনীর বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপে সৈন্যবাহিনীর বিপর্যয়কর পলায়ন তৎপরতার কৌতুকময় চিত্র উপস্থাপন করেছেন গল্পকার : 'সৈন্যরা চোখ কপালে তুলে দৌড়ুচ্ছে। যারা পায়ে হেঁটে পালাচ্ছে তাদের দুর্গতির শেষ নেই। বুট ছিঁড়ে গেছে, মোজা খুলে পড়েছে,

প্যান্ট ঢিলে হয়ে নেমে আসছে। শুন্য অসহায় দৃষ্টি মেলে ক্লান্ত সৈন্যরা ফিরছে।'[১২] মিত্র বাহিনীর বিমানবোমা নিক্ষেপ তৎপরতা কখনো কখনো এতটাই বেপরোয়া ও বিভ্রান্তিকর ছিল যে, তা মুক্তিবাহিনী অঞ্চল ও নিরীহ সাধারণ মানুষজনকে তাদের স্বগৃহ ও নিজ এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। গল্পনায়ক 'আমি' যার প্রধান শিকার। এ গল্পে একই সঙ্গে দুটো বিষয় পাশাপাশি অবস্থান করেছে – প্রথমত – পাকিস্তান সেনাবাহিনী অধ্যুষিত অঞ্চল ও পাকিস্তানি সৈনিকদের ওপর মিত্র বাহিনীর বিমানবোমা নিক্ষেপ। দ্বিতীয়ত – বিমান বোমায় আতঙ্কিত হয়ে সাধারণ নিরীহ মুক্তিকামী মানুষের নিরাপদ ও মুক্তাঞ্চলে আশ্রয়গ্রহণ এবং এতদাঞ্চলে সাধারণ কৃষক-চাষি শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মতামত এবং আশ্রিত মানুষদের আপ্যায়নের মধ্যে কৃষক-চাষিদের আদিম মনুষ্য প্রবৃত্তিকে হাসান আজিজুল হক 'মাটির তলার মাটি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। গল্পে এ ভূমিচাষিদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ইতি-নেতি দু'ধরনের মন্তব্য তুলে ধরার অন্তরালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রবলভাবে ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে, 'আটক' ও 'নবজাতক' এবং 'মাটির তলার মাটি' গল্পত্রয়ে যৌথবাহিনীর বিমান থেকে অসতর্ক বোমানিক্ষেপে সাধারণ নিরপরাধ জীবনহানিতে সাহিত্যিকের চিরন্তন মানবপ্রেমের শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

৫.

মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী হতাশা ও গ্লানির পটভূমিতে হাসান আজিজুল হকের *নামহীন গোত্রহীন* গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'ফেরা','ঘরগেরস্থি', 'কেউ আসেনি' গল্পগুলো রচিত হয়েছে। 'ফেরা' যুদ্ধফেরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আলেফ এর গৃহ প্রত্যাবর্তনের গল্প। দরিদ্র,অর্ধাহারী,অনাহারী দিনমজুর আলেফের পরিবার পরিজন ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে গমন, অতঃপর যুদ্ধকালীন পাকসেনাদের গুলিতে আহত হয়ে যুদ্ধোত্তর স্বাধীনদেশের গৃহে প্রত্যাবর্তন, স্বাধীনদেশে স্বাধীন জীবিকার, অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের স্বপ্নবাসনা গল্পটির উপজীব্য বিষয় হয়েছে। 'ফেরা' গল্পের সমাপ্তিতে নাটকীয় ঘটনার আভাষ লক্ষ করা যায়। গল্পশেষে নায়ক আলেফ এর সরকারের নিকট অস্ত্র জমাদান না করে স্বগৃহপার্শ্বের ডোবায় নিক্ষেপের মধ্যে প্রতীকী ব্যঞ্জনার অবকাশ রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা আলেফ যুদ্ধাস্ত্র সমর্পণ করেনি এ ভেবে যে, পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবমূল্যায়িতকালে সে পুনরায় অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। দুর্বল,সরল গদ্যে বর্ণিত গল্পের শিল্পমান প্রশ্নসাপেক্ষ। খণ্ড খণ্ড চিত্র এসেছে বিভিন্ন ঘটনার। হাসান আজিজুল হক এর গল্পের যে শক্তিশালী গদ্যভঙ্গি তা যেন এখানে অনেকক্ষেত্রেই ম্লান হয়ে যায়। আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনাহীন গল্পের ঘটনা যেন অনেকটাই শুরু না হয়েই শেষ হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র আলেফ এর আদ্যন্ত পটভূমি ইঙ্গিতে ভাস্বর হতে পারতো,তা যেন কোথাও পাঠক বাধাপ্রাপ্ত হয় তার জীবন-পর্যালোচনায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন : ''ফেরা' গল্পটি প্রকরণশিল্পে অত্যুচ্চ না হলেও বিষয় বৈভব ও উপস্থাপন কৌশলে এটি সমৃদ্ধ।'[১৪] এই মন্তব্যে গল্পের বিষয় ও শিল্পরূপের যাথার্থ্য নিরূপিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প 'ঘরগেরস্থি' মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ধ্বংস্তূপে পরিণত অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার স্বাধীন বাংলাদেশের প্রান্তিক গ্রাম-জনপদের প্রত্যাবাসিত হিন্দু পরিবারের স্বপ্ননিবাস রচনা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনার বহিঃপ্রকাশ। রামশরণ ও ভানুমতির পরিবার মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রাণভয়ে গৃহত্যাগ করে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করলেও যুদ্ধপরবর্তী স্বাধীনদেশে পুনরায় ফিরে এসে শ্মশানপল্লিতে থিতু হতে পারেনি। সেই জনপদ আর পূর্বের জনপদের অস্তিত্বে বিদ্যমান নেই। সরকারি ত্রাণ সহায়তাও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত নেই। অগত্যা তাই তাদের ত্যাগ করতে হয় আজন্মলালিতভূমি থেকে অনিশ্চিত গন্তব্যে। গল্পকার এই গল্পে স্বাধীনদেশে স্বাধীনতার মর্মার্থ অনুসন্ধান করেছেন। রূপকের সাহায্যে তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন পাক হায়েনাদের ভয়ে যেমন তাদের গ্রাম পরিত্যাগ করতে হয়েছিল তেমনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীনদেশে বেঁচে থাকার ন্যূনতম মৌলিক চাহিদার অভাবে, জনমানবহীন শূন্যভূমিই যেন তাদের পুনরায় পরাধীনমানবে পরিণত করেছে। তাই স্বাধীনদেশে গল্পনায়ক রামশরণের তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উচ্চারিত হয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে সংলাপে : 'রামশরণ বলে,ভাবনা কি তোর? সরকার জমি দেচ্ছে, গাড়ি গাড়ি চাল দেচ্ছে, বাঁশ বেড়া টিন দিয়ে ভিটের বাড়ি তুলে দেচ্ছে – তারপর আকাশ থেকে পড়বেনে একজোড়া জুয়ান বলদ।'[১৪] জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদার অভাবে রামশরণের নিকট মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই সে উক্তি করে :

> স্বাধীন হইছি আমরা – ঘৃণায় আর রাগে রামশরণের গলার আওয়াজ চিড় খেয়ে গেল; স্বাধীন হইছি তাতে আমার বাপের কি ? আমি তো এই দেহি, গত বছর পরাণের ভয়ে পালালাম ইন্ডেয় – ন'টা মাস শ্যাল

> কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। ছোয়াল মিয়ের হাত ধরে আজ ইস্টিশান, কাল জাহাজ ঘাট, – রামশরণের কথা থেকে ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দে ধার ছিটকোতে থাকে। স্বাধীনটা কি অ্যাঁ? আমি খাতি পালাম না – ছোয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনটা কোঁয়ানে ?[১৬]

'ঘরগেরস্থি' ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে শিল্পমূল্যের মানদণ্ডে অত্যন্ত চূড়াস্পর্শী। এতে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের গ্রামীণ-জীবনে নিরাপত্তাহীনতা ও সুযোগসন্ধানী সাম্প্রদায়িক মুসলিম গুটিকয় লোকের হাতে নির্যাতন ও গৃহসম্পদ অপহরণ করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি, গল্পের ক্ষুদ্র অবয়বে, হিন্দু সম্প্রদায়ের পারিবারিকজীবন ও গ্রামীণজীবন মূর্ত হয়ে উঠেছে অনন্য শিল্পশৈলীতে।

'কেউ আসেনি' হাসান আজিজুল হকের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের যুদ্ধাহত ও নিঃস্ব এবং হতদরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বিড়ম্বনা, বঞ্চনা,হতাশা ও প্রত্যাশিত সামাজিক মর্যাদা ও অসাম্যমুক্তির প্রশ্নে স্বপ্নভঙ্গের বেদনার করুণ আলেখ্য। গল্পের প্রধান চরিত্র আসফ আলীর যুদ্ধাবসান পরবর্তী আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসার সূত্র ধরে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা উচ্চারিত হয়। একদিকে, আসফ আলীর চিকিৎসা, অন্যদিকে, আসফ আলীর সহযোদ্ধা গফুর চরিত্রের সমসাময়িক জীবনবাস্তবতার মধ্যদিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গ্লানিময় ক্লেদাক্ত জীবন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। গল্পের মুখ্য চরিত্র আসফ আলী মুক্তিযুদ্ধে জীবনপণ যুদ্ধ করে পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আহত হয়ে হাসপাতালে পা হারালেও স্বাধীন দেশের সরকার কিংবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কেউ তার চিকিৎসার কিংবা তাকে দেখে যাওয়ার তাগিধ বোধ করেননি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সেই ক্ষোভ ও অপমানের যন্ত্রণা থেকে উচ্চারণ করেছে – 'দ্যাশ স্বাধীন হলি কি হয়' ? কেননা সে দেখেছিল হাসপাতালে তাকে নিয়ে এসেছিল তারই রণাঙ্গনের এক সময়ের সহযোদ্ধা গফুর। গফুরকে সে জিজ্ঞেস করেছিল – 'আমারে কেউ দেখতি আইছিল' ? এই একাকিত্ব,অসহায়ত্ব এবং সংক্ষোভ নিয়েই হাসপাতালে তাদের প্রাণত্যাগ করতে হয়। অন্যত্র, আসফ আলীর সহযোদ্ধা গফুর সদ্য স্বাধীন স্বদেশে বিজয়ের পরবর্তী সময়ে দেখেছেন নগর জীবনে মুক্তিযোদ্ধার সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে তীব্র অবক্ষয় ও অপরিচিত জনকোলাহল, যারা হয়তো স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। গল্পকার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> রেস্তোরাঁয় লোকের ভিড় ছিল খুব কিন্তু গফুর একটাও চেনা লোক দেখতে পেল না। কেউ এসে তার সঙ্গে কোন কথা বলল না। দু'একজন কেমন ভয়ে ভয়ে তার পোশাক আর রাইফেলটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। পয়সা গুণে নেবার সময় রেস্তোরাঁর মালিক তার দিকে একবারও তাকাল না।[১৭]

হাসান আজিজুল হক এর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটগল্পে যুদ্ধোত্তর মানবিক বিপর্যয়, স্বপ্নভঙ্গের বেদনার বহিঃপ্রকাশ কিংবা হৃদয়ভঙ্গের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছেন প্রধানত সমাজের নিম্নবর্গের অন্তেবাসী মানুষ।' ফেরা' গল্পের নায়ক আলেফ মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সময়ে ছিলেন কায়িকশ্রমিক দিনমজুর। 'ঘরগেরস্থি' গল্পের রামশরণ ভিটেসর্বস্ব গৃহস্থ কিংবা 'কেউ আসেনি ' গল্পের প্রধান দুই চরিত্র আসফ আলী ও গফুর ও গ্রামীণ কৃষক- চাষি কিংবা দিনমজুর, তাদের দারিদ্রের প্রকোপতা এতটাই গভীর যে, অন্নাভাবে তাদের স্ত্রীগণ তাদের সংসার ত্যাগ করে। অর্থাৎ তিনটি গল্পের প্রধান চরিত্রগুলো অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশায়,দারিদ্রমুক্তির স্বপ্নে দেশমাতৃকার টানে মুক্তিসংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণযোদ্ধা হয়েও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্বদেশে মুক্তির আস্বাদ লাভ করতে পারেনি। পায়নি মুক্তিযোদ্ধার প্রকৃত মর্যাদা ও কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি। 'ঘরগেরস্থি' গল্পের রামশরণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি প্রাণভয়ে কেননা তিনি ছিলেন হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ, গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন যেন হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে দরিদ্র এই রামশরণগণ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে গৃহত্যাগ করে শরণার্থী হয়েছেন। গল্পকার তাঁকেও যেন পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দান করেছেন। তিনটি গল্পের মুখ্য চরিত্রগণ যে স্বপ্ন,আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির বাসনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন,তাদের সেই দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্বদেশে ছিল বহুদূরস্থিত।

৬.

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সামগ্রিক পরিসরে অর্থাৎ উনিশ শ' সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে উনিশ শ' একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীকালের পটভূমিতে রচিত হয়েছে *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* নামক গল্পগ্রন্থের 'বিধবাদের কথা' গল্প। 'বিধবাদের কথা' আখ্যানজাতীয় গল্প ; যাকে বৃহৎ গল্প কিংবা ক্ষুদ্র উপন্যাস আখ্যায় অভিহিত করা যায়। মূলত, শুধু এই গল্পের কাহিনিকাঠামোয়ই নয়,তাঁর বহু গল্পেই এই উপন্যাসধর্মী প্রবণতা লক্ষ করা যায় । 'তাঁর দৃষ্টি বস্তুত; ঔপন্যাসিকের, একটি সামগ্রিক চালচিত্রে ও বিস্তৃত ক্যানভাসে তিনি জীবনের স্পর্শ পেতে ইচ্ছুক, উপন্যাসের

অনুকণা ছড়িয়ে রাখেন গল্পে।'[১৮] এই গল্পে তার যাথার্থ্য লক্ষিত হয়। গল্পে রূপক,প্রতীক ও সংকেত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে উনিশ শ' একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক পটভূমির মৌলিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দু এবং তাকে কেন্দ্র করে বৃহৎবৃত্ত নির্মাণের শৈল্পিক প্রয়াস। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের দেশবিভাগের ভ্রান্তপ্রয়াস পাকিস্তানরাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্তিকে গল্পকার দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র জবর-সবরের সঙ্গে নারী চরিত্র রাহেলা-সালেহার স্বাভাবিক ও সঙ্গত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার উদ্যোগ থাকলেও, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে জ্যেষ্ঠ ও শুভ্রবর্ণ জবরের সঙ্গে কনিষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ সালেহার সঙ্গে, অন্যদিকে কনিষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ সবরের সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ও শুভ্রবর্ণ রাহেলার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে লেখক রূপকাকারে দেখিয়েছেন উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের দেশবিভাগে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তকরণের কৃত্রিম ও ভ্রান্ত সংযুক্তকরণের সঙ্গে, ফলে পরিণতিও হয়েছে অনিবার্য। গল্পের সমাপ্তিতে রাহেলা- সালেহা বিধবাবেশ ধারণ করেছে অর্থাৎ পাকিস্তানরাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। এখানে রাহেলা-সালেহা নামক নারীদ্বয় অবহেলিত নিঃস্ব-বঞ্চিত পূর্ব বাংলার প্রতীক হয়ে এসেছে। পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার যে অবধারিত নিয়তি – বিনষ্টি বা বিলয় প্রাপ্ত হওয়া, সেটি হয়েছে দীর্ঘ তেইশ বছরের পাকিস্তানি শাসনকালের বিভিন্ন অপ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যেমন – উনিশ শ' ছেষট্টি সালের ছয় দফার বাস্তবায়ন না হওয়া, কিংবা উনিশ শ' সত্তর সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ী আওয়ামীলীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করা, পরবর্তীতে একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন, উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানসৃষ্টির ভ্রান্তি নিরসনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সকল শ্রেণির মানুষের কাছেই সমানভাবে মুক্তির জন্যে যুদ্ধ ছিল না। উনিশ শ' সাতচল্লিশের চেতনাবাহক একটি শ্রেণি তৈরি হয়েছে যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী ছিল। গল্পকারের এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশ্রেণি ও বিপক্ষশ্রেণির প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়েছে পিতৃভ্রাতৃঘাতী চরিত্রাঙ্কনের মধ্যদিয়ে। উভয় ধরনের চরিত্রই অঙ্কিত হয়েছে উনিশ শ' সাতচল্লিশের চেতনার সূত্র ধরে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সিদ্ধান্তের ভ্রান্তির অনিবার্য অবধারিত পরিণতি হিসেবে, তাই গল্পে জবর- রাহেলিল্লাহ পিতৃব্য-ভাইপো চরিত্রদ্বয় সাতচল্লিশোত্তর সময়ে গড়ে ওঠে মানুষরূপী হিংস্র জন্তু-দানব হিসেবে, পাকিস্তানের অন্ধ অনুরাগী হিসেবে। পাকিস্তানপ্রীতি রাহেলিল্লাহর দলকে তথা স্বাধীনতাবিরোধীপক্ষকে এতটা কলুষিত করেছে যে, তারা তাদের মাতৃসমা সালেহাকে ধর্ষণ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি কেননা সালেহা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সাহেবালির মাতা, এই সাহেবালিদলের উদ্যোগে স্বাধীনতাবিরোধী জবরকে হত্যার প্রতিশোধপরায়ণতাই চরিত্রদ্বয় সবর-সাহেবালি পিতৃব্য-ভাইপো চরিত্র অবস্থান গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ একই পরিবারে অনঃকলহ ও পিতৃভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। গল্পের এই ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য বিবর্জিত নয়। বাংলাদেশে এই ঘটনার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়।[১৯] শুধু মুক্তিযুদ্ধ বিপক্ষশক্তি পারিবারিক সম্পর্ক বিনষ্টেই অতিমাত্রায় তৎপর ছিল না, তাদের নিমজ্জিত করে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়কে উন্মুল উচ্ছেদ করতে, নারী ধর্ষণে প্রবৃত্ত করতে। মুক্তিযুদ্ধকালীন এই তীব্র আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের ব্যাপকতা-গভীরতা 'বিধবাদের কথা' গল্পে বিরল শিল্পমাধুর্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধসময়ে একই পরিবারে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কতটা বিস্তৃতি লাভ করে ধর্মমোহে, ধর্মান্ধতার আবহে তা উপলব্ধি করা যায় রাহেলিল্লাহ চরিত্রের পিতৃমাতৃসম্পর্ক বর্জন ও জিঘাংসা বাস্তবায়নের মাধ্যমে :

> এক ঝটকায় সে বাপের দুই হাত সরিয়ে দেয়। আবছা আঁধারে চোখে পড়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা রাইফেলটা সে কাঁধ থেকে খুলে হাতে নিয়েছে, সরি যাও ছামনে থাকি। আর একটা কতা বুলেছ তো গুলি করে শ্যাষ কর্যা দিব। আমি অ্যাহন আর তোমার কেউ নই, দুনিয়ায় কার সাথে কার সম্বন্ধ, এক আল্লা ছাড়া মাবুদ নাই, আমি অ্যাহন রাজাকার। রাজাকার বুঝ? এছলামের খাদেম। ই দ্যাশে অ্যাহন আর এছলাম নাই, হিঁদু কাফেরদের দ্যাশ ইটা, হিঁদু কাফের আর তাদের জম্মিত কাফের মোছলমান। সব কাফের। যদি এছলাম বাঁচাতি, দ্যাশ বাঁচাতি কেউ পারে তালি পাকিস্তানই পারবি। আমি পাকিস্তানের নোকর, ইয়াহিয়া খানের নোকর ... আর মা তোরেও কছি, শুনি রাখ কতাটা। ইচিতবিচিত করলি তুইও বাঁচবি না।[২০]

একদিকে রাহেলিল্লাহ চরিত্রে যেমন পাকিস্তানমোহ আত্মজনসম্পর্ক বিনষ্ট করেছে, তেমনি জবর চরিত্রেও একই মোহ পুত্রহন্তার মনোবৃত্তি তৈরি করেছে। গল্পকার লিখেছেন : 'তোর ছেলেকে বলে দিবি বাড়িতি য্যানো কুনোদিন না আসে, মেলেটারিকে খবর দিয়ি রাখিছি, রাজাকারদের বলে রাখিছি, সবসোমায় য্যানো ই বাড়ির দিকি নজর রাখে। দেখার সাথে সাথে গুলি করবি। ইসলামের দুশমন আপন পুত আপন ভাই হলেও মাপ নাই।'[২১]

পূর্ব বাংলার বাঙালিদের একটি বিপথগামী ক্ষুদ্র অংশ যেমন ধর্মের অপব্যাখ্যার শিকার হয়ে পাকিস্তানপ্রীতিতে বিমোহিত হয়ে জনক-জননী ও পুত্রহত্যায়ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি; তেমনি পূর্ব বাংলার অধিকারসচেতন অধিকাংশ বাঙালির মনোবৃত্তির প্রতিভূ চরিত্র গল্পের সবর ও সাহেবালি চরিত্রদ্বয়, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ পথে উপযুক্ত প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তুলেছিল। গল্পে সবরের সংলাপ ও সাহেবালির সহোদর রাহেলিল্লাহকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মতৎপরতা ও প্রতিশোধস্পৃহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারবধে লিপ্ত হয়েছিল তখনই যখন রাজাকারগণ মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করেছিল সর্বপ্রথম অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা নয় প্রতিশোধ গ্রহণে নিপতিত হয়েছিল মাত্র। এ গল্পে এদেশীয় পাকিস্তানিবাহিনীর সহযোগীদের তৎপরতা যতটা লক্ষণীয় তদ্রূপ তৎপরতা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয়। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ নেই বললেই চলে। গল্পের ইতি ও নেতিবাচক চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছে বাঙালিগণই,একই পরিবারের সদস্যগণই আপনরক্ত হত্যায় লিপ্ত হয়েছে।

৭.

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে এটি উল্লেখ করা যায়, হাসান আজিজুল হকের গল্পে মহান মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি সাতচল্লিশের দেশবিভাগকে মেনে নিতে পারেননি। একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সাতচল্লিশের ধর্মভিত্তিক দেশবিভক্তিরই সংশোধিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। সঙ্গত কারণে মুক্তিযুদ্ধের মতো গণমুখী ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বৃহৎ প্রেক্ষাপট যে গল্পকারকে আকর্ষণ করবে এটাই ছিল খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। তাঁর এ ধারার গল্পে স্বাধীনতাযুদ্ধের আদ্যন্ত ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। সেটি যেমন ঘটনার প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক তেমনি সময় পরিক্রমার পরিপ্রেক্ষিতেও সমান সত্য। এ ধরনের ছোটগল্পে যুদ্ধজীবনের যে নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়, তা আমাদের অভিজ্ঞতার সীমাকে প্রশস্ত করে; কেননা তাঁর মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলো হচ্ছে নিরন্তর জিজ্ঞাসার উৎকৃষ্ট মানস ফসল। প্রত্যেকটি গল্পের প্রধান চরিত্রের বিশেষ উক্তির মধ্য দিয়ে যুদ্ধভিত্তিক জীবনজিজ্ঞাসার ভিন্নতর সন্ধান মেলে। সেখানে গল্পের বিষয়গত জিজ্ঞাসা যেমন লক্ষণীয় তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই আঙ্গিকগত ভিন্নতাও দৃষ্টিগ্রাহ্য। তবে, মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে রচিত লেখকের গল্পগুলো শুধু গল্পকাঠামোর সীমানায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, তা হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল; শুধু ছোটগল্পেই যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের এই করুণ-নির্মম ছবি এঁকেছেন সেটিই চূড়ান্ত ছিল না, তাঁর স্মৃতিকথা বা স্কেচজাতীয় কোনো কোনো রচনায়ও মুক্তিযুদ্ধের নিরাভরণ বিবরণ স্থান পেয়েছে ছোটগল্পের সমস্ত প্রকরণ ও অনুষঙ্গ নিয়ে অর্থাৎ গল্পকার ছোটগল্প ও ছোটগল্পধর্মী বহু রচনায়ও মুক্তিযুদ্ধের অবরুদ্ধ দিবারাত্রির নরক যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন নিপুণ শিল্পিত হস্তে।

তথ্যনির্দেশ

১. শচীন দাশ, 'হাসান আজিজুল হকের আখ্যানভূমি', *হাসান আজিজুল হক : নিবিড় অবলোকন*, (চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত), (ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫), পৃ. ১৬৪

২. মহীবুল আজিজ, *হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার* (চট্টগ্রাম, লিটল ম্যাগাজিন,২০১৮), পৃ. ১৯

৩. দেবশ্রী ভট্টাচার্য, 'অবক্ষয়ের আখ্যান: হাসান আজিজুল হকের গল্প', *গল্পকথা*, (হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি ২০১২), পৃ. ১৭০

৪. আবুল হাসনাত, ভূমিকা, *হাসান আজিজুল হক : মুক্তিযুদ্ধ রচনাসংগ্রহ*, (ঢাকা, চারুলিপি, ২০১৭), পৃ ১০

৫. হাসান আজিজুল হক, 'বাংলাদেশ : পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়', *অতলের আঁধি*, (ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন), ১৯৯৮, পৃ. ৯১

৬. তদেব, পৃ. ৯০

৭. হাসান আজিজুল হক, 'ভূষণের একদিন', "নামহীন গোত্রহীন", *রচনাসংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১, তৃ.মু.), পৃ. ৩০১-৩০২

৮. তদেব, পৃ. ২৯৭

৯. তদেব, 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫

১০. তদেব, 'নামহীন গোত্রহীন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩

১১. তদেব, 'ঝড়', "রোদে যাবো", *রচনাসংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯, ২য় মু.) পৃ.১৯৫-১৯৬

১২. তদেব, 'আমরা অপেক্ষা করছি', "আমরা অপেক্ষা করছি", পূর্বোক্ত, পৃ.

১৩. তদেব, 'মাটির তলার মাটি', "আমরা অপেক্ষা করছি", পূর্বোক্ত, পৃ.১১৭

১৪. সরিফা সালোয়া ডিনা, *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প : বিষয় ও প্রকরণ,* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০),পৃ. ১৭৮

১৫. তদেব, 'ঘরগেরস্থি', "নামহীন গোত্রহীন", পৃ.৩৫৩

১৬. তদেব, 'ঘরগেরস্থি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩

১৭. তদেব, 'কেউ আসেনি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

১৮. হায়াৎ মামুদ, 'ঘনিষ্ঠ কথকতাঃ জ্যোতি ও হাসান', *সাহিত্যঃ কালের মাত্রা*, (ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৩), পৃ. ২৫৩

১৯. বাগেরহাটের রঘুনাথপুরে এমন ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে পুত্র মুক্তিযোদ্ধা এবং পিতা ও বড় ভাই স্বাধীনতাবিরোধী ও পাকিস্তানের সহযোগী। পিতা ও বড় ভাই মুক্তিযুদ্ধে ছোটভাইকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে পাকবাহিনীর হাতে তার মৃত্যু সংঘটিত হয়। স্বরোচিষ সরকার, *একাত্তরে বাগেরহাট*, (ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ২৫৯

২০. হাসান আজিজুল হক, 'বিধবাদের কথা', "বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প", *রচনাসংগ্রহ* -৬, (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ৭৭

২১. তদেব, পৃ. ৮০

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

Emergence, Sources, and Utilization of Bayt al-Mal in Islam

Dr Dilshad Ara Bulu*

Abstract: Bayt al-Mal is an institution founded by Prophet Muhammad (peace be upon him), which was systematized and followed by the Khulafa-e-Rashideen for managing the economic affairs of the newly established Islamic State in Medina. Its main functions were to manage the moveable assets and monetary resources controlled by and handed over to the Islamic State to support its socio-economic development. Umar ibn al-Khaṭṭāb (R.A.), the second Caliph, transformed it into a well structured financial institution, though the concept was originated during the time of the Prophet (Peace be upon him) and followed by the first Caliph, Abū Bakr al-Ṣiddīq (R.A.). The Muslim countries may reinstate Bayt al-Mal to finance small and medium enterprises (SMEs), manage Zakat and Awqaf, and issue various Islamic financial instruments. It can play a challenging role in eradicating hardcore poverty in Muslim societies. Bayt al-Mal can also supplement the rapid growth of Islamic banks and financial institutions all over the world. Thus, this study strives to explore the concept, emergence, sources, and utilization of Bayt al-Mal in the context of Islam.

Islamic Concept of Bayt al-Mal

The term Bayt al-Mal is an Arabic expression, which denotes a place of money or moveable assets of an Islamic state. Bayt al-Mal is the unification of two nouns, namely Bayt that stands for an abode, and al-Mal that signifies resources. In essence, the original scope of Bayt al-Mal covers a more important role against the present perception of Bayt al-Mal. It is an abode where wealth is accumulated, documented, distributed, and regulated.[1] Also, it deals with the receipt, payment, and other financial activities of an Islamic state.

Initially, Muslims as a nation and Islam as a religion concentrated in Mecca and Medina. Thus the existence of Bayt al-Mal was not quite noticeable because life was not so complicated at that time. The donated and acquired wealth and collected Zakat were gathered in the Prophet's Mosque and distributed among the beneficiaries within three days.[2] In this context, Bayt al-Mal means a competent authority[3] that accumulates and distributes wealth among the entitled recipients. However, there was a difference between Diwan Bayt al-Mal and Bayt al-Mal because Diwan Bayt al-Mal was a specific department responsible for recording the revenues, taxes, other public properties, and expenses. Diwan Bayt al-Mal had no right to deal with the assets of Bayt al-Mal. Instead, it was responsible for recording the inflows and outflows of the funds.[4]

Emergence of Bayt al-Mal in Islam

Bayt al-Mal as an establishment existed since the time of the Prophet (Peace be upon him). It administered the wealth of the newly born Islamic state obtained through diplomacy and combat. When Islam was in its juvenile form, spending for the satisfaction and way to Allah (SWT) started, and outflows were quick and definite. If any goods or funds or moveable assets were transferred, or taken, or collected from any source, then it stored in the compound of the

* Professor, Department of Islamic History and Culture, University of Rajshahi, Bangladesh.

Al-Masjid al-Nabawi (The Mosque of the Prophet) and distributed among the needy and recommended persons within three days.[5] As it was undefined treasury during the Prophet (Peace be upon him) as resources were limited. There was barely anything left after the distribution among the entitled Muslims. The Prophet used to allocate the spoils and the fifths (Khums) just at the end of a battle. Hanzalah ibn Sayfi, a staff recorded the wealth of the Bayt al-Mal, reported that the Prophet (Peace be upon him) advised him to follow the Prophet (Peace be upon him*)* and tell him of everything for no later than three days. He kept on telling the Prophet (Peace be upon him) for three days about any money or food he got. Hence, the Prophet (Peace be upon him) distributed the acquired wealth and collected Zakat without delay.

Initially, Muslims were concentrated only in Mecca and Medina. The existence of Bayt- al-Mal was not so noticeable because life was simple at that time. There was a slow expansion of Muslim territories. A similar situation was evident during the first Caliph. There was no state employee or enrolled soldier at that time. As such, there was no wage or salary, or state expense. So the demand for the treasury at the national level was unrecognized. After the death of the Prophet (Peace be upon him), the first Caliph was more concerned about the stability of the government. Though the Bayt al-Mal existed during the Prophet (Peace be upon him) and the first Caliph Abū Bakr al-Ṣiddīq (R.A.), the second Caliph, Umar ibn al-Khaṭṭāb (R.A.) made it as a well structured financial institution.

The Caliph Abū Bakr al-Ṣiddīq (R.A.) established it in the proximity to Medina, where he used to live until it relocated to Medina. He used to give the Muslims whatever was there and did not keep anything for the future. After relocating to Medina, he shifted Bayt al-Mal at his residence. After the death of Abū Bakr al-Ṣiddīq (R.A.), Umar ibn al-Khaṭṭāb (R.A.) entered in to the Bayt al-Mal and observed that nothing left except a dinar that fell from the sack.[6]

Umar ibn al-Khaṭṭāb (R.A.) employed a few employees to keep records of the public properties, such as war booties, one-fifth of the spoils, welfare funds, and weapons. All these properties were recorded and stored until disposal.[7] The head of the Bayt al-Mal was the Khazin Bayt al-Mal (Treasurer of the Treasury), and the chief of any office established under it was called the Sahib Bayt al-Mal (Trustee of the Treasury). Then it became a safe place to keep all moveable properties temporarily to distribute among designated Muslims. Members of the Islamic intelligentsia thought that the Bayt al-Mal was an institutional structure fitting for the Muslim societies as it made the administrators accountable for receipts and payments of the resources of an Islamic state.

Al-Waleed ibn Hisham suggested Umar ibn al-Khaṭṭāb (R.A.) to set up dewans for preserving the money acquired by Abu Hurayrah (500,000 dirhams) from Bahrain following the practice of the rulers in Syria**.** According to the suggestion, the Caliph then appointed Aqeel ibn Abi Talib, Makhramah ibn Nawfil, and Jubayr ibn Mut 'im to start setting up the Bayt al-Mal. Umar ibn al-Khaṭṭāb (R.A.) dedicated more to the expansion of Muslim territories, and there was a need to establish a appropriate Bayt al-Mal because financial collections mainly from wars had increased splendidly. He set up an excellent framework of Bayt al-Mal for the administration of public properties. Since then, that institution has undergone tremendous progress throughout the Islamic era. The collection from the Kharaj had increased splendidly during the Umayyad Caliph Umar bin Abdul Aziz due to his policy of expanding territories and his integrity concerning wealth administered by the Bayt al-Mal. During Caliph Harun al-Rashid, an Abbasid Caliph, wealth accumulated in the Bayt al-Mal reached 530,512,000

dirhams, and the figure increased up to 900,000,000 dirhams at the time of his demise.[8] It was due to the efficient and effective administration of the Islamic government at that time.

Sources of Bayt al-Mal

The resources acquired and distributed by the Bayt al-Mal were Jizyah, Fay, Khums, Kharaj, Zakat, Ushr, Ushur, Luqatah (a property found in a place which is not owned by anyone, not guarded and the person who found it does not know the owner), the wealth of deceased, and Diya or blood money (the financial compensation given to the victim or successors of a martyr in the events of killing). These assets were stored in the Bayt al-Mal and used for the deserving Muslims based on Shari'ah principles.

1. Zakat: It is the principal source of Bayt al-Mal. It is an obligatory giving to the poor Muslims in a set proportion of the wealth of rich Muslims that exceeds a certain level, known as the Nisab for a lunar year. If a Muslim is the owner of hard cash, diamond, gold, silver, precious metals, stock in trade, financial securities that amounting to more than the value of Nisab (at current market prices), s/he should give Zakat "(O Prophet), take Sadaqa (Zakat) out of their property-thou wouldst cleanse them and purify them thereby".[9]

Zakat has the power to change the world and as such, it has been made the Third Pillar of Islam. Its importance can easily be comprehend from the fact that Zakat has been mention at 82 verses in the Holy Qur'an in close connection with prayer (Salah), such as-establish prayer regularly and give Zakat and obey Allah (SWT) and His Messenger.[10] "And we made them (successors of Ibrahim) leaders, directing by Our authority, and We motivated them to do good deeds to establish daily Prayers and practice Zakat; and they continually served Us".[11] Urging Muslims to pay Zakat and other taxes while excluding non-Muslims was possibly opposed to natural justice. Zakat has been imposed only on Muslims having a certain amount of minimum resources disregarding age, gender, or occupation. It is paid on the surplus of wealth which is left over after the passing of a year. It is thus a payment on the accumulated wealth. Leaving aside animals and agricultural yield, Zakat is paid at almost a uniform rate of 2.5 percent. The minimum standard of surplus wealth over which Zakat is charged is known as Nisab. It differs with different kinds of property. Besides, Zakat on the farming is at 5 percent or 10 percent of the harvest each time depending on irrigation facilities, whether a crop produced once, twice, or thrice in a lunar year. Zakat payers do not enjoy any privilege for the payment of the same.

2. Khums: It is a source of Bayt al-Mal affirmed in Al Qur'an, Hadith, and Fiqh. In the Sunni view Khums is just for spoils of war. Its literal meaning is "20 percent or one-fifth". In Islamic legal terms, Khums denotes one-fifth of certain movable assets that a person acquires from the disbelievers through battle, apart from land and real estate, must be given to the Bayt al- Mal as an Islamic tax. In the early Muslim community (7th-century ad), it was ransack/war booty taken through battles from the nonbelievers, such as weapons, horses, captives, and movable goods. Allah says in the Holy Quran:

"The spoils that Allah (SWT) gives to His Messenger from the people of the townships are for Allah (SWT), His Messenger, relatives of the Prophet (Peace be upon him), the orphans, the needy, and travelers as they do not circulate among the rich only. Take whatever the Messenger gives you, refrain from whatever he forbids you, and be careful of Allah (SWT). Indeed Allah (SWT) is hard in punishment".[12]

The above verse and its earlier verses are about the battle of the Jews tribe of Banu Nadir who lived around Medina were besieged by Muslims after Jewish broke their peace deal with them. The Prophet (Peace be upon him) gave the Jewish some days to go away from Medina.

3. Fay (Crown lands): It was state acquired lands. The land acquired by Muslims in war defeating enemies constituted Fay land. The Fay lands belonged to the whole Muslim community.

4. Jizyah: Al Qur'an stated the term Jizyah.[13] The expression was originated from the Arabic root Jizyah, aiming to offset. Historically, Jizyah is a tax (Jizyah is often wrongly interpreted as a 'head tax' or 'poll tax') paid by non-Muslim residents of an Islamic state to their Muslim ruler. But, it is a charge for the safety and shelter of the non-Muslims living in the Islamic state. They do not need to fight for their securities and also do not need to pay Zakat. It is a per person yearly charge imposed by an Islamic state on some non-Muslim citizens permanently living in countries under Islamic Shari'ah.

The use of Jizyah is to see from its historical perspective. The imposition of Jizyah was possibly the most suitable choice as it was in agreement to natural justice. All citizens of the state must get the security of their life and resources. In turn, they should finance the cost of security, but not in proportion to it. Ali ibn Abi Talib (R.A.) declared- whoever is under our protection (dhimmis), his life and blood are as holy as our own, and his resources are as inalienable as our resources.[14] Like Zakat on Muslims, Jizyah was charged on the wealth and not on the income of non-Muslims. Jizyah was not imposed on females, adolescents, aged, impoverished, physically-challenged, and spiritual scholars. Jizyah payers could benefit from security and development expenses. At present, if we consider that the Prophet (peace be upon him) ordered only these two taxes, one for Muslims and another for non-Muslims, it would suggest that he treated non-Muslims as a more favored group of residents.[15] There were instances that the collection of Jizyah stopped because of the weak financial condition of non-Muslims. Once Caliph Umar ibn Al-Khattāb (R.A.) found that an old Jew begging on the roads of Medina. On his inquiry, the Caliph noticed that the outstanding Jizyah had compelled him begging. Caliph Umar ibn Al-Khattāb (R.A.) took him to the Bayt al-Mal to give him some wealth with a remark that it should be collected when non-Muslims are healthy and able to earn. Also, the rate of it should not be too high to be called regressive and unfair.[16] Umar bin Abdul Aziz (The Eighth Umayyad Caliph and known as the Fifth Pious Caliph of Islam)) also set an example of taking it with equity and compassion. One of his administrators wrote; "In Egypt, if things remain as of now, all Christians might accept Islam, and the country might lose all its income from this source". The Caliph responded "I would consider it as a glorious blessing if all Christians were switched to Islam, for Allah (SWT) sent our Prophet (Peace be upon him) to serve as a messenger and not as a revenue collector".[17]

Moreover, the transformation of a person to Islam released him from the obligation to give Jizyah but held him back to Jihad and Zakat. Likewise, the non-Muslims who preferred to work in the Muslim army need not pay Jizyah. There were diverse systems and rates of Jizyah fixed in the light of the deal with the non-Muslims. Jizyah rates on non-Muslims were considerably lower than Zakat on the Muslims. It indicates a tax alternative to jihad.

5. Kharaj: It was a land tax formerly applied only on disbelievers. The term Kharaj described any tax on land paid to the Muslim rulers, on which Muslims had gained control and rented out either to a Muslim or a non-Muslim and land rental left in the administration of its title-holder, whether it was acquired through a peace agreement or is taken by force, but left in the hands of original owners on the justification that they gave Kharaj (land tax). Kharaj has two

main forms: muqasamah and muwazzaf or wazifah. Kharaj muqasamah is defined as an impost levied in a certain proportion of the produce, such as one-fifth, one-fourth, one-third etc. It was leviable only when the land was cultivated. Kharaj muwazzaf was fixed on land according to production capability of land and was due whether the land was cultivated or not.[18] Some organizations, for example, Awqaf was exempt from Kharaj. It was imposed based on the nature or merit of the land. In Sawad, there were three classes of land tax or Kharaj. Those were based on the calculated acres (Al-Kharaj Ala Masahah Al-'ard), land tax as a percentage of the yearly crop (Al-Kharaj ‘ala Al-Muqasamah), and the set sum of money (Al-Kharaj ‘ala Muqa‘tah).

6. Ushr and Ushur: It was ten percent on the crop of watered land and rain-watered soils, five percent on land reliant on well water, and ten percent reliant on non-irrigated lands. Caliph Umar ibn Al-Khattāb (R.A.) was the first to practice it and extended its scope by including border trade tax (Ushur). It was a ten percent tax on merchandise either imported or exported by non-Muslim traders across the border controlled by the Islamic state and it was exercised in Islamic-dominated regions all over the globe until the 18th century. There are three categories of Ushur. The non- Muslims merchants of Dar al-Harab (enemy country) trading in Muslim territory had to pay ten percent on their merchandise. The Dimmis (non-Muslims in Islamic state) had to pay five percent on their merchandise and the Muslim merchants had to pay two and a half percent on their merchandise as Ushur. Both Ushur and Jizya would grant non-Muslims a privilege in wartime, i.e., non-Muslims were not be obliged to join in military activities, in case, there was a war. By paying taxes, non-Muslims were protected by Islamic law from any mischief as opposed to Muslims. Muslims were compelled to pay Zakat as well as to join in military activities to protect Muslims and non-Muslims alike.

7. Hidden wealth: One-fifth of the concealed wealth had to deposit to the Bayt al-Mal when any Muslim found it. The remaining four-fifths left for the person who discovered it. It applied to all resources that were concealed underground by the agnostics of the pre-Islamic era of darkness.

8. Metals and the like: One-fifth of metals and similar things pulled out from the earth, for example, diamond, gold, silver, iron, and others also had to deposit to the Bayt al-Mal. It was also applicable to the assets taken out of the ocean, such as gems, ambergris, and like.

9. Luqatah: It refers to material goods found in a place, which is not in the custody of any person, not protected, none claims the title, the owner is unknown, and as such, the person who got it fails to identify the titleholder. These assets must be deposited to the Bayt al-Mal.

10. Deceased wealth and blood money: The wealth of any Muslim who expires keeping no heir would go to Bayt al-Mal. If he/ she kept heirs but they do not inherit all of his/ her resources, the leftover would also go to the Bayt al-Mal. In case someone is assassinated, but he has no heir, the blood money for his killing would also go to the Bayt al-Mal and spent on the same causes as the Fay.

11. Fines and confiscated assets: Based on the Sunnah of the Prophet (Peace be upon him), if a person refused to pay Zakat, he was punished by confiscated half of his property. Similarly, a fine was inflicted on one who picked grain or fruit for free, and if he took it out of the farm, the fine would be double the value of the grain. It appears that when a penalty was imposed, it was spent in the public interest, and hence, it was justified to deposit the same in the Bayt al-Mal. Umar ibn al-Khaṭṭāb (R.A.) took half of the wealth of some persons who had been appointed to the positions of power when they became rich because of their official posts.

Utilization of the Resources in Bayt al-Mal

How the resources of Bayt al-Mal were distributed is stated in Al Qur'an and Hadith. The distribution or utilization of resources from the main sources is stated below:

Al Qur'an clarifies how Zakat is to be given to the eight classes of deserving Muslims. "Indeed, [directed] generous offerings are only for the poor and the needy, and for the Zakat administrators, and for those whose hearts are to be reconciled (truth), and for [freeing] those in bondage, and for the debt-ridden, and the cause of Allah, and the pilgrim travelers. (It is) intended by Allah, and Allah is all-knowing, all-wise".[19]

Remarkably, Allah (SWT) Himself classified the eight categories of persons for Zakat payment and the Prophet (May peace be upon him) applied the rules during his life time. Based on the Holy Qur'an, the eight deserving classes are (1) the poor, suggesting Muslims having low-income; (2) the needy, suggesting someone who is in difficulty; (3) Zakat administrators; (4) those whose hearts are to be reconciled, meaning newly converted Muslims; (5) those in servitude (slaves and captives); (6) highly-indebted Muslims; (7) in the cause of Allah (SWT); and (8) the wayfarer, meaning those who are traveling with few resources. However, the recipient must not belong to the Zakat giver's immediate family. A person's spouse, children, parents, and grandparents cannot receive his/her Zakat. Other relatives can receive his/her Zakat.

During the early period of Islam, Zakat was collected and deposited in the Bayt al-Mal and within three days the amount was distributed among the deserving Muslims. At present, a Zakat giver can identify its beneficiaries and divide it among them personally or can appoint an agent to distribute it on his/her behalf. It is also possible to hand over the Zakat to the local Muslim authority in order to distribute it properly among the appropriate recipients.

Al Qur'an stated that whatever war-booty you may acquire, a fifth of it is (assigned) for Allah (SWT), the Messenger (Peace be upon him), near relatives of the Messenger, the orphans, the poor who do not beg, and the wayfarers if you do believe in Allah and in that which We sent down to Our Messenger on the day of criterion (between right and wrong), the day when the two forces met (the battle of Badr). And Allah (SWT) has power over all things.[20] The Sunni clerics' viewed that the name of Allah (SWT) in the said verse is for the honor. He does not need any share. So divide Khums among the remaining five groups except for Allah (SWT). These five groups are the Prophet to current Caliph; the relatives of the Prophet (Peace be upon him); orphans; poor/ needy; and wayfarers.

Al Qur'an affirmed the distribution of spoils after the surrender of Banu Nadir, the Jewish tribe of Medina. The tribe left Medina by abandoning their houses, areas, and farmland. Few companions of the Prophet (Peace be upon him) asked him to take one-fourth of the spoils for himself and give the rest to them. In the above verse, Allah (SWT) emphasized that since the enemy surrendered without any war, all of the acquired wealth belonged to Him and His Messenger (Peace be upon him). Conversely, some clerics stated that when Banu Nadir left their houses and properties, Muslims requested the Prophet (Peace be upon him) to take one-fifth of the properties and divide the rest amid them as war booties. The literal meaning of the above verse is that "the spoils that Allah gave to His Messenger from the non-believers of the precincts are for Allah and the Messenger, the relatives and the orphans, and the needy and the travelers so that they do not circulate among the rich. And take whatever the Messenger grants you, abstain from whatever he forbids you, and be careful of Allah. Indeed Allah is strict in punishment".[21]

Furthermore, the property of a non-Muslim living under Muslim protection dies without keeping any successor, or if something is remaining from his wealth after his successors have received their share, it should be under the jurisdiction of Fay. Also, when a traitor is executed or expired, his successors do not inherit his property based on the Hanafi doctrine. Instead, it appears under the title of Fay.

Jizyah was one of the important sources of Bayt al-Mal. The rates of Jizyah were not uniform.[22] The rates varied in accordance with the wealth of the non- Muslim citizens of the region and their ability to pay. However, Muhammad Hamidullah wrote, in the time of the Prophet (Peace be upon him), the Jizyah was around ten dirhams annually, which represented the expenses of an average family for ten days.[23] The collected amounts were deposit to the Bayt al-Mal and then disbursed. Collection of revenues from all other sources has also been placed in Bayt al-Mal and then distributed for the stated purposes.

The Role of Bayt al-Mal in the Postmodern Era:

The Bayt al-Mal can perform duties similar to the functions of the Ministry of Finance in the modern era. It can also perform the tasks of the Central Bank to monitor and control the financial system, including investment and leading, and so forth.

The role of Bayt al-Mal can be restored and encouraged by offering mid-cap and small-cap funds, promoting Waqf and Zakat, leading funds, introducing different fiscal devices, and so forth. Bayt al-Mal can perform the vital task of annihilating hunger and poverty from society. Thus, with the speedy spread of Islamic finance, Bayt al-Mal can be used to have healthy economic growth.

In the early days of Islam, Bayt al-Mal played the role of the ministry of finance, the treasury, and the central bank of the Islamic country. But at present, it is commonly regarded as a philanthropic foundation, and the use of Bayt al-Mal becomes limited to render monetary support, contributions, and generous offerings to the inhabitants of a country.[24] Hence, it is better to rename Bayt al-Mal as waqf all over the globe. In the Islamic perspective, Bayt al-Mal has to achieve its explicit goals with the resources, such as economic advancement following the Islamic norms; universal harmony and equity; just allocation of resources; and liberty of the residents about social development. In reality, Bayt al-Mal can perform an active role in sustainable economic advancement by the proper use of resources. With the above backdrop, the function of Bayt al-Mal in this modern era may be as under:

Allocating and Controlling of Resources: An ethical and apprised allocation and control of resources is an essential feature of Islam. It is strictly associated with personal and societal progress. The ultimate economic growth relies on whether the resources are well managed, well distributed, and created a benefit for those who need to get attention. The vision of the public resources department and achieving its promises for socio-economic development relies on proper mobilization and just allocation of resources.

Mounting Humanitarian Endowment: Islam invariably praises philanthropic giving. Bayt al-Mal can grant financial support to the needy, destitute, borrowers, pilgrims, and so forth. It can provide funds for charitable purposes that support the welfare of the Muslim communities subject to attaining the overall prosperity of the impoverished Muslims. Bayt al-Mal can spread financial assistance to non-Muslims as well. Umar al-Faruq approved philanthropy from the Bayt al-Mal for an old dhimmi whom he noticed begging.

Increasing Sources of Income: Bayt al-Mal could play an influential role in the economic development of a country. And for that, income sources of Bayt al-Mal are to be increased, particularly identifying different springs of endowment and new sources of Sadaqah and Zakat, such as agricultural products, companies & other business firms, professional farms, mining, and identical sources. Moreover, its funds must be invested in Shari'ah-approved halal businesses to increase the resources of Bayt al-Mal.

Promoting Islamic Micro-credit: Bayt al-Mal can provide shari'ah compliant micro-credit for Small and Medium Enterprises (SMEs) and similar other businesses, such as Qardul al-Hasan (QH). However, dependency on QH financing should ultimately be replaced over time by the revenue flows from halal investments.

Promoting Al-Rahnu: It is a secured loan to a person where the collateral security is the assets generated by the loan. The purpose of this scheme is to extend money quickly and make the asset as collateral. It could promote entrepreneurship. This scheme is not to make a profit but to provide finance to needy firms and entrepreneurs. In this case, controlling the misappropriation of funds by the borrowers is a big challenge, and as such, Bayt al-Mal should formulate appropriate mechanisms to manage the same.

Furthering General Services: For advancing the welfare activities of the Muslim community, in particular and human society at large, Bayt al-Mal can render the services that are essential for a smooth and healthy life. It could focus on human development, and hence, it could promote a quality education system, build educational institutions, and improve the teaching-learning pedagogy. It also could contribute to the overall infrastructural development of the country through building streets and roads, rendering modern health care services, funding both the manufacturing and service sectors, financing the construction of houses and apartments, etc.

Annihilating poverty from society: Bayt al-Mal can help eradicate poverty by distributing needed finance and co-operations to needy entrepreneurs. It could provide interest-free micro-loans, cash- gifts, grants, debt remission, etc., to the poor and disadvantaged Muslims. Bayt al-Mal can provide direct and indirect emergency support to the vulnerable poor and those affected by natural or man-created hazards. It can provide technical assistance, housing, education, employment, and other social services, alongside that of the efforts of the government of a country. However, authorized and approved service delivery partners, such as charity organizations and NGOs should provide the above-stated services.

Miscellaneous Activities: Bayt al-Mal could collect and distribute Zakat and manage Waqf properties to help the poor and promote social activities. As stated earlier, Bayt al-Mal could invest its excess funds in the Shari'ah-compliant companies, businesses, projects, and diverse financial instruments. It could provide equity to small business start-ups under Mudarabah, Musharakah, Quard-e-Hasana, and so forth. Aside from financing, Bayt al-Mal could also strive to increase fixed assets, and the revenue stream routed back to it as a source of its income. Moreover, it could provide social security expenses for the most disadvantaged and helpless segments of the society. This type of spending can help achieve long-term growth and eradicate poverty by increasing the productivity of the underprivileged. Thus, all-out efforts are needed to create and enhance the fund of Bayt al-Mal to perform the above activities smoothly. But nothing is possible without the legal and administrative backing of the government.

Conclusion

The study disclosed that Bayt al-Mal was a financial institution responsible for managing the resources, revenues, and expenses of an Islamic state, notably in the initial growing Islamic Caliphate. Two sections executed the tasks of Bayt al-Mal. The first section managed its sources and collection of revenues, while the other dealt with the funds and payment that Bayt al-Mal made to the entitled citizens. At present, Bayt al-Mal is a philanthropic institution, and its functions have become limited to grant aid, donations, and generous giving to the citizens. However, there is yet a big room left for Bayt al-Mal to offer. In the Islamic system, revenues of Bayt al-Mal can help attain economic welfare within the structure of the ethical standards in Islam, universal friendship and equity, equitable sharing of resources, and individual rights in the context of community service. With the speedy evolution of Islamic economics, Islamic states can now use Bayt al-Mal to develop their financial sector. Bayt al-Mal can provide microfinance based on Mudarabah (profit-loss sharing basis) and Qard al-hasan to the SME enterprises. It can also support the education expenses of poor meritorious Muslim students in line with its philanthropic ventures. It can also collect Zakat, Sadaqah, Awqaf, and other endowments to support social, economic, and cultural development. Bayt al-Mal, indeed, can serve as a fiscal negotiator amid the excess and the deficit segments of an Islamic state. It also can contribute to implement public services and create the necessary physical infrastructures. Hence, Bayt al-Mal manages all moveable and immovable resources of an Islamic state that are held by and assigned to it, for example, Jizyah, Fay, Zakat, Wakf, Khums, Ushr, Kharaj, Hidden wealth, Luqatah, deceased wealth, blood money, Fines & confiscated assets, which are permitted by Islamic Shari'ah to eradicate hardcore poverty. Finally, this study assumes that more research can explore the workability of other sources of funds for Bayt al-Mal that can promote Islamic financial instruments to exploit resources from Islamic capital, money, and derivate markets. Besides, research is also required to examine other potential sectors where Bayt al-Mal can contribute.

References:

1 Al-Mawardi, *Abu al-Hassan. al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (The Laws of Islamic Governance). Translated by Asadullah Yate, London: Ta-Ha Publishers Limited, 2005, p. 301.

2 Tahir, Hailani Muji. *Institusi BaitulMal dalam Pembangunan Negara. Bangi*: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007, p.15.

3 Zallum, Abd al-Qadim. *Funds in the Khilafah State (Al-Amwal fi Dowlat Al-Khilafah)*. 2nd Edn, London: al-Khilafah Publications, 1998, p.14.

4 Rahman, Md Habibur, 'Bayt al –Mal and its Role in Economic Development: A Contemporary Study'. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 2(2), 2015, pp. 21-43.

5 Tahir, Hailani Muji, op. cit., 2007, p.15.

6 *Al- Athir, Ali ibn. Al-Kamil fi al-Tarikh* (The Complete History). Composed in ca. 1231, Beirut: al-Maktaba al-Assrya, 2008, p.290.

7 Abu Yusuf. *Kitab al-Kharaj.* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, p.36.

8 Tahir, Hailani Muji, op. cit., 2007, pp.16-19.

9 Al Qur'an, 9:103.

10 Al Qur'an, 33:33.

11 Al Qur'an, 21:73.

12 Al Qur'an, 59:7

13 Al Qur'an, 9: 29.

14 Hamidullah, Muhammad. *Tolerance in the Prophet's Deeds at Medina.* Print copy of lecture organized by UNESCO, 1980.

15 Hasanuzzaman, S. M. *The Economic Functions of the Early Islamic State.* International Islamic Publishers, Karachi, 1989, p.170.

16 Peerzade, Sayed Afzal. Jizyah: A Misunderstood Levy, *JKAU: Islamic Econ.* Vol. 23, No. 1, 2010, pp. 149-159.

17 Bhargava, K.D. *A Survey of Islamic Culture and Institutions,* Kitab Mahal, Allahabad, 1981, p. 30.

18 Islahi, Abdul Azim. *Kharaj and land proprietary right in the sixteenth century: An example of law and economics.* Online athttps://mpra.ub.uni-muenchen.de/18231/MPRA Paper No. 18231, 2006, Islamic Economics Research Center, KAAU, Jeddah, KSA.

19 Al Qur'an, 9:60

20 Al Qur'an, 8:41

21 Al Qur'an, 59:7

22 Walker Arnold, Thomas. *Preaching of Islam: A history of the propagation of the Muslim faith*. Constable & Robinson Ltd, 1913, p. 60

23 Hamidullah, Muhammad, *Introduction to Islam, Ch. 12 "The Status of non-Muslims in Islam",* New Delhi: Kitab Bhavan Publishers, 1992, pp.406-442

24 Possumah and Ismail **(**2012**)**, Baitul Mal and Legal Constraint: Public Wealth Management in Malaysian Context, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol.2, no.11, pp. 27-52

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

ড. মো. ফজলুল হক*

Abstract: Abstract: Arab nationalism is a ideology that asserts the Arabs'interest and promotes the unitmy of Arab people, celebrating the glories of Arab civilization, the language and literature of the Arabs, calling for rejuvenation and political union in the Arab world. Its central premise is that the peoples of the Arab world, from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean, constitute one nation bound together by common ethnicity, language, culture, history, identity, geography and politics. One of the primary goals of Arab nationalism is the end of Western influence in the Arab world, seen as a "nemesis" of Arab strength, and the removal of those Arab governments considered to be dependent upon Western power. It rose to prominence with the weakening and defeat of the Ottoman Empire in the early 20th century and declined after the defeat of the Arab armies in the Six-Day War. Personalities and groups associated with Arab nationalism include King Faisal of Iraq, Egyptian President Gamal Abdel Nasser, the Arab Nationalist Movement, Libyan leader Muammar Gaddafi, the Palestine Liberation Organization, the Arab Socialist Ba'ath Party which came to power in Iraq for some years and is still the ruling party in Syria, and its founder Michel Aflaq. Pan-Arabism is a related concept, in as much as it calls for supranational communalism among the Arab states.

ভূমিকা

আরব জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ আরব সভ্যতার গৌরব, ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যের অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য আরব জনগণের ঐক্যের মাধ্যমে আরব বিশ্বে নবজাগরণ সৃষ্টি করে একটি সংযুক্ত আরব ইউনিয়ন গঠনের আহবান জানায়।[১] এর মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত আরব বিশ্বের মানুষ জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পরিচিতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিকভাবে আবদ্ধ হয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠন করা।[২] আরব জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আরব বিশ্বে পশ্চিমা প্রভাবের অবসান করা। কারণ আরব জাতীয়তাবাদীগণ মনে করেন আরবের উপর পশ্চিমা শক্তি অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার অব্যাহত রেখেছে এবং পশ্চিমা শক্তির উপর নির্ভরশীল বলে বিবেচিত আরব সরকারকে অপসারণ করা প্রয়োজন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দূর্বলতা ও পরাজয়ের সাথে জাতীয়তাবাদীদের এ ধারণাটি সর্বাধিক সমার্থক বলে প্রতিয়মান হয়। আরব জাতীয়তাবাদের সাথে সর্বাধিক যুক্ত ব্যক্তি, দল ও রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম তৎকালীন ইরাকের রাজা প্রথম ফয়সাল, মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের, আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলন, লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি, ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা, আরব সমাজতান্ত্রিক বাথ পার্টি, সিরিয়ার বার্থ পার্টি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা মিশেল আফলাক।[৩] প্যান-আরববাদ সম্পর্কিত ধারণার মাধ্যমে আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রাতিগ সাম্প্রদায়িকতার দাবি করে।

আরব জাতীয়তাবাদের আদর্শ

আরব জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করেন যে উনিশ-বিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উত্থানের পূর্বে আরব জাতি ঐতিহাসিক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে আরব জাতি ক্রমান্বয়ে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতিকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এ অঞ্চলে একটি বলয় তৈরীর চেষ্টা করে। আরবী ভাষা ও ইসলাম আরব জাতির স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য বিশারদ এবং আরব ঐতিহাসিক ড. ইউসুফ এম চৌইরির (Dr. Youssef

---

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

M. Choueiri) মতে "আরবদের সচেতনতার পাশাপাশি জাতি এবং এর সমস্ত উপাদানগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের তাদের প্রয়াসকে প্রতিনিধিত্ব করে।"[৪]

আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে মূলত তিনটি ধারা বিদ্যমান (ক) আরব জাতি, (খ) আরব জাতীয়তাবাদ এবং (গ) প্যান-আরব ঐক্য। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ আরব বিদ্রোহে আরব জাতীয়তাবাদী বার্থ পার্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেয়। তারা মনে করে আরব জাতীয়তাবাদীরা একই জাতির অন্তর্ভূক্ত। কারণ তারা আরবীতে কথা বলে এবং আরব বিশ্বে বাস করে। আরব জাতীয়তাবাদ আরব জাতির জন্য একক বৈশিষ্ট্য এবং গুনাবলীর সমষ্টি। প্যান-আরব ঐক্য হলো আধুনিক ধারণা যা আরব দেশগুলোকে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে একক রাষ্ট্র গঠনের জন্য একত্রিত করার প্রচেষ্টা।[৫] ১৯৮০'র দশকে আরব জাতীয়তাবাদের কাঠামোয় পৃথক আরব দেশগুলোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় দেশপ্রেমকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এটি আরব উপদ্বীপকে সেমিটিক জনগণের (কনানীয়, অরামীয়, আসিরিয়ান, ব্যাবিলনীয়, ম্যাসোপটেমিয়া) আদি জন্মভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে, যা প্রাচীন পূর্ব সংস্কৃতিকে যুক্ত করে মিসর ও উত্তর আফ্রিকাকে আরব সংস্কৃতির বলয়ে পরিণত করে।[৬]

আরব জাতীয়তাবাদকে আরবী ভাষায় আল-কাওমিয়া আল-আরবিয়া (القومية العربية) বলা হয়। আধুনিক আরবী ভাষায় স্বতন্ত্র দুটি শব্দ আছে। কওমিয়া (قـومـيـة) কওম শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উপজাতি/জাতিগত/জাতীয়তা এবং ওয়াটানিয়া (وطنية) শব্দটি ওয়াতান শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ স্বদেশ/স্বদেশের দেশ। কওমিয়া শব্দটি আরব জাতির সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে ওয়াটানিয়া শব্দটি একক আরব রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল। প্যান-আরববাদকে আরব জাতীয়তাবাদের একমাত্র বৈধ রূপ বলে বিবেচনাকারীগণ কখনও কখনও ওয়াটানিয়াকে আঞ্চলিকতা হিসেবে অস্বীকার করেন।[৭]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে কওমিয়া ধারণাটি পর্যায়ক্রমে বামপন্থী রূপলাভ করে আরব ঐক্য গঠনের দিকে প্রসারিত হয়। এই চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত দলগুলো সর্বসম্মতভাবে ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনি, একদিকে আরবজাতীয়তাবাদ অপরদিকে ইসরাইল বিরোধী মনোভাব এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কওমিয়া'র পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেন মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের। তিনি আরব বিশ্বব্যপী প্যান-আরব আদর্শের সংস্করণ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক উভয়ভাবে প্রচেষ্টা চালান। কওমিয়া সমর্থক বেশী থাকলেও নাসেরের মৃত্যুর পর ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে (৫-১০ জুন) আরব (মিসর, সিরিয়া ও জর্দান)-ইসরাইলী যুদ্ধে আরবশক্তির পরাজয়ের ফলে কওমিয়া আদর্শের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। আরব নীতিনির্ধারকদের মধ্যে বর্তমান প্রধান প্রভাবশালী আদর্শ ওয়াটানিয়া।[৮]

আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান

১৮৮০ দশকের শুরুতে ১৯ শতকের শেষভাগে মিসর এবং পূর্ববর্তী অঞ্চলসমূহে জন্মভূমির প্রতি আনুগত্যের অনুভূতি বিকশিত হয়, তবে এটি আরব জন্মভূমির প্রতি জাতীয়তাবাদী রূপ লাভ করতে পারেনি। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর প্রযুক্তিগত সাফল্য এবং দেশপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে আরব বিশ্বে এরূপ জাগরণের সৃষ্টি হয়। এ সময় আরব দেশে পশ্চিমা দেশগুলোর খ্রিস্টান মিশনারী ও বিভিন্ন পেশার শিক্ষিত ব্যক্তিদের অবাধ আগমনের ফলে আরব রাজনৈতক পুনর্জাগরণ শুরু হয়, ফলে আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক গোপন সংস্কারপন্থি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

১৮৬০ এর দশকে তৎকালীন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধী মাশরিক এবং মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে আরব জন্মভূমির আন্দোলনের বহুমাত্রিকতায় প্রকাশিত সাহিত্য জনমনে সংবেদনশীল তীব্রতা সৃষ্টি করে, যা পাশ্চাত্য ঘেষা খ্রিস্টানদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, মাশরিক বা মাশরেক বলতে আরব বিশ্বের পূর্ব অংশ, পশ্চিশ অংশ এবং পূর্ব-উত্তর আফ্রিকার অঞ্চলসমূহকে বোঝায়। বাহরাইন, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, ওমান, ফিলিস্তিন, কাতার, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইয়েমেনের রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে এ অঞ্চল গঠিত। অপরদিকে মেসোপটেমিয়া পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী উর্বর অঞ্চল ইরাক, কুয়েত, সিরিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ, তুরস্ক ও ইরান অঞ্চল নিয়ে গঠিত। মাশরিক অঞ্চলের আরব জন্মভূমির দাবীতে দেশপ্রেমিকদের দৃষ্টিতে ইসলাম, আরবদের বিজয়, সাংস্কৃতিক গৌরব ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদের কারণে প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে। জাতীয়তাবাদীগণ এজন্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতা এবং ইসলাম থেকে বিচ্যুতিকেই অনেকাংশে দায়ী বলে

মনে করেন, এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে পতনের দিকেও ধাবিত করে। সংস্কারপন্থীগণ ওসমানীয় ও মিসরীয় সরকারকে এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেন। কারণ তারা ইসলাম পরিপন্থি পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুশীলনকে গুরুত্ব দিচ্ছিল। আরব দেশপ্রেমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইসলামী সরকারগুলো সত্যিকারভাবে ইসলামকে পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার, তা নাহলে পরবর্তীতে সাংবিধানিক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।[৯]

সিরিয়া, লেবানন এবং আরবের কিছু কিছু অঞ্চলে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আধিপত্যের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে লেবাননের একজন খ্রিস্টান দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, কবি ও সাংবাদিক ইব্রাহিম আল-ইয়াজিজি[১০] আরবদের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ওসমানীয় আধিপত্য বিরোধী আন্দোলনের আহবান জানায়। ১৮৭০ -এর দশকের শেষদিকে ইব্রাহিম আল-ইয়াজিজির এ আহবানে সাড়া দিয়ে একটি গোপন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এই দলের সদস্যরা বৈরুতে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্ল্যাকার্ড বহন করে। এদিকে লেবানন এবং দামেস্কে উল্লেখযোগ্য মুসলিম একইভাবে গোপন আন্দোলন গড়ে তুলে, যদিও তারা খ্রিস্টান আন্দোলনকারীদের অগ্রাহ্য করেছিল। মুসলিম আরব সমাজগুলো সাধারণত স্বায়ত্ত্বশাসিত বৃহত্তর সিরিয়াকে তখনও ওসমানীয় শাসনের অধীনে মনে করতো।

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে সিরিয়ার খ্রিস্টান লেখক ফ্রান্সিস মাররাশ (Francis Marrash) জন্মভূমির ধারণাটি জাতীয় ধারণার সাথে কিছুটা পৃথক করে বৃহত্তর সিরিয়ার উত্তরোত্তর প্রসারের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেন।[১১] উল্লেখ্য ফ্রান্সিস মাররাশ ফ্রান্সিস বিন ফাতাল্লাহ বিন নাসরাল্লাহ মারশ সাধারণত ফান্সি আল মাররাশ বা ফ্রান্সিস মারশ আল-হালাবী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সিরিয়ার একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত, প্রচারক, লেখক, চিকিৎসক এবং আরব রেনেসাঁর কবি হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর বেশীরভাগ রচনা বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং জ্ঞানবিদ্যার আলোকে বিকশিত হয়। তিনি জাতীয় পরিচয়ের পাশাপাশি জাতীয়তার জন্য ভাষার বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে হাসান আল-মার্সাফি (Hasan al-Marsafi) জন্মভূমি এবং জাতি'র মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। বিশ শতকের শুরুর দিকে কিছুসংখ্যক আরব জাতীয়তাবাদীগণ আরবের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যা ২০ শতকের আরব জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আরব জাতীয়তাবাদের এই নতুন সংস্করণটি মিসরীয় মুসলিম পণ্ডিত মুহাম্মদ আবদুহ'র (Muhammad Abduh) ইসলামী আধুনিকতাবাদ এবং আরব পুনর্জাগরণ দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেন। মুহাম্মদ আব্দুহ ছিলেন একজন মিসরীয় ইসলামী পণ্ডিত, আইনবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি ইসলামী আদর্শবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। তিনি বিশ্বাস করেন আরবের মুসলিম পূর্বপুরুষরা মানবজাতির উপর যৌক্তিকতা প্রদান করেছিলেন এবং পশ্চিমা প্রভাবে আধুনিকতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। সুতরাং যখন ইউরোপ ইসলামের আধুনিকতাবাদী আদর্শ গ্রহণ করা থেকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন মুসলমানরা ইসলামের সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়।[১২] আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদকে তিনি প্রভাবিত করেছিলেন, কারণ আরবের প্রকৃত ইসলামের পূর্বপুরুষগণ আরব সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ এবং মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসেবে আরবদের পুনরুদ্ধারে নিবেদিত হন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে আবদ আল-রহমান আল-কাওয়াকিবি (Abd al-Rahman al-Kawakibi) প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন "ওসমানীয় সাম্রাজ্য তুর্কি ও আরব উভয়ই হওয়া উচিত, পরবর্তীতে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন করা উচিত"।[১৩]

আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে আরবের পূর্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদগণ প্যারিসে আল-ফাতাত (al-Fatat) বা ইয়াং আরব সোসাইটি (Young Arab Society) ওসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি গুপ্ত আরব জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪] এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিলো স্বাধীনতা অর্জন করা এবং বিভিন্ন আরব অঞ্চলসমূহকে একত্রীকরণ করা। এই সংস্থা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সংস্কার আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আবদুল আল-মিরজাইয়ের মতো অনেক বিপ্লবীদের অন্তর্ভূক্ত করে। তুরস্কে এনভার পাশা নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পর এই সংস্থা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়। এই সংস্থা তুরস্কের যুবতুর্কী আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল "আরব রাষ্ট্রগুলোর মান আধুনিক দেশগুলোর স্তরে উন্নীত করা"। আল-ফাতাত প্রথম দিকে আরব বিশ্বেও রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতার চেয়ে একত্রীভূত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তর স্বায়ত্বশাসনের আহবান

করে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আল-ফাতাত প্যারিসে একটি আরব কংগ্রেসের আয়োজন করে। এ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল আরব বিশ্বের অন্যান্য বিরোধী ব্যাক্তিদের সাথে কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা করা। ওসমানীয় কর্তৃপক্ষ এ সংগঠন এবং এর সদস্যদের আক্রমণ শুরু করলে আল-ফাতাত আত্মগোপনে চলে যায় এবং গুপ্ত অবস্থায় তারা আরব প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ঐক্যের আহবান জানায়।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণে আরব জাতীয়তাবাদীগণ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও আরব জাতীয়তাবাদের ধারণাটি বেশীরভাগ আরবদের উপর কার্যত তেমন কোনও প্রভাব ফেলেনি, কারণ তারা নিজেদের ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অনুগত বলে মনে করতেন। ব্রিটিশরা তাদের পক্ষে মক্কার শরীফ হোসেনকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চলাকালীন আরব বিদ্রোহ শুরু করতে প্ররোচিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানীয় সাম্রাজ্য পরাজিত হলে শরীফ হেসেনের পুত্র ফয়সাল ইবনে আল-হুসাইন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে প্রবেশ করে। ফয়সাল ইবনে আল-হুসাইন ইরাকের বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও সামরিক অফিসারসহ আল-ফাতাত দলে যোগদান করে হেজাজ এবং পূর্ববর্তী অঞ্চলসমূহের সমন্বয়ে একটি আরব রাস্ট্র গঠন করেন।

দামাস্কাস আরব জাতীয়তাবাদী আন্দেলনের জন্মভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ফয়সালের রাষ্ট্র গঠনের পরে স্থানীয় আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলকারীদের মধ্যে আরবি ভাষা ও ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে একটি একক স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। এতে বৃহত্তর আরব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে উত্তেজনা দৃশ্যমান হয়। সিরিয়ার অভিজাত পরিবারের প্রবীণ জাতীয়তাবাদী সদস্য, ফয়সালের সমর্থক অপেক্ষাকৃত তরুণ জাতীয়তাবাদী সদস্য, হেজাজ, ইরাক, সিরিয়ার সামরিক কর্মকর্তা, ফিলিস্তিন এবং সিরিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। প্রবীন নেতা এবং ফয়সালের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী রিদা পাশা আল-রিকাবি (Rida Pasha al-Rikabi) ছিলেন প্রবীনদের অন্যতম। যদিও তরুন জাতীয়তাবাদীদের কোন নির্দিষ্ট নেতা ছিল না, তবে আল-ফাতাত এর তরুন সদস্যরা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে আরব ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি (আল-ইসতিকলাল) গঠন করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগষ্ট ব্রিটিশ ম্যানডেটরি শাসনের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে আরব ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি (AIP) প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ ইজ্জত দরওয়াজা (Muhammad Izzat Darwaza) ফাহমি আল-আব্বোশি, মুইন আল-মাদি, আকরাম জুয়াতির, আজাজ নুওয়াহিদ, রশিদ আল-হাজ্জ ইব্রাহিম, সহি আল-খাদ্রা এবং সেলিম সালামাহ এর সহযেগিতায় এই দলটি পতিষ্ঠা করেন। এর মূল লক্ষ্য ঐক্য ও সম্পূর্ণ আরবের স্বাধীনতা অর্জন। এই পার্টির সদস্যদের মধ্যে ইজ্জত দরজা এবং শুকরি আল-কাওয়াতলী (Shukri al-Quwatli) ছিলেন অন্যতম। দামেস্ক এবং পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন শহরে এ পার্টির শাখা প্রতিষ্টিত হয়। আল-ইসতিকলাল ফয়সালের নিকট থেকে রাজনৈতিক ও আর্থিক সমর্থন পায়, পক্ষান্তরে আল-ফাতাত অভ্যন্তরীণ বৃত্তের উপর নির্ভর করে টিকে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন মূলত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অস্ত্র হিসেবে আরব জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা এবং আদর্শের প্রধান পৃষ্টপোষক ছিল। তারা আরব বাহিনীকে এমন একটি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যার মধ্যে বেশীরভাগ আরব উপদ্বীপ ও উর্বর অঞ্চলসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ইরাককে ব্রিটিশ এবং সিরিয়া-লেবাননকে ফ্রান্সের ম্যান্ডেটরী শাসনের অর্ন্তভূক্ত করা হয়। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট শাসনামলে আরব জাতীযতাবাদ ইউরোপীয় শাসনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্রমবিকাশ

ব্রিটিশ এবং ফরাসী ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠার পর ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইরাকী বিদ্রোহীদের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শহরে বসবাসকারী জনগণের পাশাপাশি ইরাকের গ্রামীণ উপজাতিরাও তাদের বিদ্রোহ বন্ধ করে। ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের ইরাক নীতির কিছুটা পরিবর্তন করলেও সরকারীভাবে ব্রিটিশদের ভূমিকা বলবৎ ছিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার দ্রুজ (Druze) বিদ্রোহীরা ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। দ্রুজ হলো পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত আরবি ভাষাভাষি একটি রহস্যবাদী গোষ্ঠী। এরা নিজেদের একেশ্বরবাদের লোক হিসেবে পরিচয় দেয়। মেডিয়ানের জেথ্রোকে দ্রুজের পূর্বপুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারা হামজা ইবনে আলী ইবনে আহমদ, ষষ্ঠ ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম বিন আমর, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং পিথাগোরাস প্রমূখের শিক্ষার উপর

গুরুত্বরোপ একেশ্বরবাদী চর্চা করে। এই বিদ্রোহ পরবর্তীকালে সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষকরে দামেস্কে প্রচন্ড বিদ্রোহ শুরু হয়। ফরাসী বাহিনী শহরটিতে প্রচন্ড গোলাবর্ষণ করে, ফলে হাজার হাজার লোক মারা যায়। বছরের শেষদিকে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। সিরিয়ার স্বাধীনতা যাতে অর্জন করতে না পারে এ জন্য ফরাসী বাহিনী আরও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই মিসরে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়। পরবর্তী তিন বছর আন্দোলন অব্যাহত থাকার পর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আলোচনা সাপেক্ষে ব্রিটিশ মিসরকে স্বাধীনতা দিতে সম্মত হয়। মিসরীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক নেতারা আরব জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে মিসরীয় জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে।[১৫]

মিসর, ইরাক, সৌদি আরব এবং উত্তর ইয়েমেনের আপেক্ষিক স্বাধীনতা আরব জাতীয়তাবাদকে এই অঞ্চলে উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মসূচি এগিয়ে নিতে যথেষ্ট উৎসাহিত করে। ঐতিহাসিক ইউসুফ চৌইরির (Youssef Choueiri) মতে "জেরুজালেমে প্যান-ইসলামিক সম্মেলনের সময় প্রথম জনসন্মুখে প্যান-আরব নীতির গুরুত্ব উত্থাপন করা হয়, যা মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান উন্নতিতে প্যালেসটাইনে ইহুদিবাদের (Zionism) প্রসার ঘটায়।" পরবর্তীতে আরব প্রতিনিধিরা পৃথক একটি সম্মেলনে মিসর, আরব উপদ্বীপ এবং উর্বর অঞ্চলের প্রতিনিধিদের একত্রিত করে আরবের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে প্যান-আরবীয় আদর্শের তিনটি মূলনীতি ঘোষণা করে।

১। আরব দেশগুলোকে নিয়ে একটি অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য অঞ্চল গঠন করা;

২। প্রতিটি আরবদেশ তাদের একক প্রচেষ্টা এবং ঐক্যের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইস্যুতে একে অপরের বিরোধিতা করবেনা;

৩। আরব জাতির স্বাতন্ত্র ও মর্যাদাবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় উপনিবেশবাদকে প্রত্যাখান ও প্রতিহত করা।

অদূর ভবিষ্যতে আর একটি সম্মেলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কিন্তু ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফয়সালের মৃত্যু এবং ব্রিটিশ বিরোধিতার কারণে সম্মেলনটি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এদিকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগষ্ট জেরুজালেম সম্মেলনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের নেতৃত্বে আরব ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি এবং ইরাকের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা আল-ফাতাত সংগঠিত হয়। আরব ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টির (AIP) বেশিরভাগ কার্যক্রম ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রিভূত ছিল, তবে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধে আরব প্রতিরোধকে শক্তিশালী করার উপায় হিসেবে আরব ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করে ফিলিস্তিনে ইহুদি জনবসতি যাতে বৃদ্ধি না পায় সে দিকেও দলটি যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের আগষ্টে লেবাননে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত বেসামরিক পেশাজীবীদের সমন্বয়ে আরব দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক বাধা অপসারণের পাশাপাশি আরবে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করার জন্য লেবানন ন্যাশনাল অ্যাকশন (LNA) পার্টি গঠিত হয়।[১৬]এ সংস্কারবাদী আন্দোলন ভূস্বামীদের এবং সামন্ততন্ত্রবাদীদের ক্ষমতা হ্রাস করে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়। এলএনএ এর কার্যক্রম স্থানীয় জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় ভূস্বামী এবং ইহুদিদের জন্য জমি ক্রয়কারী ইউরোপীয়দের ক্ষুন্ন করে। এলএনএ ১৯৩০ এর দশক জুড়ে আরবে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করলেও ১৯৪০ এর দশকে এসে তা হ্রাস পায়।

ফিলিস্তিনি শহর ইয়াবাদে ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক সিরিয়ার আরব গেরিলা নেতা ইজ্জ আদ-দিন আল কাসেম (Izz ad-Din al-Qassam) কে হত্যার পর ফিলিস্তিনে আরব-ইহুদি উত্তেজনা চূড়ান্ত পর্যায়ে বেড়ে যায়। একটি আরবীয় সশস্ত্র গ্রুপ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ এপ্রিল বালিয়া নামক গ্রামে একটি গাড়ী আটকে রেখে একজন ইহুদি নাগরিককে হত্যা করলে আরব-ইহুদি উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ইহুদিরা জাফার কাছে দু'জন আরব কৃষককে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ফিলিস্তিনে আরব বিদ্রোহ শুরু হয়। আরব ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি, ফিলিস্তিনের উল্লেখযোগ্য নেতা এবং জেরুজালেমের গ্রান্ড মুফতি আমিন আল-হুসেনি (Amin al-Husseini) আরব দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ বিদ্রোহ মোকাবেলা করার জন্য উচ্চতর আরব জাতীয় কমিটি গঠন করে [Arab Higher Committee (AHC)]। এই কমিটি ইহুদি অভিবাসন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইহুদিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে

বয়কট করার জন্য একটি সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। ফিলিস্তিনের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে মিসর ও সিরিয়ায় একই রকম উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে। মিসরে সপ্তাহব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভের ফলে শেষ পর্যন্ত মিসরীয় সংবিধান পুরুদ্ধার হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিব্যাপী অনুষ্ঠিত সাধারণ ধর্মঘটের ফলে ফরাসী সরকার সিরিয়াকে স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা সাপেক্ষে চুক্তির জন্য সম্মত হয়। ফিলিস্তিনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার অনড় অবস্থান গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে আমিন আল-হুসেনি লেবাননে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করে এবং আরব জাতীয় কমিটি (AHC) ভেঙে দেয়া হয়। ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আমিন আল-হুসেনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর সিরিয়ায় প্যান-আরব ব্লাউডন সম্মেলন (Bloudan Conference) আয়োজনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন, এই সম্মেলনে সিরিয়া এবং আরব বিশ্বের ৫২৪ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। যদিও আমিন আল-হুসেনি এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। লেখক আদিব দাভিশার মতে "১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এবং অভ্যুত্থান শুরুর পরেও এই সম্মেলনের প্রভাব আরব জাতীয়তাবাদী মনোভাব বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখে ছিল এবং আরব সরকারগুলোর মধ্যে 'সংহতি' বিকাশের সূচনা করে।"[১৭]

এদিকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইরাকে গোপনে আরব জাতীয়তাবাদী দল [Arab Nationalist Party (ANP)] নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এএনপি আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব না নিয়ে শুধুমাত্র ইরাকের আভ্যন্তরিণ ঘটনা ও নেতাদের প্রভাবিত করার মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করে রাখে। ইরাকের রাজা ছিলেন এর একজন নেতা। ইরাকের রাজা গাজী কুয়েতকে সংযুক্ত করে ইরাকের একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কুয়েতের অনেক আরব জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তেল আবিষ্কারের পর কুয়েতের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে শুরু করে। বিদ্রোহ দমনের পর ইরাক সরকার আল সাবাহ পরিবারকে ইরাকে নিরাপদ আশ্রয় দেয়। তখনও কুয়েত অঞ্চল ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিল। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় গাজী মারা যায়। একই বছর আমিন আল-হুসেনি লেবানন থেকে পলায়ন করে বাগদাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ইরাকী রাজনীতিতে প্যান-আরব মনোবল পুনরুজ্জীবিত করে তুলেন। গাজী ইরাকের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-সাইদ এবং রাজা আবদুল-ইলাহ'র নিকট প্যান-আরবীয় সহানুভূতিগুলো সমর্থনযোগ্য করতে পারেনি।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে রশিদ আলী আল-গায়লানী (Rashid Ali al-Gaylani) প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-সাইদ এর স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করলেও যুদ্ধরত ব্রিটেন ও জার্মান সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখেন। চাপের মুখে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জানুয়ারি রশিদ আলী আল-গায়লানী পদত্যাগ করলে নূরী আল-সাইদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইরাকের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্রিটিশের হস্তক্ষেপের ফলে আরব জাতীয়তাবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। আন্দোলনকারীদের একটি দল এপ্রিল মাসে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রশিদ আলী আল-গায়লানকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসায়। আল-গায়লানী এ অভ্যুত্থানে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের সমর্থনের জন্য জার্মান সেনাবাহিনীর সহায়তা চাইলেও জার্মান সেনাবাহিনী কোন সহায়তা করেনি। জার্মানপন্থী ফ্রান্সের ভিসি সরকার সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার সাথে সাথে ব্রিটেন ইরাককে অক্ষশক্তির পক্ষে যোগদান থেকে বিরত রাখতে পুনরায় ইরাক দখল করে নেয়। ১ জুনের মধ্যে আল-গায়লানী এবং আমিন আল-হুসেনি জার্মানীতে পালিয়ে যায়। অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়।

আমিন আল-হুসেনি, অ্যাডলফ হিটলার এবং অন্যান্য নাৎসি নেতাদের সাথে ক্রমান্বয়ে পরিচিত হন। ফিলিস্তিনের ইহুদি সমস্যা বিষয়ে নারাজি এবং আরব নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।[১৮] মুফতি আমিন আল-হুসেনি এক বিবৃতিতে আরবদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান করে বলেন "যেখানেই ইহুদিদের পাবেন সেখানেই হত্যা করবেন"।[১৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে জার্মানীর নাৎসি সরকার রেডিও'র মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্য বিরোধী এবং আরবিভাষী মুসলমানদের পক্ষে সেমিটিক বিরোধী বার্তা প্রচার করে।[২০]

এদিকে ইরাকের সংঘাত আরব বিশ্বজুড়ে ক্রোধ ও হতাশাকে উস্কে দেয়। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদী চেতনাবোধের স্বীকৃতি দেয়। তারা মনে করে ইরাকের ঘটনাবলী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব অ্যান্টনি ইডেন (Anthony Eden) এ অঞ্চলে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব সহজ করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্যান-আরব সম্পর্ককে সমর্থন করে। এ ধরণের পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মিসরে আরব ইউনিয়ন ক্লাব গঠিত হয়। যা মিসর এবং আরব বিশ্বের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধারণাকে আরও সুদৃঢ় ও বিকশিত করে। পরবর্তীকালে বাগদাদ, বৈরুত, জাফা এবং দামেস্কে আরব ইউনিয়ন ক্লাব এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসরের প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা এল-নাহস এই ক্লাবের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় আরব ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য একে "সিসটার আরব ন্যাশন্স" (Sister Arab Nations) বলে অভিহিত করেন।[২১]

আরবলীগ প্রতিষ্ঠা

রশিদ আলী আল-গায়লানীর ব্যর্থতার পরে আরব বিশ্বের নেতৃত্ব বেশীরভাগ ইরাক ও মিসরের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিকশিত হয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে নূরী আল-সাইদ এর নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আরব ঐক্যের জন্য উৎসাহিত করা হলে তিনি Fertile Crescent Union এর মাধ্যমে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে আরবের উর্বর অর্ধচন্দ্রাকার অঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বন্ধন অত্র অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরী করে। এই রাজ্যগুলোকে পর্যায় ভিত্তিক একত্রিত করণের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের ইহুদিদের সীমিত স্বায়ত্বশাসন, লেবাননের খ্রিস্টানদের বিশেষ অধিকারের সাথে সিরিয়া, ট্রান্সজর্ডান, ফিলিস্তিন এবং লেবাননকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। অতপর ইরাক একটি আরব লীগ গঠন করবে, যেখানে আরব রাষ্ট্রসমূহ যোগদান করবে এবং এর অভ্যন্তরীণ, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয়ে তদারকি করবে।[২২] হাশেমিয়দের সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্খা, মিসরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এ প্রস্তাবে মিশ্রপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মিসরীয় সরকার নাহাস পাশা (Nahas Pasha) আন্ত-আরব সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্য কয়েকটি আরব রাষ্ট্রে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রভাবশালী আরব জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিরা মিসরের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। তাঁরা মনে করে পাশার প্রচেষ্টা নূরী আল-সাইদ এর Fertile Crescent Union প্রস্তাবের চেয়ে বিভিন্ন আরব সরকাগুলোর নিকট বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। কারণ সৌদি রাজপরিবারের বিরোধিতা, দামেস্কের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী হাশেমীয় পরিবারের নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্খা, লেবাননের মেরোনাইট খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়কে প্রশমিত করার জন্য আন্ত-আরব সম্পর্ক উন্নয়ন অপরিহার্য। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবরের মধ্যে ইরাক, সিরিয়া, সৌদি আরব, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান, ইয়েমেন এবং ফিলিস্তিনের নেতাগণ আলেকজান্দ্রিয়ায় এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যা আলেকজান্দ্রিয়া প্রোটোকল নামে পরিচিত।[২৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মিসরের নেতা জামাল আবদেল নাসের (Gamal Abdel Nasser) আরব জাতীয়তাবাদের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে তিনি আরব লীগের কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য সম্মিলিত আরব সুরক্ষা চুক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তানাহলে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং ইস্রারাইলে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ব্রিটিশ-মার্কিন যৌথ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবে। জামাল আবদেল নাসের সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করে এ অঞ্চলে পশ্চিমা শক্তিগুলোর আধিপত্যকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন। একই সময়ে তিনি স্নায়ু যুদ্ধের প্রভাব বলয় থেকে মিসরকে মুক্ত রাখার জন্য সোভিয়েত ব্লক মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সহায়তা এবং অস্ত্রের চালান গ্রহণ করে মিসরকে শক্তিশালী করেন। তবে উদীয়মান আরব জাতীয়তাবাদকে সাম্যবাদের প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রচার কল্পে তিনি এ অঞ্চলে স্নায়ু যুদ্ধের আধিপত্য রোধ কল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও সহায়তা পেয়েছিলেন। ধর্মীয় এবং সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে ফিলিস্তিন এবং ইহুদিবাদের প্রশ্নটি মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মূল বিষয় হলো ইহুদিরা ইহুদিবাদের নীতিবাক্য এবং আরব জাতীয়তাবাদীরা ইসলামের মূল নীতিকে সংজ্ঞায়িত করে স্ব স্ব অবস্থানে অনড় থাকে। এমতাবস্থায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে মানবতার বিপর্যয় হলেও প্যান-আরব জাতীয়তাবাদী আদর্শের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আরবদের দৃঢ়তাকে আরও মজবুত করে। ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পৃক্তদের বিশ্বাস ছিল প্যান-আরব ঐক্য ইস্রাইলের ধ্বংস সাধন করবে।

আরব জাতীয়তাবাদীরা সাধারণত ধর্মকে রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার না করে আরবদের ঐক্যের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়। আরবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টতা আরব জাতীয়তাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ১৯৪০ এর দশকে মিখাইল আফলাক (Michel Aflaq) সালাহ আল-দীন-বিটার এবং জাকি আল-আরসুজিসহ

সিরিয়ায় বার্থ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। আফলাক খ্রিস্টান হলেও ইসলামকে আরবের প্রতিভা এবং মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র আরব জাহানের প্রতিভূ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। যেহেতু আরবগণ ইসলামের প্রসারের মাধ্যমে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জন করেছে, সেহেতু ইসলামকে সর্বজনীন বার্তা হিসেবে গ্রহণ করা এবং আরব জনগণের পক্ষ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষা করা দরকার। মূল কথা হলো ১৯৬০ এর দশকে ইরাক ও সিরিয়ায় বাথবাদী সামরিক অভ্যুত্থানের পরে বাথবাদীরা সর্ব-আরব জাতীয়তাবাদের বিকাশে খুব কম অবদান রাখে।[২৪] এদিকে সৌদি আরবের রাজা ফয়সাল বিকল্প হিসেবে প্যান-ইসলামবাদের প্রচার করে এ অঞ্চলে আরব জাতীয়তাবাদ এবং সাম্যবাদের প্রভাব মোকাবেলার চেষ্টা করেন। তিনি এ ধারণাটির পক্ষে বিভিন্ন মুসলিম দেশ সফর করে মুসলিম বিশ্ব লীগ প্রতিষ্ঠার আহবান করেন। এ বিষয়ে তিনি জামাল আবদেল নাসের এর সাথে অপপ্রচার ও বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

আরব জাতীয়তাবাদের ক্রমাবনতি

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ছয়দিন ব্যাপী আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব জোটের পরাজয়ের ফলে আরব জাতীয়তাবাদী নেতা জামাল আবদেল নাসেরকে আল-মরাকা আল-মাসিরিয়া (*al-Ma'raka al-Masiriya*) নামে অভিহিত করা হয়। ফলে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অপরিবর্তনীয় ও সমন্বিত রাজনৈতিক পরিবর্তনের অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়। ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে দলীয় বিভক্তি ও আদর্শিক লড়াইয়ের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দেলন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রক্তন নাসেরপন্থী আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মার্কসবাদ-লেলিনবাদের পক্ষে প্রকাশ্যে নাসেরাবাদ ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আরব সমাজতান্ত্রিক বার্থ পার্টি যথাক্রমে বাগদাদ এবং দামেস্ক ভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পরাজয়কে বাদ দিলে জাতীয়তবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার কারণগুলোর মধ্যে-

১। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকের শুরুতে আরব সাম্রাজ্যবাদ ও পশ্চিমাপন্থী হিসেবে জাতীয়তাবাদী আবেগকে গুরুত্ব না দেয়া। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আবেদ দাভিশা'র (Adeed Dawisha) অভিমত "মিসর ও ইরাকে ব্রিটিশ উপস্থিতির অবসান করা, বাগদাদ চুক্তি ব্যর্থতা, জর্ডানের ব্রিটিশ চিফ অফ স্টাফ স্যার জন বাগোট গ্লোব (John Bagot Glubb) কে বরখাস্ত করা, লেবাননের পশ্চিমাপন্থী সমর্থক রাষ্ট্রপতি ক্যামিল চামৌনকে (Camille Chamoun) স্বাধীন ফুয়াদ শিহাবের (Fu'ad Shihab) স্থলাভিষিক্ত করা এবং বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে এক মিলিয়ন মৃত্যের আত্মত্যাগকারী আলজেরিয়রা ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির উপর জয়লাভ করেছিল জাতীয়তবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার অন্যতম বিষয়।[২৫]

২। আঞ্চলিক সংযুক্তি প্রসঙ্গে ইরাকের রাষ্ট্রপতি আবদুর করিম কাসিম এর 'প্রথম ইরাক' নীতি।

৩। উপজাতীয় মূল্যবোধের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ততা।

৪। ইরাকের সুন্নি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং সংখ্যালঘু শিয়া ও কুর্দি সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বয় হীনতা।

৫। আরব জাতীয়তাবাদের হ্রাসের সাথে সাথে ইসলামী পুনরুজ্জীবন বৃদ্ধি। ইসলামপন্থীরা সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদের প্রতি বিরূপ ছিল।

৬। বহুত্ববাদ, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আগ্রহের অভাব।

ঐক্যের চেষ্টা

১৯৪০ এর দশকে জর্ডানের প্রথম আব্দুল্লাহ এবং ইরাকের নুরি আল-সাঈদ ম্যান্ডেটরি শাসনের সময়কালে একটি বৃহত্তর আরব সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করে। আব্দুল্লার স্বপ্ন ছিল বৃহত্তর সিরিয়া রাজ্য গঠন। পাশাপশি নুরি আল-সাঈদ এর স্বপ্ন ছিল উর্বর আরব অঞ্চলকে একত্রিত করে বৃহত্তর আরব সাম্রাজ্য গঠন করা। কিন্তু আরব লীগ গঠন এবং এর

প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি আঞ্চলিক অখন্ডতার শর্তে তাদের কোন স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তাছাড়া ১৪ জুলাই আব্দুল্লার গুপ্তহত্যার ফলে এ ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিশ শতকের বেশিরভাগ সময় সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনের নেতৃত্ব নিয়ে মিসর এবং সিরিয়ার মধ্যে বিরোধ লেগে থাকে।[২৬] ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মিসর এবং সিরিয়া সাময়িকভাবে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠনে সম্মত হয়। এ সংযুক্তির সাথে ইরাক ও উত্তর ইয়েমেনকে অন্তর্ভূক্ত করার ফলে আরব রাজনীতির কেন্দ্রে মিসরের অবস্থান সিরিয়াকে ভাবিয়ে তোলে। একই বছর ইরাকে ১৪ জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে পশ্চিমা শক্তি এ অঞ্চলে আরব জাতীয়তাবাদের পতনের পথ খুঁজতে থাকে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলো কেবল অন্যান্য আরব রাজ্যে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সম্ভাব্য বিস্তার সম্পর্কেই উদ্বিগ্ন ছিল না, তারা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক তেল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। মিসরের আধিপত্য নিয়ে অসন্তুষ্টি এবং অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সিরিয়ায় অধিকতর মৌলবাদী সরকার ক্ষমতায় আসায় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নাসেরের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মিসরে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র শব্দটি প্রচলিত ছিল।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠনের অপর একটি ব্যার্থ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঐ বছর আরব জাতীয়তাবাদী বাথ পার্টি সিরিয়া ও ইরাকে ক্ষমতায় আসে। এ দুদেশকে একত্রিত করার জন্য মিসর প্রস্তাব দেয়। ১৭ এপ্রিল দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে বাথ পার্টির নেতারা কেন্দ্রীয়ভাবে মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের একক নেতৃত্বের প্রতি অভিযোগ করে। কিন্তু সিরিয়ায় নাসেরের সমর্থক, সামরিক বাহিনী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ নাসেরের নেতৃত্বের প্রতি অবিচল থাকে। অপর দিকে নাসেরের সমর্থকদের সাথে দামেস্ক এবং আলেপ্পোতে বৃহত্তর দাঙ্গায় ৫০ জন নিহত হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই সিরিয়ায় নাসেরপন্থী একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। দামেস্ক রেডিও স্টেশন এবং সেনাবাহিনীর সদর দফতর দখলের প্রয়াসে শতাধিক মানুষ নিহত হয় এবং ২৭ জন বিদ্রোহী কর্মকর্তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এর পর নাসের ইউনিয়ন গঠনের চুক্তি থেকে সরে আসেন এবং সিরিয়ান বাথবাদীদের ফ্রাসিস্ট এবং হত্যাকারী হিসেবে নিন্দা করেন।[২৭]

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠনের জন্য মিসর, ইরাক এবং উত্তর ইয়েমেন একটি সমন্বিত রাজনৈতিক কমান্ড গঠন করে। তবে ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দুটি পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়। ১৯৭১-১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মুয়াম্মার গাদ্দাফি লিবিয়া, মিসর, সুদান এবং সিরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করেন।[২৮] প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্বের প্রশ্নে এবং রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বিরোধের কারণে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভক্ত ভাবে এটি টিকে থাকে। অপর দিকে মুয়াম্মার গাদ্দাফি লিবিয়ায় এবং হাবিব বুরগুইবা (Habib Bourguiba) তিউনিসিয়ায় আরব ইসলামিক প্রজাতন্ত্র গঠনের চেষ্টা করে। আরবের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর ঐক্যের বিষয় চিন্তা করে হাবিব বুরগুইবা এ পরিকল্পনা প্রত্যাখান করে, যা পরবর্তীতে পূর্বঅঞ্চলীয় ইউনিয়নে পরিণত হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে ইরাকের প্রেসিডেন্ট আহমেদ হাসান আল-বকর এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল-আসাদ যৌথভাবে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি বাতিল করার জন্য কাজ করতে থাকে। তারা বাগদাদে জয়েন্ট ন্যাশনাল অ্যাকশন সনদে স্বাক্ষর করে, যা সম্পূর্ণ সামরিক ঐক্যের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক একত্রিকরণসহ ঘনিষ্ঠতম ঐক্যের একটি প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। দুই রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করার এ চুক্তিটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইরাকের উপ-রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেন আসাদের নিকট ক্ষমতা হারানো ভীতিজনক অবস্থান থেকে সরে আসতে হাসান আল-বকরকে বাধ্য করেন।[২৯] জুলাইয়ের পরে হাফেজ আল-আসাদ এবং সাদ্দাম হোসেন এর মধ্যে ঐক্যের বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকে। তবে আসাদ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পূর্ণ সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম এবং তাৎক্ষণিক উন্নয়নের নামে সিরিয়ায় ইরাকী সেনা মোতায়েনের ইরাকী দাবী প্রত্যাখান করে। পরবর্তীতে ইরাকী আধিপত্য এবং ইস্রাইলের সাথে যুদ্ধের আশঙ্কায় ধাপে ধাপে হাফেজ আল-আসাদ ঐক্য প্রক্রিয়া থেকে সরে আসে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সিরিয়ার ষড়যন্ত্রের কারণে আরব ঐক্যের আলোচনা অবশেষে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়।[৩০]

তথ্য নির্দেশ

১ Adeed Dawisha, "Requiem for Arab Nationalism", *Middle East Quarterly*, 2003, p.53.
২ Louise Fawcett, *International Relations in the Middle East,* p. 220.
৩ মিশেল আফলাক একজন সিরিয়ান দর্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী এবং আরব জাতীয়তাবাদী ছিলেন। জন্মভূমির স্বাধিকার, জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশে তিনি কাজ করেন। জীবদ্দশায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো The Battle for One Destiny 1958 and The Struggle Against Distorting the Movement of Arab Revolution 1975.
৪ Choueiri, Youssef. *Arab Nationalism – A History: Nation and State in the Arab World. Wiley-Blackwell,* 2000, p.23.
৫ *Ibid,* p.25.
৬ *Ibid,* p.26.
৭ Sela, Avraham. "*Arab Nationalism.*" *The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East.* Ed. Sela. New York: Continuum, 2002. p. 153.
৮ *Ibid,* p.154-155.
৯ Khalidi, Rashid. *The Origins of Arab Nationalism,* Columbia University Press, 1993, p. 7.
১০ ইব্রাহিম আল-ইয়াজিজি ছিলেন লেবাননের একজন খ্রিস্টান দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, কবি ও সাংবাদিক। তিনি লেবানন পর্বতে অবস্থানকারী মুতসারিফেটের গ্রীক ক্যাথলিক জনগোষ্ঠির অর্ন্তভূক্ত ছিলেন।
১১ Suleiman, Yasir, *The Arabic Language and National Identity: a Study in Ideology.* Edinburgh University Press. 2003, p. 114.
১২ Khalidi, Rashid, *op.cit,* p. 8.
১৩ *Ibid,* p. 9.
১৪ Choueiri, Youssef, *op.cit,* pp. 166-168.
১৫ Gershoni and Jankowski, *op.cit,* pp.40–41.
১৬ Choueiri, Youssef, *op.cit,* p. 93.
১৭ Dawisha, Adeed, *Iraq: A Political History from Independence to Occupation*. Princeton University Press.2009, p.117.
১৮ *The Israel-Arab reader: a documentary history of the Middle East conflict,* Walter Laqueur, Barry M. Rubin 2001, p. 51.
১৯ *Dalin, David G.&Rothmann, John F. (2008). Icon of Evil: Hitler's Mufti and the Rise of Radical Islam. New York: Random House. p. 4. ISBN 978-1-4000-6653-7. Retrieved 18 March 2011.* "History Shows That True Peace Is Not Possible with Arabs", Joshua P. Feiler, *The Palm Beach Post*, 9 May 1994. Retrieved 16 November 2010. Herf, Jeffrey. "Nazi Propaganda for the Arab World."*Google Books*. 30 January 2013.
২০ Herf, Jeffrey. "Nazi Propaganda for the Arab World."*Google Books*. 30 January 2013.
২১ Dawisha, Adeed, *op.cit,* p. 118.
২২ *Ibid*, p.119.
২৩ *Ibid*, p.123.
২৪ Sela, Avraham, *op.cit*, p. 154.
২৫ Dawisha, Adeed, "Requiem for Arab Nationalism". *Middle East Quarterly. Middle East Forum*, 2003.p. 61.
২৬ Charles Smith. "The Arab-Israeli Conflict", Louise Fawcett, *International Relations of the Middle East,* p. 220.
২৭ Seale, Patrick, *Asad, the Struggle for the Middle East,* University of California Press, 1989, p.83
২৮ *Ibid*, p. 155.
২৯ Dawisha, Adeed, *op.cit,* p. 118.
৩০ McDonald, Michelle, *The Kiss of Saddam*. University of Queensland Press, 2009, p. 128.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

Contribution and Achievements of Classical and Medieval Islam

Dr. Shahnaj Sultana[*]
Dr. Md. Harun-Or-Rashid[**]

Abstract: The article encompasses the origin and development of classical and medieval Islam. This article is also searching and highlighting the achievements of classical and medieval Islam. Islam originated in Mecca and Medina. Later it was disseminated in the different parts of the Muslim world. In the course of time Islam played a vital role in the literature, science, art and architecture and all the fields of human life. This article mainly focuses on nature of the classical and medieval Islam.

The early Muslim conquests were nominally directed by a central power with headquarters first in Arabia, then in the Umayyad capital at Damascus, Syria, and after 762 CE in Abbasid Baghdad in Iraq. For five centuries, after the Muslim empire reached the zenith of its western conquests in 732CE, it held its ground, receding only slowly in the West. During this era, the over-all political structure of the Mediterranean remained remarkably stable despite constant wars and periodical exchanges of territory between the three great religious empires of the Muslim, the Byzantine Greek Orthodox, and the Latin Catholic.[1]

Each bloc tended to expand away from the center of power. The Latins pushed northward seizing the Baltic regions and converting the western Slavs. The Byzantines evangelized the Balkans and spread into Russia. Islam continued its expansion into East and central Asia and Africa. Occasionally there were incursions like the twelfth and thirteenth-century Crusader bridgehead in the Levant, but they were successfully checked.

While religious ties remained strong within each of the three areas, political control disintegrated as each suffered similarly from poor communications, inadequate public finances, and a general decline in the prestige of their leaders, leaving each in approximately the same power relationship to the others as had obtained earlier. Boundaries between them were determined by religion.[2]

Each of the three principal religious groups was convinced of its own superiority; each aspired to rule the civilized world. Byzantium continued to claim territory it had lost despite its growing weakness. Islam divided the world into regions where Islam prevailed called *dar al-Islam* (world of Islam) and those yet to be Islamized or *dar al-Harb* (world of war). Between the two there could be no permanent peace, at best a long-term truce. The result was unceasing border warfare along the Muslim-Christian frontiers.[3]

Hereditary groups of professional soldiers were established in military feudal estates along the borders in both the Muslim and Greek Orthodox regions, Muslim and Byzantine feudalism the fief holder depended directly on his sovereign for his domain. They differed from Western feudalism, which was built on a hierarchy of fief holders, each directly responsible to his immediate overlord.

---

[*] Professor, Dept. of Islamic History & Culture, University of Rajshahi.
[**] Professor, Dept. of Islamic History & Culture, University of Rajshahi.

Rome had ruled an extensive part of all three regions. Roman institutions strongly influenced their development. Latin was still the language of administration and education in the Latin and Greek zones. The Muslim bloc was also a legatee of Roman influences in its law, administration, finance, philosophy, literature, and architecture, largely as a result of its Byzantine heritage.[4]

Although Islamic civilization reached the quintessence of its development in Baghdad between the eighth and tenth centuries, political control of the western provinces became progressively weaker as the Arab capital moved East. Since became an autonomous Arab kingdom in 756 CE, followed by Morocco in 788 CE, Tunisia in 800 CE and Egypt in 868 CE. Each country became virtually independent under its own local Muslim dynasty. By the mid-tenth century, the same process of political erosion began in the eastern region, until the Abbasid caliphs controlled only Iraq and parts of Syria. Although the region had distance of incursions by other religious blocs. Similarly in Europe the Latin Catholic and Greek Orthodox blocs were fragmented into numerous kingdoms. But among all three blocs, religion fostered a cultural and spiritual unity that continued along after political fragmentation. The Christian reconquest of Spain during the fifteenth century was there any considerable loss of Muslim territory. The Muslims who remained in Christian Spain became the first sizable Muslim minority group.[5]

Even after the political fragmentation of the Islamic world, language and faith supported an intellectual unity that made the educated Muslim accepted as a fellow "citizen" anywhere Islam was recognized. The famous traveller, Ibn Battuta, a native of Tangier, became the judge in Delhi. Ibn Khaldun, the historian and statesman born in Tunis, served various North African princes and became a chief judge in Cairo.

The Umayyad dynasty tried to keep the traditional Arab government led by the *soyyid*, or tribal chieftain. The latter owed his office to personal prestige derived from his noble lineage, although this alone did not determine the succession. Qualities of leadership and generosity were essential too. He was merely the first among equals, chosen democratically by the tribal council. His prerogatives did not infringe upon the essential equality of his followers. All had access to him for he was shrouded behind no elaborate ceremonial.[6]

The tribal system of government became increasingly difficult to maintain as the empire expanded, and the Abbasids incorporated of the traditions of their Iranian supporters, including the concept of kingship. The Iranian king had ruled through divine right which he inherited from a long line of previous rulers. Too much contact with the masses was thought to be defiling and to detract from the awe with which he should be regarded; therefore he was protected by an elaborate etiquette and ceremony. Under the Abbasids, the Iranian despot was merged with the Islamic theocratic representative of Allah, and the ancient Arab chief, although the attributes of a democratic chief were lost when the caliph became an outright autocrat.[7]

Gradually, the caliph became no less-despotic than the Byzantine rulers. Like the Roman emperors, both the Byzantine monarchs and the Abbasids caliphs had unlimited power. Although theory supported the election of both the emperor and the caliph, practice worked in the favor of heredity. The Byzantine emperor was also the titular head of the Greek Orthodox church, whereas the caliph was merely the administrator of the Islamic state with no power to alter the body of religious law. In the latter years of the Abbasid Caliphate, after it had become a prisoner of the Seljuk Turks, the caliphate lost all political or legal significance and was merely the symbol of Islamic unity.[8]

Under the reign of the sultan-caliph, an elaborate civil bureaucracy developed along Persian lines. It was headed by the *wazir* (Turkish, *vezir*), the caliph's helper who directed the civil administration. He supervised the various bureau *(diwan)* head, such as the treasury, the war office, and the posts. Each province also had its own *diwan*, but around the year 900 CE, they were incorporated into a central bureau with three main branches. Provincial governors had responsibility for local civil and military affairs, including tax collection. They increasingly asserted their independence of Baghdad until many became autonomous, acknowledging the caliph only by paying.

State income came from a number of sources: tribute from conquered lands; loot gained in battle; the alms tax, including the tithe paid on agricultural lands and products; taxes on non-Muslims; local imposts; money extorted from fallen officials or otherwise confiscated; and fees, tolls, and customs. Taxes were farmed out to the highest bidders and assessments were imposed collectively on local communities. Until the tenth century, the empire succeeded in raising adequate sums for its public expenses, such as frontier security, road maintenance and the payment of provincial officials. But by the tenth century, expenditure began to exceed income due to diminishing sources caused by the contraction of the Abbasid territories. Corruption, nepotism, and inefficiency have also undermined financial stability. Maladministration had become so prevalent that of some sixteen million dinars (the principal gold coin of the Muslim) collected in one year, only two million was used for public expenses. The rest is drained off to support the royal household and to pay exorbitant salaries to officials in the capital.[9]

Parallel to the civil bureaucracy were the Islamic courts headed by *kadis*, or judges, who interpreted the Sharia law. In the early Abbasid era, the caliphs themselves and their governors in the provinces assumed the kadi's function. By the eleventh century, regular judges were left with little power; the civil bureaucracy had usurped their function.

Even though much of the able-bodied Muslim's life was spent under arms, and Arab and Iranian tradition both emphasized courage and soldierly qualities, the civilization was not military. While the military elite frequently ruled behind the scenes, there was formal civilian leadership and the *wazir* outranked the general. Between the seventh and ninth centuries, the transformation of the caliph from a general to a chief administrator was completed.[10]

Although official posts were not hereditary, most appointments were made by a small circle of families who possessed intimate knowledge of government operations, were familiar with conditions throughout the empire, and had the right connections. Not infrequently positions remained within the same family or group of families for generations.

The civil servant was trained in grammar, belles-letters, and history. He sought facility and elegance in writing about etiquette and style. Judges and theologians had to aster the science of Hadith, or traditions, canon law, and scholastic theology. Each civil servant wore a distinctive dress for their respective status.[11]

The scholar was especially favored and considered practically omniscient. As time wore on, however, original thought and legal opinion became less acceptable than commentary on earlier achievements, and scholarly functions became limited to protecting religious law and lore. The saint who became an authorized spokesman for the oppressed was closely related to the scholar. Although the saint and savant frequently expressed general criticism of society and its institutions, the idea of social progress was not widely accepted. The effectiveness of Muslim

reformers was lessened by their concentration on specific abuses and on curing the evils of the day rather than on an attempt to alter the system.

A good number of Arabic language scholars recruited from non-Arab peoples increased and the relatively poor Arabian culture gradually became a rich multiethnic Muslim civilization. Not only non-Arabs but also non-Islamic elements were woven into the fabric of the cosmopolitan Abbasid civilization, unified, however, by the common use of the Arabic language and the prevailing practice of Islamic orthodoxy. The talents of the best minds from all the empire's various nationalities thus combined, culminating in the Islamic Golden Age between 750 CE and 950 CE. At first Muhammad welded Judeo-Christian with Arabic ideas and values, including much of the pre-Islamic pagan tradition. Later, Hellenic-Greek thought was absorbed through translations from the Syriac. Greek dialectics and methods of allegorical interpretation and Christian asceticism were adopted to broaden Islam's base beyond the limitations of the Quran. Discussion of problems according to categories of formal logic, purely theoretical speculation and a secular science independence of religious sectarianism was Greek in origin. The Persian tradition, itself earlier influenced by Hellenism, shaped the ethics of civic life. Ancient guilds, the Sassanid Persian financial system, and oriental religious despotism were all present. Indian medicine, pharmacology, mathematics, and possibly Indian mysticism and literary theory also left their imprint on Islamic learning.[12]

Islam originally consisted of adapting these imports to its own requirements and blending them within its civilization. Elements that might endanger its own religious foundation were eliminated or neutralized. From this synthesis of older classical cultures emerged the distinctive Islamic civilization with its own extensions and contributions in philosophy, medicine, mathematics, astronomy, science, geography, architecture, and, above all, in literature. "Islam", writes von Grunebaum, "can hardly be called creative in the sense that the Greeks were creative in the fifth and fourth centuries B.C or the Western world since the Renaissance, but its flavor is unmistakable on whatever it touched; and, while very little of its conceptual and not too much of its emotional contribution is new or unique, its style of thought and range of feelings are without a real precedent."[13]

Nearly all the Hellenic and Hellenistic philosophies were translated from Greek into Arabic, becoming the basis of early Islamic philosophy. Five Islamic philosophers were of a truly international status: al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali and Ibn Rushd. All were strongly influenced by Neo-Platonism. The earliest Arab philosopher was Al-Kindi (Alkindius) born in Iraq in the ninth century. He blended philosophy and theology, holding the world of intelligence as supreme. He also wrote on medicine and astrology and was a prolific translator of Greek works. Immortality, he argued, resulted from the correct knowledge of God and the universe. He regarded mathematics as the basis of both scientific and philosophic investigations. In the next century, al-Farabi (Alpharabius), a Turk, combined the thought of Aristotle, Plato and the Sufi Muslim mystics. He outlined his philosophy in a treatise describing a model city where happiness governed all. His belief that the world had no beginning shocked many Muslims-and influenced St. Thomas Aquinas. Al-Ghazali, born in 1059 CE in Persia, after studying the rationalist philosophers became a mystic convinced that ultimate truth could be attained only through revelation. While others claimed that God dealt only with universally, Ghazali's God was concerned with the most minute details. Perhaps best known to the Western World were Ibn Sina, known in Europe as Avicenna (980-1037), and Ibn Rushd (Averroes). Ibn Sina was an Ismaili Muslim born in Bukhara at the end of the tenth century. His numerous works, also rooted in Aristotle, greatly influenced medical European philosophers such as Abelard, Albertus Magnuis, and St. Thomas Aquinas. Ibn Rushd, born in 1126 CE in Spain, wrote about

philosophy, mathematics, law, and theology, building upon his predecessors, Al-Farabi and Ibn Sina. He was the last of the classical Muslim philosophers in Spain. Faith in the existence of human knowledge in all men marked his philosophy-which also had many similarities to that of Thomas Aquinas.[14]

Throughout the era of medieval Islam, most Muslim philosophers and scientists studied medicine and many were practicing physicians. These skills were also learned by the Greeks, Syrians, and Iranians by way of Greek work. Hospitals were imported by the Iranians by Harun al-Rashid and schools of Pharmacy were established. The most outstanding physician was al-Razi (865-925), called Rhazes in the West. His writings greatly influenced European medical thought. He compiled the first medical encyclopedia (more than twenty volumes), giving a complete account of all the Greek, Syriac, and Arabic medical knowledge at the time. Ibn Sina, the philosopher, produced the most famous Muslim medical works in the eleventh century. He recognized the contagious nature of some diseases and that they could be spread through water. He *Canon of Medicine (al-Karun)* was the chief medical book of the Middle East and Western Europe from the twelfth to the seventeenth century. During the Black Death in the fourteenth century, two Muslim physicians in Granada, Spain recognized its contagious nature. So skillful were the Muslim physicians that their services were eagerly sought by the Crusaders.[15]

Building on Indian and Greek works, Islamic civilization greatly advanced the study of mathematics by transmitting and simplifying Greek arithmetic, introducing Arabic numerals (whose origin is still disputed) and the decimal system. The Arab use of zero- a concept that probably originated with Indian scholars and the digit to denote units of tens, hundreds, thousands, and so on, made mathematics more useful in everyday life. Algebra, geometry, and trigonometry were carried on to the West by the Arab mathematicians.

Arab astronomy also developed from Greek, Iranian, and Indian contributions. Through study of the planets, stars, and constellations, the Arabs determined the earth's diameter and circumference and measured the length of the Mediterranean. They gave Arabic names to many stars and constellations and contributed words such as *azimuth, nadir* and *zenith*.

Arabic works on chemistry introduced words such as alkali, alcohol, and antimony into modern usage. In physics, theoretical and applied mechanics, experiments related, in particular, to irrigation and the flow of water were useful Arab contributions. Most significant in physics were experiments in optics providing faulty Euclid's and Ptolemy's theory that the eye emits visual rays and replacing it by the theory that vision comes from the impact of light rays.[16]

From the original Arabian mosque plan- a square composed of palm-trunk rows surrounded by stone and brick walls and probably covered with a flimsy palm branch roof-developed the magnificent mosque architecture found throughout the Mediterranean region today. Muslim architecture borrowed extensively from Roman, Persian, and Byzantine models, developing the dome, arches, columns, and capitals into a new, characteristic Muslim design. The mosque minaret, probably developed from pre-Islamic lighthouses, became the model for the Christian bell tower. While many mosques are decorated with elaborate facades, the major emphasis is on the interior work where the Arabesque can be seen in its greatest splendor. Since Islamic tradition hampered the reproduction of living forms, Islamic art has been decorative using elaborate geometric forms.

Islamic civilization reached its apogee in the humanities. Whereas contributions to science, mathematics, music, art and architecture were largely influenced by Greek, Persian, and Indian precedents, there was far greater originality and initiative their historiography, philology, and literature. While the roots of the Muslim literary tradition were also Persian and the Greek, the Arabic was the most influential. The most well-known medieval Muslim literature has been the colorful *Thousand and One Nights* or *Arabian Nights*, developed from numerous oriental folk tales in various sections of the Arabic-speaking world between 900CE and 1500CE. Many stories originally of Jewish, Buddhist, or Hellenistic inspiration were absorbed in the Muslim tradition and recolored with Muslim mores and lore and, in turn, have influenced European literature. In historical writing, the long genealogies of the Arabic tribes traced back the changes in political groupings, alliances, and Bedouin federations and confederations. The best known of the medieval Muslim historians was Ibn Khaldun (1332-1406). Although born in Tunisia, he was esteemed and held high positions in Granada in Spain, in Algeria, and in Cairo. Most renowned has been the first volume of his long history called the *Mukaddamah (Prolegomena*), outlining a philosophy of history based on a study of its interrelated social, economic, geographic, and culture factors.[17]

References:

1. Don Peretz, *The Middle East Today* (New York: Praeger, 4th edition, 1983), p. 34.
2. *Ibid.*, p. 35.
3. Henry S. Lucas, *A Short History of Civilization* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1943), p. 130.
4. Arnold J. Toynbee, *Survey of International Affairs: 1935* (London: Oxford University Press, 1936) Vol. I, p. 113.
5. J.C. Hurewitz, *Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record: 1914-1956* (New York: Van Nostrand Company, 1956), Vol.2, p. 189.
6. Abid A. Al-Marayati, *The Middle East and North Africa, 1976-1977* (London: Europa Publications Limited, 1976), p. 151.
7. Don Peretz, *op.cit.,* p. 35.
8. *Ibid.*, p. 36.
9. Arnold J. Toynbee, *op.cit.,* p. 116.
10. *Ibid.*, p. 123.
11. Henry S. Lucas, *op.cit.,* p. 133.
12. *Ibid*.
13. *Ibid.*, p. 136.
14. Abid A. Al-Marayati, *op.cit.,* p. 153.
15. *Ibid.*, p. 154.
16. Henry S. Lucas, *op.cit.,* p. 168.
17. *Ibid.*, p. 169.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

মাহমুদ দারবীশের কবিতায় দ্রোহ: একটি পর্যালোচনা

ড. জিয়াউর রহমান খান*

Abstract: Mahmud Darwish was one of the shining stars of modern Arabic poetry. He was a great man in the struggle for the liberation of the Palestinian nation. To liberate the Palestinian nation from the shackles of subjugation he waged a lifelong was through his pen and poetry. The pain and bitterness of subjugation is portrayed in his poetry vividly. The deportation, dispersal, misery and unspoken tragedies of the Palestinians are expressed in his poems. His rebellious poems have exploded like war bombs against hegemonic lsraelis. The essence of his rebellion, on the one hand, has aroused the spirit of all Palestinians; on the other hand, it has created panic in the minds of the aggressive Israeli. Darwish's satirical poetry has been equally successful like the success of thousands of Palestinian warriors who have fought against the Israeli domination. The appeal of Darwish's seditious poems as a form of protest against oppression and injustice will forever make him memorable to the world. This article has tried to shed light on Mahmud Darwish's seditious poems.

ভূমিকা: আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম মাহমুদ দারবীশ।[১] যার সাবলীল কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে শোষণ, লাঞ্চনা আর গঞ্জনার বাস্তবচিত্র। পেয়ে হারানো আর না পাওয়ার বেদনা আক্ষেপ হয়ে যার কবিতায় দ্রোহ ও প্রতিরোধ এর জন্ম দিয়েছে। ‘ফিলিস্তীন দেশমাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে[২] ফিলিস্তীনবাসী যাকে অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে সব সময় পাশে পেয়েছে। তিনি যেমন প্রেমের কবি, মানবতার কবি, সাম্যের কবি তেমনি তিনি দ্রোহের কবি। তাঁর কবিতার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে দ্রোহের আগুন। যে দ্রোহ জায়নবাদী ইসরাঈলিদের ক্ষমতার ভীতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। পাশপাশি তাঁর দ্রোহ ফিলিস্তিনীদের মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। তাঁর দ্রোহমূলক কবিতা অসীম সাহস যুগিয়েছে আপমর ফিলিস্তিনীদের। আধিপত্যবাদী ইসরাঈলিদের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি যে কবিতা রচনা করেছেন সেই কবিতার দ্রোহের আগুন গোটা ফিলিস্তীন[৩]কৈ আলোড়িত করেছে। কখনো প্রকাশ্যে তীর্যকভাবে আবার কখনো উপমার ছদ্মাবরণে তিনি তাঁর দ্রোহকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর কবিতা ও তাঁর দ্রোহ একাকার হয়ে ফিলিস্তিনীদের মুক্তি সংগ্রামে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে এবং ক্ষমতাসীন ইসরাঈলিদের প্রাণে ত্রাসের জন্ম দিয়েছে।

কবি মাহমুদ দারবীশ গতানুগতিক কোন কবি ছিলেন না। তিনি স্থবির ও সংকীর্ণমনা কোন কবিও ছিলেন না বরং তিনি কাব্যিকতায় ব্যাপক প্রতিযোগিতায় অভিজ্ঞ এবং প্রসস্ত কাব্যিক গতিময়তার এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[৪] তাঁর কবিতা নেতিয়ে পড়া ফিলিস্তিনীদের রক্তে উন্মদনা সৃষ্টি করেছে, যে উন্মাদনা ফিলিস্তীনকে ছাপিয়ে বিশ্বের সকল উপনিবেশের শিকার মজলুম জনগণকে আন্দোলিত করেছে। বস্তুত মাহমুদ দারবীশের দ্রোহ, তাঁর প্রতিরোধ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছে তাঁর কবিতায়, জ্ঞানে, তাঁর ভাবে। এই প্রতিরোধের বিস্তৃতি সীমাহীন, গভীর অন্তহীন। তাঁর দ্রোহ ও প্রতিরোধ বিষয়ক কবিতা মূলত ফিলিস্তিনীদের লড়াই সংগ্রামের নানান সময়ের নানা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও সময়কে কেন্দ্র করে কবিতা রচিত হওয়ায় তার প্রতিরোধের প্রকাশ ভঙ্গিতেও ভিন্নতার স্বাদ পাওয়া যায়।[৫] কবিতার মাধ্যমে তিনি জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রায়াস চালান। ১৯৬৪ সালে তাঁর "أوراق الزيتون" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[৬]এ কাব্যগ্রন্থের "عن الامنيات" বা ‘বাসনাপুঞ্জ’ কবিতায় তিনি বলেন- [৭]

لا تقل لى: ليتنى بائع خبز في الجزائر

لأغني مع ثائر!

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

لا تقل لى: ليتنى راعى مواش فى اليمن

لأغنِّى لا نتفاضات الزمن!

لا تقل لى: ليتنى عامل مقهى فى هفانا

لأغنى لاختصارات الحزانى!

لا تقل لى: ليتنى أعمل فى اسوان حمالا صغير

لأغنى للصخور

'আমাকে এ কথা বল না,
যদি আলজিয়ার্সে রুটি বিক্রেতা হতাম
তাহলে বিদ্রোহীর খাতায় ঠিক নাম লেখাতাম।
আমাকে বলনা এ কথা-
যদি ইয়ামানের মাঠে রাখাল হতাম
তাহলে কম্পমান সময়ের ডাকে আমিও ঠিক কাঁপাতাম,
আমাকে বলনা-
যদি কুবার আবানা শহরে কফি ওয়েটার হতাম
তাহলে দুখিনী মা-বোনদের বিজয় সংগীতে গলা মিলাতাম।
আমাকে শুনিও না এ কথা-
যদি আসওয়ানে শক্তিশালী দিনমজুর হিসেবে কাজ করতাম
তাহলে পাহাড়ে পাহাড়ে আমার গান বাজতো।'

কবি তাঁর জাতিকে সময়ের গড্ডালিকা প্রবাহে জীবন ভাসিয়ে না দিয়ে বরং দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যে আহ্বানে তাঁর সুস্পষ্ট দ্রোহ ফুটে উঠেছে। যেমন কবি বলেন-[৮]

يا صديقى!

لن يصب النيل فى الفولغا

ولا الكونغو، ولا الاردن، فى نهر الفرات!

كل نهر، وله نبع ... ومجرى... وحياة!

يا صديقى! ... أرضنا ليست بعاقر

كل أرض، ولها ميلادها

كل فجر، وله موعد ثائر!

'হে বন্ধু শোনো-
নীলনদ ভোলগায় গিয়ে পড়বে না।
কঙ্গো জর্দানও পড়বে না ইউফ্রেটিসে গিয়ে
সকল নদীরই আছে উৎস, গতিপথ আর নিজস্ব জীবন।

‘বন্ধু আমার-
আমাদের দেশ তো বন্ধ্যা নয়
প্রতিটি দেশের থাকে জন্মবার দিনক্ষণ
প্রতিটি ভোর হলো নবজাত বিদ্রোহীর জন্মদিন।’

অনুরূপ মাহমুদ দারবীশের কাব্যগ্রন্থ “ حبيبتي تنهض من نومها” প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে।[৯] যে কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তাঁর কালজয়ী কবিতা “ يوميات جرح فليسطني” ‘ফিলিস্তিনী ক্ষতের দিনপুঞ্জি’ নামক কবিতা স্থান পায়। যে কবিতায় ইসরাঈলিদের নিপীড়ন নির্যাতনের প্রতিবাদে কবির দ্রোহ যেন আগুন হয়ে ঝড়ে পড়ে। যেমন কবি বলেন-[১০]

دمعتي في الحلق، يا أخت،

وفي عيني نار

وتحررت من الشكوى على باب الخليفة

كل من ماتوا

ومن سوف يموتون على باب النهار

عانقوني، صنعوا مني .. قذيفه!

‘বোন আমার, শোন!
গলা বুজে আসে কান্নায়, দৃষ্টিতে অগ্নিকণা
নগরের রাজপথে আমি আর প্রতিবাদ করতে যাব না।
যারা মরে গেছে, যারা মরে যাবে দিবসের দ্বারপ্রান্তে
সবাই আলিঙ্গন করেছে আমায়
আমাকেই বানিয়ে তুলেছ এক শানানো অস্ত্র!’

ইসরাঈলের নিপীড়ন ফিলিস্তীনের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইসরাঈলি বাহিনী ফিলিস্তীনে ‘উড়ে এসে জুড়ে বসার’ মতো নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক দল ফিলিস্তীনে কৃষি বসতি গড়ে তুললেও থিওডর হারৎজেলের জাইয়নবাদী সংঘঠনের প্রতিষ্ঠা তাদেরকে ইরেজ ইসরাঈলে প্রত্যাবর্তনে সর্বপ্রথম অনুপ্রাণিত ও আগ্রহী করে তোলে। কিন্তু সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েই তারা নৃশংস হয়ে ওঠে।[১১] এমনকি বর্তমান বিশ্বেও ১ কোটি ৪৭ লাখ ইহুদীর বাস। এর মধ্যে ৬৭ লাখ ইসরাঈলে, ৫৭ লাখ যুক্ত রাষ্ট্রে এবং অন্যান্য দেশে আছে ২৩ লাখ ইহুদী।[১২] ইহুদীরা ইসরাঈলে প্রতিষ্ঠিত হয়েই বিভিন্ন কূট চালের মাধ্যমে নৃশংস হয়ে ওঠে।

কিন্তু যতই আঘাত করুক দেশ তো ফিলিস্তিনীদের। এই মাটিতে অধিকার শুধু ফিলিস্তিনীদেরই। তাই প্রতিটি ফিলিস্তিনীর হৃদয়ের বাণীকে কবি তাঁর কলমে তুলে ধরে ”يوميات جرح فلسطيني” বা ‘ফিলিস্তিনী ক্ষতের দিনগুলো’ কবিতায় বলেন-[১৩]

آه يا جرحي الكمابر

وطني ليس حقيبة

وأنا ليست مسافر

وإننى العاشق، والأرض حبيبة!

‘হায় হায়! আমার ক্ষতটা কোথায়-
খুঁজে পাচ্ছিনা।
আমার দেশ তো তল্পিতল্পা নয়
আমিও কোন মুসাফির নই
অনিবার্য আমি একজন প্রেমিক
এই ভূমি আমার প্রেমিকা।’

ফিলিস্তীনের দূর্দিনে ফিলিস্তীনবাসীদের আর কোন দূরাশার পিছনে ছুটে চলার সুযোগ নেই। তাদের সামনে একটিই পথ আর তা হলো দেশ মাতৃকার মুক্তি।

তাই তো কবি বলেন-[১৪]

نحن فى حل من التذكار

فالكرمل فينا

وعلى اهدابنا عشب الجليل

لا تقولى: ليتنا نركض كالنهر إليها،

لا تقولى!

نحن فى لحم بلادى ... وهى فينا!

‘আমাদেরকে স্মরণ করানোর কোন প্রয়োজন নাই
কার্মেল পাহাড় আছে আমাদের মাঝেই
আর দুই চোখে ‘আল-জালিজেলর’ তৃণভূমী!
বলো না যে
যদি ছুটে যেতে পারতাম তার কাছে
নদী যেমন বয়ে যায়!
এমনটাও বলো না
আমরা আর আমাদের এই দেশ একই অস্থিমজ্জা।’

ফিলিস্তীন দেশমাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে আপামর জনসাধারণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেন একাকার হয়ে যায় এটাই কবির প্রত্যাশা। যেন ফিলিস্তিনীরা তাদের কর্মকান্ডে প্রমাণ করতে পারে যে তারা অত্যাচারীর খড়্গকে কোনই ভয় পায় না। তাইতো কবি বলেন-[১৫]

آن لى ان أبدل اللفظة بالفعل،

وآن لى أن أثبت حبى للثرى والقبرة

‘সময় এসেছে, এখন আর কথা নয়
কাজ করতে হবে
প্রমাণ করার সময় এসেছে
ভালবাসি এই মাটি আর দোয়েলের গান।’

মাহমুদ দারবীশ ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। আর মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[১৬] দারবীশের কাব্যমালা আরবী কাব্যঙ্গনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। স্বাধীনতার জন্য, জনগণের মুক্তির জন্য তার কবিতা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। আর ক্ষমতাসীন ইসরাঈল বাহিনীকে তটস্থ করে তোলে। বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারের বর্ণনা দেন। ১৯৫৬ সালে আরব ও ইহুদীদের মাঝে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এ যুদ্ধে ইসরাঈল সফল হয় এবং বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনী আরব উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এ যুদ্ধ ফিলিস্তিনীদের আরো উজ্জীবিত করে।[১৭] এ সময় ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুরা নিজেদের সংগঠিত করার প্রয়াস পায়। এ প্রয়াসের ফলে ১৯৬৪ সালে P.L.O গঠিত হয়। একটি জাতীয় সনদও গঠিত হয়। ফিলিস্তীনকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামের বিকল্প নেই বলে সনদে স্বীকৃত হয়। ফিলিস্তিনী গেরিলাদের আক্রমনে ইসরাঈলি সেনাবাহিনীর ক্ষতিসাধন হতে থাকে।[১৮]

১৯৬৯ সালে দারবীশের কাব্যগ্রন্থে "العصافير تموت فى الجليل" প্রকাশিত হয়।[১৯] এ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা "آه .. عبد الله" 'ওহ আব্দুল্লাহ'। এ কবিতায় কবি সুন্দর উপমার মাধ্যমে শত্রু সেনাদের সরূপ উন্মোচন করেন। যেমন কবি বলেন-[২০]

قال عبد الله للجلاد:

جسمي كلمات ودوى

ضاع فيه الرعد

والبرق على السكين

والوالي قوي

هكذا الدنيا...

وأنت الآن يا جلاد أقوى

'আব্দুল্লাহ জল্লাদ কে বলে-
আমার শরীর হলো বাক্য
এবং প্রতিধ্বনি
যাতে বজ্রও যায় হারিয়ে
ছুরির উপর বিদ্যুতের ঝলকানি
রাজ্য শাসক শক্তিধর
ঠিক যেমন ধরা
আর এখন জল্লাদ তুমি
তার চেয়ে মহা প্রতাপশালী।'

স্বাধীন ফিলিস্তীনের স্বপ্নদ্রষ্টা মাহমুদ দারবীশ তাঁর কবিতাকেই ইসরাঈলিদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেন।[২১] ইসরাঈলিদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়তেই থাকে। ১৯৪৮ সালের পর থেকে বেশ কয়েকবার ফিলিস্তিনী আরবদের সাথে দখলদার ইসরাঈলিদের যুদ্ধ হয়। এর মধ্যে ১৯৭৩ সালের আরব ইসরাঈল যুদ্ধে ইসরাঈল বাহিনী সবচেয়ে বেশী পর্যদুস্থ হয়। এই যুদ্ধে ৫০০ ইসরাঈলি নিহত ও ২০০০ ইসরাঈলি আহত হয়।[২২] এর পরে ইসরাঈলিরা আরো বেশী ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। অপর দিকে দারবীশও তাঁর কাব্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৮৬ সালে প্রকাশ পায় তাঁর কাব্যগ্রন্থ[২৩] "ورد أقل" এ গ্রন্থের একটি কবিতা "يحبوننى ميتا "

বা ‘তারা আমার মৃত্যু চায়’ নামক কবিতা। যে কবিতায় তিনি আগ্রাসনবাদী ইসরাঈলের স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেন, যেখানে তাঁর আক্ষেপ আর দ্রোহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন কবি বলেন-[২৪]

يحبونني ميتا ليقولوا: لقد كان منا، وكان لنا.

سمعت الخطى ذاتها. منذ عشرين عاما تدق على حائط الليل.

تأتى ولا تفتح الباب

‘তারা আমার মৃত্যু চায়
আমি মারা গেলে তারা বলতে পারবে
‘ও আমাদের ছিল, ও আমাদেরই’
বিশটি বছর রাতের দেয়ালে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনেছি।
আমার ঘরে ঢুকতে তাদের কোন দরজা খুলতে হয়নি’

প্রকৃতপক্ষে আধিপত্যবাদী ইসরাঈলি বাহিনী হলো ঠান্ডামাথার খুনি। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীন আরব আর ইসরাঈলের মাঝে যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধে আরবরা ব্যর্থ হয়। ইসরাঈল বাহিনী ফিলিস্তীনকে দখল করে। ইতিহাসের এক করুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এর উল্লেখযোগ্য অধিবাসী ইসরাঈলের সন্ত্রাসবাদী কার্মকান্ডে নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে পাশ্ববর্তী আরব দেশগুলোতে আশ্রয় নেয়।[২৫] তারা কারণে অকারণে তাদেরকে হত্যা করে। সুপরিকল্পিত ঠান্ডা মাথার এ সকল খুনিদের উদ্দেশ্যে প্রতীকী সুরে কবি বলেন-[২৬]

قلت: سأسألكم ان تكونوا بطيئين، ان تقتلونى رويدا رويدا

لأكتب شعرا أخيرا لزوجة قلبى، ولكنهم يضحكون

ولا يسرقون من البيت غير الكلام الذى سأقول لزوجة قلبى...

‘আমি বললাম: ঠিক আছে তাড়াহুরার কিছু নেই
আমি চাই তোমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে আমাকে মারো
শেষ কবিতাটি আমি প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে লিখে ফেলি, তারা হাসে
অতপর আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় সেই শব্দমালা
যা আমার প্রিয়তমাকে উৎসর্গ করেছি।’

ফিলিস্তীন ভূমিতে ফিলিস্তিনীদের হত্যা আর বিতারণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং গোটা ফিলিস্তীনের স্বাভাবিক একটা বিষয়। কিন্তু নির্বাসিত ফিলিস্তিনীরা তাদের আর্তনাদ নিয়ে হাহাকার করত। যেন এর কোন পরিসমাপ্তি নাই। নির্বাসিত সে সব ফিলিস্তিনীদের হাহাকার দ্রোহ হয়ে ফুটে ওঠে মাহমুদ দারবীশের কবিতায়। যেমন দারবীশ "إلى القارئ" কবিতায় বলেন-[২৭]

الزنبقات السود فى قلبى

وفى شفتى ... اللهب

من اى غاب جئتنى

يأكل صلبان الغضب؟

بايعت أحزاني...

وصانحت التشرد والسغب

غضبي يدى...

'আমার হৃদয়ের পদ্মফুল
ক্রোধের আগুনে কালচে হয়ে আছে
ঠোঁটে প্রজ্বলিত ভিসুভিয়াস
কোন জঙ্গল থেকে এলে?
আজ দুঃখের সাথে আমার বন্ধুত্ব
ক্ষুধা আর নির্বাসনের সাথে আমি হাত মিলাই
এখন ক্রোধ মানেই আমার হাত।'

আগ্রাসনবাদী ইসরাঈলিদের বিরুদ্ধে গোটা ফিলিস্তীন যেন এক আত্মা এক দেহ প্রাণ। কেননা ইসরাঈলি বাহিনী অস্ত্র আর হামলার দ্বারা রাতারাতি বৈধ ফিলিস্তিনীদের তাদের নিজের দেশের অবৈধ করে দিত। কবি দারবীশ নিজেও মাতৃভূমি থেকে বিতারিত ছিলেন।[২৮] এই বিতারণ, এই নির্বাসন নির্বাসিতদের হৃদয়ে দ্রোহের জন্ম দেয়। কারণ তারা নিজ ভূমেই পরবাসী হয়ে যায়। এই মনোকষ্টের কারণে ধীরে ধীরে তাঁর মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আর এক সময় গর্জে ওঠেন মাহমুদ দারবীশ। রচনা করেন তাঁর কালজয়ী কবিতা "جواز سفر" কবিতা। এ কবিতায় কবি তাঁর দ্রোহ ব্যক্ত করে বলেন-[২৯]

كل العصافير التى لا حقت

كفي على باب المطار البعيد

كل حقول القمح،

كل السجون،

كل القبور البيض

كل الحدود

كل المناديل التى لوحت

كل العيون

كانت معى لكنهم

قد أسقطوها من جواز السفر!

عار من الاسم، من الانتماء؟

فى تربة ربيتها باليدين؟

أيوب صاح اليوم ملء السماء:

لا تجعلوني عبرة مرتين!

'যেসব পাখির দল জেনেছিল আমার ভাগ্যরেখা-তারা জানে 'অদূরবর্তী বিমান বন্দরের ফটক, শস্যের মাঠ, বন্দিশালা, সফেদ সমাধির পাথর
কাঁটাতার ঘেরা সীমান্ত, বাতাসে দুলতে থাকা কারুকাজ
আমার ছিল, কিন্তু পাসপোর্ট থেকে সবকিছু কারা যেন উধাও করে দিয়েছিল।

ওরা আমাকে পরিচয়হীন মনে করে? যে মাটিতে বেড়ে উঠেছি শৈশব থেকে, সেই মাটি থেকে আমার নাম পরিচয় মুছে দিতে চাও? আজ আর্তনাদে আকাশ কেঁপে ওঠে, আমাকে আরেকবার জাগিও না।'

বর্বর ইসরাঈলি শক্তি গোটা ফিলিস্তীনকে যেন একটা বন্দিশালায় পরিণত করেছিল। এক অজানা আতংকে সাধারণ নাগরিকদের নাগরিক জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। বন্দিশালাগুলো নিরাপরাধ ফিলিস্তিনীদের দ্বারা ভরে উঠেছিল।

নিরাপরাধ সেই সকল ফিলিস্তিনীদের মুখমাত্র হিসেবে দারবীশ "السجن" কবিতায় বলেন-[৩০]

تغير عنوان بيتي

وموعد أكلي

ومقدار تبغي تغير

ولون ثيابي، ووجهي أو شكلي

وحتى القمر

عزيز على هنا...

صار أحلى وأكبر

'ঘর-ঠিকানা পাল্টে গেছে
পাল্টে গেছে কাল খাওয়ার
আর বদলে গেছে ধুমছে ধুম পানের হার
বদলে গেছে পোষাক-আশাক
মুখশ্রী ও অবয়বের রূপ বাহার
বদলে গেছে আকার-ইকার, দূর আকাশের চন্দ্রিমার
যা ছিলো সব বড়ই প্রিয় নিত্য সময় এ আমার।'

সুতরাং দুঃখ, গ্লানি আর কষ্টকে সম্বল করে অত্যাচারিত ফিলিস্তিনীরা ভিতরে ভিতরে ফুঁসেছে। অভাগা দেশের মুক্তির জন্য আর্তনাদ করেছে। কারণ যুগ যুগ ধরে ফিলিস্তিনীরা ফিলিস্তীনের এইকরূপ দূর্দশা প্রত্যক্ষ করেছে। তাইতো جبين وغضب নামক কবিতায় দারবীশ বলেন-[৩১]

كل ما أملكه في حضرة الموت:

جبين وغضب.

وأنا أوصيت ان يزرع قلبي شجرة

وجبيني منزلا للقبرة

وطني، إنا ولدنا وكبرنا بجراحك

وأكلنا شجر البلّوط..

كي نشهد ميلاد صباحك

‘সমস্ত রকম মৃত্যুর সম্মুখে দাড়িয়ে
আজ আমার আছে
কেবল আত্মাভিমান ও ক্রোধ
মৃত্যুর পর আমার হৃদপিন্ডকে
একটি গাছের মত রোপন করে দিও
যেন আমার কপালে বাসা বাধতে পারে
চাতক-চাতকী
হে আমার জন্মভূমি
জন্মেই তোমাকে দেখেছি ক্ষত-বিক্ষত
তোমার বৃক্ষের ফল খেয়ে
অবলোকন করেছি প্রতিটি সূর্যোদয়।’

নিজ দেশের আলো-বাতাস, পানি অবলম্বন করে যদি মানুষ তার দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত না করতে পারে, দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে না পারে, তবে তারা দেশের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হল। আর তারা দেশের যোগ্য নাগরিক নয়। ইসরাঈলিদের কবল থেকে ফিলিস্তীনকে মুক্ত করতে না পারার কারণে তাই কবি দারবীশ অভিমান ও ক্রোধের প্রকাশ করে জন্মভূমির উদ্দেশ্যে বলেন-[৩২]

وأنا لست جديرا بجناحك

كل ما أملكه في حضرة الموت:

جبين... وغضب!

‘আমি যোগ্য নই তোমার সুদৃশ্য ডানার পালক হবার
সমস্ত রকম মৃত্যুর সম্মুখে দাড়িয়ে
আজ আমার আছে
কেবল আত্মাভিমান ও ক্রোধ।’

তবে ফিলিস্তীনবাসী ফিলিস্তীন কে ইসরাঈলমুক্ত না করতে পারলেও তারা একদিনের তরেও তাদের সংগ্রাম থেকে পিছপা হয়নি। সেই ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল ফিলিস্তীন দখল করে। তখন থেকেই তাদের সংগ্রাম অব্যাহত আছে। দফায় দফায় ইসরাঈলিদের সাথে ফিলিস্তীনের যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনীদের প্রতিশোধ স্পৃহা এক নতুন রূপ লাভ করে। পরাজয়জনিত চরম হতাশা ফিলিস্তিনীদের মাঝে যুদ্ধাংদেহী মনোভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন গেরিলা বাহিনীর ইসরাঈলিদের উপর হামলা বিশ্বে চমক ও আরবদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে।[৩৩] ইসরাঈলবাহিনীর অব্যাহত জুলুমের মুখে ফিলিস্তিনীরা আজো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। যদিও তারা বন্দি হয়েছে, শরণার্থী হয়েছে। নিজের দেশে নিজেই পরবাসী হয়েছে। এরূপ শত বিপত্তির মুখেও তারা হাল ছেড়ে দেয়নি। আর কবি মাহমুদ দারবীশও শত প্রতিকুলতার মাঝে ফিলিস্তিনীদের সাহস যুগিয়ে গেছেন। যেমন দারবীশের কবিতা

"أنا من هناك"। যে কবিতায় কবি নির্যাতিত বিতারিত ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধি হয়ে নিজের আত্মপরিচয় তুলে ধরে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন-[৩৪]

أنا من هناك. ولى ذكريات ولدت كما تولد الناس لى والدة

وبيت كثير النوفذ. لى إخوة اصدقاء وسجن بنافدة باردة

ولى موجة خطفتها النوارس. لى مشهدي الخاص– لى عشبة زائدة...

مررت على الأرض قبل مرور السيوف على جسد حولوه إلى مائدة.

'আমি এসেছি সেখান থেকে, যেখানে আমার অনেক স্মৃতি আছে। আমি জন্ম গ্রহণ করেছি যেমন মানুষ জন্ম গ্রহণ করে, আমার মা আছে, জানালা কাটা একটা ঘর, ভাই, বন্ধু এবং প্রহরী আছে। সমুদ্রচিলের লাঞ্চনার মত আমার নিজস্ব ঢেউ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং একান্ত আপনতম ঘাস আছে... তরবারির রাজত্বের বহু আগ থেকে আমরা এই ভূমিতে হেঁটেছি অবিরাম।'

সুতরাং শক্তিশালী ও অত্যাচারী ইসরাঈলিরা যতই ফিলিস্তিনীদের দেশ তেকে বিতারিত করুক। শত নির্যাতন আর শত বিতারণের মুখেও ফিলিস্তিনীরা শুধু একটি কথাই বলবে ফিলিস্তীন আমার জন্মভূমি। যেমন কবি বলেন-[৩৫]

تعلمت كل الكلام، وفككته كى اركب مفردة واحدة هى: الوطن...

আমি যত শব্দ শিখেছি, যত শব্দ ভেঙ্গেছি, সবই শুধু একটি মাত্র শব্দের জন্য 'জন্মভূমি।'

স্বাধীন ফিলিস্তিনীদের উপর বর্বর ইসরাঈল শক্তির দমন পিড়ন যত বৃদ্ধি পেয়েছে মাতৃভূমির প্রতি ফিলিস্তিনীদের অনুরাগ ততই গাঢ় হয়েছে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনীরা দ্রোহের আগুনে দগ্ধ হয়েছে। মায়ের সামনে ছেলেকে, বোনের সামনে ভাইকে আর স্ত্রীর সামনে স্বামীকে নির্যাতন ও বন্দিকরণ তাদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। যা মাহমুদ দারবীশের কবিতায় দ্রোহের আগুন হয়ে ছড়ে পড়েছে। যেমন "رد الفعل" কবিতায় কবি বলেন-[৩৬]

وطني! يعلمنى حديد سلاسلى

عنف النسور، ورقة المتفائل

ما كنت اعرف أن تحت جلودنا

ميلاد عاصفة... وعرس جداول

سدوا على النور فى زانزانه

فتوهجت فى القلب... شمس مشاعل

كتبوا على الجدران ... رقم بطاقتى

فنما على الجدران ... مرج سنابل

رسموا على الجدران صورة قاتلى.

'প্রিয় জন্মভূমি! এই বাধন আমাকে শিখিয়েছে ঈগলের তেজময়তা এবং আশাবাদী স্নেহপরায়ণতা। আমার জানা ছিলনা, আমাদের ত্বকের নিচে আছে ঝড়- ছোট নদীর বিবাহ উৎসব।

'অন্ধকার কুঠুরিতে আমাকে তারা বন্দি করে রেখেছিল, আর সূর্যের আলোয় আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আমার কার্ডের নম্বর তারা দেয়ালে লিখে রেখেছিল। সেই দেয়ালের চারণভূমিতে জন্ম নিয়েছিল শস্যের শ্রবণেন্দ্রীয়। আমার খুনির মুখ তারা দেয়ালে এঁকেছিল।'

ইসরাঈলিরা চেয়েছিল ফিলিস্তিনীদের তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিতে। কিন্তু ফিলিস্তিনীরা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তারা দেশপ্রেমকে পুঁজি করে বার বার ঘুরে দাড়িয়েছে। আর দ্রোহের আগুনে ঝলসে উঠেছে। কবি ভাষায়-[৩৭]

وحفرت بالاسنان رسمك داميا

وكتبت اغنية العذاب الراحل

أغمدت فى لحم الظلام هزيمتي

وغرزت فى شعر الشموس انامل

والفاتحون على سطوح منازلي

'আমি আবার দাঁত দিয়ে এঁকেছি তোমাদের রক্তাক্ত মুখের ছবি। বিদায় বেদনা নিয়ে লিখেছি গান। অন্ধকারের মাংসপিণ্ডে প্রোথিত করেছি আমার পরাজয়। রৌদ্রোজ্জ্বল চুলে রেখেছি আঙ্গুল। ছাদের ওপাশে থাকা জবরদখলকারী।'

কবি মাহমুদ দারবীশ ইসলাঈলিদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দেশ জাতির মুক্তি সংগ্রামে এক সংগ্রামী মহাপুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইসরাঈলি শক্তি ২০০২ সালে রামাল্লায় আক্রমণ করে এবং তা অবরোধ করে ফেলে। কবি দারবীশ তখন রামাল্লায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় রামাল্লায় অবস্থান কালে তিনি রচনা করেন তার বিখ্যাত কবিতা "حالة حصار"[৩৮] অবরুদ্ধ দেশ, অবরুদ্ধ জাতি, অবরুদ্ধ বিশ্ববিবেক, কিন্তু দেশ প্রেমিক কবির কবিতা তখনও থেমে যায়নি। স্বাধীনতার আশা তখনও তাঁর হৃদয় থেকে মুছে যায়নি। তবুও তিনি গর্জে উঠেছেন। জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে গেছেন। কবি বলেন-[৩৯]

هنا عند منحدرات التلال، امام الغروب

وفوهة الوقت،

قرب بساتين مقطوعة الظل،

نفعل ما يفعل السجناء

وما يفعل العاطلون عن العمل:

نربي الأمل.

بلاد على اهبة الفجر

صرنا أقل ذكاء

لانا نحملق فى ساعة النصر:

‘এখানকার পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
অস্তমিত সূর্য আর সময়ের কামানগুলোর দিকে মুখ করে
চূর্ণ-বিচূর্ণ ছায়াগুলোর বাগিচা ঘেষে
আমরা সেটাই করছি
বন্দিরা যা করে, কর্মচ্যুত মানুষেরা যা যা করে
আমরা স্বপ্নের চাষাবাদ করছি।
শুভ্র প্রভাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে একটি দেশ
নির্মেধা হয়ে উঠেছি আমরা
খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করছি
বিজয়ের ক্ষণ আসছে আমাদের।’

দ্রোহের আগুনে ঝলসানো এক অবিস্মরণীয় নাম মাহমুদ দারবীশ। শিশুকাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যিনি প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার মাঝে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। ইসলাঈলি পরাশক্তির কাছে বারংবার লুণ্ঠিত হয়েছেন। তার বসত বাড়ি, জমি জমা সবই লুণ্ঠিত হয়েছে। তার জায়গা-জমিতেই ইহুদীরা গড়ে তুলেছে ইহুদীবসতী।[৪০] কিন্তু তিনি মাথানত করেননি বা কখনো ইসরাঈলির শক্তির কাছে করুণা ভিক্ষা করেননি। আর তাঁর মত আরো যারা ইসরাঈলিদের দ্বারা সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে তিনি কবিতার মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আর তাঁর দ্রোহকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন "بطاقة هوية" কবিতায় কবি বলেন-[৪১]

سجل!

أنا عربى

واعمل مع رفاق الكدح فى محجر

وأطعالي ثمانية

اسل لهم رغيف الخبز

والأثواب والدفتر

من الصخر

ولا اتوسل الصدقات من بابك

ولا أصغر

امام بلاط أعتابك

فهل تغضب؟

‘লিখে রাখ!
আমি একজন আরব বংশদ্ভুত
আমি মেহনতি বন্ধুদের সাথে পাথর খনিতে কাজ করি
আমার সন্তান সন্তুতি আটজন

আমি তাদের রুটির টুকরা দিয়ে শান্ত্বনা দান করি
আর তাদের জামাকাপড় আর খাতা কলম
এই খনি থেকেই উপার্জন করি।
তোমাদের দুয়ারে ভিক্ষা চাই না
তোমাদের প্রাসাদের সামনে মাথা নত করি না
কি রাগ করছ?'

কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমাহীন হয়ে যায়, আর মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় তখন মানুষ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কবি দারবীশও তাই ইসরাঈলিদের হুংকার দিয়ে সর্তক করে দেন যে, যদি মানুষ জেগে ওঠে তবে কোনভাবেই তাদের দমানো যাবে না বরং তাদের বিজয় হবে সু-নিশ্চিত। কবির ভাষায়-[৪২]

اذن!

سجل ... برأس الصفحة الأولى

أنا لا اكره الناس

ولا اسطو على أحد

ولكن... إذا ما جعت

آكل لحم مغتصبي

حذار ... حذار ... من جوعي

ومن غضبى !!

'সুতরাং!...
প্রথম পৃষ্ঠার উপরে লিখে নাও
আমি মানুষকে ঘৃণা করি না
কারো উপর জবরদস্তিও করি না
কিন্তু... যখন আমি ক্ষুধার্ত হয়ে যাই
তখন আমি আমার লুণ্ঠনকারীর মাংস ভক্ষণ করি
সাবধান... সাবধান আমার ক্ষুধা থেকে
আর আমার ক্রোধ থেকে।'

এভাবে একের পর এক কবিতা রচনা করে কবি মাহমুদ দারবীশ ফিলিস্তিনী জাতিসত্ত্বা ও তাদের মাতৃভূমিকে জবর দখলকারী, বর্বর ইসরাঈলদের কবল থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। তার কাব্য প্রচেষ্টা জাতিকে যেমন নতুন পথ দেখিয়েছে তেমনি তাদের নতুন করে বাঁচার আশা জাগিয়েছে। তার কবিতার দ্রোহ বর্বর ইসরাঈলিদের অস্থির করে তুলেছে। তাদের বুলেট, বোমা আর অস্ত্রের মুখে দারবীশের কবিতা যেন মারনাস্ত্র হয়ে ইসরাঈলদের মর্মে আঘাত করেছে। নিরস্ত্র ফিলিস্তিনীদের মাঝে দারবীশের একেকটি কবিতা ইসরাঈল বিধ্বংসী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ফিলিস্তীন ইসরাঈল দ্বন্দ্ব স্মরণাতীত কালের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব, যে দ্বন্দ্বে ইসরাঈলিরা একদিনের জন্য

ফিলিস্তিনীদের উপর তাদের অত্যাচার নির্যাতন থামায়নি। এমনকি এই প্রবন্ধ লেখবার সময়ও ইসরাঈলি বাহিনী গাজায় মুহুর্মুহ বোমা হামলা চালিয়েছে।[৪৩]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি মানবতার কবি, ফিলিস্তীনের জাতীয় কবি, মাহমুদ দারবীশ তাঁর কাব্য প্রচেষ্টায় আধিপত্যবাদী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দ্রোহের কবি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে গোটা ইসরাঈলি শক্তিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন। তাই তারা কবি দারবীশ ও তাঁর কবিতাকে খুবই ভয় পেত। তারা তাঁর ব্যাপারে সজাগ থাকত। কিন্তু শত বাধার মুখেও কবি তাঁর কাব্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন যা স্বাধীন ফিলিস্তীন ও স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনী জনগণের প্রাণের স্পন্দন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আরবী কাব্য সাহিত্য কে জাগরুক করে রেখেছে।

টিকা ও তথ্যনির্দেশ

১ মাহমুদ দারবীশ ১৯৪২ সালে ফিলিস্তীনের আল-বিরওয়াহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল বাহিনী ফিলিস্তীন দখল করলে বিরওয়াহ গ্রামটি আক্রান্ত হয়। প্রাণে বেঁচে যান দারবীশ ও তাঁর পরিবার। তারা ৩৬ ঘণ্টা ইসরাঈল বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। এর পর তারা শরণার্থী হয়ে লেবাননে আশ্রয় নেন। এক বছর পর যখন দারবীশের বয়স সাত বছর তখন তিনি লেবাননের সীমান্ত দিয়ে ফিলিস্তীনে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে প্রবেশ করেন। ততদিনে তার ঘরবাড়ী ও গ্রাম ইসরাঈলি সেনাদের দ্বারা ভষ্মিভূত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার প্রাথমিক শিক্ষা হয় 'দাইরুল আছাদ' এ আত্মপরিচয় গোপন করে। আর তার মাধ্যমিক শিক্ষা হয় কাফার ইয়াসিফ গ্রামে। আর এর পরই তিনি জড়িয়ে পড়েন নানা তৎপরতায়। তার জীবন হয়ে ওঠে শুধু কবিতা লেখা এবং কবিতার মাধ্যমে লড়াই চালাতে। এ সময় তিনি ইসরাঈলি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং পার্টির পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তার কবিতা ফিলিস্তিনীদের দারুনভাবে প্রভাবিত করে। তিনি 'আমাছিয়া' বা সন্ধ্যা কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে গ্রামে গ্রামে গিয়ে কবিতা পাঠ করতেন। যার কারণে ইসরাঈলবাহিনী ভীত হয়ে ওঠে। সেই সময় ইসরাঈলবাহিনী তাঁকে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত গৃহবন্দি করে রাখে। দারবীশের রাজনৈতিক কার্মকান্ডের কারণে তাঁকে ১৯৬১, ১৯৬৫, ১৯৬৭ তে কারাবরণ করতে হয়। সত্তর দশকে তিনি বৈরুতে চলে যান। ১৯৭৭ সালে তিনি 'আল্লাজনাতুত্তানফিযা লি মুনাজ্জামাতিত তাহরীরির ফিলিস্তিনী'তে যোগ দেন। ১৯৯৩ সালে আসলো চুক্তির পর তিনি এর প্রতিবাদে এ দল থেকে বেড়িয়ে আসেন। ১৯৯৪ সালে তিনি ফিলিস্তীনের রামাল্লায় ফিরে আসেন। এ সময় ইসরাঈলি বাহিনী তাকে গৃহবন্দি করে রাখে। লেলিন সাহিত্য পুরস্কারসহ দারবীশ অনেক পুরস্কার লাভ করেন। ৯ আগস্ট ২০০৮ সালে ৬৭ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্র. https://bn.wipedia.org/wiki/মাহমুদ দারবীশ (login date: 26-11-2020).

২ ১৯৭১ সালের ২ নভেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড আর্থার বালফোর ইহুদী নেতা ব্যারণ রথচাইল্ডকে একটি চিঠি লিখেন, যা ইতিহাসে বালফোর ঘোষণাপত্র হিসেবে পরিচিত। এই চিঠিতে তিনি লিখেন, 'মহামান্য (বৃটিশ) সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদী জনগণের জন্য জাতীয় আবাসভূমি গড়ে তোলার পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বত্তোম প্রয়াস প্রয়োগ করা হবে। এই চিঠিই মধ্যপ্রাচ্য বিপর্যয় সৃষ্টির গোড়া পত্তন করে। বালফোর ঘোষণার জের ধরেই ১৯৪৮ সালে আত্ম প্রকাশ করে উগ্র ইহুদীবাদী রাষ্ট্র ইসরাঈল। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনীকে হত্যা, ধর্ষণ ও হামলার মাধ্যমে তাদের বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী শরণার্থী হয়ে যায়। এই ধারাবাহিকতা আজও চলে আসছে। যার বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমান ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের দূর্বিসহ অবস্থা। এখানকার জনগণ তাদের স্বাধীকার ফিরে পাওয়ার জন্য আজও সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

দ্র. Hen Pappe, *The Ethnic Cleansing of Palestine* (London: One World Publications, 2006), p. 17.

৩ ফিলিস্তীন: ফিলিস্তীন (فلسطين) প্রাচীন Palestine এর আরবীকৃত নাম। Philistine দের দেশ। এই নামটি ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং অন্যান্য গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থকারগণ Philistene এর উপকুল অংশকে বুঝাতে ব্যবহার করেছেন। কোন কোন সময় উহার পূর্ব পার্শ্বস্থ অঞ্চল, যা প্রায় আবর মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত সেই অঞ্চলকেও ফিলিস্তীন বলে অভিহিত করা হয়েছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে Palestine এর তিনটি প্রদেশ ছিল: ১. Palaestina Prima ২. Palaestine Secunde ৩. Palaestina Tertia. ইসলামী শাসনাধীনে আরব বিজয়ীগণ কর্তৃক ইতিপূর্বে Palaestina Prima নামে পরিচিত প্রাচীন বায়যানটাইন প্রদেশের সেই অঞ্চলে প্রশাসনিক ও সামরিক জিলা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাকেই ফিলিস্তীন নামে অভিহিত করা হয়। ইহা উত্তর দিকে Carmel পর্বত হতে দক্ষিণ দিকে Ghazza পর্যন্ত বিস্তৃত।

দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ১৫তম খন্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে- ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৩।

৪ রজা আন-নাক্কাশ, *মাহমুদ দারবীশ শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ* (মিসর: দরুল হিলাল, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৯।

৫ শরীফ আতিক-উজ-জামান, *মাহমুদ দারবীশ পাঠ ও বিবেচনা* (ঢাকা: সংবেদ, ফেব্রুয়ারী, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪৯-৫০।

৬ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১* (রিয়াদ: আর-রাঈস বুক, ১ম সংস্করণ জুন- ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৩।

৭ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩।

৮ *তদেব*।

৯ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩।

১০ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০।

১১ For Zionist activities after Bastle Congress, cf., Leonard Stein, *The Balfour Declaration* (Newyork: Simon and Schuster, 1961).

১২ বিশ্বের দেড় কোটি ইহুদীর ৬৭ লাখ ইসরাঈলে, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা: বুধবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২০।

১৩ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬১।

১৪ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬।

১৫ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫।

১৬ শরীফ আতিক-উজ-জামান, *মাহমুদ দারবীশ পাঠ ও বিবেচনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

১৭ ড. কামিল আস-সাওয়াফিরী, *আশ-শি'রিল 'আরাবীয়্যিল হাদীস ফী মা'য়াসাতি ফিলিস্তীন* (মিসর: মাতবা'আতু নাহদাহ, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৭৯।

১৮ For raids and Counter raids, cf., Lt. Gen. E.L. Burns, *Between Arab and Israeli* (London: Harrap, 1962)

১৯ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।

২০ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।

২১ ড. নাসীব নিসাবী, *মাদখাল ইলা দিরাসাতিল মাদারিস আল-আদাবিয়্যাহ* (দিমাস্ক: ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৪৩৯।

২২ Dr. MOHSEN MOHMMED SALEH. *History of Palestine A Methodologicl Study of a Critical Issue*, Al Fatah Foundation, 24 At-Tayaran st., Nasr city, Cairo, Egypt, p. 229.

২৩ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-৩* (রিয়াদ: আর-রাঈস বুক, ১ম সংস্করণ জুন- ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১০৫।

২৪ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-৩*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

২৫ For terrorism of the Jewish terrorist organizations, cf., Edgar O' Ballance *The Arab-Israeli War* (Newyork: 1948).

২৬ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-৩*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

২৭ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-৩*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

২৮ *শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

২৯ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭১-৩৭২।

৩০ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

৩১ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩।

৩২ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪।

৩৩ ড. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, ১ম খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ৩৯৫-৩৯৬।

৩৪ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-৩*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩।

৩৫ *তদেব*।

৩৬ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯।

৩৭ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯-৫০।

৩৮ মাহমুদ দারবীশ, *হালাতু হিসার* (রিয়াদ: আর-রাঈস বুক, ১ম সংস্করণ এপ্রিল- ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৭।

৩৯ মাহমুদ দারবীশ, *হালাতু হিসার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১০।

৪০ *শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৪১ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০।

৪২ মাহমুদ দারবীশ, *দীওয়ান: আল-আ'মালুল উলা-১*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩-৮৪।

৪৩ Fsrael Pounds Gaza after rocket attack, *The Daily Star*, Dhaka: Monday November 23, 2020.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

আরবি ভাষার সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. মনিরুজ্জামান*

Abstract: Language is the mirror of thought, the fruit of the mind ; it is an exhibition of human culture and its civilization, a means of human communication Arabic Language the language of the eternal message of Allah, the vessel of the pure Sunnah of Prophet, a teacher in the path of knowledge, The language Arabic belongs to the family of Semitic languages emanating from the group of Afro-Asian languages including Canaanite as well as Aramaic and Arabic, but Arabic is the most common Semitic language and the most widespread and used, due to its preservation of the components of the mother Semitic language more than any other Semitic language. Arabic is a vibrant and flowing language that millions of people speak as an official language as well as hundreds of millions as a religious language. The noteworthy fealing of this language includes its structures and formulas, the abundance of its sources and its collections, the quality of its vocabulary and its derivation, the accuracy of its expressions and its composition, and the good order of its structure.

ভূমিকা

অ্যাফ্রো-এশিয়ান ভাষাসমূহের মাঝে আরবি অন্যতম। এ ভাষা সেমিটিক ভাষার অপভ্রংশ। এভাষার জনক ‘ইয়া‘রিব ইব্ন কাহ্তান। মতান্তরে হযরত ইসমা‘ঈল (আ) চৌদ্দ বছর বয়সে আরবি ভাষায় প্রথম কথা বলেন। উত্তরাঞ্চলীয় সেমিটিক ভাষার মাঝে আরবি, ‘ইবরানী ও সুরয়ানী প্রসিদ্ধ। এ তিন ভাষার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিশাল অঞ্চলজুড়ে আরবি ভাষার একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তৃত। প্রায় চারশত সাতচল্লিশ মিলিয়ন লোক এ ভাষায় কথা বলে। বাইশটি দেশের রাষ্ট্রভাষা আরবি। জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষার একটি আরবি ভাষা। এ ভাষার শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ। ইবনু মানজূরের লিসানুল আরব অভিধানে আশি হাজারের অধিক মূল-ধাতূব্যবহৃত হয়েছে। এ ভাষার শব্দসংখ্যা বার মিলিয়নের অধিক। জাহেলী যুগের পর হতে আরবি ভাষার হদিস পাওয়া যায়। অঞ্চলভেদে আরবগণ উনত্রিশটি ডায়ালেক্ট বা উপভাষায় কথা বলে থাকেন। ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আরবি ভাষার বিকাশের প্রথম ও প্রধান কারণ হলো, আল কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবি। আরবি ভাষা পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় পাঁচ হাজার ভাষার মাঝে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ভাষা। নানা বৈশিষ্ট্য, নান্দনিকতা ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এ ভাষাকে গাম্ভীর্যপূর্ণ ও অর্থবহ ভাষায় পরিণত করেছে।

আরবি ভাষার সৌন্দর্য

লুগাতুদ দ্বাদ(لغة الضاد):আরবি ভাষাকে الضادلغةবা দ্বাদ এর ভাষা বলা হয়। কেননা আরবি হরফ উনত্রিশটি। তন্মধ্যে الضاد (দ্বাদ) ব্যতীত অন্যান্য হরফের উচ্চারণ অন্যান্য ভাষায় পাওয়া যায়। الضاد (দ্বাদ) একমাত্র হরফ যার উচ্চারণ পৃথিবীর অপর কোন ভাষায় নেই এবং অন্যান্যরা সাবলীলভাবে এ হরফ উচ্চারণ করতেও সক্ষম নয়। উপরের দুই দাঁতের মাড়ির সাথে জিহ্বার আগা লাগিয়েالضاد (দ্বাদ) উচ্চারণ করতে হয়। মুখের ডান ও বাম দিক ভিতরের দিকে চেপে এসে শব্দটি বের হয়। হরফটি বাম দিক হতে বের হয় বটে, কিন্তু ডান দিক হতেই অধিক উচ্চারিত হয়। দাল কে الطاء (ত্বা) এর প্রতি ঝুঁকিয়ে যে الضاد (দ্বাদ) উচ্চারণ করা হয় তা উদ্দেশ্য নয়; বরং الظاء (যোয়া) কে লামের প্রতি ঝুঁকিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। উচ্চারণকালে স্বরالضاد (দ্বাদ) এর সাথে মিশ্রিত হয়ে উচ্চারিত হয়।আরবিভাষী ব্যতীত অন্যভাষীগণ আরবি শিখতে গিয়ে দ্বাদের উচ্চারণে চরম কষ্টের সম্মুখীন হয়ে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

থাকেন, অথচ আরবরা সহজে এ হরফের উচ্চারণ করতে পারে। কবি আহমদ শাওকী এ হরফের মহিমা বর্ণনায় বলেন-

إنّ الذي ملأ اللغات مَحاسِناً * جَعَلَ الجمال وسِرَّه في الضاد[1]

অর্থাৎ, যিনি ভাষাসমূহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন, তিনি দ্ব.াদের ভাষার মাঝে সৌন্দর্য ও রহস্য স্থাপন করেছেন।

কবি খলীল মুতরান বলেন-

وُفود بني الضاد جاءَت إليك * وأثنَت عليك بما وَجبْ[2]

অর্থাৎ, দ্বাদের ভাষীগণের পক্ষ হতে তোমার নিকট যে প্রতিনিধি দল এসেছে, তারা তোমার যথার্থ প্রশংসা করেছে।

কবি ইসমাঈল সাবরী বলেন-

هذا مَنهلٌ صفا لأهل الضاد*أيّها الناطقون بالضاد[3]

অর্থাৎ, হে দ্বাদের ভাষীগণ ! এ হচ্ছে দ্ব.াদ এর ভাষাভাষীদের জন্য পরিচ্ছন্ন একটি ঘাট।

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিসমূহে কবিগণ আরবি ভাষাকে দ্বাদের ভাষা বলে সম্বোধন করেন। তারা আরবি ভাষার হরফ দ্বাদকে আরবি ভাষার পরিচায়ক হিসেবে ব্যবহার করেন।

আরবি লিপির সৌন্দর্য : চিত্রশিল্পী পিকাসু বলেন, চিত্রশিল্পের প্রয়োজনে আমি যে বিন্দুতেই হাত দিয়েছি দেখতে পেয়েছি যে, আরবি লিপি আমার বহুকাল পূর্বে সে ধাপে পৌঁছে গেছে।[৪]আরবি বর্ণমালা একপ্রকার শৈল্পিক সৌন্দর্য বহন করে। বিভিন্ন স্থানে খোদাইকৃত ফলকে আরবি হরফের অবস্থান কারুকার্যমণ্ডিত, যা সৌন্দর্য ও মুগ্ধতার স্মারক। বর্তমানে আরবি হরফের জন্য বিভিন্ন প্রকার আরবি ফন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল ফন্টে আরবি হরফ লেখার সময় অপরূপ নান্দনিকতা ফুটে ওঠে। আরবি বর্ণমালার একশত ছয় প্রকার লিপি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অল্পকিছু ব্যতীত অবশিষ্টগুলো বিলুপ্ত প্রায়। বর্তমানে প্রচলিত লিপির শ্রেণিসংখ্যা ছাব্বিশটি। যেমন- কূফী, মুহাক্কিক রায়হানী, টোমার, জালী, সুদুস, নুস্‌খ, ফার্সী, শাকসা, দীওয়ানী, জালী দিওয়ানী, রুক‘আহ, ইজাযাহ, মাগরিবী, সুম্বলী, বিসাম, তোগরা, সিয়াকাহ, হরূফুত তাজ, মাশক, মাক্কী-মাদানী, সুদানী, বিহারী, কারিশমা, মু‘আল্লী, আল কুদ্দূসী, আল হুর্‌র। তন্মধ্যে রুক‘আহ, নুসখ ও তোগরা বহুল প্রচলিত। আরবি লিপির অনন্য সৌন্দর্যের দুটি চিত্র নিম্নরূপ-

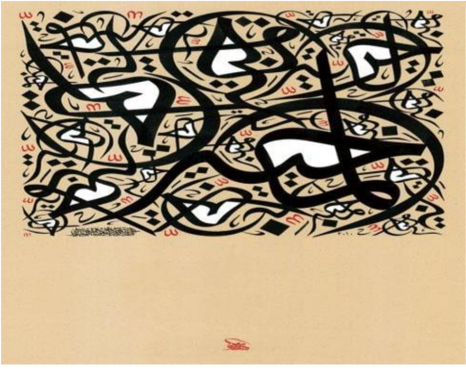
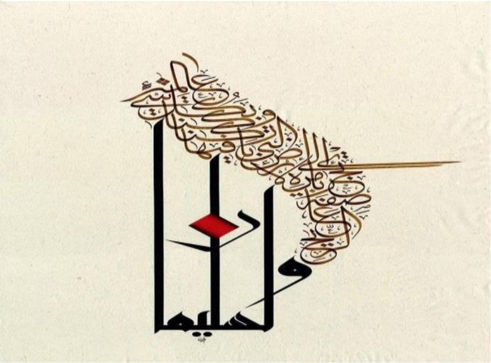

আরবি শিলালিপি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বিশেষত মুসলিম অধ্যুষিত ও মুসলিম শাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন মসজিদ, কবর, পাঠশালা ও দেয়ালের গায়ে আরবি হরফে খোদাইকৃত কারুকার্যমণ্ডিত শিলালিপি আরবি হরফের সৌন্দর্যের বাহক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া আল কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় গ্রন্থের প্রচ্ছদে আরবি হরফের চমকপ্রদ উপস্থাপনশৈলী পাঠক মনে ভক্তিগুণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।[৫]

পরিপূর্ণতা : আরবি একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা। এ ভাষা মানব জীবনের সকল বিষয়কে ধারণ করতে সক্ষম। যে কোনো ভাব প্রকাশে আরবি ভাষার জুড়ি নেই। পৃথিবীর তাবৎ ভাষাসমূহ আরবি ভাষায় অনুবাদ করা যায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য ভাষার শব্দভাণ্ডার আরবি ভাষাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করতে অক্ষম। আরবি ভাষার শব্দভাণ্ডার পৃথিবীর যে কোন ভাষার তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ । সর্বশেষ পরিসংখ্যানে প্রতিভাত হয় যে, আরবি ভাষায় শব্দ সংখ্যা বার মিলিয়ন তথা এক কোটি বিশ লক্ষ, অথচ ফরাসী ভাষার শব্দসংখ্যা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। রুশ ভাষার শব্দসংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং ইংরেজী ভাষার শব্দ সংখ্যা ছয় লক্ষ। আরবি ভাষা আয়ত্ত করতে আটাশি ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়, অথচ অন্যান্য ভাষা আয়ত্ত করতে মাত্র বাইশ থেকে তেইশ সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন পড়ে।[৬]

প্রাচীনত্ব : পৃথিবীতে প্রচলিত ও অপ্রচলিত ভাষাসমূহের মাঝে আরবি প্রাচীনতম ও বহুল প্রচলিত ভাষা। আরবি ভাষার সমগোত্রীয় ভাষা ইবরানী (হিব্রু ভাষা) ও সুরয়ানীও প্রাচীনতম ভাষা; কিন্তু এ ভাষাদুটি সর্বযুগে জীবন্ত ও প্রচলিত ছিলনা। ইবরানী ভাষায় তাওরাত এবং সুরয়ানী ভাষায় ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে। তথাপি ভাষাদুইটি চিরন্তন ও জীবন্ত হওয়ার গুণাবলি হতে বঞ্চিত। সম্ভবত আসমানী কিতাবে বারংবার বিকৃতি আসার কারণে ভাষাদ্বয় আপনত্ব হারিয়ে ফেলে। অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ওপর আরবি ভাষায় আল কুরআন নাযিলের ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় গণ্ডি এবং সে ধর্মের ভাষার বিকাশ সংকুচিত হয়ে আসে। আরবি ভাষার বর্তমান কাঠামোর আয়ুষ্কাল পনের শত বছর, যা ছয়শত খ্রিষ্টাব্দে সূচনা লাভ করে আজও আপন মহিমায় ভাস্বর। এর পূর্বে সাফাইয়্যা উপভাষা চালু ছিল, যা পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সৃষ্টির পর হতে এ ভাষা বিস্তৃতি লাভ করে চলছে। এ ভাষা প্রাচীনত্বের পাশাপাশি জীবন্ত ও চির অম্লান। এটি যেমন মানুষের মুখের ভাষা তদ্রূপ প্রাণেরও ভাষা বটে। শত জনমে এটি মানুষের মুখে মুখে বেঁচে আছে। বেঁচে আছে তাফসীর হাদীস, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, বক্তৃতা ও ধর্মীয় নানাবিধ বৈচিত্র্যময় লেখনীতে। আল্লাহ তায়ালা এ ভাষাকে চিরন্তন করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ অর্থাৎ, আমি আল কুরআন নাযিল করেছি, আর এটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও আমার।[৭]

সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গি : আরবি ভাষার অন্যতম অলঙ্কার তার সুনিপুণ প্রকাশভঙ্গি। مقتضى الحال তথাস্থান-কাল -পাত্রভেদে শব্দের ব্যবহার, নানা প্রেক্ষিৎ, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বিবেচনায় যথোপযুক্ত শব্দ প্রয়োগের ফলে আরবি ভাষা অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো ‘চাহিদা’। এটি প্রকাশ করার জন্য স্থান-কাল-পাত্রভেদে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ-

فلان جائع إلى الخبز، قرم إلى اللحم، عطشان إلى الماء، عيمان إلى اللبن، قَرِد إلى التمر، جعم إلى الفاكهة، شبق إلى النكاح

উক্ত উদাহরণে রুটির চাহিদা বুঝাতে جـائع গোস্তের আকাঙ্ক্ষা বুঝাতে قَرِم পানির তৃষ্ণা বুঝাতে عـطشان দুধের আকর্ষণ বুঝাতে عيمـان খেজুরের প্রতি আকর্ষণ বুঝাতে قَرِد ফলের চাহিদা বুঝাতে جعـم এবং বিবাহের আগ্রহ ও চাহিদা বুঝাতে شبق ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে বিচ্ছিন্ন ও কেটে ফেলা বুঝাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন-

فلان جدع أنـفه، فقأعينه، شترجفنه، شرم شفته، جذم يده، جب ذكره

এ উদাহরণে নাক কাটা বুঝাতে جدع চোখ উপড়ে ফেলা বুঝাতে فقأ ভ্রু কাটা বুঝাতে شتر ঠোঁট কাটা বুঝাতে شرم হাত কাটা বুঝাতে جذم পুরুষাঙ্গ কাটা বুঝাতে جب শব্দ ব্যবহৃত হয়। এমনকি মানুষের কোন একটি বিষয়ের নানা অবস্থা বুঝাতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা-

أول النوم: النعاس وهوأن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الوسن: وهو ثـقل النعاس، ثم التزنيق: وهو مخالطة النعاس العين، ثم الكرى والغمض: وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان، ثم التغفيق: وهو النوم وأنت تسمع كلام القوم، ثم الإغفاء: وهوالنوم الخفيف، ثم الهجود: وهوالنوم الغرق ثم التسبيخ: وهو أشد النوم.

উক্ত উদাহরণে ঘুমের প্রাথমিক অবস্থা তন্দ্রা বুঝাতে النعاس ভারী তন্দ্রা বুঝাতে الوسن চোখে তন্দ্রা জেঁকে আসা বুঝাতে التزنيق ঘুম ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা বুঝাতে الكرى والغمض ঘুমের ঘোরে কথা শুনতে পারার অবস্থা বুঝাতে التغفيق ভাসা ভাসা ঘুম বুঝাতে الإغفاء গভীর ঘুম বুঝাতে الهجود এবং চরম ঘুম বুঝাতে التسبيخ ব্যবহৃত হয়।[৮]

ই'রাবের সৌন্দর্য : প্রাচীন সভ্যতার বাহক ব্যবিলন, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় ই'রাবের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এটি আরবি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবি শব্দের শেষে 'আমিল' অনুযায়ী যে পরিবর্তন ঘটে তাকে ই'রাব বলে। যেমন- মুবতাদা বা ফায়িল হলে রফ'আহ, মাফউল হলে নসব এবং মুদাফ ইলাইহি হলে জর হয়। ই'রাব প্রকাশের স্থান শব্দের শেষ হরফ। আরবি বাক্যের সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করার জন্য ই'রাবের সঠিক প্রয়োগ অনস্বীকার্য। ই'রাবের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগের অভাবে বাক্যের সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা যায়না। বিশেষত অনারব আরবি শিক্ষার্থী বা শ্রোতা সঠিক ই'রাবের ব্যবহার ব্যতীত আরবি ভাষার অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়না। ই'রাবের হেরফের হলে ভাব ও মর্ম অনুদঘাটিত থেকে যাবে এবং বাক্যটি কোন উপকারে আসবেনা। যেমন- জনৈক বাংলা ভাষী যিনি আরবি জানেন, তার সম্মূখে আরবের কোন বক্তা ই'রাব প্রয়োগ না করে "ما أحسن زيد"، বললে শ্রোতা কোন মর্ম বুঝতে সক্ষম হবেনা। পক্ষান্তরে যদি "ما أحسَنَ زيدًا" أو "ما أحسَنُ زيدٍ" أو "ما أحسَنَ زيدٌ" বলে তাহলে শ্রোতা বাক্যটির সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।[৯]

ইশতিকাক : আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো ইশতিকাক। শব্দটির অর্থ নির্গত হওয়া। অর্থাৎ, একটি শব্দ থেকে অপরাপর শব্দাবলি বের হওয়ার প্রক্রিয়াকে ইশতিকাক বলে। যেমন-

فعّل، فاعل، انفعل، افتعل، افعلَّ، تفعَّل، تفاعل، استفعل، افعوعل، افعوَّل، افعالَّ، افعنعل، افعنلى

এ শব্দগুলো فعلَ শব্দ থেকে নির্গত। অনুরূপ سَلَم، سلّم، وسالم، وسلمان، ومسلم، وسلمي، السلامـــة، السلم শব্দগুলো سلم থেকে নির্গত। মূলধাতুর ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে শব্দ নির্গত হওয়ার প্রক্রিয়াকে 'ইশতিকাকে সগীর' বলে। আর যদি মূলধাতুর বিন্যাসকে ভেঙ্গে ধাতুকে পূর্বাপর করে নতুন শব্দ বের করা হয় তবে তাকে 'ইশতিকাকে কবীর' বলে। যেমন- لوق، لقو، وَلَق، وَقَل، قلو শব্দগুলো قول শব্দ থেকে নির্গত। অনরূপ سلم، مسل، ملس، لمس، لسم শব্দাবলি "سمل" থেকে নির্গত। আরবি ভাষায় শব্দের রূপান্তর ও নির্গমন প্রক্রিয়া শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক। এ প্রক্রিয়াটি অন্যান্য ভাষায় বিরল। ইশতিকাকের এ নিয়মটি আরবি ভাষার সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।[১০]

মুতারাদিফ ও মুতাযাদের নান্দনিকতা : আরবি ভাষার ব্যাপকতা ও পরিধি ঈর্ষনীয়। মুতারাদিফ শব্দের অর্থ সমার্থক। পরিভাষায় একাধিক শব্দ কোন একটি অর্থ ধারণ করলে শব্দসমূহকে পরস্পরের মুতারাদিফ বলে। পৃথিবীর সকল

ভাষার তুলনায় আরবি ভাষায় মুতারাদিফ শব্দের সমাহার সর্বাধিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষা আরবি ভাষার ধারেকাছেও নেই। মুতারাদিফের কতিপয় শব্দ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

হুব্বুন : الحبশব্দের অর্থ ভালোবাসা। শব্দটির অগণিত মুতারাদিফ রয়েছে। যেমন-

المحبة ، العلاقة ، الهوى ، الصبوة ، الصبابة ، الشغف ، المقة ، الوجد ، الكلف ، التتيم ، العشق، الجوى ، الدنف ، الشجو ، الشجن ، الشوق ، الخلابة ، البلابل ، التباريح ، السدم ، السهد ، الغمرات ، الوهل ، اللاعج ، الاكتئاب ، الوصب ، الحزن ، الكمد ، اللذع ، الحُرق ، الأرق ، اللهف ، الحنين ، الاستكانة ، التبالة ، اللوعة ، الفتون ، الجنون ، اللمم ، الخبل ، الرسيس ، الداء المخامر ، الود ، الخُلة ، الخِلم ، الغرام ، الهُيام ، التدليه ، الوله ، التعبد.

উল্লিখিত প্রতিটি শব্দ ভালোবাসার অর্থ বহন করে। ম্যারি উকা একজন জাপানী লেখিকা। তিনি ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, জাপানী ভাষায় ভালোবাসা প্রকাশের জন্য শুধুমাত্র একটি শব্দ পাওয়া যায়। অথচ আমি ভালোবাসার আরবি গানে ভালোবাসা প্রকাশের জন্য বহু নান্দনিক শব্দের ব্যবহার দেখতে পেয়েছি।

নারী বিষয়ক শব্দ : নারীর আরবি প্রতিশব্দ মারআতুন। আরবি ভাষায় নারীকে বুঝাতে অসংখ্য শব্দসমাহার বিদ্যমান। যেমন-

الربحلة: ভারসাম্যপূর্ণ মোটা নারী।السبحلة : মোটা নারী, তবে দেখতে অসুন্দর নয়। الجارية : তরুণী বা লম্বা ও প্রশস্ত নারী। الوضيئة : যে নারীর মাঝে রূপের ছোঁয়া বা ঝলক আছে। العيطبول : দেখতে সুন্দর ও রূপের পরিচায়ক দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট নারী। الغانية : সাজসজ্জা ব্যতীত যে নারী দেখতে সুন্দরী। الوسيمة : অঙ্কিত ছবির মত স্থিতিশীল দেহের অধিকারী নারী। القسيمة : অপ্সরা। الرعبوب : শুভ্রদেহী ও ভরা স্বাস্থ্যবতী নারী। الزهراء : চাঁদ রূপসী বা পূর্ণিমার মত সাদা-হলদে রঙের নারী। الدعجاء : ডাগর ও কাজল নয়না। الشنباء : চিরল দাঁতের পারফেক্ট সুন্দরী। الخود : সুন্দর গঠনের অধিকারিণী। المملودة : নিপুন সুন্দরী। الخرعبة : সুন্দর অবয়ব ও কোমল নার্ভের অধিকারিনী। المبتلة : যার মাংসে মাংসে ঘর্ষণ হয়না।الهيفاء : সুন্দর পেটবিশিষ্টা নারী।الممشوقة : দীর্ঘদেহী কোমল কোমর বিশিষ্টা নারী। الخدبجة : হাত পা মোটা স্বাস্থ্যবতী নারী। البرمادة : মোটা নারী যার মাংস কেপেঁ ওঠে। الرقراقة : যে নারীর মুখমণ্ডলে পানি ঝরে। البضة : কোমল ত্বকের অধিকারিনী। النضرة: যার মুখমণ্ডল কোমল ও সজীব। الوهنانة : অধিক স্বাস্থ্যের কারণে যে নারীর চলতে-ফিরতে সমস্যা হয়। البهنانة : হাল্কাপাতলা ও শান্তশিষ্ট। العرهرة : বিশালদেহী সুন্দরী। العبقرة : সুন্দরী ও কোমল। الغيداء : দ্বিগুণ কোমল নারী। الرشوف : যে নারীর মুখে সুঘ্রাণ লেগে থাকে। أنوف : যে নারীর হাতে সুঘ্রাণ লেগে থাকে।[১১]

মধু বুঝাতে আরবি ভাষায় ৮০টি শব্দ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতিপয় শব্দ -

العسل، والضرب، والضربة، والضريب، والشوب، والذوب، والحميت، والتحمويت، والجَلس، والورس، والشَّهد، والشُّهد، والماذي، ولعاب النحل، والرحيق.[12]

অনুরূপ তরবারীর জন্য অসংখ্য শব্দ পাওয়া যায়। যেমন-

سيف،والصارم، والرداء، والقضيب، والصفيحة،والمفقّر، والصمصامة، والكهام، والمشرفي، والحسام، والعضب، والمذكر، والمهند، والصقيل، والأبيض.

আরবিতে সিংহের হাজারের অধিক নাম পাওয়া যায়। ইবনে খালুবিয়া সিংহের ৫০০টি নাম উল্লেখ করেন। পরবর্তী লেখকগণের গবেষণায় এ সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। তন্মধ্যে কতিপয় নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো-

الأسد،الأثمد ، الأدلم ، أسجر ، أسامة ، الأشهب ، الأصهب ، أغلب ، بهنس ، البيهس ، الباسل، تيمو ر ، جرهام ،الحارقة ، حبيل،براح، حفص ، حمزة ، حلبس ، حُلابس ، حُلبس ، حيدرة ، حية،الوادي ، الخُبعثن الخبوس ،الخابس، خنابس،خائن،العين، الدواس، الدوكس، الدرياس، الدلهمس، الدرباس، الد

رواس، ذو،زوائد،الرئبال ، رستم ، رنبال ، السرحان ، السِيد ، سبع ، ساعدة ، الشباك ، الشجعم ، الشد يظم ، الشيظمي ، شخبر ،الصمة ، الصلهام ، الضرغم ، الضرضم ، الضبارم، ضيغم، ضرغام، الضمضم ، الضُماضم، الضباث، الضيثم، ضراك، الطيثار، الظلوم، العرباض ، العرندس ، العثمثم ، العجوز ، العوف ، عباس ، عتريس ، عِفر، عِفرية،عُفارية، عِفريت، عيّار، عوّال، عنبس، عُنابس ، عنبسة ، عزام ، عُذافر ، غضنفر ، الفرافرة، الفرانس،فرافض، فرافضة ، القرضاب ، قسورة، قصاقص، قضاقض ، قنصوة ، قهبلس، قلهام، القسقس،القشعم،كهمس، الكردوس، لبؤ، ليث، المزعفر، المهزع، المخدر، مهصر، الهيمص ، الهصمصم ، الهجاس ، الهرس، الهُمام ، الهمّاس ، الهموس ، الهواس ، الهرماس ، الهزبر ، الهصور، الأهرس ، هيصر ، هيصار، هصّار ،هُصر ، هصرة ، هُمام ، هترك ، هزير ، هموس ، ورد .

সিংহের মূলনামের পাশাপাশি উপনামও বিদ্যমান আছে। যেমন-

أبو العباس - أبو الأبطال - أبو ضيغم - أبو الأشبال - أبو الحارث – أبو فراس – أبو حفص .

সিংহশাবকেরও অগণিত নাম আছে।যেমন-

جَرو ، جِرو ، شبل ، الشيع ، الحفص ، الفُرهد ، السجلل.

মদের ১০০টির মত নাম আছে। তন্মধ্যে কতিপয় নাম যেমন-

المُدام - الطلي- الطلاء - الحمراء- ليلى الصفراء - الصافية- الصرخدي - الصهباء- العقار--الخمر الترياق- السلسل- السلسبيل- السلاف – السلافة - الشمول - القهوة- القرقف - الإثم- العرق-العتابة – العاني - العروس- الراح- اللذة- النفيسة- الزنجبيل- المدامة- البكر- العذراء- الخرطوم – الكميت .

মদের মূলনামের পাশাপাশি উপনামও রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় উপনাম যেমন-

أم ليلى- أم الخبائث- بنت الحان- أم الدهر- أم حنين- بنت الدنان .

আরবি ভাষায় একটি শব্দের বহুসংখ্যক মুতারাদিফ শব্দ থাকার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। উপরোল্লিখিত শব্দাবলি ব্যতীত এরূপ আরো হাজারো শব্দের নজীর বিরাজমান আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় শব্দ সম্পর্কে তথ্য দেয়া হলো। বছরের ২৪টি, আলোর ২৫টি, অন্ধকারের ৫২টি, সূর্যের ২৯টি, বাদলের ৫০টি, বৃষ্টির ৬৪টি, কূপের ৮৮টি, পানির ১৭০টি, দুধের ১৩টি, উটের ২৫৫টি নাম পাওয়া যায়। নামের মত বিভিন্ন গুণের জন্যও অগণিত শব্দ পাওয়া যায়। যেমন- লম্বা বুঝাতে ৯১টি শব্দ এবং খাটো বুঝাতে ১৬০টি শব্দ রয়েছে। অনুরূপভাবে গরু, ছাগল, ষাড়, বর্শা, ধনুক ইত্যাদির জন্য আরবি ভাষায় বহুসংখ্যক শব্দ বর্তমান আছে। স্বভাবের ১০০টি নাম রয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সাগানী ও আবূ আলী আল-ফার্সীর আলাদা আলাদা রচনা রয়েছে। আবুল আলা আল-মা'আররী কুকুরের ৭০টি নাম উল্লেখ করেন। সুয়ূতী কুকুরের ষাটের অধিক নাম উল্লেখ করেন।[১৩]

মুতাযাদ : মুতারাদিফের বিপরীতে মুতাযাদ শব্দ রয়েছে। মুতাযাদ অর্থ বিপরীত। পরস্পরবিরোধী একাধিক অর্থ কোন শব্দে পাওয়া গেলে সে শব্দকে 'মুতাযাদ' বলে। যেমন- الصريمশব্দটির অর্থ- দিবা-রাত্রি, الصـــارخঅর্থ– সাহায্য প্রার্থী ও সাহায্যকারী, السدفةঅর্থ– আলো ও আঁধার, القـروءঅর্থ– মাসিক ও পবিত্র, الزوج অর্থ– নারী ও পুরুষ, البسلঅর্থ– হালাল ও হারাম, الناهل অর্থ– পিপাসা, الجون অর্থ– সাদা ও কালো, الخيلولة অর্থ– সংশয় ও নিশ্চয়তা।[১৪]

মাখরাজগত সৌন্দর্য : আরবি ভাষার উচ্চারণস্থলকে মাখরাজ বলে। আরবি বর্ণমালা ঊনত্রিশটি। মাখরাজ সতেরটি। সঠিকভাবে এ বর্ণমালা উচ্চারণের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। আরবি ভাষার জন্য মাখরাজ একটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরবি হরফের উচ্চারণে হেরফের হলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। যেমন- হা ও আইনের মাখরাজ হলো কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ। যদি এ দুটিকে কণ্ঠনালীর অগ্রভাগ হতে উচ্চারণ করা হয় তবে তা হামযা ও হায়ে হাওয়াযে

পরিণত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে অর্থের বিকৃত ঘটে। যেমন- الحمدঅর্থ প্রশংসা করা। আরالهمدঅর্থ নিভে যাওয়া। অনুরূপ علمঅর্থ জ্ঞান, আর ألم অর্থ যন্ত্রণা। উচ্চারণের ব্যবধানের ফলে অর্থগত ব্যবধান অনস্বীকার্য। আরবি ভাষা বলার সময় সঠিক মাখরাজ অনুসরণ করা হলে উপস্থাপনভঙ্গি অপরূপ হয়ে যায়। আরবি ভাষার গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গদ্য, বক্তৃতা, বাগধারা, নাহু-সরফ ইত্যাদি শ্রুতিমধুর ও নান্দনিক। আরবি হরফের বাচনভঙ্গি, উচ্চারণশৈলী ও শব্দাবলির ঝঙ্কার শ্রোতার কর্ণকুহরে সুরের মূর্ছনা তৈরী করে। এ ভাষার অন্তর্নিহিত ভাব কথামালা ও ইশারার ভঙ্গিতে প্রকাশ করা যায়।

আরবিতে বেশকিছু এমন হরফ রয়েছে যাদের একটির উচ্চারণ আরেকটির উচ্চারনের প্রায় কাছাকাছি। যেমন- الثاء، الذال–الضاد হরফগুলো উচ্চারণের পরস্পরের কাছাকাছি। তথাপি প্রত্যেকটির মাখরাজ ভিন্ন হওয়ায় একটির সাথে অপরটিকে গুলিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। অনুরূপ السينও الصاد এর উচ্চারণ প্রায় কাছাকাছি। এরূপ আরো কতিপয় শব্দের উচ্চারণ পরস্পরের কাছাকাছি। যেমন- العينও الألف এর উচ্চারণ, الحاءও الهاء এর উচ্চারণ, التاءও الطاء এর উচ্চারণ। আরবি হরফের মাখরাজ ১৭টি। মাখরাজসমূহের মূল স্থানগুলো হলো- হলক বা কণ্ঠনালীর প্রথম, মধ্য ও শেষভাগ। বক্ষ ও জিহ্বার অগ্রভাগ, মধ্যভাগ, পার্শ্ব এবং উপরের তালু ও দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান। এই স্থানগুলোতে ১৭টি মাখরাজ রয়েছে, যা হতে আরবি ২৯টি হরফ উচ্চারিত হয়। যথা-

১নং মাখরাজ : হলক্বের শুরু হতে ৹ء

২নং মাখরাজ : হলক্বের মধ্যভাগ হতে عح

৩নং মাখরাজ : হলক্বের শেষ হতে غخ

৪নং মাখরাজ : জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (দুই নুক্তা ওয়ালা) ق

৫ নং মাখরাজ : জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে এবং একটু আগে বাড়িয়ে ك

৬নং মাখরাজ : জিহ্বার মধ্যভাগ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে جشى

৭নং মাখরাজ : জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের দাঁতের মাড়ির গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে ض

৮নং মাখরাজ : জিহ্বার আগার কিনার সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে ل

৯নং মাখরাজ : জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ن

১০ নং মাখরাজ : জিহ্বার আগার পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ر

১১ নং মাখরাজ : জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে طدت

১২ নং মাখরাজ : জিহ্বার আগা, সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগিয়েصسز

১৩ নং মাখরাজ : জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ظذث

১৪ নং মাখরাজ : নীচের ঠোঁটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ف

১৫ নং মাখরাজ : দুই ঠোঁট হইতেبمو বা উভয় ঠোটের ভিজা স্থান থেকে মীম, উভয় ঠোঁটের শুকনা স্থান থেকে ওয়াও দুই ঠোট গোল হয়ে মধ্যখানে সামান্য ছিদ্র থাকবে।

১৬ নং মাখরাজ : মুখের খালি জায়গা হতে মদের হরফ واي

১৭নং মাখরাজ : নাকের বাশি হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যথা: اَنَّثُمَّ[১৫]

সিফাতুল হুরূপ : আরবি হরফের জন্য মাখরাজের অনুরূপ সিফাতও রয়েছে।হরফের উচ্চারণভঙ্গিকে সিফাত বলে। সিফাত প্রথমত দুই প্রকার। (১) সিফাতে লাযিমাহ (২) সিফাতে আরিযাহ। লাযিমাহ হলো, যে হরফের জন্য যে নির্দিষ্ট সিফাত আছে সে সিফাত অনুপাতে যদি হরফটিকে আদায় না করা হয়, তাহলে হরফ হরফই থাকেনা, অথবা হরফটি ত্রুটিপূর্ণভাবে আদায় হয়। হরফ হরফই থাকে না যেমন- (ত্বোয়া, তা) ত্বোয়া এর মধ্যে সিফাত হলো পোর। পোর সিফাত অনুপাতে (ত্বোয়া) উচ্চারিত না হলে ত্বোয়াটি তা হয়ে যায়। হরফ ত্রুটিপূর্ণভাবে আদায় হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো- যেমন (দাল) এর মধ্যে কুলকুলাহ এর সিফাত রয়েছে। দালকে কুলকুলাহ সিফাতসহ আদায় না করলে (দাল) ত্রুটিপূর্ণভাবে আদায় হয়।

আরিযাহ : আরিযাহ তাকে কে বলে যে হরফের জন্য যে নির্দিষ্ট সিফাত আছে, সেই সিফাতসহ যদি হরফটিকে আদায় না করা হয় তাহলে হরফ হরফই থেকে যায় কিন্তু হরফের উচ্চারণের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। যেমন: (ইন্না, লাম্মা) নুনে ও মীমে তাশদীদ হলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। যদি গুন্নাহ না করে পড়া হয়, তাহলে নুন ও মীম ঠিক থাকে কিন্তু গুন্নাহ না করার কারণে উচ্চারণের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। প্রথমোক্ত সিফাতে লাযিমাহ দুই প্রকার। যথা- ১. المتضادة ২. غيرالمتضادة

المتضادة এর পরিচয় : যার বিপরীতে অন্য একটি সিফাত থাকে তাকে মুতাযাদ্দাহ বলে। এটিপাঁচ জোড়ায় দশটি সিফাতকে অন্তর্ভুক্ত করে। যথা-

১। الهمسوالجهــــر : অর্থাৎ হরফ উচ্চারকালে শ্বাস জারি থাকা ও শ্বাস বন্ধ হওয়া। ক. الهمس সিফাতের হরফগুলি আদায় করার সময় তার মাখরাজে আস্তে ধাক্কা লাগার কারণে শ্বাস জারি থাকে এবং আওয়াজ ছোট হয়। এর হরফ ১০টি : فحثهشخصسكت খ. الجهر সিফাতের হরফগুলি আদায় করার সময় তার মাখরাজে জোরে ধাক্কা লাগার কারণে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং আওয়াজ বড় হয়। الهمس এর ১০টি হরফ বাদে বাকি ১৯টি জাহারের হরফ।

২। الشدة - الرخوة - التوسط : অর্থাৎ হরফ উচ্চারণকালে আওয়াজ বন্ধ, জারি ও মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকা। ক. شدة সিফাতের হরফগুলো আদায় করার সময় তার মাখরাজে শক্তভাবে ধাক্কা লাগার কারণে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় এবং আওয়াজ শক্ত হয়। এর হরফ ৮টি। যথা- اجدكقطبت খ.الرخوة. সিফাতের হরফ আদায় করার সময় তার মাখরাজে সহজে ধাক্কা লাগার কারণে আওয়াজ জারী থাকে এবং আওয়াজ কোমল হয়। এর হরফ الشدة এবং التوسط এর ১৩টি বাদে অবশিষ্ট ১৬টি। গ. التوسط সিফাতের হরফ উচ্চারণইের সময় আওয়াজ বন্ধ বা জারি না থেকে বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করবে। এর হরফ ৫টি। যথা- لنعمر

৩। الاستعلاءوالاستفال: পোর ও বারিক। ক. الاستعلاء সিফাতের হরফ আদায় করার সময় জিহ্বার গোড়া উপরের তালুর দিকে উঠার কারণে হরফটি মোটা হয়। এরূপ হরফ ৭টি। যথা- خصضغطقظ খ. الاستفال সিফাতের হরফগুলি আদায় করার সময় জিহ্বার গোড়া নীচের দিকে চেপে থাকার কারণে হরফগুলো বারীক বা চিকন সুরে আদায় হয়। الاستعلاء এর ৭টি হরফ বাদে অবশিষ্ট ২২টি হরফ الاستفالএর।

৪। الانفتاحوالإطباق: জিহ্বার মধ্যখান উপরের তালুর সঙ্গে লাগা বা না লাগা প্রসঙ্গ। ক.الاطباق সিফাতের হরফ আদায় করার সময় জিহ্বার মধ্যস্থান উপরের তালুর সাথে লেগে যাবে। এর হরফ ৪টি। যথা- صضطظ খ. الانفتاح সিফাতের হরফ আদায় করার সময় জিহ্বার মধ্যখান নীচের দিকে চেপে রেখে মুখ খুলে আদায় করতে হয় اطباق এর ৪টি হরফ বাদে অবশিষ্টট ২৫টি انفتاح এর হরফ।

পঁঞ্চম : ১.الاذلاق২.الاصمات : জলদীভাবে আদায় করা বা ধীরস্থীরভাবে আদায় করা। ক. الاذلاق সিফাতের হরফগুলো আদায় করার সময় জিহ্বা এবং ঠোঁটের কিনারা দ্বারা সহজে ও তাড়াতাড়ি আদায় হয়। এর হরফ ৬টি ঃ فرمنلب । খ. الاصمات সিফাতের হরফগুলো আদায় করার সময় নিজ মাখরাজ থেকে ধীরস্থির এবং দৃঢ়তার সাথে আদায় হয়, এর হরফ اذلاق এর হরফ বাদে বাকী ২৩টি।

সিফাতে غيرالمتضادة এর পরিচয়: الصفةالغيرالمتضادة বলা হয় যার বিপরীতে অন্য কোন সিফাত থাকে না। এটি সাত প্রকার। যথা-

১.الصفير : এই সিফাতের হরফগুলো আদায় করার সময় চড়ুইপাখি বা বাঁশির আওয়াজের ন্যায় বেজে উঠে। এর হরফ ৩টি ঃ صسز

২.القلقله : এই সিফাতের হরফগুলি সাকিন অবস্থায় আদায় করার সময় তার মাখরাজে শক্তভাবে ধাক্কা লাগার কারণে যে অতিরিক্ত আওয়াজ হয় তাকে قلقله বলে। ইহার হরফ ৫টি। যথা- قطبجد

৩.اللين : واو বা يا সাকিন হয়ে ডানে যবর হলে এ দু'টিকে লীনের হরফ বলে। লীনের হরফ নরমভাবে আদায় হয়। যেমন- بيت - خوف

৪.الانحراف : এই সিফাতের হরফ দু'টি। যথা- ر - ل ইনহিরাফ এর অর্থ ঝুঁকে যাওয়া, অর্থাৎ ইনহিরাফ সিফাতের হরফ আদায় করার সময় لام হরফটি را এর মাখরাজের দিকে এবং را হরফটি لام এর মাখরাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কাজেই অতিরিক্ত ঝুঁকলে ر হরফটি لام এবং لام হরফটি ر হয়ে যাবে, সুতরাং অতিরিক্ত ঝুঁকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৫.التكرار : এই সিফাতের হরফ ১টি ر; এই ر হরফটি আদায় করার সময় জিহ্বার মাথা কেঁপে উঠে, যার কারণে ১টি রা এর পরিবর্তে কয়েকটি রা হতে চায় এজন্য অতিরিক্ত (কম্পন) থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬.التفشى : এই সিফাতের হরফ ১টি। আর তাহলো ش; এই ش হরফটি আদায় করার সময় মুখের ভেতরে শা, শা শব্দ ছড়িয়ে পড়বে।

৭.الاستطالة : এর অর্থ লম্বা করা الاستطالة সিফাতের হরফ ১টি ض ; এই ض হরফটি আদায় করার সময় তার মাখরাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ জারি রেখে আদায় করতে হয়।[১৬]

তা'রীব : আরবি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তা'রীব। অনারবী শব্দকে আরবি ভাষায় উচ্চারণের জন্য বা আরবদের ব্যবহারের উপযোগী করতে আরবি ভাষার ওজন, গঠন ও অবয়ব অনুযায়ী রূপান্তর করা অথবা অনারবী শব্দকে আরবি ভাষায় উচ্চারণের জন্য আরবি হরফ দ্বারা উচ্চারণ করাকে তা'রীব বলে। ভিনদেশী ভাষাকে ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র আরবি ভাষারই আছে। কেননা অপরাপর ভাষার তুলনায় আরবি ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ। ফার্সী, উর্দু, হিন্দী ও গ্রীক ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। দর্শন, প্রশাসন ও চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ে অসংখ্য পরিভাষা ব্যবহার হয়েছে। আরবদের নিকট অনারবদের আবিষ্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কিত এ সকল পরিভাষাকে পরিচিত করতে আরবি ভাষায় রূপান্তর করা হয়। আরবি ভাষার উচ্চ ধারণক্ষমতার ফলে তা অনায়াসে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। যেমন- অনারবী ভাষা থেকে আরবদের গৃহীত কতিপয় পরিভাষার উদাহরণ:

রোমান ভাষা হতে আরবিতে রূপান্তরিত কতিপয় শব্দ: -الترياق - টার্ট, الطلسم-তালিসম্যান, القولنج-গোলিং, السرسام-বালি, القبان-গম্বুজ, قنطار-কান্তার, أصطرلاب-অ্যাসল, الفردوس - স্বর্গ,القسطاসক্যাথিটার।

ফার্সী ভাষা হতে আরবিতে রূপান্তরিত কতিপয় শব্দ : الياقوت- নীলা, الجلنار-গুলানর, البلور-স্ফটিক, الكافور-ইউক্যালিপটাস, الزنجبيل-আদা, الدسكرة-দশকরা, الاستبرق -স্ট্যাব্রাক, الديباج -ব্রোকেড, السندس-সন্ডোস, السكنجبين-স্কিনজাবেন, البركار-ব্র্যাককার, الصابون -সাবান, التنور- চুলা।

গ্রীক ভাষা হতে আরবিতে রূপান্তরিত কতিপয় শব্দ :الأنسون -অ্যানিস, السقمونيا -ম্যাস্টিক, والمصطكى ম্যাস্টিক البقدونس -পার্সলে এবং الزيدفون জেফির।

হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা হতে আরবিতে রূপান্তরিত কতিপয় শব্দ: الفلفل - গোলমরিচ, الجاموس-মহিষ, الشطرنج-দাবা, الصندل -চন্দন কাঠ।[১৭]

তা'রীব করার নিয়মাবলি : অনারবী ভাষাকে আরবি করে পড়ার জন্য বেশকিছু নিয়ম রয়েছে। যেমন-

১. হরফ বৃদ্ধি বা হ্রাস করার মাধ্যমে তা'রীব করা যায়। যেমন- الدرهمমূলত درمছিল, برنامجমূলত برنامه ছিল।

২. الشين , السين এবং اللامকে الزاءّ দ্বারা পরিবর্তন করে পড়ার মাধ্যমে তা'রীব করা যায়। যেমন- نيشابورকে نيسابورএবং إشمائيلকে إسماعيلপড়া হয়।
৩. দুটি শব্দকে একত্রিত করে পড়ার মাধ্যমে তা'রীব। যেমন- جاموسশব্দটি كاوও ميشশব্দ হতে আরবিতে রূপান্তরিত।
৪. অনারব হরফকে আরবি শব্দের ওজনে রূপান্তর করার মাধ্যমে তা'রীব করা। যেমন- فردوسশব্দটি برادايسথেকে রূপান্তরিত, كعكশব্দটি كاكশব্দ হতে আরবিতে রূপান্তরিত।
৫. كافহরফকে جএবং جيمকে كافঅথবা قاف দ্বারা রূপান্তর করে পড়ার মাধ্যমে তা'রীব। যেমন- جوربমূলত كوربছিল।[১৮]

সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে علم البديع এর ভূমিকা : বাদী' অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্যতম শাখা। আরবি ভাষার সৌন্দর্য বর্ধনে ইলমুল বাদী'-এর জুড়ি মেলা ভার। বাদী' শব্দ ও অর্থ উভয়কে সুন্দর করে তোলে।

علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة.

অর্থাৎ, সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ও ভাব স্পষ্ট হওয়ার বিষয় লক্ষ রেখে বক্তব্যকে সুন্দর করার পদ্ধতিসমূহ অবগত হওয়ার বিদ্যাকে বলে।[১৯] শব্দগত সৌন্দর্যবর্ধনকে المحسنات اللفظيةবলে, আর অর্থগত সৌন্দর্যবর্ধনকে المحسنات المعنوية বলে। المحسنات اللفظية এর প্রকারসমূহ নিম্নরূপ-

الجناس: জিনাস অর্থ সমজাতীয় শব্দ। এটির সংজ্ঞায় শায়খ নাসিফ আল ইয়াযিজী বলেন- الجناس بين اللفظين هو أن يتشابه منطوقهما অর্থাৎ, পরস্পরের মাঝে মিল রয়েছে এমন দুটি শব্দ একই রকম উচ্চারিত হওয়া।[২০] এটি আবার দুই প্রকার। যদি দুই শব্দের হরফ, বচন, বিন্যাস ও হরকতের মাঝে হুবহু মিল থাকে তাকে جناس تامবলে। যেমন-يقيني بالله يقيني অর্থাৎ, আমার বিশ্বাস আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। এ বাক্যে يقيني দুবার ব্যবহার হয়েছে। প্রথমটি হরফ, বচন, বিন্যাস ও হরকতের দিক হতে অভিন্ন। কিন্তু দুটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমটির অর্থ সাধারণ বিশ্বাস এবং দ্বিতীয়টির অর্থ তিনি আমাকে রক্ষা করবেন।

আর যদি উভয় শব্দের কোন একটি হরফ ব্যতিক্রম হয়, তাকে جناس ناقصবলে। যেমন- ينسي ও أنسي , অনুরূপ আবু তাম্মামের নিম্নোক্ত কবিতা-

السيف أصدق أنباء من الكتبِ في حده الحد بين الجد واللعب[21]

অর্থাৎ বইয়ের চেয়ে তরবারী সঠিক সংবাদ নিয়ে আসে। এটির ধারে ভালো-মন্দের সীমানা নির্ধারিত হয়। এ কবিতায় বাদী' এর মহা আয়োজন ঘটেছে। যেমন- حده والحَدّ (تضاد)الكتب/ طباق السيف এ দুই শব্দের মাঝে جناس تامহয়েছে। দুটির মাঝে শব্দগত পূর্ণ মিল থাকলেও দুটির অর্থ আলাদা। الجد واللعب এ দুই শব্দের মাঝে طباق (تضاد)الحد / الجد এ দুই শব্দের মাঝে جناس ناقص হয়েছে। الدال ও الباءএর স্বর চারবার করে ধ্বনিত হয়েছে। الكتب / اللعبদুটির মাঝে التصريعহয়েছে। একই জাতীয় হরফ দ্বারা সমাপ্ত শব্দকে التصريع বলে। (مستفعلن فعلن مستفعلن فعلُ).এটি لبحر البسيطএর ওজন বা ছন্দ। এ ছন্দ হতে ঘন্টাধ্বনির আওয়াজ উৎসারিত হয়।

السجع : সাজা' অর্থ অন্ত্যমিল। পরিভাষায় সাজার সংজ্ঞা হলো-

هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد.

অর্থাৎ, গদ্যের দুটি বাক্যের শেষ হরফে মিল হওয়াকে **السجع** বলে।[২২] যেমন- رب تقبل توبتي ، وأجب دعوتيএ বাক্যে একাধিক বাক্যের মধ্যকার অকৃত্রিম ও স্বভাবজাত অন্ত্যমিল পরিলক্ষিত হয়।

المحسنات المعنوية প্রায় পঁয়ত্রিশ প্রকার। তন্মধ্যে রয়েছে الطباق : উমর বিন আলাবী বলেন- هو الجمع بين المتضادين অর্থাৎ, দুই বিপরীত বিষয়কে বাক্যে একত্রিত কদরাকে الطباق বলে।[২৩] যেমন-

لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى (طباق الإيجاب) ، قد بلى الحديد وما بليت(طباق السلب).

অর্থাৎ, কালোর উপর সাদার প্রাধান্য নেই, তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্য সাব্যস্ত হবে।[২৪] এ বাক্যে সাদা ও কালোকে একত্রিত করা হয়। বাক্যটি ইতিবাচক অর্থবোধক। দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ লোহা পুরান হলেও আমি পুরান হইনি। বাক্যটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার হয়। ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় শ্রেণীর বাক্যে বিপরীত শব্দের সমাহারের ফলে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

المقابلة : বাক্যে দুই বা ততোধিক বিপরীত শব্দের সমাহারকে মোকাবালা বলে।[২৫] বক্তার বক্তব্যকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিপরীত শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী-فليضحكوا قليلًا و ليبكوا كثيرا অর্থাৎ, তারা যেন স্বল্প হাসে এবং বেশী রোদন করে।[২৬]এ আয়াতে হাসি-কান্না এবং কম-বেশের মিলন ঘটেছে। আল্লাহর বাণী- يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث অর্থাৎ, তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল এবং নোংরা জিনিসসমূহ হারাম।[27] এ আয়াতে হালাল-হারাম ও ভালো-মন্দের সমাহার ঘটেছে। এরূপ বাক্যের মাধ্যমে মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে।

التورية : তাওরিয়া অর্থ গোপন করা। পরিভাষায় أن يذكر المتكلم لفظا له معنيان أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والآخر بعيد، ودلالة اللفظ عليه خفية، ويريد المعنى البعيد ويوري عنه بالمعنى القريب অর্থাৎ, দুটি শব্দ বা বাক্যের অর্থে সাদৃশ্য থাকা। বাক্যটির একাধিক অর্থের মাঝে প্রথম অর্থটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ এবং দ্বিতীয় অর্থটি অপ্রসিদ্ধ বা অস্পষ্ট হওয়া। অতঃপর ক্ষেত্রবিশেষে বাক্য বা শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় অস্পষ্ট অর্থ উদ্দেশ্য করাকে তাওরিয়া বা গোপন করা বলা হয়।[২৮] যেমন هو رقيق এবাক্যের মাঝে অবস্থিত رقيق শব্দের নিকটতম ও প্রধান অর্থ দাস। আর দূরতম অপ্রধান অর্থ পাতলা, সূক্ষ্ম ও কোমল।

আরবি ভাষার বিশেষ নান্দনিকতা :আরবি ভাষার কোন শব্দকে ভেঙ্গে হরফকে পূর্বাপর করার ফলে নতুন শব্দ গঠিত হয়। অনুরূপ বাক্য ভেঙ্গে শব্দসমূহকে পূর্বাপর করে নতুন অর্থবহ বাক্য তৈরী করা যায়। যেমন কবিতা[২৯]-

مَـوَدَّتُـهُ تَـدُومُ لِـكُلِّ هَـوْلٍ - وَهَـلْ كُـلٌّ مَـوَدَّتُـهُ تَـدُومُ

যে কোন বিপদে তার ভালোবাসা অবিরাম থাকে। সকলের ভালোবাসা কি বিপদের সময় অবিরাম থাকে?

এ কবিতার প্রথম চরণে কতিপয় শব্দ নিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় চরণে কবি প্রথম চরনের বাক্যে অবস্থিত শব্দবিন্যাস ভেঙ্গে দিয়ে নতুন বাক্য গঠন করে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন। এরূপ খেলাকে قلب বলে।

আরবি ভাষায় এরূপ আরো অনন্য নান্দনিকতার দৃষ্টান্ত হলো; বাক্যের শেষ হতে হরফসমূহ উল্টে দিলে নতুন বাক্য নতুন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। যেমন-একদা রোমানরা জনৈক মুসলিম গোয়েন্দাকে গ্রেফতার করে। তারা মুসলিম নেতাকে তাদের কাছে আসার জন্য পত্র লিখতে সৈন্যের উপর চাপ প্রয়োগ করে। বীর মুসলিম সৈন্যটি মুসলিম নেতার উদ্দেশ্যে স্রেফ একটি বাক্য লিখে পাঠান, যাতে লেখা রয়েছে, আগত বাক্যটি উল্টো করে লিখবেন - فدع ريبك ودع مهلك(অর্থাৎ, আমার উপদেশ হলো, সংশয় ও সন্দেহ ত্যাগ কর এবং তোমার স্থান ত্যাগ কর।) বাক্যের হরফসমূহ উল্টো করে পড়া হলে বাক্যটির রূপ দাঁড়ায়- فتحصن عد كبير عدو كلهم অর্থাৎ, তারা সকলই মারাত্মকশত্রু। সুতরাং ফিরে গিয়ে আত্মরক্ষা কর।[৩০]

আল কুরআনে অযৌক্তিক বিষয় পরিত্যাজ্য: আরবজাতি আরবি ভাষার স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে আরবি ভাষার গতি-প্রকৃতি শতভাগ নিশ্চিত করেছেন। আল কুরআন নাযিলের পর আরবের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল আল কুরআনের ছোট্ট একটি সূরার মত সূরা তৈরী করতে। যারাই

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দু-তিনটি বাক্য তৈরী করার সাহস দেখিয়েছিল, তারাই ব্যর্থ হয়ে পরক্ষণে ঘোষণা করল ليس هذا من كلام البشر অর্থাৎ, এটি মানুষের বাণী নয়। নাহুবিদ আসমাঈ[৩১] বলেন, আমি وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ, চোর পুরুষ ও নারীর তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ দুই হাত কেটে দাও, এটি আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আয়াতটি এভাবে পাঠ করি। আমার পাশে জনৈক বেদুইন ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার বক্তব্য? আমি বললাম আল্লাহর বাণী। তিনি বললেন আবার পড়ুন। আমি পুনরায় এভাবে তেলাওয়াত করলাম, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. অর্থাৎ, চোর পুরুষ নারীর তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ দুই হাত কেটে দাও। এটি আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি। আর আল্লাহ শক্তিধর ও বিজ্ঞ।[৩২] এবার বেদুইন বললেন, এবার তোমার তিলাওয়াত ঠিক হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আল কুরআন পড়েন?তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কোত্থেকে শিখলেন? তিনি বললেন-

يا هذا، عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع

অর্থাৎ, আল্লাহ শক্তিমান, তাই তিনি রায় দিয়েছেন চোরের হাত কর্তনের। তিনি যদি চোরকে ক্ষমা করতেন ও দয়া করতেন, তাহলে আদৌ হাত কর্তনের আদেশ দিতেননা।[৩৩] আল্লাহ তায়ালার সুবিন্যস্ত বিশুদ্ধ ও বিদগ্ধ বাণীর ফলে আরবি ভাষার সৌন্দর্য চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভ করেছে।[৩৪]

আরবি ভাষায় এমনও কবিতা পাওয়া যায় যা জিহ্বানা নেড়েও আবৃত্তি করা যায়। যেমন আলী (রা) বলেন-[৩৫]

آب همي وهم بي أحبابي * همهم ما بهم وهمي مابي

অর্থাৎ, আমার দুশ্চিন্তা ফিরে এসেছে। আমার বন্ধুরাও আমার ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তা করছে। তারা তাদের নিজেদের সমস্যার ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় আছে। আর আমি আমার নিজের সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। এ কবিতায় যতগুলো হরফ আছে সবগুলো জিহ্বা না নেড়ে পড়া হয়। পৃথিবীর আর কোন ভাষায় এমন নান্দনিকতা বর্তমান নেই। আবার ঠোঁট না নেড়েও আস্ত কবিতা পড়া যায়। যেমন আলী (রা) বলেন-[৩৬]

قطعنا على قطع القطا قطع ليلة * سراعا على الخيل العتاق اللاحقي

অর্থাৎ, উটপাখির মত পথ চলে রাত্রির যাত্রা সমাপ্ত করেছি। পেছনে থাকা উত্তম ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত পথ অতিক্রম করেছি। উক্ত পংক্তিতে যে হরফসমূহ রয়েছে তন্মধ্যে কোনটি উচ্চারণের সময় দুঠোঁট নড়েনা। এরূপ সৌন্দর্যের নজীর আর কোন ভাষাতে নেই।

হযরত আলী (রা) একজন বিদগ্ধ বাগ্মী ছিলেন। তিনি এমন দুটি খুতবাহ দেন যার একটিতে আলিফ নেই আর অপরটিতে নুকতা নেই। এ বিরল গুণটি আরবি ভাষার একার। পৃথিবীর আর কোন ভাষায় এরূপ দৃষ্টান্ত নেই। আলিফ ব্যতীত খোতবা :[৩৭]

حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته وسبقت رحمته غضبه، وتمت كلمته، ونفذت مشيئته، وبلغت قضيته، حمدته حمد مُقرٍ بربوبيته، متخضع لعبوديته، متنصل من خطيئته، متفرد بتوحده، مؤمل منه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فصيلته وبنيه، ونستعينه ونسترشده ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه وشهدت له شهود مخلص موقن، وفردته تفريد مؤمن متيقن، ووحدته توحيد عبد مذعن، ليس له شريك في ملكه ولم يكن له ولي في صنعه، جلَّ عن مشير ووزير، وعن عون ومعين ونصير ونظير علم ولن يزول كمثله شيءٌ وهو بعد كل شيءٍ.رب معتز بعزته، متمكن بقوته، متقدس بعلوّه متكبر بسموّه ليس يدركه بصر، ولم يحط به نظر قوي منيع، بصير سميع، رؤوف رحيم، عجز عن وصفه من يصفه، وضل عن نعته من يعرفه، قرب فبعد وبَعُد فقرب، يجيب دعوة من يدعوه، ويرزقه ويحبوه، ذو لطف خفي، وبطش قوي، ورحمة موسعة، وعقوبة موجعة، رحمته جنة عريضة مونقة،

وعقوبته جحيم ممدودة موبقة، وشهدت ببعث محمد رسوله وعبده وصفيه ونبيه ونجيه وحبيبه وخليله.

নুকতাহ ব্যতীত খুতবাহ :[৩৮]

الحمد لله الملك المحمود ، المالك الودود مصور كل مولود ، مآل كل مطرود ساطع المهاد وموطد الأوطاد ومرسل الأمطار، ومسهل الأوطار وعالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومصدرها عم سماحه وكمل ركامه وهمل وطاوع السؤال والأمل أوسع الرمل وأرمل أحمده حمدا ممدودا وأوحده كما وحد الأواه وهو الله لا إله للأمم سواه ولا صادع لما عدله وسواه، أرسل محمدا علما للإسلام ، وإماما للحكام ، ومسددا.

আরবি ছোট বাক্যে ব্যাপকার্থ ধারণ :আরবি ভাষায় ছোট একটি বাক্য যে অর্থ বহন রতে সক্ষম, সে অর্থ ইংরেজীতে প্রকাশ করতে অনেক দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োজন পড়ে। যেমন আল্লাহর বাণী- **أنلزمكموها** (আমি কি তোমাকে এ বিষয় গ্রহণে বাধ্য করতে পারবোনা?)[৩৯] এ বাক্যটির ইংরেজী হলো- **Shall we compel you to accept it.এরূপভাবে ছোট আরবি বাক্য অসংখ্য শব্দ নিয়ে গঠিত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- "فأسقيناكموه"অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে সেটি পান করিয়েছি।**[৪০] **এ বাক্যে حرف عطف، وفعل، وفاعل، ومفعول أول، ومفعول ثان পাঁচটি শব্দের সমাহার ঘটেছে। একটি মূলধাতু দ্বারা অনেকগুলো শব্দ তৈরী করে একই বাক্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন কবি মুতানাব্বী বলেন**[৪১] **-**

أَلَمٌ أَلَمَّ أَلَمْ أُلِمَّ بِدَائِهِ - إِنْ آنَ آنٌ آنَ آنُ أَوَانِهِ

ألم অর্থ ব্যথা, ألم বেষ্টন করা, ألم না, ألم ألم জানা। إن অর্থ যখন, آن ব্যথা, آن ব্যথা অনুভবকারী, آنসময় ।অর্থাৎ, কোন এক যন্ত্রনা আমাকে বেষ্টন করে রেখেছে, আমি (কি) তার রোগের কথা জানি? যখন ব্যথাতুর ব্যক্তি যন্ত্রণা উপভোগ করে, তখন তার রোগমুক্তির সময় ঘনিয়ে আসে।

আরবি ভাষা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মন্তব্য: রিনান বলেন আরবি মরুভূমির একটি ভ্রাম্যমান জাতির নিকট পূর্ণতা লাভ করেছে। ভাষাটি প্রচুর শব্দভাণ্ডার, নিপুন প্রকাশ ভঙ্গি ও চমৎকার মাত্রার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

আব্দুর রাজ্জাক সা'দী বলেন, আরবি একটি আকর্ষণীয় পূর্ণাঙ্গ ভাষা। এ ভাষার শব্দাবলি প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অন্তরের পদক্ষেপসমূহ চিত্রায়ন করতে পারে। শব্দের ঝঙ্কারে অর্থ ফুটে ওঠে, যেন শব্দগুলো মনের পদক্ষেপ, হৃদয়ের স্পন্দন ও জীবনের সুর।[৪২]

উপসংহার: আরবি পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাসমূহের মাঝে সর্বাধিক সমৃদ্ধ, উন্নত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আরবিভাষাভাষীর নিকট আরবিই শ্রেষ্ট। অন্যান্য ভাষাভাষীগণও তাদের ভাষাকে জগতের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ভাষা মনে করে। কিন্তু যখন আরবি ভাষী ব্যতীত অন্যকোনব্যক্তি আরবি ও ইংরেজীতে সমান দক্ষতা অর্জন করবে এবং সে সাক্ষ্য দিবে যে,আরবি সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও মজাদার ভাষা, তখন নিশ্চয় তার বক্তব্য সর্বমহলে গৃহীত হবে। আর এরূপ হাজারো পণ্ডিত ও খ্যতনামা ব্যক্তি যুগে যুগে আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছে। দালিলিক ভিত্তিতে এ দাবী যথার্থ যে,আরবিই সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও উন্নত ভাষা। যুগ-যুগান্তরে কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের অনবদ্য সৃষ্টির মাধ্যমে আরবির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। আল কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য, সাধারণ সাহিত্য উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে আরবি কালজয়ী ভাষা হিসেবে বেঁচে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১ আব্বাস হাসান, *আন নাহবুল ওয়াফী* (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৪), খ.৪, পৃ. ২৭২।

২ হান্না ঈসা, *লুগাতী হুবিয়্যাতি : লুগাতুদ দ্বাদ, দুনয়াল ওয়াতান*, ১৯.১২.২০১৭ খ্রি.।

৩ মুহাম্মদ আব্দুশ শাফী আল কাউসী, *আবকারিয়্যাতুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ* (মরক্কো : ইসিসকো, ২০১৬), পৃ. ৩৫-৩৭।

৪ *https://www.baianat.com/ar/books/arabic-calligraphy-culture/the-arabic-calligraphy-as-a-form-of-art*

৫ *প্রাগুক্ত।*

৬ *Top Ten Internet Languages in The World - Internet Statistics,*www. internetworldstats. com.

৭ *বুরূজ*, আয়াত: ২২

৮ আবূ মানসূর আস সা'আলিবী, *ফিকহুল লুগাতি ওয়া আসরারুল আরাবিয়্যাহ*(সায়দা, ১ম সংস্করণ, ১৪২০হি.), পৃ. ২০৫, ২০৬।

৯ ইবনু ফারিস, *আস সাহিবী ফী ফিকহিল লুগাহ*(বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ১৬১ ।

১০ আবুল ফাতাহ উসমান ইবনু জিন্নী, *আল খাসাইস* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ, তা.বি), খ.১, পৃ. ৬৭, ৬৮, ৪৯০, ৪৯৩।

১১ *https://www.traidnt.net/vb/traidnt125218/*

১২ জুরজীযায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ* (বৈরুত : দারুল হিলাল, তা.বি), পৃ.১১।

১৩ জুরজীযায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৫), পৃ. ৪৭-৪৮।

১৪ আবূ বকর মুহাম্মাদ আল আনবারী, *কিতাবুল আযদাদ*, লিডেন, ১৮৮১।

১৫ ড. আবূ আসিম আব্দুল আযীয বিন আব্দুল ফাত্তাহ আল কারী, *আত তাজবীদ আল মুয়াসসার* (মদীনা : মাকতাবাত আদ্দার, ৯ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ ২১-২৮।

১৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-৩০।

১৭ আবূ মানসূর আস সা'আলিবী, *ফিকহুল লুগাতি ওয়া আসরারুল আরাবিয়্যাহ* (সায়দা, ১ম সংস্করণ, ১৪২০হি.), পৃ. ৩৩৮।

১৮ মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আল হামদ, *ফিকহুল লুগাহ: মাফহুমুহু, মাওদুআতুহু, কাযায়াহু* (দারু ইবনি খুযায়মাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০৫), পৃ. ১৬৯।

১৯ খতীব আল কাযবীনী, আল *ইযাহু ফী ইলমিল বালাগাতি ওয়াল বায়ানি ওয়াল মা'আনী*, তাহকীক: ইবরাহীম শামছুদ্দীন(বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ২৫৫।

২০ শায়খ নাসিফ আল ইয়াযিজী, *মাজমুউল আদাব*(বৈরূত : মাতবা'আতুল উম্মাহ, ১৯৩২), পৃ.১৬২।

২১ *দিওয়ানু আবি তাম্মাম*, তাহকীক: মুহিউদ্দিন আল খায়্যাত (কায়রো: মুহাম্মদ জামাল, তা. বি.), পৃ. ৭।

২২ সাক্কাকী, *আত তালখীস*(বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, তা. বি), পৃ. ৩৯৭।

২৩ উমর বিন আলাবী, *আল বালাগাহ-আল মা'আনী- আল বায়ান- আল বাদী'*(বৈরূত : দারুল মিনহাজ,২০০৩), পৃ.৩৭৩।

২৪ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, বাব : আল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত, হাদীস নং ৬৭৩।

২৫ নাসিফ আল ইয়াযিজী, *মাজমূউল আদব* (বৈরূত : মাতবাআতুল উম্মাহ, ১৯৩২), পৃ. ১৪৩।

২৬ *তাওবা : ৮২*

২৭ *আরাফ : ১৫৭*

২৮ আহমদ মোস্তফা আল মুরাগী, *উলূমুল বালাগাহ* (বৈরূত : দারুল কুতুব, ১৯৮২), পৃ. ৩৮৯-৯০।

২৯ হযরত আলী (রা), *দিওয়ানু আলী*।

৩০ মুহাম্মাদ রজব আল সামরাই, *আত তারীফ ওয়াল গারীব ফিল লুগাতি ওয়াত তালীফ* (রিয়াদ: দারুল হাদারাহ, ১ম সংস্করণ, তা.বি), পৃ. ১৮

৩১ আব্দল মালিক বিন কারীব বিন আলী বিন আসমা' আল বাহিলী, জন্ম-৭৪০, মৃত্য-৮৩১খ্রি.। তিনি আরবি ভাষার রাবী, ভাষা বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ ছিলেন।

৩২ *আল মায়িদাহ,* আয়াত : ৩৮

৩৩ মুহাম্মদ আলী আস সাবূনী, *রাওয়াইউল বায়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম*, খ. ১ (সিরিয়া: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮০), পৃ. ৫৪৫।

৩৪ *https://myarabic2020.blogspot.com*

৩৫ *https://forums.alkafeel.net/node/17761*

৩৬ *প্রাগুক্ত।*

৩৭ **ইবনু আবিল হাদীদ, *শরহু নাহজিল বালাগাহ*(আল মাকতাবা আস শিইয়্যাহ, খ. ১৯, পৃ. ১৪০।**

৩৮ *http://wondersofarabic.weebly.com/*

৩৯ *হুদ*, আয়াত:২৮।

৪০ *হিজর*, আয়াত:২২।

৪১ *https://www.zyadda.com/pain-pain-pain-pain/*
৪২ আব্দুর রাজ্জাক আস সা'দী, প্রবন্ধ: *মুকাওয়িমাতুল আলামিয়্যাহ ফিল লুগাতিল আরাবিয়া ও তাহাদ্দিয়াতিহা ফী আসরিল আওলামাহ*, মাজাল্লাতু আফাকিস সাকাফাহ ওয়াত তুরাস, সংখ্যা ৬৩, ১৪২৯ হি, পৃ. ৪৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

কবি মাই যিয়াদাহ্ ও তাঁর কবিতায় স্বদেশ ভাবনা

ড. মো. সেতাউর রহমান*

Abstract: May Ziadah is one of those poets and litterateurs in whose writings are found the echo of the renaissance and freedom of the Palestinian people**.** She is also one of the most influential feminist and romantic poets of the 20th century. She was a prolific Lebanese-Palestinian poet, orator, critic, essayist and translator. She demonstrated her versatility in different fields of Arabic and French literatures. She firmly established herself as a vibrant female voice at that time. She immigrated to Egypt in 1908 and started composing in French in 1911. A lot of her work consisted of novels, free-verse poetry and essays. She also translated several European authors into Arabic. The story of a sovereign state and the people's real love for their country has found a beautiful expression in her write-ups. She presented her excellence in the natural beauty of her country. In her poetry she invited the Palestinian people to stand against Israel's occupation and aggression. Although she spent most of her lifetime in Egypt and Lebanon, she had a deep attraction for her own country. This is evident in many of her poems. Poet Ziadah died in 1941. That is why; her poetry on freedom is scanty. The tortures on the Palestinian people started towards the end of her life. She got many national awards for encouraging her countrymen to gain freedom. Ziadah ran the most famous literary salon of the Arab world during the twenties and thirties of the last century. She was a prominent representative of Arabic Romanticism. The lucidity of her poetic language and the intensity of her thoughts gave her a place of dignity among her contemporary poets. This paper aims at introducing the poet in question and a selection of her poetry. So, the main objective of this study is to provide a clear idea about the glorious position of the poet May Ziadah and her contribution to Arabic patriotic poetry.

ভূমিকা

মাই যিয়াদাহ বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আবির্ভূত একজন ফিলিস্তিনী মহিলা কবি। ফিলিস্তিনীদের জাগরণ, স্বাধীনতা ও মুক্তির সুর যে সকল কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যে ঝঙ্কৃত হয়েছে তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অনবদ্য লেখনিতে অঙ্কিত হয়েছে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা, মাতৃভূমির প্রতি গভীর আকর্ষণ ও এখানকার অধিবাসীদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নয়নাভিরাম দৃশ্যের অনিন্দ্য সুন্দর উপস্থাপনা দেখা যায় তাঁর কবিতায়। তাছাড়াও ফিলিস্তিনবাসীকে ইজরাইলের দখলদারিত্ব ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রতি আহবান জানিয়েছেন তিনি।[১]

তিনি নিজেকে সমসাময়িককালের একজন শক্তিশালী মহিলা কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সমকালীন কবি খলীল জীবরানের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁরা একে অন্যের সাথে কখনও মিলিত হননি। তবে তাঁদের মাঝে পত্রালাপ ও পত্রসাহিত্যের দ্বারা যে সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল তা ইতিহাসে বিরল ঘটনা।[২]তিনি একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা নিয়ে তিনি বেশকিছু কবিতা রচনা করেছেন।[৩]

কবি মাই যিয়াদাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবি মাই যিয়াদাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে বিধৃত হলোঃ

---

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ফিলিস্তিনের সাহিত্যাকাশে ধ্রুব তারার ন্যায় চিরভাস্বর মাই যিয়াদাহ ১৮৮৬ সালে 'আন-নাসেরা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তাঁর প্রকৃত নাম 'মারি ইলিয়াস যিয়াদাহ'। তবে তিনি 'মাই যিয়াদাহ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা লেবাননের অধিবাসী এবং মাতা ছিলেন ফিলিস্তিনের অধিবাসী।[৫]

শৈশবকাল

জন্মের পর তিনি 'আন-নাসেরা' নামক স্থানের নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে পিতা-মাতার আদর-যত্ন ও স্নেহ-ভালোবাসায় লালিত-পালিত হতে থাকেন। শৈশবেই তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মেধার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। দেখতে অনিন্দ্য সুন্দরী হওয়ায় পরিবারের লোকদের পাশাপাশি পাড়া-প্রতিবেশিদের বাড়তি আকর্ষণ ছিল দুরন্তপনায় ভরপুর এই মাই যিয়াদার প্রতি। সকলের অকৃত্রিম ভালোবাসায় তাঁর শৈশবকাল অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে অতিবাহিত হয়। দিনদিন তিনি হয়ে ওঠেন আরো বেশি পরিণত ও বুদ্ধিদীপ্ত।

শিক্ষাজীবন

বাবা-মায়ের কাছেই মাই যিয়াদার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। শৈশবকাল থেকেই লেখাপড়ার প্রতি গভীর আগ্রহ পিতা-মাতাকে বাড়তি দ্বায়িত্ব গ্রহণে তাগিদ প্রদান করে। ফলে আদরের সন্তানের সুশিক্ষা লাভের ব্যাপারে তাঁরা অনেক বেশি যত্নশীল হন। নিজেরা শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য আন-নাসেরাতে অবস্থিত স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি করে দেন। এই স্কুলে পাঠ গ্রহণের মধ্যদিয়েই মাই যিয়াদার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এরপর ১৯০৭ সাল পর্যন্ত লেবাননের 'আইনাতুরাহ'তে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন।[৬]

মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য সপরিবারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচীন নগরী মিসরের কায়রোতে গমন করেন। সেখানে তিনি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়ন শুরু করেন। শুরুতেই তিনি ইংরেজি, ফরাসি, ইতালি ও জার্মানি ভাষা শিক্ষালাভ করেন। তবে ফরাসি ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশি। ফরাসি ভাষায় তাঁর দক্ষতার বিষয়টি সহপাঠিসহ অন্যদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি আরবীর পাশাপাশি ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি, ইতালি, লাতিন, ইউনানি, সুরইয়ানি ও স্প্যানিশসহ প্রায় নয়টি ভাষার জ্ঞানার্জন করেন। এমনকি এ সমস্ত ভাষায় তিনি কবিতা রচনাও শুরু করেন। এরপর তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও দর্শনসহ আরো নানা বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানলাভ করেন।

সাহিত্যচর্চা

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি সাহিত্যচর্চার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখি ও সাংবাদিকতা শুরু করেন। শুরুতে তিনি ফরাসি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করলেও আরবী ভাষার প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল লক্ষণীয়। তিনি তৎকালীন মিসরের অনেক বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ পত্রিতা ও জার্নালে নিয়মিত লিখতে থাকেন। তিনি যেসকল পত্রিকা ও জার্নালে লিখতেন এর মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল আল-আহরাম, আল-মুকতিম, আল-হিলাল, আয-যুহুর, আল-আহরুসা, আল-মুকতাতিফ ইত্যাদি।[৭]

এ সকল পত্রিকা ও জার্নালে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, যৌক্তিক সাহিত্য সমালোচনাসহ সামাজিক অসংগতিগুলো তুলে ধরতেন। তাঁর এই কৃতীত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য খুব অল্পসময়েই তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনি সে সময়ের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উল্লেখ্য যে, লেখালেখির পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চার জন্য প্রতি মঙ্গলবার একটি সাহিত্য বৈঠকের আয়োজন করতেন। সেখানে সাহিত্যামোদীদের নিয়ে এক জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের স্বরচিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, গল্প পাঠ করে শুনাতেন। এগুলোর গঠনমূলক সমালোচনা করতেন। এই সাহিত্য বৈঠক মাই যিয়াদার সাহিত্য-ভাবনার দিগন্তকে আরো বেশি প্রসারিত করে তাঁর চিন্তা ও

ভাবনার জগতকে করে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। ১৯১১ সালে ফরাসি ভাষায় রচিত ‘আযাহিরু হিলম’ (أزاهيرحلم) ছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।[৮]

তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মসমূহ সম্পর্কে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ড. ইয়াকুব শুরুফ কে একটি চিঠি লিখেন। যা নিম্নরুপ:

أتمنى أن يأتي بعد موتي من ينصفني ويستخرج من كتاباتي الصغيرة المتواضعة ما فيها من روح الإ خلاص والصدق والحمية، والتحمس لكل شيء حسن وصالح وجميل، لأنه كذلك لا عن رغبة في الانتفاع به[৯].

এরপর তিনি ১৯২০ সালে *কালিমাতু ওয়া ইশারাতু* (كلمات وإشارات), ১৯২২ সালে *আলমুসাওয়াত* (المساواة), ১০২৩ সালে *জুলুমাতুন ওয়াশিয়াতুন* (ظلمات واشعة) ও *বাইনাল জাযরি ওয়াল মাদ্দি* (بين الجزر والمد), ১৯২৪ সালে *বাহিসাতুল বাদিয়া* (باحثة البادية) ও *আস সহাইফ* (الصحائف) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনাসমূহ পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও গৃহীত হয় এবং তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর এই অনবদ্য রচনাগুলো সাহিত্য ভাণ্ডারে এক নতুনমাত্রা যোগ করে। সময়ের ব্যবধানে তিনিও সমাসীন হন তৎকালীন খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমালোচকদের সারিতে।

মৃত্যু

১৯২৯ সালে মাই যিয়াদার পিতা ও ১৯৩২ সালে তাঁর মাতার ইন্তেকালের পর তিনি এক দীর্ঘসময় নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়ে জীবনাতিপাত করেন। পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর তিনিও মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েন। এমনকি শারীরিক অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এরপর আস্তে আস্তে তিনি শোক কাটিয়ে উঠেন এবং সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ১৯৪১ সালে ৫৫ বছর বয়সে এই খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক ও বহুভাষাবিদ মিসরের কায়রোতে একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।[১০] তাঁর মৃত্যুতে আরবী সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হয়।

মাই যিয়াদাহ-এর কবিতায় দেশপ্রেম

জীবনের অধিকাংশ সময় মিসর ও লেবাননে অতিবাহিত হলেও নিজ দেশ ফিলিস্তিনের প্রতি মাই যিয়াদাহ-এর এক গভীর আকর্ষণ ছিল। জন্মভূমি ফিলিস্তিন ও এখানকার অধিবাসীদের প্রতি ভালোবাসাও ছিল উল্লেখ করার মত। যা তাঁর বহু কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। সকল কবিতায় তিনি তাঁর মাতৃভূমির প্রতি এক অনবদ্য ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أجل، لكل منا حق على الحياة والحرية والراحة،

ولكن ليس على راحة الأخرين ولا حياتهم ولا حريتهم[১১]

‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমাদের সকলের একটি সুন্দর জীবন, স্বাধীনতা ও প্রশান্তি লাভের অধিকার রয়েছে।

কিন্তু অপরের প্রশান্তি, তাদের জীবন এবং স্বাধীনতার উপর আমাদের কোন অধিকার নেই।’

কবি বলেন, প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবেই জন্মগ্রহণ করে এবং এ পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে। স্বাধীনতা প্রতিটি নাগরিকের জন্মগত অধিকার, এ অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারেনা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ইসরাঈলী সেনাদের নগ্ন নখরে ফিলিস্তিনী জনগণের সে অধিকার আজ ছিন্নভিন্ন।

তিনি আরও বলেন,

إنما حياة الإنسان على الأرض جهاد مستمر،

رغم كونها محض عبور[১২]

'পৃথিবীতে মানবজীবন হলো একটি চলমান সংগ্রাম,

যদিও তা শুধুমাত্র পাড়ি দেয়ার স্থান।'

উপরোক্ত কবিতায় কবি মানব জীবনের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন। মানব জীবন সদা-সর্বদা সংগ্রামমুখর। সংগ্রাম করেই এ পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কারণে যখন কোন দেশের নাগরিকের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ থাকেনা, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ পথ পাড়ি দিতে হয়। তিনি বলেন,

نحن الرمال القاحلة،

لا خصب يوازي خصبنا!

نحن الرمال الجامدة

هل من حياة كحياتنا؟[১৩]

'আমরা শুকনো বালুকারাশি

আমরা উপমাহীন, আমাদের উর্বরতার নেই

জুড়ি।

আমরা জমাট বালুর সমুদ্র

আছে কোন জীবন আমাদের জীবনের সমতুল্য?'

উক্ত কবিতায় কবি ফিলিস্তিনী জনগণের অস্বাভাবিক জীবনযাপনের গতিধারা তুলে ধরেছেন। তাদের জীবনে নেই কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ, নেই স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা। এমন জীবন পরিক্রমা পৃথিবীতে সাধারণত বিরল। ফিলিস্তিনী জনগণের এহেন দুর্দশাগ্রস্থ জীবনযাত্রায় কবি ব্যথিত, মর্মাহত।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে উপরোক্ত কবিতাসমূহে কবির গভীর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ফিলিস্তিনী ভূমি আর জনগণের প্রতি কবির যে প্রবল আকর্ষণ, তারই বাস্তবতা লক্ষ্য যায় উপরোক্ত কবিতাসমূহে।

মাই যিয়াদাহ-এর কবিতায় স্বাধীনতা

কবি মাই যিয়াদাহ ১৯৪১ সালে ইন্তেকাল করেন। তাই স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর কবিতা অপ্রতুল। তবে তাঁর জীবনের শেষ দিকে ফিলিস্তিনীদের উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। তাই স্বাধীনতা বিষয়েও তাঁর বেশ কিছু কবিতা দৃশ্যমান হয়। এ সমস্ত কবিতায় তিনি ফিলিস্তিনী জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে স্বজাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। এ সমস্ত কবিতায় তিনি দখলদারদের বিরূদ্ধে সদা জাগ্রত ও সোচ্চার থাকার জন্য ফিলিস্তিনীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি اليقظة। কবিতায় বলেন,

فليحي الاستقلال التام!
فلتحي الحرية!
فلتعش مصر حرة مستقلة!
فليحي الوطن![১৪]

'পুনর্জীবিত হোক পূর্ণ শক্তি!

বেঁচে থাক স্বাধীনতা!
মিসর স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাক!
বেঁচে থাকুক আমার স্বদেশ!'

এই কবিতায় তিনি ফিলিস্তিনের মাটি ও ফিলিস্তিনী জনগণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যাশা করেছেন এবং তাদের এই স্বাধীনতা যেন আজীবন টিকে থাকে সে প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন তিনি। ফিলিস্তিনের মাটি যেন দখলদারমুক্ত হয়, দেশের প্রতিটি মানুষ যেন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে তাদের স্বাভাবিক জীবন পরিচালনা করতে পারে সে প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন তিনি এই কবিতায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে যেন প্রতিটি নাগরিক ঝাঁপিয়ে পড়ে সে উদাত্ত আহ্বানও জানিয়েছেন কবি তাঁর কবিতায়। তিনি আরও বলেন,

استيقظت الأمة وهتفتْ.
فإذا في صوتها غضبة الأسود,
ومفاداة الأبطال, وعزم الرجال[১৫]

'জাতি (ফিলিস্তিনী) যেন সদা জাগ্রত থাকে এবং (ইসরাঈলীদের বিরুদ্ধে) শ্লোগান দিতে থাকে।
তাদের কণ্ঠে যেন সিংহের গর্জন শোনা যায়।
বীর যোদ্ধাদের ত্যাগ কুরবানী ও পুরুষদের দৃঢ়তা (যেন প্রতিফলিত হয়)।'

এই কবিতায় কবি ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য জনতাকে সদা জাগ্রত থাকার পরামর্শ প্রদান করেছেন। দখলদারদের বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা সোচ্চার থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। অন্যায়-অবিচার আর যুলুমের বিরূদ্ধে দেশের জনগণকে সদা সচেতন থাকা এবং সাহসিকতা প্রদর্শনেরও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও তিনি দেশের রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অসংখ্য বই, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

উপসংহার

কবি মাই যিয়াদাহ বিংশ শতাব্দীর এমন একজন আরব কবি, যাঁর কবিতায় ফিলিস্তিনী জনগণের সামগ্রিক দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র সুচারুরূপে চিত্রিত হয়েছে। তিনি তাঁর রচনায় আরব মহিলাদের প্রকৃত অবস্থা সুচারুরূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ফিলিস্তিনী জনগণকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করায় অনেকগুলো জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। সমসাময়িককালে আরব সমাজে নারী শিক্ষার অবস্থা খুব একটা ভাল ছিলনা। নারী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। বাল্যকাল থেকেই তিনি রোমান্টিক কবি ছিলেন। কবিতা রচনায় তাঁর ভাষার সারল্য, ভাবের গাম্ভীর্য এবং রচনাশৈলীর চমৎকারিত্ব তাঁর কাব্যিক মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে এবং সমকালীন কবিকূলের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ আবূ নু'আইম, *মাই যিয়াদাহ: নাশআতুহা ওয়া তুফুলাতুহা* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭৫।

২ Khalil Gibran, *The love Letters of Khalil Gibran to May Ziadeh* (London: Cambridge University Press, 1930), p.134.

৩ Rose Ghorayeb, *May Ziadeh (1886-1941),* The University of Chicago Press Journals, Vol. 5, No. 2, 1979, pp. 375-376.

৪ Suheil Bushrui, *May Ziadeh: The Life of an Arab Feminist Writer* (London: Cambridge University Press, 1935), p.38.

৫ ড. খালিদ মুহাম্মদ গাজী, *মাই যিয়াদাহ-সিরাতু হায়াতিহা ওয়া আদাবিহা ওয়া আওরাকু লাম তানসুর* (মিসর: ওকালাতুস সহাফাতুল আরাবিয়্যাহ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১১-১২।

৬ *May Ziadeh: The Life of an Arab Feminist Writer*, p.42.

৭ *May Ziadeh: a Biography of Conflict,* Al-Raida Journals, vol. 6, p.145.

৮ *May Ziadeh: The Life of an Arab Feminist Writer,* p.55.

৯ ড. খালিদ মুহাম্মদ গাজী, *মাই যিয়াদাহ-সিরাতু হায়াতিহা ওয়া আদাবিহা ওয়া আওরাকু লাম তানসুর*, পৃ. ৭.

১০ আবূ নু'আইম, *মাই যিয়াদাহ: নাশআতুহা ওয়া তুফুলাতুহা*, পৃ. ৭৭।

১১ মাই যিয়াদাহ, *দীওয়ান* (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১১৩।
১২ *দীওয়ান*, পৃ. ২৪৩।
১৩ *দীওয়ান*, পৃ. ২১২।
১৪ *দীওয়ান*, পৃ. ১৪৭।
১৫ *দীওয়ান*, পৃ. ১১২।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

কুরআনী গল্প: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. মো. কামারুজ্জামান*

Abstract: Allah revealed many verses in the Quran mentioning the stories of previous prophets and nations. The stories are of the highest literary and descriptive level. However, Quranic stories and descriptive poetic stories are not comparable. In spite of having some similarities between them in some aspects (like theme, character, conversation, presentation style, description), objective of the Quranic stories are different. Because the Quran is not a book of History, Philosophy and Science. The Quran is the book revealed to guide human beings which upholds a way of life to keep them on the right path. In Quranic stories, characters are important: prophets, angels, and even evil characters who are perished. It is clear, if we study, for example, the story of Ibrahim (A) and Yusuf (A) we understand that the stories always have a motive of showing the right and the wrong. Also, in Quranic stories, conversation are sometimes self conversations and sometimes conversations between two different characters. In Quranic stories, conflict implies the conflict between right and wrong. In this regard, we can mention the position of Musa (A) against the magician and the position of Ibrahim (A) about the sun, the moon and the stars. These stories reflect a great deal of human values that are needed in order for us to succeed and be accepted into a community.

ভুমিকা

কুরআন আল্লাহর কিতাব যা মানবজাতির হেদায়তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণনার পাশাপাশি কিছু গল্পের উল্লেখ রয়েছে। এই গুলোর সবই মানব জীবনেতিহাসে ঘটে যাওয়া বাস্তবতা। যা থেকে মানবজাতি শিক্ষা নিতে পারে। কুরআনে বর্ণিত গল্পগুলো মানবরচিত গল্পের মতো নয়। কুরআনের গল্পগুলোতে শৈল্পিক গল্পের উদাহরণসমূহ বিদ্যমান থাকলেও এ গুলোর বর্ণনাভঙ্গি ও শিল্প ঐশ্বরিক। এই গল্পগুলো একদিক শিল্পগুণ সমৃদ্ধ অন্যদিকে সত্য ও বাস্তবতার সুস্পষ্ট বার্তাবাহী। স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কুরআনে একটি মাত্র গল্প তথা ইউসুফ (আ.) এর ইতিবৃত্ত ব্যতীত কোন গল্পই সাধারণ গল্প গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করা হয়নি; বরং প্রত্যেক গল্পের শুধু ঐ অংশই বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে, যা মানবীয় হেদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

শৈল্পিক গল্প ও কুরআনী গল্প

শৈল্পিক গল্পের ব্যাপারে সাহিত্যিকগণ বলেন-

هي عرض لفكرة مرت بخاطر الكاتب أو تسجيل لصورة تأثرت بها مخيلته أو بسط لعاطفه اختلجت في صدره فأراد أن يعير عنها بكلام ليصيل بها إلى أذهان القراء محاولا أن يكون أثرها في نفوسهم مثل أثرها في نفسه-[১]

"তা হলো লেখকের হৃদয়ে ঘটে যাওয়া চিন্তা ধারার উপস্থাপন অথবা লেখকের কল্পনা যা দ্বারা প্রভাবিত চিত্রায়ণ অথবা লেখকের হৃদয়ে নাড়া দেয়া আবেগের চিত্রায়ণ। লেখক তা কথার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান যাতে করে তা পাঠকের স্মৃতিপটে পৌঁছে যায়। লেখক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেন যেন গল্পের প্রভাবে পাঠকের মনে তেমনি প্রভাব ফেলে যেমন তার হৃদয়ে ফেলেছে।"

শৈল্পিক গল্পের তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে।[২] তা হলো

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

الموضوع বা বিষয়বস্তু

الشخصيات বা চরিত্রসমূহ

الحوار বা সংলাপ।

এছাড়াও কিছু নিয়ম রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. গল্পটি শৈল্পিক কাঠামোয় হওয়া।
২. কোনো চরিত্র উপস্থাপন।
৩. উদ্দেশ্যমূলক হওয়া।
৪. সরাসরি উপদেশ অথবা হিকমা বা প্রজ্ঞা বর্ণনা না করে তা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতে বর্ণনা করা।
৫. আগ্রহ সৃষ্টিকরণে উপাদান বিদ্যমান থাকা।

আমরা যদি শৈল্পিক গল্প ও কুরআনী গল্পের মধ্যে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাই যে, এ দুটি কোনোভাবেই এক নয়। তা সত্ত্বেও উভয়ের মাঝে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

কুরআনী গল্প আল্লাহর হৃদয়ে উদয় হয় না; দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ তার কল্পনা প্রভাবিত হয় না; তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ তার হৃদয়ে নাড়া দেয়া আবেগের চিত্রায়ণও হয় না, যেন প্রভাব পাঠকের মনে তেমনি প্রভাব ফেলে যেমন তার হৃদয়ে ফেলেছে।

কুরআনী গল্প শৈল্পিক গল্পের ন্যায় শিল্পকর্ম নয়। তার বিষয়বস্তু, উপস্থাপন পদ্ধতি ও ঘটনা বর্ণনা ভিন্ন। [৩]

কুরআনী গল্প অন্যতম মাধ্যম যা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা হয়। আর তা হলো বিধান প্রবর্তন এবং ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধন।

কারণ কুরআন হলো ইসলামী দাওয়াতের গ্রন্থ। এটি বিজ্ঞান, দর্শন ইতিহাস এর গ্রন্থ নয়। বরং তা হলো ওহীর বিধান প্রবর্তন ও আকীদার গ্রন্থ। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসার জন্য নাযিল করেছেন। এটি মানবজীবনের আত্মিক, শারীরিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দিক নির্দেশক সংবিধান। কুরআনী গল্প পথনির্দেশনা, ঈমান, উপদেশ, শরয়ী আদেশ-নিষেধের ব্যাখ্যা, সত্য ও কল্যাণকর চিন্তাধারার প্রসার এবং মানুষের মাঝে পারস্পারিক সহযোগিতা প্রসারের মাধ্যম। কুরআনী গল্প কুরআন নাযিলের মূল লক্ষ্যে পৌঁছার অন্যতম সিঁড়ি।[৪]

কুরআনী গল্পের লক্ষ্য

কুরআনী গল্পের লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। এ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত কলেবরে যা ধারণ করা সম্ভব নয়। যার সারসংক্ষেপ হলো:

প্রথমত: আকীদা সংশোধন

১. তাওহীদের আকীদা প্রতিষ্ঠাকরণ ও শিরকের আকীদার মূলোৎপাটন।
২. পূর্ববর্তী নবীগণ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর রিসালাতের আকীদায় গুরুত্ব প্রদান।
৩. কুরআনী গল্প পুনরুত্থান, বিচার, প্রতিদান এবং আখেরাতের অন্যান্য বিষয় যেমন আমল পরিমাপ করণ, পুলসিরাত অতিক্রম, জান্নাতে আল্লাহর দর্শন, মুমিনগণের জান্নাতে প্রবেশ, তার নেয়ামতের সুসংবাদ, কাফের-মুশরিকদের জাহান্নামে প্রবেশ ও জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করে। আকীদার মৌলিক তিনটি বিষয় আল উলুহিয়্যাত, রিসালাত ও পরকাল আকীদার আরো অনেক বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। আলউলুহিয়্যাতে বিশ্বাসের অর্থ হবে আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তার ইনসাফ, ক্ষমতা, প্রজ্ঞা বান্দার প্রতি তার ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত। রিসালাতের ক্ষেত্রে কুরআনী গল্পের নির্দেশনা হলো যে, নবীগণ সফল কল্যাণকর গুণাবলীর অধিকারী। মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা পৃথিবীবাসীর জন্য আদর্শ। কারণ তারা ওহীপ্রাপ্ত ও আল্লাহর নিকটতম বান্দা। [৫]

দ্বিতীয়ত: কুরআনী গল্প শুধু যে অভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করে তা নয়। বরং তা বস্তুগত উন্নতির দিকেও গুরুত্বারোপ করে। কারণ মানব জীবন গঠনে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান। আর তাই পবিত্র কুরআনে পরকলীন কল্যাণের পাশাপাশি পার্থিব কল্যাণ প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -[৬] "হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।"

তৃতীয়ত: কুরআনী গল্পে পূর্ববর্তী জাতির ধ্বংসযজ্ঞ বিস্ময়কর পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এতে রয়েছে বিলাসিতা, বিদ্রোহ, অহংকার, যুলুম, সন্ত্রাস, বিদ্রুপ ইত্যাদির বর্ণনা। পাশাপাশি এতে রয়েছে আত্মিক শারীরিক ইহকালীন পরকালীন সফলতা ও মুক্তির বিশদ বিবরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ - أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ-[৭]

"আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহগার। এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে। তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।"

এ ছাড়াও যারা এ গল্পগুলির শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে তার সফলতার বর্ণনার দিকেও মনোনিবেশ করা হয়েছে।

চতুর্থত: কুরআনী গল্পের অন্যতম দিক হচ্ছে সত্যধর্ম পালনে উৎসাহিতকরণ যা কর্মজীবন থেকে আলাদা নয়। বরং জীবনের সাথে এর নিবিড় সম্পর্কে রয়েছে।

পঞ্চমত: কুরআনী গল্পের অন্যতম দিক হলো আল্লাহর পথে দাওয়াতের পদ্ধতি ও মূলনীতি স্পষ্ট করণ। যেমন মুসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى-[৮]

"তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।"

ষষ্ঠত: কুরআনী গল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যায়ন, তাদের স্মৃতি ও অবদান চিরস্মরণীয় করণ এবং তাদের মোজেযা বর্ণনা যা আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার নিদর্শন।[৯]

সপ্তমত: মুহাম্মাদ (সা.) এর দাওয়াত ও পূর্ববর্তী জাতি সম্পর্কে তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তার সত্যায়ন কুরআনী গল্পের অন্যতম লক্ষ্য।[১০]

অষ্টমত

১. গল্পগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার হুকুম বর্ণনা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ-[১১]

"এগুলো পরিপূর্ণ হিকমাত। তবে সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।"

২. মিথ্যাবাদীদের পরিণামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার ইনসাফের বর্ণনা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ-[১২]

"আর আমি তাদের উপর যুলম করিনি, বরং তারা নিজেদের উপর যুলম করেছে। তারপর যখন তোমার রবের নির্দেশ আসল তখন আল্লাহ ছাড়া যে সব উপাস্যকে তারা ডাকত, তারা তাদের কোন উপকার করেনি এবং তারা ধ্বংস ব্যতীত তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।"

৩. ঈমানদারগণের প্রতিদানে তার অনুগ্রহের বর্ণনা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ - نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ -[১৩]

"তবে লূত পরিবারের ওপর নয়। আমি তাদেরকে শেষ রাতে নাজাত দিয়েছিলাম আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। এভাবেই আমি তাকে প্রতিদান দেই, যে কৃতজ্ঞ হয়।"

৪. মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা নবী করিম (সা.) কে যে কষ্ট প্রদান করেছে তা হতে সান্ত্বনাস্বরূপ। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী-

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ -[১৪]

"আর তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছিল নূহ, 'আদ ও ছামূদের কওম, ইবরাহীম ও লূতের কওম, এবং মাদয়ানবাসীরা। আর অস্বীকার করা হয়েছিল মুসাকে। তাই কাফিরদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কেমন ছিল শাস্তি?"

৫. মুমিনগণকে ঈমানের উপর অবিচল থাকার জন্য উৎসাহিতকরণ। কারণ মুমিনগণ জানে যে, পূর্ববর্তী মুমিনগণকে আল্লাহ তায়ালা তার গায়েবী মদদ দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী -

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا-[১৫]

"তবে কি তারা যমীনে ভ্রমণ করেনি, তারপর দেখেনি যারা তাদের পূর্বে ছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে এর অনুরূপ পরিণাম।"

কুরআনী গল্পের বৈশিষ্ট্য

কুরআনী গল্প বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. একই গল্পের পুনরোল্লেখ

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একই ঘটনার পুনরোল্লেখ রয়েছে। আর এ পুনরোল্লেখ নিরর্থক ও উপকারিতাহীন নয়। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে এর যৌক্তিক কারণ ও বিভিন্ন উপদেশ গ্রহণের দিক রয়েছে। তবে এটা পুরোপুরি পুনরোল্লেখ নয় এবং প্রত্যটি স্থানে একই শব্দের পুনরোল্লেখও নয়। বরং তা কিছু বিষয়ের পুনরোল্লেখ। আর এ পুনরোল্লেখ প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনী গল্প যেখানেই পুনরোল্লেখ হয়েছে সেখানেই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সুনির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে যা পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য হতে ভিন্ন।[১৬] উদাহরণস্বরূপ আমরা মুসা (আ.) এর ঘটনা উল্লেখ করতে পারি যা পবিত্র কুরআনের প্রায় ত্রিশ স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

কোনবার এ ঘটনাটি ভয়-ভীতি দিয়ে হৃদয়কে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। কোনো সময় তা ভালবাসা সহানুভূতি ও অনুগ্রহ দিয়ে হৃদয়কে ভরে দেয়। আবার কোনো সময় তা মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ক্ষমতা মাহাত্ম্য এবং বড়ত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করে। যেমন মুসা (আ.) এর মুজেযার বর্ণনা যার হাতে লাঠি সাপে পরিণত হত, পাথরে পানির প্রবাহধারা সৃষ্টি হত এবং লাঠির আঘাতে সমুদ্রে রাস্তা হয়ে যেতো।[১৭]

২. গল্পের বিভিন্ন অংশ চয়ন

কুরআনী গল্প ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পুনরোল্লেখ করা হয়। উদ্দেশ্য সাধনে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উল্লেখ করা হয়। কোনো সময় প্রথম থেকে, কোনো সময় মধ্য থেকে আবার কোনো সময় পুরো ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়।[১৮]

৩. উপদেশ

বিভিন্ন ধরণের কুরআনী গল্প ও বিষয়বস্তুর মূল্য লক্ষ্য উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণ।[১৯]
আল কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি গল্প এরই সাক্ষী। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ-[২০]

"তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।"

কুরআনী গল্পের উপাদান

কুরআনী গল্পের লক্ষ্য হল ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি। আমরা কুরআনী গল্পে যে উপাদানগুলি পাই তা নিম্নরূপঃ

(১) الشخصية বা চরিত্র

(২) الحوار বা সংলাপ

১। الشخصية বা চরিত্র

একটি কাহিনীর চরিত্রের সাথে পাঠক যতই একাত্ম হবেন এবং মিশে যাবেন ততই কাহিনী সার্থক হয়ে উঠবে। পবিত্র আল কুরআনে বিভিন্নভাবে একই চরিত্রের অবতারণা হয়েছে। কখনো তা স্বাভাবিক মানবীয় আকৃতিতে, আবার কখনো আদর্শ চরিত্ররূপে, আবার কোনো সময় আলোচ্য দুটি ভঙ্গিতে এ চরিত্রের অবতারণা হয়েছে। যদি আমরা ইবরাহিম (আ.) এর ঘটনা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই, তিনি ছিলেন ঈমানকে শক্তভাবে ধারণকারী, দীনের উপর অটল, সুন্দর চরিত্রে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। যৌবনকাল হতেই তিনি গম্ভীর ও শান্ত। বাধর্ক্যেও তার অবস্থা তাই ছিল। বরং বার্ধক্য তার গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করেছিল। তিনি তার পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে কুরবাণী করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর এতে তিনি ঈমান, ধৈর্য্য ও আত্মত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আমরা যদি ইউসুফ (আ.) এর চরিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে তাতে আমরা এমন কিছু নিদর্শন পাই যাকে মানবিকতা ও আদর্শের মাঝে উপস্থাপন করা যায়। তার প্রাথমিক জীবন থেকে শুরু করে তার পিতার লালন-পালন, আজিজে মিসরের ঘরে অবস্থান, মিসর রাজ্যের অর্থবিভাগের দায়িত্বসহ সবকিছু জানতে পারি।[২১] এমনিভাবে সাবা রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বিলকিসের সাথে সুলায়মান (আ.) এর চরিত্র আমাদের কাছে ফুটে উঠে। এতে কখনো সাধারণ মানবীয় চিত্র, আবার কখনো নববী চিত্র, আবার কখনো উভয়ের মাঝে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। এভাবে যদি আমরা কুরআনের বিভিন্ন ঘটনাগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে প্রতিটি ঘটনায় এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই যা দ্বারা আমরা বলতে পারি যে কুরআন একক বিস্ময়কর উচ্চ শিল্পমানে উন্নীত।

২। الحوار বা সংলাপ

ঘটনাকে শ্রোতার স্মৃতিপটে নিবিষ্ট করার লক্ষ্যে الحوار বা সংলাপের অবতারণা হয়। [২২] কুরআনী গল্পে সংলাপ বিভিন্নভাবে সাধিত হয়েছে। কখনো তা আত্মসংলাপ বা ব্যক্তি ও তার অন্তরে উদ্ভাসিত কল্পনাপ্রসূত। যেমন- ইবরাহীম (আ.) এর ঘটনায় আমরা দেখি যে তিনি চন্দ্র, নক্ষত্র, সূর্য নিয়ে গবেষণা করে আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার সময় আত্মসংলাপ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন-

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ - فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ - فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ - إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ-[২৩]

"অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল, বলল: এটা আমার প্রতিপালক। অত:পর যখন তা অস্তমিত হল তখন বলল: আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। অত:পর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল: এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অত:পর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল: এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি এক মুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই।"

কখনো সংলাপ দুচরিত্রের মাঝে সম্পন্ন হয়েছে। যেমন ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতা অথবা তার সম্প্রদায় অথবা পাখি অথবা শয়তানের সাথে সংলাপ। কখনো তা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে আবার কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে।

৩। الصراع বা দ্বন্দ্ব

এখানে الصراع বলতে ভাল-মন্দ, হক-বাতিল, ঈমান-কুফর, তাওহীদ-শিরকের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব উদ্দেশ্য। আর এই দ্বন্দ্ব বস্তুগত ও আত্মিক দুভাবেই হতে পারে।[২৪]

এক্ষেত্রে আমরা জাদুকরদের সাথে মুসা (আ.) এর অবস্থানকে বস্তুগত দ্বন্দ্ব এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের ব্যাপারে ইবরাহীম (আ.) এর অবস্থানকে আত্মিক দ্বন্দ্ব বলতে পারি। আর কুরআনী গল্পে الصراع তথা দ্বন্দ্বের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। কারণ এগুলোর মাধ্যমে ঘটনা ও চরিত্র ফুটে উঠেছে। যদি আমরা ইউসুফ (আ) এর ঘটনার দিকে তাকাই তাহলে আমরা তার ঘটনায় الصراع তথা দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক দেখতে পাই। যেমন- ইয়াকুব (আ.) ও তার পুত্রদের মাঝে, ইউসুফ (আ.) ও আযীযে মিসর-এর স্ত্রীর মাঝে, এবং মিশরের দায়িত্ব গ্রহণের পর তার ও তার ভাইদের মাঝে الصراع বা দ্বন্দ্ব উল্লেখযোগ্য। তবে এ صراع বা দ্বন্দ্ব এক প্রাকৃতিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হলো ঈমান ও ভ্রষ্টতা।

৪। المفاجأة বা আকস্মিকতা

কুরআনী গল্পের অন্যতম উপাদান হলো المفاجأة বা আকস্মিকতা। আর তা বিভিন্নভাবে হতে পারে।

১। আকস্মিকতার রহস্য কখনো নায়ক ও দর্শক উভয় থেকেই গোপন করা হয় যাতে করে একই মূহুর্তে তাদের কাছে উন্মোচিত হয়। যেমন সূরা কাহাফে বর্ণিত নেককার বান্দার সাথে মুসা (আ.) এর ঘটনা। ঘটনাটির সূচনা হয়েছে وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ-[২৫] "আর স্মরণ কর, যখন মুসা তার সহচর যুবকটিকে বলল" আয়াতের মাধ্যমে। ঘটনাটি পাঠ করলে পরপর অনেক আকস্মিকতা পাওয়া যায় যার কোন রহস্য পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান গল্পের নায়ক মুসা (আ.) এর ন্যায় হয়ে যায়। ঘটনার পূর্ণতাদানের জন্য কুরআন আমাদেরকে তার নাম বলে না। অত:পর ঘটনাকে আলোয় নিয়ে আসে। যেমন আল কুরআনে এসেছে-

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ-[২৬]

"নৌকাটির বিষয় হল, তা ছিল কিছু দরিদ্র লোকের যারা সমুদ্রে কাজ করত।"

অত:পর তা দর্শক ও মুসা (আ.) উভয়ে জানতে পারে।

২। কখনো আকস্মিকতার রহস্য গোপন থাকবে না। নায়ক ও দর্শক একই মূহুর্তে রহস্য জানতে পারবে। এটা মরিয়ম (আ.) এর ঘটনার আকস্মিকতার ন্যায়। যখন তিনি তার পরিবার থেকে আড়ালে ছিলেন তখন সেখানে আকস্মিক ভাবে মানুষের আকৃতিতে জিবরিল (আ.) এর আগমন ঘটে। এতে তিনি বলেন-

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا-[২৭]

"আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি যদি তুমি মুত্তাকী হও।"

আমরা এটা আগেই ঘটনা থেকে জেনেছি যে তিনি জিবরিল (আ.)। কিন্তু কিছু সময় যেতে না যেতেই তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন-

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا-[২৮]

"সে বলল, আমি তো কেবল তোমার রবের বার্তাবাহক, তোমাকে একজন পবিত্র পুত্রসন্তান দান করার জন্য এসেছি।"

৫। التصميم বা রূপরেখা

ঘটনার রূপরেখা ও বিন্যাসের দিক থেকে কুরআনী গল্পসমূহে চারটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

১. বিস্তারিতভাবে ঘটনা বর্ণনার পূর্বে সূচনাতেই ঘটনার সারসংক্ষেপ উল্লেখকরণ। যেমন আসহাবে কাহাফের ঘটনা।
২. ঘটনা বিস্তারিতভাবে শুরু করার পূর্বে এর ফলাফল ও পরিণতি উল্লেখকরণ। যেমন সূরা আল-ক্বাসাসে মুসা (আ.) এর ঘটনা।

نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ-

"আমি তোমার কাছে পাঠ করছি মুসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।"

৩. কখনো ভূমিকা ও সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা ছাড়াই সরাসরি ঘটনা উল্লেখ করণ। যেমন ঈসা (আ.) এর জন্মের সময় মরিয়ম (আ.) এর ঘটনা এবং হুদহুদ ও রানী বিলকিসের সাথে সুলায়মান (আ.) এর ঘটনা।
৪. কখনো তা নাটকীয় ভঙ্গিতে হবে। যেমন ইবরাহীম (আ.) এর ঘটনায় তাঁর রবের সাথে এবং তার সন্তানদের সাথে সংলাপ।

এগুলো হল কুরআনী গল্পের উপাদান। এগুলো কখনো আধুনিক শৈল্পিক গল্পের উপকরণের সাথে একিভূত হয়। তবে কুরআনী গল্পের আলাদা কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এর বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, উপস্থাপন পদ্ধতি ও ঘটনা বিন্যাসে এটি একটি একক শিল্পকর্ম।

উপসংহার

কুরআনী গল্পগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি ওহী যাতে কোনো মিথ্যা অথবা সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ কুরআন সংরক্ষেণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজ হাতে নিয়েছেন। এসব গল্পের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। নবী রাসুলদের নবুওতির প্রমাণ, আখিরাতের অবশ্যম্ভাবিতার প্রমাণপঞ্জী চমৎকার আঙ্গিকে ও শৈলীতে সুন্দর বর্ণনায় শব্দরূপ দেয়া হয়েছে। কুরআনের গল্পগুলো অনেক উন্নতমানের শিল্পসুষমায় ভরা। কুরআন শব্দের অলৌকিক সৌকর্যের পাশাপাশি কখনোই মানুষকে হেদায়েত করার প্রয়োজনীয় অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু ও বাস্তব সত্যটিকে তুলে ধরতে ভুলেনি।

তথ্যনির্দেশ

১ মুহাম্মদ আল আদাবি, মা'আলিমুল কিসসা ফিল কুরআন, ১ম সংস্করণ (আম্মান: দারুল আদাবি, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৩৫।

২ ড. মুহাম্মদ আত তুনজি, আল মুজামুল মুফাচ্ছল ফিল আদাব, ১ম খন্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ৭০৮।

৩ সাইয়েদ কুতুব, আত তাছবিরুল ফান্নি ফিল কুরআনিল কারিম, ১০ম সংস্করণ (কায়রো: দারুশ শুরুক, ২০১২ খ্রি.) পৃ. ১১৭।

৪ ড. আল আরাবি লাখদার, আদ-দিরাসাতুল ফান্নিয়া আল মুআছিরা লিল কিসমাতিল কুরআনিয়া (ওয়াহরান: দারুল গরব, ২০০৫ খ্রি.) পৃ. ১২।

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

৬ সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২০১।

৭ সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪৫ ও ৪৬।

৮ সূরা ত্বহা, আয়াত: ৪৪।

৯ আব্দুল কারিম আল খতিব, আল-কাসাসুল কুরআনী ফী মানতুকিহি ওয়া মাফহুমিহি (বৈরুত: দারুল মারিফা, ১৯৭৫ খ্রি.) পৃ. ৪০।

১০ প্রাগুক্ত।

১১ সূরা আল-ক্বামার, আয়াত: ৫।

১২ সূরা হুদ, আয়াত: ১০১।

১৩ সূরা আল-ক্বামার, আয়াত: ৩৪ ও ৩৫।

১৪ সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪২-৪৪।

১৫ সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১০।

১৬ সাইয়েদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, ১ম খন্ড, ১৭ তম সংস্কারণ (কায়রো: দারুশ শুরুক, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩৬২২

১৭ পরস্তু কিয়ামন্দ ও আলী বাকের তাহের নিয়া, দিরাসাতুত তাকরার ফী কিসসাতি মুসা ওয়া ফিরআউন ফিল কুরআনিল কারিম, আত তুরাছ আল আরাবী, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ১২৪।

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

১৯ মুস্তফা দিব আল বিগা ও মুহিউদ্দীন দিব মস্তু, আল ওয়াজিহ ফী উলুমিল কুরআন, ২য় সংস্করণ (দামেশক: দারুল কালিমিত তয়্যিব, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৯৫।

২০ সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১।

২১ আল-কাসাসুল কুরআনী ফী মানতুকিহি ওয়া মাফহুমিহি, পৃ. ৯৫।

২২ আহমাদ নাওফেল, সূরা ইউসুফ: দিরাসাহ তাহলিলিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ (আম্মান: দারুল ফুরকান, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৪৬।

২৩ সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৭৬-৭৯।

২৪ আল কাসাসুল কুরআনী ফী মানতুকিহি ওয়া মাফহুমিহি, পৃ. ১৯৩।

২৫ সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ৬০।

২৬ সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ৭৯।

২৭ সূরা মারইয়াম, আয়াত: ১৮।

২৮ সূরা মারইয়াম, আয়াত: ১৯।

২৯ সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

জুরজী যায়দানের উপন্যাস *আল 'আব্বাসা*: ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

ড. মো. সাজিদুল হক*

Abstract: Jurji Zaydan is a well-known figure in modern Arabic literature. He is a famous novelist and historian. He has extensively studied Islamic history as well as Arabic language and literature, and penned a series of historical novels from the pre-Islamic period to the Ottoman Caliphate. *Al Abbasa* is one of the best novels on Abbasid period among his historical novels. In this novel, Jurji Zaydan has presented to the reader the governance of Harunur Rashid and his personality, love story and marriage of Abbasa, murder of Ja'far Barmaki and its background. Many aspects of his novel have been criticized by critics, and several statements have been found regarding changing the truth. In this situation, it has become necessary to conduct an impartial research on the subject. So the main objects of this research article are to review all the criticized aspects and information presented in the novel by Jurji Zaydan about Harunur Rashid, Abbasa and Ja'far Barmaki, and to analyse how accurate are those in the light of objective history. In this article, along with the original novel, historical books have been taken as secondary sources, including the statements of ancient and modern historians and critics about the characters and information. This research work will play a considerable role in understanding Arabic novel or literature as well as in informing the readers and researchers about the real facts of this historical novel, especially the distorted history about Abbasa which is popular among the general people.

ভূমিকা

আধুনিক আরবী উপন্যাস সাহিত্যে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক জুরজী যায়দান (১৮৬১-১৯১৪ খ্রি.) অন্যতম। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন এবং ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। ফলে তাঁর উপন্যাসে আরব সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার চিত্র অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফুটে উঠে। এছাড়াও ফুটে উঠে ইতিহাসের বিখ্যাত চরিত্র ও ঘটনাসমূহ। আব্বাসীয় যুগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত *আল 'আব্বাসা* উপন্যাসটি তাঁর ঐতিহাসিক সিরিজের অন্যতম একটি উপন্যাস। উপন্যাসটিতে খলীফা হারুনুর রশীদ (৭৬২-৮০৯ খ্রি.), 'আব্বাসা (৭৭৭-৮২৫ খ্রি.), জাফর বার্মাকীসহ (৭৬৮-৮০৩ খ্রি.) বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চরিত্র চিত্রায়ন করেন এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপন করেন। তাঁর এ বিখ্যাত উপন্যাসটি পাঠক সমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। তবে উপন্যাসটির মৌলিক চরিত্রসহ বেশ কিছু বিষয় ইতিহাসবিদ ও সমালোচকগণ কর্তৃক সমালোচিত হয়। এমতাবস্থায় নিরপেক্ষ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সঠিখ তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করা সময়ের দাবী হয়ে উঠে। বিধায় উপন্যাসটির মৌলিক চরিত্র ও ঘটনা সম্পর্কে যে সমস্ত সমালোচিত তথ্য জুরজী যায়দান কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে, তা ইতিহাসের আলোকে কতটুকু যথার্থ তার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ গবেষণা প্রবন্ধের মূল বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের বক্তব্য ও সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনসহ মৌলিক তথ্যাবলী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এ গবেষণা প্রবন্ধটি জুরজী যায়দান কর্তৃক রচিত *আল 'আব্বাসা* উপন্যাসের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে পাঠক ও গবেষকবৃন্দকে অবহিত করবে। এছাড়াও 'আব্বাসা সম্পর্কে যে বিকৃত ইতিহাস লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে, সে সম্পর্কে বিশুদ্ধ তথ্য সরবরাহ করবে যার মাধ্যমে পাঠক ও গবেষক মহল উপকৃত হবে।

লেখক পরিচিতি

আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জুরজী যায়দান লেবাননের অধিবাসী। তিনি লেবাননের আইনু আনূব গ্রামে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর এক খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যদের সাথে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বৈরুত শহরে গমন করেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন।[২] পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তাঁর পিতা তাঁকে হোটেলের কাজে নিয়োজিত করেন। এ সময় তিনি কাজের পাশাপাশি নৈশ বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেন। জ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ থাকায় বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং ইয়াকুব সররুফ, সালীম বুসতানী, বুতরুস বুসতানীর ন্যায় বেশ কিছু সাহিত্যিকদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ঔষধ প্রস্তুতকরণ বিদ্যা অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান অর্জন করেন। বিভিন্ন আর্থিক দৈন্যতায় তিনি নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে না পারলেও নিজ প্রচেষ্টায় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেন।[৩] তিনি আরবী ভাষাসহ ফরাসি, ইংরেজী, হিব্রু ও সিরীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

শিক্ষাজীবনের ন্যায় তাঁর কর্মজীবনও বেশ বৈচিত্রময়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিসরের আয-যামান পত্রিকায় সম্পাদনার দাায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন, অত:পর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ কর্তৃক সুদান অভিযানের সময় সেনাবাহিনীতে দোভাষী হিসেবে বেশ কিছুদিন কর্মরত থাকেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিসরের বিখ্যাত পত্রিকা আল মুকতাতাফ কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে তা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন এবং ইতিহাস, সাহিত্য ও শিক্ষামূলক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে পত্রিকাটির মান সমৃদ্ধ করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মিসরের আবীদিয়া আল কুবরা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করে সেখানে দুই বছর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের শেষ দিকে শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর নিয়ে তিনি আল হিলাল পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তা সম্পাদনার দায়িত্বে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাটি সমকালীন আরব বিশ্বে ব্যাপক প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি ২১ জুলাই, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মিসরে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৪]

উপন্যাস পরিচিতি

উপন্যাসটির পূর্ণ নাম *আল 'আব্বাসা: উখতুর রশীদ* (*Al Abbasa: A Sister of Harun Al-Rashid*)। এটি জুরজী যায়দান কর্তৃক রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস সিরিজের নবম উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মিসরের আল হিলাল প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি বাংলা ভাষা ছাড়াও ফরাসী, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়। এতে আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের শাসন ব্যবস্থা ও তাঁর ব্যক্তিত্ব, 'আব্বাসা-জাফরের প্রেম ও বিয়ের কাহিনী এবং বার্মাকীদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ও কারণসমূহ তুলে ধরা হয়।

উপন্যাসের সারসংক্ষেপ

আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের ক্ষেত্রে বার্মাকী সম্প্রদায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলীফাদের সাথে বার্মাকী পরিবারের সদস্যদের অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় তারা সাম্রাজ্যের বড় বড় পদ পরিচালনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের প্রভূত সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করে। এ পরিবারেরই অন্যতম সদস্য জাফর বার্মাকী, যিনি ছিলেন দুরদর্শী, বিচক্ষণ ও কৌশলী। তাঁর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার কারণে খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন। খলীফা নিজের যে কোনো কাজে তাঁকে সাথে রাখতেন এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করতেন তাঁর জন্যও তা পছন্দ করতেন। এছাড়া জাফরের পিতা খলীফা হারুনুর রশীদের শিক্ষক হওয়ায় তিনি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

খলীফার 'আব্বাসা নামক এক বোন ছিল, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। খলীফা প্রিয় বোন 'আব্বাসা ও স্নেহাস্পদ জাফর দুজনকেই খুব ভালোবাসতেন, তাদের দেখা ছাড়া তাঁর ভালো লাগতো না। খলীফা চাইতেন তাঁর দরবারে উভয়েই উপস্থিত থাকুক। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিতে উভয়ের উপস্থিতিকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে খলীফা বিশ্বস্ত উযীর জাফরের সাথে 'আব্বাসাকে বিবাহ দেন। তবে বিবাহের পর তারা উভয়ে কোনো প্রকার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না মর্মে তিনি শর্ত আরোপ করেন। পরবর্তীতে খলীফার অগোচরে জাফর ও 'আব্বাসার মাঝে শারীরিক সম্পর্ক তৈরী হয় এবং তাদের তিনটি সন্তান হয় যাদের একজন দুই বছর বয়সে মারা যায়। খলীফার ভয়ে তাদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে সন্তানদের দেখার উদ্দেশ্যে 'আব্বাসা গোপনে তাদেরকে বাগদাদ শহরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। নির্দেশমত সন্তানদের উপস্থিত করা হলে তিনি তাদের

সাথে সাক্ষাত করেন এবং নিরাপদ স্থানে তাদের লুকিয়ে রাখার জন্য দাসী উতবাকে আদেশ প্রদান করেন। ঘটনাক্রমে বিষয়টি রাজ দরবারের কবি আবুল আতাহিয়া জানতে পারেন এবং অর্থের লোভে হারুনুর রশীদের বড় ছেলে আল আমীনকে অবহিত করেন।

সৎ ভাই মামুনকে প্রাধান্য দেয়া ও অনারব বার্মাকী পরিবারের সন্তান হওয়ায় উযীর জাফর বার্মাকীর প্রতি আল আমীন অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং মনে মনে ঘৃণা পোষন করতেন। জাফর বার্মাকীর প্রভাব ও সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় আল আমীনসহ অনেকেই তাঁকে উযীর পদ থেকে অপসারণের চেষ্টা করতে থাকে এবং বিভিন্ন উপায়ে খলীফার কান ভারী করতে থাকে। 'আব্বাসা ও জাফরের বিষয়টি জানতে পেরে পরামর্শের জন্য খলীফা পুত্র আল আমীন তাঁর মাতা যুবায়দার নিকট গমন করে। উভয়ের আলোচনায় জাফর সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য সামনে আসলে বিষয়টি খলীফাকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এদিকে খলীফার নির্দেশ অমান্য করে আলুভী নেতাকে মুক্ত করার বিষয়টি খলীফা জানতে পেরে উযীরের উপর অসন্তুষ্ট হন। অন্যদিকে যুবায়দা সুযোগ বুঝে 'আব্বাসা ও জাফরের বিষয়টি অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। বিষয়টি খলীফার নিকট প্রমাণিত হলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং জাফরের ঔদ্ধতাকে সাম্রাজ্যের জন্য বিপজ্জনক মনে করেন। তাই তিনি প্রিয় বোন 'আব্বাসা, বিশ্বস্ত উযীর জাফর বার্মাকী ও তাদের সন্তানদের হত্যার সিদ্ধান্ত নেন এবং মাসরুর নামক কর্মচারীকে এ হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। খলীফার নির্দেশ মতে জাফরকে হত্যা করে রাস্তায় ঝুলানো হয় এবং 'আব্বাসা ও তাঁর সন্তানদের হত্যা করে প্রাসাদের নিচে মাটি খুড়ে কবর দেয়া হয়। জাফর বার্মাকীর পিতা ও ভাইসহ অনেককে কারাগারে বন্দী করা হয় এবং অনেক বার্মাকীদের হত্যা করা হয়। এছাড়াও অধিকাংশ বার্মাকীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাজ্যের কোষাগারে জমা করা হয়। প্রশাসনিক দায়িত্বে নতুন লোক নিয়োগ দেয়া হয় এবং জাফরের জায়গায় আল আমীনের উযীর ফযল বিন রবী'ইকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়।[৫]

উপন্যাসের মৌলিক চরিত্রসমূহ

জুরজী যায়দান তাঁর *আল 'আব্বাসা* উপন্যাসে যে সমস্ত চরিত্রের অবতারণা করেছেন, তার একটি তালিকা গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সমস্ত চরিত্রের মধ্যে রয়েছে হারুনুর রশীদ (আব্বাসীয় খলীফা), জাফর বার্মাকী (হারুনুর রশীদের উযীর), 'আব্বাসা (হারুনুর রশীদের বোন), যুবায়দা (হারুনুর রশীদের স্ত্রী), আবুল আতাহিয়া (হারুনুর রশীদের সভাকবি), আল আমীন (হারুনুর রশীদের পুত্র), উতবাহ ('আব্বাসার দাসী), ফযল বিন রবী'ই (আল আমীনের উযীর), মাসরুর ফারগানী (হারুনুর রশীদের জল্লাদ)। তবে উল্লেখিত চরিত্রসমূহের মধ্যে হারুনুর রশীদ, জাফর বার্মাকী এবং 'আব্বাসাকে মৌলিক চরিত্রে উপস্থাপন করা হয় এবং তাঁদের মাধ্যমে উপন্যাসের ধারা পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়।

উপন্যাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

জুরজী যায়দান একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং বিজ্ঞ ঐতিহাসিকও বটে। ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও তিনি ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। *আল 'আব্বাসা* উপন্যাসটিতে জুরজী যায়দান যে ইতিহাস পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন, তা ইতিহাসের আলোকে কতটুকু যথার্থ তা নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায়। ফলে উপন্যাসটির বেশ কিছু সমালোচিত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের দাবী রাখে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাস বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাসের কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন বর্ণনাসমূহের সমন্বয়সাধন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ একজন গবেষকের জন্য সতিই কষ্টসাধ্য। তথাপি বিষয়টির গুরুত্ব ও পাঠকমহলের চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে এ গবেষণাকর্মটি পরিচালনার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও আলোচনার সীমাবদ্ধতার কারণে শুধুমাত্র উপন্যাসের মৌলিক চরিত্র ও ঘটনাসমূহের সমালোচিত তথ্যগুলোর পর্যালোচনা করা হয় এবং বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের উপর গুরত্ব দেয়া হয়। উপন্যাসের মৌলিক চরিত্র ও ঘটনা সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো ইতিহাসবিদ কিংবা সমালোচকগণ কর্তৃক সমালোচিত হিসেবে অত্র গবেষণায় ফুটে উঠে তা নিম্নরূপ:

- হারুনুর রশীদের শাসন ব্যবস্থা ও তাঁর ব্যক্তিত্ব
- 'আব্বাসার সাথে জাফরের প্রেম ও বিয়ের কাহিনী
- জাফর বার্মাকীর হত্যা ও তার কারণ

উপন্যাসটিতে জুরজী যায়দান কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন চরিত্রের সমাহার থাকলেও গ্রন্থের শুরুতে নয়টি চরিত্রের তালিকা উল্লেখ করা হয়। তবে মৌলিক চরিত্র হিসেবে খলীফা হারুনুর রশীদ, প্রধান উযীর জাফর বার্মাকী ও রাজকন্যা 'আব্বাসাকে উপস্থাপন করতে দেখা যায় এবং তাঁদের চরিত্রায়নের মাধ্যমে উপন্যাসটির পূর্ণতার রূপ দান করা হয়। মৌলিক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হওয়ায় উক্ত তিনটি ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের সমালোচিত তথ্যগুলো সম্পর্কে নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ অত্র গবেষণা প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য। উল্লিখিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের পূর্বে ইতিহাসের আলোকে সংশ্লিষ্ট উপন্যাসটির প্রধান তিনটি ঐতিহাসিক চরিত্রের পরিচিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন, যা একজন গবেষকের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে মনে করি। সুতরাং উপন্যাসটির মৌলিক ও প্রধান তিনটি চরিত্র তথা হারুনুর রশীদ, 'আব্বাসা এবং জাফর বার্মাকীর পরিচিতি উল্লেখপূর্বক উক্ত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

খলীফা হারুনুর রশীদ

ইসলামের ইতিহাসে যে সকল খলীফা গৌরবের ইতিহাস রচনা করেছেন, খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। হারুনুর রশীদ খলীফা মানসুরের শাসনামলে ১৪৬ হিজরীতে (৭৬২ খ্রি.) রাই নামক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] তাঁর পিতার নাম আল মাহদী ও মাতার নাম খাইজুরান। বাল্যকালে তিনি ইয়াহয়া বার্মাকীর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং ইয়াহয়ার মতই একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিণত হন। ১৭০ হিজরীতে (৭৮৬ খ্রি.) হাদীর মৃত্যুর পর আব্বাসী বংশের ৫ম শাসক হিসেবে তিনি খিলাফাতের মসনদে আরোহণ করেন।[৭] দক্ষতার সাথে সুদীর্ঘ ২৩ বছর শাসন করার পর তিনি ১৯৩ হিজরীতে (৮০৯ খ্রি.) তুস নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৮] মৃত্যুর পূর্বে খিলাফাতের উত্তরাধিকার হিসেবে আমীন, মামুন ও মুতামিন নামক তিন ছেলেকে মনোনয়ন করেন।[৯]

আরব বিশ্বের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে হারুনুর রশীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তিনি যেমন ছিলেন সমরকৌশলী, তেমনি প্রজাবৎসল শাসকও। পাশাপাশি তিনি একজন ধর্মপরায়ণ শাসকও ছিলেন। শাসনকার্যের বিভিন্ন ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ না হওয়া সাপেক্ষে তিনি প্রতিদিন একশত রাকাত নামাজ আদায় করতেন, হজ্বের সময় একশত লোককে নিজ খরচে হজ্বে নিয়ে যেতেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের সময় তিনশত লোককে পুরো খরচসহ হজ্বে পাঠাতেন।[১০] তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, গরিব-দুঃখীদের জন্য সরাইখানা চালু করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নতুন নতুন মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা। বিজ্ঞান শাস্ত্রের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির জন্য তাঁর শাসনকালকে আব্বাসী খিলাফাতের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে।[১১]

উপন্যাসে বর্ণিত হারুনুর রশীদের শাসন ব্যবস্থা ও তাঁর ব্যক্তিত্ব

আল 'আব্বাসা উপন্যাসটি আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সোনালী যুগ তথা হারুনুর রশীদের শাসনামলকে নিয়ে রচিত। জুরজী যায়দান উক্ত উপন্যাসে আব্বাসী যুগের অন্যতম খলীফা হারুনুর রশীদ এর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন। লেখকের উপস্থাপিত বর্ণনার মাধ্যমে যে বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

খলীফার স্বৈরাচারিতা ও স্বার্থপরতা: জুরজী যায়দান তাঁর 'আব্বাসা উপন্যাসে খলীফা হারুনুর রশীদের এমন কিছু চিত্র উপস্থাপন যার মাধ্যমে খলীফার স্বৈরাচারিতা ও স্বার্থপরতার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি এ বিষয়টি একাধিকবার উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেন। 'আব্বাসার বক্তব্যের মাধ্যমে খলীফার স্বৈরাচারিতা ও স্বার্থপরতার যে চিত্র তিনি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন, তা নিম্নরূপ: [১২]

> "মেয়েটি ফুপিয়ে কেঁদে উঠল, করুণ কণ্ঠে বলল: উহ উতবা! তুমি অসম্ভব কল্পনা করছ। তুমি ভালো করেই জানো আমাদের শত্রু কত ক্ষমতাশালী আর অত্যাচারী। সে যা চায় তাই করে। নিজের ইচ্ছা পূরণে সে যা খুশী করতে পারে। সব রকম নিষ্ঠুরতা তার কাছে সহজ। তার অন্তরে কোনো ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা নেই। কথা বলতে বলতে নকশা তোলা রেশমী রুমাল দিয়ে সে অশ্রু মুছতে লাগল।"

'আব্বাসা ও তাঁর সন্তানদের হত্যা: উপন্যাসটিতে উল্লেখ করা হয়, রাজদরবারে উপস্থিতির সময় পর্দার সমস্যা সমাধানের জন্য শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করার শর্তে খলীফা তাঁর বিশ্বস্ত উযীর জাফর বার্মাকীর সাথে প্রিয় বোন 'আব্বাসার বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের পরবর্তীতে উভয়ের মাঝে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠার মাধ্যমে তাঁদের তিনটি সন্তান জন্মলাভ করে যার মধ্যে একটি সন্তান শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। বিষয়টি সম্পর্কে খলীফা অবগত হলে ক্রুদ্ধ হয়ে 'আব্বাসা ও তাঁর সন্তানদ্বয়কে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে জুরজী যায়দান বর্ণনা করেন: [১৩]

> "জাফরকে হত্যা করার কথা শুনে 'আব্বাসার আত্মা কেঁপে উঠলো। প্রেমিকের প্রাণ ভিক্ষায় সে একদম গলে গেল। সন্তানের চেয়ে এখন প্রেমিককে বাঁচানোই মূখ্য হয়ে উঠলো। নিজেকে একটু সংযত করে অবনত হলো ভাইয়ের সামনে। .... তিনি তো আপনার উযীর। আপনার সেবায় তো সে ত্রুটি করেনি। বিনা দোষে একজনকে কি আপনি হত্যা করতে চাইছেন? সে তো কোন পাপ করেনি। অন্তত এ হত্যা থেকে একজনকে মুক্তি দিন। আর হত্যা করতে চাইলে আমাকেই হত্যা করুন। আমিই এর জন্য দায়ী, আমিই অপরাধী। সে তো কোন দোষ করেনি। তার কথা শুনে খলীফা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন এবং অবজ্ঞাভরে ও ক্রোধে বলে উঠলেন: তোমাদের দুজনকেই হত্যা করা হবে। তার আগে হত্যা করব তোমাদের সন্তানদের, কারণ তোমাদের পাপের চিহ্ন চিরতরে মুছে ফেলতে হবে।"

আনন্দ উপভোগ ও মদপানের আসর: জুরজী যায়দান কর্তৃক উপস্থাপিত উপন্যাসটির আরেকটি স্পর্শকাতর বিষয় হলো খলীফা হারুনুর রশীদের আনন্দ উপভোগ ও মদ পানের আসর। জুরজী যায়দানের বর্ণনা মতে খলীফা হারুনুর রশীদের জীবন আনন্দ উপভোগ ও বিনোদনের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তিনি মদপানে অভ্যস্ত ছিলেন এবং অবসর সময়ে বিনোদনের জন্য গান শুনতেন বা গানের আসর বসাতেন। শুধু তাই নয়, খলীফার মদ পানের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ ও পোষাক ছিল। মদের আসরে বসার পূর্বে নির্দিষ্ট পোষাক পরিধান করে আসতেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের মদ সাজানো থাকতো। গানের সুর মূর্ছনা উপভোগের সময় আসরে নিয়োজিত সেবকরা তা পরিবেশন করতো। এ প্রসঙ্গে জুরজী যায়দান বলেন: [১৪]

> "এমন মায়াময় সঙ্গীত মুর্ছনার পর শরাবের আদেশ শুনে উপস্থিত কবি বন্ধুরা আনন্দিত হলো। খলীফা রশীদের প্রাসাদে প্রায় তিনশত গায়িকা আছে, যাদের কেউ বীণা বাজায়, কেউ তাম্বুরা বা খঞ্জনীর সুর তোলে, কেউ বাশি বাজায় আর কেউ বা সেতারা বাজায়। সঙ্গীতে দক্ষতা আর সৌন্দর্যের বিচারে এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এ ছাড়া আরো দুই হাজার দাসী ছিল, যারা উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এসব উপপত্নী ও গায়িকাদের তত্ত্বাবধায়ক হলো খাদেম মাসরুর। আজ সে অনুপস্থিত, তাই তার পদের দায়িত্বে আছে কাইয়ূম। শরাব পরিবেশনকারীরা শরাব আনলো। ..... যখন গায়িকারা গানের আয়োজন করল, তখন সাকী মদ পরিবেশন করল খলীফাকে। একদিকে পর্দার আড়ালে গায়িকারা, আরেকদিকে উপস্থিত লোকেরা। গায়িকাদের সাথে রয়েছে আবু যিকার। যখন কোন গায়িকা গান পরিবেশন করে, যিকার তার নাম বলে আর তার গান ও সুরের পরিচিতি বলে দেয়।"

জুরজী যায়দান কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

উল্লিখিত বিষয়সমূহ নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খলীফার স্বৈরাচারিতা ও স্বার্থপরতার তথ্যটি সঠিক নয়। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও প্রজাদরদী শাসক ছিলেন। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের কোথাও তাঁর স্বৈরাচারিতা ও স্বার্থপরতার সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং পাশ্চাত্যের কিছু ঐতিহাসিক তাঁর ব্যাপারে নানা অপবাদ ছড়ায়ে তাঁকে ইতিহাসের পাতায় অসম্মানীত করার চেষ্টা করে।[১৫] প্রখ্যাত ইসলামী গবেষক মাশহুর বিন হাসান উল্লেখ করেন:[১৬] *আল 'আব্বাসা* উপন্যাসটিতে খলীফা হারুনুর রশীদকে স্বৈরাচারী, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হিসেবে অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং বার্মাকী সম্প্রদায়কে হত্যা করার বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি হারুনুর রশীদের বোন 'আব্বাসার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করা হয়েছে।

'আব্বাসা ও তাঁর সন্তানদের হত্যা করার বিষয়টি নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাসের গ্রন্থে উল্লেখ নেই। মূলত ইতিহাস 'আব্বাসার মৃত্যু সম্পর্কে অনেকটাই নিরব ভূমিকা পালন করেছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় মিসরে তাঁর মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বুতরুস বুসতানী একটি তথ্য প্রদান করেন, যেখানে তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে অসুস্থতাকে উল্লেখ করা হয়।[১৭]

খলীফা হারুনুর রশীদের মদপানের যে তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা রীতিমত বিস্ময়কর ও ভিত্তিহীন। ইবনু খালদুন আফসোস করে উল্লেখ করেন: ঐতিহাসিকগণ খলীফা হারুনের সুরাসক্তি ও সুরাপানের আসর বসানোর যে অবমাননাকর কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই আমাদের নেই। তিনি তৎকালীন উলামা ও দরবেশ লোকদের সাথে উঠাবসা করতেন। সময় মত নামায ও অন্যান্য ইবাদাত করতেন, এক বছর হজ্ব ও অন্য বছর জিহাদ করতেন। খিলাফাতের উত্তরসূরী, ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক খলীফার পক্ষে এটা কীভাবেই বা সম্ভব।[১৮]

এ প্রসঙ্গে শাওকী আবু খলীল বলেন: তিনি সর্বদা জ্ঞানীগুণী ও আধ্যাত্মিক মনীষীদের সাহচর্যে থাকতেন। তিনি ফুযাইল ইবনু আয়াজ, কাযী ইউসুফ, ইমাম মালিক, আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, হাসান শায়বানীর ন্যায় গুণীদের সাথে আলোচনা করতেন। সুফিয়ান সাউরীর ন্যায় মনীষীর সাথে তাঁর পত্রালাপ চলতো। যদি তিনি মদ পান করতেন বা মদের আসর বসাতেন, তাহলে বিষয়টি অবশ্যই তাঁদের কানে আসতো এবং তাঁরা তাঁকে মদ পান থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করতেন।[১৯]

মদের ব্যাপারে খলীফার অনাসক্তি প্রমানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, খলীফা মদপানের কারণে কবি আবু নুয়াসকে গ্রেফতার করেন এবং মদপান ত্যাগ করার আগে তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি। অবশ্য খলীফা আংগুরের রস পান করতেন, যাকে আরবীতে নাবীজ[২০] বলা হয়। বিশুদ্ধ মতে নাবীজ মদের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং তা পান করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ।[২১] খলীফার নাবীজ পানের বিষয়ে একটি মন্তব্য পাওয়া যায়। ড. শাকির মোস্তফা উল্লেখ করেন যে, খলীফার পেটের কিছু সমস্যা ছিল যা তাঁকে খুব কষ্ট দিত। এমনকি পেটের সমস্যার কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর এ রোগের মূল চিকিৎসা ছিল নাবীজ। বিধায় চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁকে নাবীজ পান করানো হতো।[২২] প্রকৃত পক্ষে খলীফার মদ পান বা মদের আসর বসানোর কোনো বিশ্বস্ত বর্ণনা ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[২৩]

খলীফার আনন্দ উপভোগ হিসেবে গানের আসরে অংশগ্রহণ বা গান শ্রবনের যে তথ্যটি উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়, তার সত্যতার ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি খুজে পাওয়া যায় না। খলীফা সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন বটে, তবে সঙ্গীতপ্রেমিক ছিলেন না। খলীফার অনুগ্রহ ও উপঢৌকন প্রাপ্তির আশায় তাঁর দরবারে অনেক কবি ও সাহিত্যিক আসা যাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন গায়ক আগমন করার কারণে অনেকের মনে খলীফার সঙ্গীত আসক্তির ধারণা তৈরী হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খলীফার দরবারে কোন সঙ্গীত আসর বসত না। তাছাড়া খলীফা হারুনুর রশীদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন কাজী আবু ইউসুফ। তিনি খলীফার নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাদের উভয়ের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কাজী আবু ইউসুফের মতে সঙ্গীত বা গানের আসর হারাম কাজের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং খলীফার গানের আসরে যোগদান করার বিষয়টি অবগত হলে সে ব্যাপারে তিনি কোনো নির্দেশনা প্রদান করতেন। সুতরাং সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা প্রকাশিত না হওয়ার অর্থ হলো খলীফা উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না।[২৪]

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক ও ইতিহাসবিদ মানসুর আব্দুল হাকিম ঐতিহাসিক বিভিন্ন বর্ণনার চমৎকার একটি সমন্বয়মূলক মন্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন: খলীফা হারুনুর রশীদের সঙ্গীতপ্রেমের তথ্যটিকে যদি আমরা কিছুটা সত্য হিসেবে গণ্য করি, তথাপি সেখানে একটি বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যার অবকাশ থেকে যায় যা অনেকের দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে গেছে। ব্যাখ্যাটির ক্ষেত্রে প্রথমত বলা যায় যে, খলীফা ছন্দবদ্ধ কবিতা বা বাদ্যহীন গান পছন্দ করতেন। এজন্য বিভিন্ন কবি ও গায়ক দরবারে উপস্থিত হয়ে খলীফাকে আনন্দ প্রদান করতো। দ্বিতীয়ত বলা যায় যে, তাঁর নিজস্ব অর্থে ক্রয়কৃত অনেক সেবিকা (দাসী) যারা তাঁর দরবারে সেবার কাজে নিয়োজিত থাকতো তাদের অনেকেই সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। তিনি হয়তোবা উক্ত দাসীদের মাধ্যমে বাদ্যহীন গান শ্রবন করতেন, যা ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মনিবের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ। সুতরাং সঙ্গীতপ্রেমের অপবাদটি তাঁর ক্ষেত্রে কোন মতে প্রযোজ্য নয়। আরো উল্লেখ্য যে, তিনি পেশাদার গায়ক কিংবা গায়িকাদের থেকে কখনই গান শুনতেন না, বরং তিনি তাদের অপছন্দ করতেন এবং তাদের থেকে নিজেকে সব সময় দুরে সরিয়ে রাখতেন।[২৫]

বর্ণিত আলোচনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে খলীফা হারুনুর রশীদ একজন ন্যায়বিচারক, জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ শাসক ছিলেন। সুতরাং একজন ন্যায়বিচারক ও ধর্মপরায়ণ শাসকের জন্য স্বৈরাচারী হওয়া, অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা বা গানের আসর বসিয়ে আনন্দ উল্লাস করা কখনই সম্ভব নয়। মূলত আগানী অথবা এ জাতীয় গ্রন্থের মাধ্যমে যারা আব্বাসীয় যুগের অন্যতম খলীফা হারুনুর রশীদের ইতিহাস অনুসন্ধান করবে, তারা তাঁর দরবারে আনন্দ

উপভোগ, গান বাজনা ও প্রেমের দৃশ্য অবলোকন করবে। তবে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থের আলোকে অনুসন্ধান করলে হারুনুর রশীদকে একজন খোদাভীরু, ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে দেখতে পাবে।[২৬]

'আব্বাসা

'আব্বাসার পুরো নাম উলাইয়া বিনতে মাহদী ইবনু মানসুর। তাঁর মূল নাম উলাইয়া হলেও তিনি 'আব্বাসা নামে বেশী পরিচিতি লাভ করেন। কিছু কিছু ইতিহাস গ্রন্থে 'আব্বাসা ও উলাইয়া ভিন্ন দুটি বোন হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৭] তবে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতে, 'আব্বাসা ও উলাইয়া একই নারীর দুটি নাম। তাঁর নাম নিয়ে একাধিক বক্তব্য থাকলেও আব্বাসীয় রাজকন্যা হিসেবে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তাঁর পিতা আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের তৃতীয় খলীফা আল মাহদী এবং তাঁর মাতা মাকনূনা খলীফার উপপত্নী যিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন।[২৮] এছাড়াও তিনি আল হাদী, হারুনুর রশীদ ও ইবরাহীম এর সৎবোন ছিলেন।[২৯] 'আব্বাসা খলীফা মাহদীর শাসনামলে কূফা শহরে ১৬০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৩০] তিনি তাঁর শৈশব ও কৈশোর প্রাসাদ পরিবেশে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ভাষা-সাহিত্যসহ রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর পিতা খলীফা মাহদীর মৃত্যুর পর খলীফা হারুনুর রশীদের তত্ত্বাবধানে তিনি বেড়ে উঠেন। তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের কারণে খলীফার নিকট তিনি বেশ প্রিয় হয়ে উঠেন এবং প্রাসাদে প্রভাবশালী রমনী হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। ১৭২ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান সাথে তাঁর বিবাহ হয়, যিনি খলীফা মাহদী ও হাদীর শাসনামলে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং খলীফা হারুনুর রশীদের আমলে দীর্ঘ সময় কুফা, মক্কা ও মদীনার গভর্ণর এর দায়িত্ব পালন করেন।[৩১] বিবাহের পর তাঁকে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৭৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩২] তাঁর প্রথম স্বামী মৃত্যুবরণ করলে পরবর্তীতে ইবরাহীম বিন সালিহের সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পাদিত হয় এবং ইবরাহীমকে মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তিনিও ১৭৬ হিজরীতে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৩] এরপর মুসা বিন ঈসা আব্বাসীর সাথে তাঁর তৃতীয় বিবাহ সম্পাদিত হয় এবং তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় 'আব্বাসা ২১০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৪] 'আব্বাসার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তারীখুত তাবারীসহ বেশ কিছু ইতিহাস গ্রন্থে ১৮৭ হিজরীকে (৮০৩ খ্রি.) 'আব্বাসার মৃত্যু সাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়।[৩৫] তবে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতে, আব্বাসীয় এ রাজকন্যা ২১০ হিজরীতে (৮২৫ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।[৩৬]

উপন্যাসে বর্ণিত 'আব্বাসার সাথে জাফরের প্রেম ও বিয়ের কাহিনী

আল 'আব্বাসা উপন্যাসের প্রধান একটি বিষয় হলো 'আব্বাসার সাথে জাফরের প্রেম ও তাঁদের বিয়ের কাহিনী। মূলত এ বিষয়টিকে উপজীব্য করে জুরজী যায়দান উপন্যাসটি রচনা করেন। তিনি তাঁদের প্রেম ও বিয়ের ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি বিয়ের কারণটিও উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে জুরজী যায়দান বলেন: [৩৭]

> "আতাহিয়্যাহ দীর্ঘক্ষণ হাঁটুর ভরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে পিঠে তীব্র ব্যাথা অনুভব করেন। এতক্ষণের আলোচনা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন এই অপরুপা লাবণ্যময়ী রমণীটি খলীফা হারুনুর রশীদের বোন 'আব্বাসা। তিনি জানেন খলীফা তাঁর বোনকে উযীর জাফর বিন ইয়াহয়া বার্মাকীর সাথে শুধু এ কারণে বিয়ে দিয়েছিলেন যেন দরবারে একসঙ্গে বসে থাকার সময় জাফরের দৃষ্টি অবৈধ না হয়। কেননা খলীফা হারুন জাফরকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁর পারিবারিক আসরেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতেন। রশীদ তাঁর বোন 'আব্বাসাকেও অত্যাধিক ভালোবাসতেন। দরবারে সে তাঁর পাশে উপস্থিত থাকত। উযীর বিয়ে করে বৈধ দৃষ্টিতে যেন 'আব্বাসার দিকে তাকান, তাই এ অভিনব বিয়ে। কিন্তু তাকিয়ে দেখা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর কোনো সম্পর্কই তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য আতাহিয়্যাহ আজ বুঝতে পারলেন নিষিদ্ধ হলেও 'আব্বাসা ও জাফরের গোপন মেলামেশা হয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে এ দুই নিস্পাপ শিশুর জন্ম হয়েছে। এখন 'আব্বাসা ভয় পাচ্ছে বিষয়টি যদি ঘূর্ণাক্ষরেও তার ভাই জানতে পারে, তবে তাদেরকে হত্যা করবে।"

জুরজী যায়দান কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

'আব্বাসা ও জাফরের যে প্রেম কাহিনী উপন্যাসিটিতে আলোচিত হয়েছে, তার বর্ণনা বিশুদ্ধ কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 'আব্বাসা ও জাফরকে জড়িয়ে যে গল্প-কাহিনীগুলো চালু হয়েছে তার মূল উৎস ইবনু জারীর তাবারীর একটি বর্ণনা। *তারীখুত তাবারী* গ্রন্থে বার্মাকীদের পতনের কারণ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করতে গিয়ে তাবারী বর্ণনা করেন: আমাকে আহমাদ ইবনু যুহাইর বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর চাচা যাহির বিন হারব থেকে জাফর ও বার্মাকীদের পতনের কারণটি বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন: খলীফা হারুনুর রশীদ জাফর ও 'আব্বাসা দুজনকেই খুব ভালোবাসতেন, তাদের সাক্ষাত ছাড়া তাঁর সময় কাটত না। খলীফা চাইতেন মদপানের মজলিসে তাদের উভয়ই উপস্থিত থাকুক। এ কারণে খলীফা জাফরকে অনুরোধ জানালেন যেন সে 'আব্বাসাকে বিবাহ করে, তাহলে আর পর্দার সমস্যা হবে না। তবে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারবে না। এই শর্তে খলীফা জাফরের সাথে 'আব্বাসার বিবাহ দেন। পরে মদ্যপ অবস্থায় জাফর 'আব্বাসার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে এবং তাদের তিনটি সন্তান হয় যাদের একজন শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এ সংবাদ খলীফা থেকে গোপন করে শিশুদেরকে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু 'আব্বাসার সাথে মনোমালিন্যের জের ধরে জনৈক দাসী একথা খলীফাকে জানিয়ে দেয়। খলীফা সে বছর হজ্জের সফরে শিশুদের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তিনি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[৩৮]

তাবারীর বর্ণনা এটুকুই। 'আব্বাসাকে নিয়ে বিভ্রান্তির সূচনাও এখান থেকেই। তাবারী স্বীয় অভ্যাস মতে অন্যান্য বর্ণনার সাথে উক্ত বর্ণনাটিকে লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে এ সমস্ত বর্ণনার কোনোটিকেই তিনি প্রাধান্য দেননি। তাবারীর পরে অন্যান্যরা এ গল্পকে আরো বড় করেছেন। বিশেষ করে ঐতিহাসিক মাসউদি *মুরুজুজ জাহাব* গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাটিকে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।[৩৯]

তাবারীর উল্লিখিত বর্ণনাটি কতটুকু বিশুদ্ধ তা পর্যালোচনা করা হলে অনেক অজানা বিষয় আমাদের সামনে প্রকাশিত হবে এবং ঘটনার মৌলিকতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সৃষ্টি হবে। তাবারীর বর্ণনাকে সামনে রেখে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা বিস্তারিতভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- প্রথমত আহমাদ ইবনু যুহাইর ও তার চাচা যাহের উভয়ই জাফরের হত্যাকাণ্ডের সময় বাগদাদে উপস্থিত ছিলেন না। দ্বিতীয়ত তাবারী ছাড়া অন্য কোনো ঐতিহাসিক এ ঘটনার বর্ণনায় তাদের নাম উল্লেখ করেননি। আহমাদ ইবনু যুহাইর ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বস্ত হলেও তাবারীর একক বর্ণনার কারণে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে কমে যায়।
- বার্মাকীদের পতনের পর আবু নুয়াস ও অন্যান্য কবিরা যে সকল কবিতা রচনা করেছেন, তাতে এই বিবাহের কোনো আভাসও নেই। তাবারী ছাড়া আর কারো কাছেই যেন এ বিবাহের সংবাদ পৌঁছেনি।
- আরব বংশজ্রোত একজন আব্বাসীয় খলীফার পক্ষে তার বোনকে অনারব ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়ার বিষয়টি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবিক, তা বেশ চিন্তার বিষয়। ইবনু খালদুন অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বর্ণনা করেন: জাফর ইবনু ইয়াহয়ার সাথে 'আব্বাসার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন কী করে সম্ভব হতে পারে? একজনের পূর্বপুরুষ রাসুলের (সা:) পিতৃব্য ও কোরাইশ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত আর অন্যজনের পূর্বপুরুষ অনারব পারস্যবাসী। আব্বাসীয় খলীফাগণই বার্মাকীদের ক্রীতদাসের কলংক থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করেন। চিন্তাশীল পাঠক যদি বিষয়টি নিয়ে ভাবেন তাহলে তার বিবেক কিছুতেই এই কথা সমর্থন করবে না যে, 'আব্বাসা নিজ বংশের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত একজনের সাথে এ প্রকার সম্পর্কে রাজী হবেন।[৪০]
- ইবনু কাসীর উক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেন: ইবনু জারীর উক্ত ঘটনার বিবরণ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করলেও অধিকাংশ ইসলামী পণ্ডিত বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছে। তাছাড়া তাঁর বর্ণনাটি অবাস্তব ও অশুদ্ধ। কেননা বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আব্বাসা সব সময় খলীফার দরবারে উপস্থিত থাকতেন। তথাপী দীর্ঘ সময় 'আব্বাসা গর্ভবতী থাকা সত্ত্বেও তা খলীফার নিকট গোপন থাকার বিষয়টি সুস্থ্য বিবেক সম্পন্ন কোনো ব্যক্তির নিকট বোধগম্য নয়।[৪১]

'আব্বাসা সম্পর্কে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও গ্রহনযোগ্য বক্তব্য হলো, জাফরের সাথে তাঁর কোনো প্রকার প্রণয় সম্পর্ক গড়ে উঠেনি এবং তাঁদের উভয়ের মাঝে কখনো বিবাহ সম্পাদিত হয়নি। বরং তাঁর জীবনে একাধিক বিবাহ সংঘটিত হয় এবং তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় রাজদরবারের বাইরে অতিবাহিত করেন। 'আব্বাসার প্রথম বিবাহ হয় মুহাম্মাদ

বিন সুলায়মান এর সাথে, দ্বিতীয় বিবাহ হয় ইবরাহীম বিন সালেহ এর সাথে,[৪২] এরপর মুসা বিন ঈসা আব্বাসীর সাথে তাঁর তৃতীয় বিবাহ সম্পাদিত হয় এবং তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় 'আব্বাসা ২১০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ইবনু কুতাইবা দিনাওয়ারী জাফরের হত্যাকাণ্ডের ২৬ বছর পর ২১৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের এক দীর্ঘ সময় তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। সে সময় বাগদাদে বার্মাকীদের অনেকেই বেঁচে ছিল যারা জাফর হত্যাকাণ্ডের পূর্বাপর জানতো। যদি বার্মাকীরা জাফর হত্যার জন্য 'আব্বাসার সাথে জাফরের বিবাহের গল্প বলতো তাহলে তিনি অবশ্যই সে তথ্য উল্লেখ করতেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী 'আব্বাসার প্রথম স্বামী মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বসরার গভর্ণর হওয়ায় তিনি প্রথমে সেখানে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে দ্বিতীয় স্বামী মিসরের গভর্ণর হওয়ায় তিনি মিসরে চলে আসেন এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। এছাড়াও উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়াহয়া ইবনে খাকান হারুনুর রশীদের সেবক মাসরুরকে 'আব্বাসা সম্পর্কিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন সে বলে: আপনি সম্ভবত তাঁর বিষয়ে লোকমুখে যে কথা প্রচলিত আছে, তা জানতে চাচ্ছেন। আল্লাহর শপথ! এ কথার কোনো ভিত্তি নেই।[৪৩] সুতরাং হারুনুর রশীদের দরবারে উপস্থিতির মাধ্যমে জাফর বার্মাকীর সাথে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে উঠা এবং তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তথ্যটি উপরোক্ত আলোচনার আলোকে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

জাফর বার্মাকী

খলীফা আবু জাফর মানসুরের শাসনকালে ১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খ্রি.) জাফর বিন ইয়াহয়া বার্মাকী বাগদাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৪] বাল্যকালেই জাফরের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষাজীবন শেষে জাফর সাহিত্য, ফিকাহ, দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেন। মুহাম্মদ বিন রাশেদ ইসহাক মসুলীর বর্ণনা মতে, জাফর বাগদাদের আলেমদের অন্যতম ছিলেন। প্রশাসনিক কাজে জাফর কখন নিযুক্ত হন তার কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে এটা বুঝা যায়, হারুনুর রশীদ খলীফা হওয়ার এক বছর পর জাফরকে উযীর নিযুক্ত করা হয়। ১৭৫ হিজরীতে (৭৯১ খ্রি.) জাফরকে মিসরের শাসক নিযুক্ত করা হয়। ১৭৭ হিজরীতে (৭৯৩ খ্রি.) তাঁর পরিবর্তে ইসহাক বিন সুলাইমানকে পাঠানো হয়। ১৮০ হিজরীতে জাফরকে পাঠানো হয় শামের বিদ্রোহ দমন করতে। কিছুকাল তাঁকে খোরাসান ও সিজিস্তানে পাঠানো হয়। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। জাফরের পিতা ইয়াহয়া হারুনের শিক্ষক হওয়ায় খলীফার সাথে তাঁর অত্যন্ত ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। খলীফা নিজের যে কোনো কাজে জাফরকে সাথে রাখতেন, নিজের জন্য যা পছন্দ করতেন জাফরের জন্যও তা পছন্দ করতেন এবং প্রায়ই তাঁকে ভাই বলে ডাকতেন। উযীর হিসেবে জাফর ছিলেন দুরদর্শী, বিচক্ষণ ও কৌশলী।[৪৫] জাফরকে হত্যা করা হয় ১৮৭ হিজরীতে। পুরো ব্যাপারটিই ছিল আকস্মিক। একই রাতে খলীফা জাফর বার্মাকীকে হত্যা, ইয়াহয়া বার্মাকী ও ফযল বার্মাকীকে গ্রেফতার এবং বার্মাকীদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[৪৬]

উপন্যাসে বর্ণিত জাফর বার্মাকীর হত্যা ও তার কারণ

আল 'আব্বাসা উপন্যাসের অন্যতম একটি বিষয় হলো জাফর বার্মাকী ও তাঁর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। জাফর বার্মাকীর হত্যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও এ বিষয়টি নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। জুরজী যায়দান তাঁর উপন্যাসে যে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেন, সেখানে জাফরের আলুভী (আলী রা. এর বংশীয় লোকজন) সম্প্রদায়ের সাথে গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠার ও আলুভী সম্প্রদায়ের নেতা ইয়াহয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানকে মুক্ত করার ঘটনাটি উল্লেখ করেন। তিনি উক্ত ঘটনার পাশাপাশি 'আব্বাসার সাথে মেলামেশা ও সন্তান জন্মদানের বিষয়টি বর্ণনা করেন। জাফরের প্রতি খলীফার অগাধ ভালোবাসা অনেকের কাছে হিংসার কারণ হওয়ায় বিভিন্নভাবে তাঁকে অপবাদ দেয়ার চেষ্টা করা হতো। প্রথম দিকে তিনি তাঁর ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর প্রতি তেমন মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে উযীরের এমন আচরণ খলীফাকে তাঁর বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করে। এছাড়াও খলীফার প্রিয় স্ত্রী যুবায়দা জাফরের বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে খলীফার মনে তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করেন। অবশেষে তিনি তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মাসরুর নামক খাদেমকে তা বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশ দেন। মাসরুর অত্যন্ত

কৌশলে তাঁকে খলীফার প্রাসাদে নিয়ে আসে এবং তরবারীর আঘাতে তাঁকে হত্যা করে। এ প্রসঙ্গে জুরজী যায়দান বলেন: [৪৭]

> "বিশেষ দরবার থেকে জাফর যাবার পরই খলীফা মাসরুরকে এই তুর্কি তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দেন। তারপর তাকে কৌশলে ডেকে আনতে বলেন। খলীফা অনেক ভেবেছেন জাফরের ব্যাপারে। এটা অনেক দুঃসাহসী পদক্ষেপ। কারণ তাঁর খিলাফাতের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে বার্মাকীদের অবদান অপরিসীম। আব্বাসীয় খিলাফাত দৃঢ়করণে তাদের অনেক ত্যাগ ও শ্রম রয়েছে। খলীফা এই দীর্ঘ রাত জাগার পরও কোনো খাবার বা পানীয় স্পর্শ করতে পারেননি ভীষন উৎকণ্ঠা আর মানসিক অস্থিরতায়। অস্থিরতা, অনিদ্রা শুধু তাঁর ক্রোধকেই বৃদ্ধি করছে, ক্ষুৎপিপাসা বোধকে নয়।"

জুরজী যায়দান কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

জুরজী যায়দান জাফর বার্মাকীর হত্যার ঘটনা সম্পর্কে উপন্যাসে যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তা থেকে দুটি কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমটি আলুভী সম্প্রদায়ের নেতা ইয়াহয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানকে মুক্ত করার অপরাধ ও অপরটি 'আব্বাসার সাথে মেলামেশা ও সন্তান জন্মদানের অপরাধ। মূলত জাফরকে হত্যা করার পুরো ব্যাপারটিই ছিল আকস্মিক। জাফরের হত্যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হওয়ায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এ হত্যার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় পুরো ঘটনার বিবরণ উপস্থাপনের চেয়ে এ হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করাটা বেশী প্রয়োজন বলে মনে করি। পর্যালোচনার সুবিধার্থে ঐতিহাসিকগণের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ইবনু কাসীর এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি হলো, খলীফা জাফরকে আলুভী সম্প্রদায়ের নেতা ইয়াহয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানকে নিজের ঘরে বন্দী রাখতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ইয়াহয়ার অনুরোধ ও বারংবার মিনতির কারণে জাফর তাঁকে মুক্ত করে দেন। বিষয়টি অবগত হলে খলীফা প্রথমে এ সংবাদ বিশ্বাস করতে পারেননি, কিন্তু পরবর্তীতে জাফর তা স্বীকার করলে খলীফা ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে হত্যা করার শপথ গ্রহণ করেন। আরেকটি কারণ হলো, তিনি বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমনে বের হলে উক্ত এলাকার দামী ও ভালো জমিগুলো জাফরের দখলে দেখতে পান। এছাড়া জাফর প্রচুর অর্থ ব্যয়ে নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ফলে জাফরের এ জাতীয় কর্মকাণ্ড খলীফার উপর নীতিবাচক প্রভাব ফেলে ও তাঁর প্রতি খলীফাকে আরো রাগান্বিত করে তোলে।[৪৮]

জাফরের কর্মকাণ্ড ছাড়াও বার্মাকী সম্প্রদায়ের আচরণ খলীফাকে বেশ চিন্তিত করে তোলে। তাদের প্রতি খলীফার সন্দেহ সৃষ্টি হয় ও সময়ের বিবর্তনে তাদের সাথে খলীফার দূরত্ব তৈরী হয়। ফলে জাফর হত্যার জন্য জাফরের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বার্মাকীদের কর্মকাণ্ড ও আচরণও দায়ী। ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে এ সত্যটি প্রতীয়মান হয়। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

ইবনুল আসীর জাফরের নির্মিত বিলাসবহুল গৃহের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি আরেকটি কারণ বর্ণনা করেন। তা হলো, একদিন ইয়াহয়া বার্মাকী খলীফার বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করে। খলীফা তখন সামনে উপবিষ্ট শাহী চিকিৎসককে বলেন, তোমাদের এলাকায় কি লোকজন অনুমতি ছাড়া ঘরে চলে আসে? একথা শুনে ইয়াহয়া লজ্জিত হন। মূলত এ সময় থেকেই খলীফা বার্মাকীদের উপর ক্ষিপ্ত হতে শুরু করেন।[৪৯]

ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী জাফরের হত্যাকাণ্ডের কারণ বর্ণনার পাশাপাশি বার্মাকীদের পতনের কারণও উল্লেখ করেন। তা হলো ইয়াহয়া বার্মাকী দরবারে প্রবেশ করলে গিলমানরা (কুমারী দাসী) তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতো। বিষয়টি খলীফা অপছন্দ করেন এবং এভাবে সম্মান প্রদর্শন না করার জন্য মাসরুরকে নির্দেশ দেন।[৫০]

বিশিষ্ট গবেষক মুহম্মদ রেজা-ই-করীম মন্তব্য করেন, সম্ভবত আব্বাসীয় দরবারে বার্মাকীদের ইরানী প্রভাব আরব সভাসদবর্গের ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং উহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য তাহারা খলীফাকে কুমন্ত্রণা দিয়াছিল।[৫১]

জুরজী যায়দান তাঁর *তারীখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী* (*History of Islamic Civilization*) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন: খলীফা হারুনুর রশীদ বার্মাকীদের হত্যা করেন আব্বাসীয় সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য, কেননা তিনি আশংকা করেছিলেন তারা হয়তো তাঁর সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিবে। আর এটি একমাত্র রাজনৈতিক প্রয়োজনের কারণে তাঁকে সংঘটিত করতে হয়।[৫২]

ইবনু খালদুন বর্ণনা করেন: প্রশাসনিক ব্যবস্থা বার্মাকীদের হাতে চলে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই খলীফা কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন। এছাড়া বার্মাকীদের বিরোধী পক্ষ তাদের ব্যাপারে খলীফার কান ভারী করতে থাকে। ফলে জাফরের ছোট ছোট দোষও খলীফার চোখে বড় হয়ে দেখা দেয়। এ সমস্ত কারণে খলীফা জাফর ও তার পরিবারের উপর রুষ্ট হন।[৫৩] অন্যত্র তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে বার্মাকীদের পতনের যথার্থ কারণ তাদের অযথা হস্তক্ষেপের মধ্যে নিহিত ছিল।[৫৪]

ইবনুল জাওযী আবু বকর সুলীর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন। সুলী বলেন: খলীফার বোন আলিয়া তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, আপনি কেন জাফরকে হত্যা করেছেন। খলীফা জবাব দিলেন: যদি আমি জানতে পারি যে আমার জামা এই হত্যার কারণ জানে, তাহলে আমি জামাকেও পুড়িয়ে ফেলবো।[৫৫]

ইসলামী গবেষক ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. সাদী দান্নাবী খলীফা হারুনুর রশীদের উপর উত্থাপিত অভিযোগগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তথ্যবহুল বিশ্লেষণের মাধ্যমে আরোপিত অভিযোগগুলো খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। আলোচনার শেষ প্রান্তে তিনি এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন যে, জাফর বার্মাকী কিংবা বার্মাকী সম্প্রদায়ের হত্যাকাণ্ড তাদের সম্পাদিত কর্মের ফল এবং এ শাস্তি তাদের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়নি। তবে কোন অপরাধের কারণে তাদের এ শাস্তি প্রদান করা হয়, তা সুস্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ নেই এবং ইতিহাসও এ ব্যাপারে নিরব ভূমিকা পালন করেছে।[৫৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হলো, জাফর হত্যাকাণ্ড ও বার্মাকীদের পতন সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বক্তব্য অনেকটা ধারণা প্রসূত। ঘটনার ধারাবাহিকতা ও বিভিন্ন যুক্তির আলোকে এ সমস্ত কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে। আলুভী সম্প্রদায়ের নেতা ইয়াহয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানকে মুক্ত করা বা অর্থসম্পদের আধিক্য জাফরের হত্যার কারণ কিনা তা খলীফা হারুনের কোনো বক্তব্যে প্রমাণিত নয়। আবার বার্মাকীদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও অন্যায় হস্তক্ষেপ তাদের পতনের কারণ ছিল, খলীফার এমন কোন বক্তব্য ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ নেই। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে উল্লিখিত বিষয়গুলো খলীফাকে ভাবিয়ে তুলেছিল এবং তাঁর ভাবনা তাঁকে কোনো একটা কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে।

উপন্যাসে ব্যবহৃত উৎস গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

উপন্যাসের উৎস গ্রন্থসমূহ: ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য উপন্যাসটির উৎস গ্রন্থ অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। উৎস গ্রন্থের বর্ণনার বিশুদ্ধতা উপন্যাসে বর্ণিত তথ্যের মূল্যায়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। জুরজী যায়দান তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস *আল 'আব্বাসা* রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, তার একটি তালিকা তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন।[৫৭] উল্লেখিত তালিকায় রয়েছে: আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী: *তারিখুত তাবারী*, ইবনু তিকতাকা: *আল ফাখরিয়্যু ফিল আদাবিস সুলতানিয়া ওয়াদ দুয়ালিল ইসলামিয়্যাহ*, ইবনুল আছীর: *আল কামিল ফিত তারীখ*, আবুল ফিদা: *আল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, আবুল হাসান মাসউদী: *আখবারুয যামান ওয়া আযাইবুল বুলদান*, আবুল ফারাজ ইস্পাহানী: *কিতাবুল আগানী*, ইবনু খাল্লিকান: *ওফায়াতুল আইয়ান*, আহমাদ বিন আবদি রাব্বিহ: *আল 'ইকদুল ফারীদ*, মুহাম্মাদ দিয়াব আল ইতলিদী: *ইলামুন নাস বিমা ওকা'আ লিল বারামিকা মা'আ বানিল 'আব্বাস*, আবুল হাসান মাসউদী: *মুরুজুজ জাহাব*, মুহাম্মাদ বিন শাকির আল কুতুবী: *ফাওয়াতুল ওফায়াত*, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল মাক্কারী: *নাফহুত তীব মিন গুসনিল আন্দালুস আর রাতীব*, আবু নুয়াস: *দীওয়ানু আবি নুয়াস*, আবু বকর আত তুরতুশী: *সিরাজুল মুলক*, মুহসিন বিন আলী আত তুনুখী: *আল ফারজ বাদাশ শিদ্দাহ*।

উৎস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যের বিশুদ্ধতা: জুরজী যায়দান তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস *আল 'আব্বাসা* রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন এবং ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো চিত্রায়নের জন্য সে সমস্ত উৎস গ্রন্থসমূহ থেকে বিভিন্ন তথ্য পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য উৎস গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে *তারীখুত তাবারী*, *আল*

আগানী ও *তারীখু ইতলিদী* গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। ইতিহাসের বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য কতটুকু যথার্থ ও মৌলিক তা নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

তারীখুত তাবারী: আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনু জারীর তাবারী একজন প্রথম সারির অন্যতম ঐতিহাসিক। তার রচিত ইতিহাসগ্রন্থটিও আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। তবে তাবারীর সব বর্ণনাই নির্ভুল কিংবা গ্রহণযোগ্য, বিষয়টা এমন নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি লোকমুখে শ্রুত ও প্রচলিত অনেক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যার কোনো ভিত্তি নেই। এসব বর্ণনা তিনি উল্লেখ করেছেন অন্যান্য বর্ণনার পাশাপাশি, তবে এগুলোর কোনো একটিকে তিনি প্রাধান্য প্রদান করেননি। শুধু তাবারী একা নন, ঐতিহাসিকদের অনেকেই এমন কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা এনেছেন, যেগুলোর দ্বারা পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে অনেক ভিত্তিহীন গল্প। কাযী ইয়াহয়া ইবনু আকসামের মদপান, মামুনের প্রেমের গল্প, এসব এমনই ভিত্তিহীন গল্পের অংশ। ইবনু খালদুন এ ব্যাপারে বলেন, ঐতিহাসিকদের অনেকেই কল্পিত বর্ণনা ও মিথ্যা কাহিনীর সংযোজন করেছেন। পরবর্তীতে অনেকেই এগুলো অক্ষুন্ন রেখেছেন এবং এই অতিরঞ্জিত বিবরণই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এখানে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়নি বা বিচার বিশ্লেষণ করে ঘটনাবলীকে কলুষমুক্ত করার চেষ্টাও করা হয়নি।[৫৮]

কিতাবুল আগানী: *কিতাবুল আগানী* আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অত্যন্ত সুপরিচিত একটি গ্রন্থ। আল আগানী গ্রন্থের লেখক আবুল ফারাজ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মন্তব্য পাওয়া যায়। ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন: তিনি তাঁর গ্রন্থে পাপাচার উসকে দিয়েছেন। মদপানকে হালকা করে দেখিয়েছেন। যে কেউই গভীরভাবে তাঁর গ্রন্থ (*কিতাবুল আগানী*) পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে শুধু নিন্দা ও খারাপ কাজের বর্ণনাই পাবে।[৫৯] খতীব আল বাগদাদী বর্ণনা করেন: আবু মুহাম্মদ হাসান বিন হাসান নুবাখতি বলে বেড়াতেন যে, আবুল ফারাজ ইস্পাহানী একজন মিথ্যুক। তিনি প্রায় কাগজ ও বইয়ের বাজারে গমন করতেন এবং সেখান থেকে বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ ক্রয় করতেন। অত:পর সেগুলোকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এসে সেগুলোর বর্ণনা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করতেন।[৬০] ইমাম যাহাবী বর্ণনা করেন: *কিতাবুল আগানী* গ্রন্থের প্রণেতা আবুল ফারাজ ইস্পাহানী একজন শিয়া মতালম্বী। উমাইয়া আমলের এটি একটি বিরল ঘটনা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং বিভিন্ন কবিতা, গান ও আলোচনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁর সহায়তা গ্রহণ করা হয়। তবে তিনি তাঁর গ্রন্থে আজব আজব সব ঘটনা বর্ণনা করেন।[৬১] ইমাম যাহাবীর ন্যায় ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেন। তবে তিনি আরেকটু সংযোজন করে বলেন: তিনি এমন সব বক্তব্য উপস্থাপন করেন যেগুলো সম্পর্কে তাঁকে মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ দেয়া হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য সত্য হয়ে থাকে।[৬২]

মূলত *কিতাবুল আগানী* সাহিত্য ও সঙ্গীতের একটি মৌলিক গ্রন্থ। লেখক সেখানে সাহিত্য ও সঙ্গীতের পাশাপাশি আরবদের জীবনাচার ও তাদের ইতিহাস উল্লেখ করেন এবং ইতিহাসের অনেক তথ্য গ্রন্থটিতে সংযোজন করেন। তবে একথা সত্য যে গ্রন্থটি সাহিত্য ও সঙ্গীতের মৌলিক জ্ঞানকোষ হিসেবে বিবেচিত হলেও ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেকটা সমালোচিত।

ইলামুন নাস বিমা ওকা'আ লিল বারামিকা মা'আ বানিল 'আব্বাস: গ্রন্থটির রচয়িতা মুহাম্মাদ দিয়াব আল ইতলিদী, যিনি একজন সতেরো শতকের ঐতিহাসিক ও গল্প লেখক। *ইলামুন নাস বিমা ওকা'আ লিল বারামিকা মা'আ বানিল 'আব্বাস* গ্রন্থটি তাঁর বিখ্যাত একটি রচনা। এ গ্রন্থে তিনি উমাইয়া শাসকসহ আব্বাসীয় শাসকদের বিভিন্ন ইতিহাস তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি বার্মাকীদের উত্থান, তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ও গৌরবময় কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করেন। তিনি গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত করেন ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি উক্ত গ্রন্থে এমন কিছু ঘটনা ও গল্পের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, যেগুলোর সত্যতার ব্যাপারে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক মাশহুর বিন হাসান তাঁর *কুতুবুন হাজ্জারা মিনহাল 'উলামা* নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৬৩]

ইতলিদী তাঁর গ্রন্থে খলীফা হারুনুর রশীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও নানা ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি সেখানে 'আব্বাসা ও জাফরের সম্পর্কের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। জুরজী যায়দান এসব তথ্যের সহায়তায় তাঁর উপন্যাস রচনা করেন। এখানে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হলো হারুনুর রশীদের যুগ ও ইতলিদীর সময়ের মাঝে প্রায় নয়শত বছরের ব্যবধান। এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এছাড়া তিনি

যে সব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। বিশেষত 'আব্বাসা ও জাফর সম্পর্কে যে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য অনেক ঐতিহাসিকের নিকট মিথ্যা ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। যেমন খতীব আল বাগদাদী বলেন: 'আব্বাসা ও জাফরের প্রেম সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, সেগুলো ইতিহাসের বক্তব্য নয়।[৬৪]

উপসংহার

হারুনুর রশীদ ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় বংশের একজন শ্রেষ্ঠ খলীফা হিসেবে বিবেচিত। তাঁর খিলাফাতকালে সবচেয়ে আলোচিত ও বিস্ময়কর ঘটনা হলো খলীফা কর্তৃক জাফর বার্মকীর হত্যাকাণ্ড ও বার্মাকীদের পতন। বার্মাকীরা আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং সাম্রাজ্য পরিচালনায় বেশ প্রভাব বিস্তার করে। ঔপন্যাসিক জুরজী যায়দান প্রকৃত ইতিহাসের সাথে খলীফা হারুনুর রশীদের বোন 'আব্বাসা ও উযীর জাফর বার্মাকীর প্রেম কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইতিহাস ও উপন্যাসকে সুপাঠ্য করে তোলেন। তবে তাঁর রচিত *আল 'আব্বাসা* উপন্যাসটির বর্ণনা ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনার মাঝে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসটিতে খলীফা হারুনুর রশীদের চরিত্র, 'আব্বাসার প্রেম ও বিয়ের কাহিনী, জাফর বার্মাকীর হত্যার কারণ সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত তথ্য ও চিত্র উপস্থাপন করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের আলোকে অনেকটাই সমালোচিত। নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হলো, 'আব্বাসা ও জাফর সংক্রান্ত ঘটনাটি কল্পনা প্রসূত একটি বিষয়। এটি খলীফা হারুনুর রশীদ ও তাঁর পরিবারের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সাজানো হয়। আরো প্রতীয়মান হয় যে, এটি পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বর্ণিত একটি গল্প যার মাধ্যমে হাশেমী বংশের খলীফা থেকে বার্মাকীদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।[৬৫] মূলত বার্মাকীদের হত্যার কারণে খলীফা হারুনুর রশীদ পারসিকদের রোষাণলে পতিত হন। ফলে পরবর্তীতে পারসিকদের প্রভাবে প্রভাবিত কিছু কিছু ঐতিহাসিক বার্মাকীদের হত্যার কারণকে 'আব্বাসার সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে খলীফার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করার চেষ্টা করে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, খলীফা হারুনুর রশীদ এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে তাঁর ব্যাপারে এ সমস্ত অপবাদ আরোপ করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। জুরজী যায়দান তাঁর *আল 'আব্বাসা* উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে বার্মাকী সমর্থিত ঐতিহাসিক বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কাল্পনিক চরিত্র চিত্রায়নের ক্ষেত্রে লেখকের পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকলেও ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রায়নের ক্ষেত্রে এমনটি নয়। ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রায়নের ক্ষেত্রে পাঠকের সামনে প্রকৃত ইতিহাস উপস্থাপন করাটাই একজন লেখকের স্বার্থকতা।

টীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১. আহমাদ ইসকানদারী ও অন্যান্য, *আল মুফাস্সাল ফী তারিখিল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: ইহ্ইয়াউল উলূম, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৬১৯; মুহাম্মাদ ইউসুফ কাউকান, *আ'লামুন নাসর ওয়াশ্ শি'র ফিল আসরিল 'আরাবী আল হাদীস* (মাদ্রাজ: হাফিযা হাউস, ১৯৮০ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫।

২ মুহাম্মাদ আব্দুল গনী হাসান, *জুরজী যায়দান* (কায়রো: আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ, সং. বি, ১৯৭০ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৭।

৩ J. A. Haywood, *Modern Arabic Literature* (London: Lund Humphries, 1971), p. 133.

৪. মুহাম্মাদ আব্দুল গনী হাসান, *জুরজী যায়দান*, পৃষ্ঠা: ৭।

৫ দ্রষ্টব্য: জুরজী যায়দান, *আল 'আব্বাসা: উখতুর রশীদ*, কায়রো: মুআসসাসাতু হিন্দাবী, প্রথম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.।

৬ মাহমূদ শাকির, *আত তারিখুল ইসলামী* (আল মাকতাবুল ইসলামী, অষ্টম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৬।

৭ ইবনু কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরুত: মাকতাবাতুল মাআরিফ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.), ১৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬১।

৮. মাহমূদ শাকির, *আত তারিখুল ইসলামী*, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৬; আহমাদ বিন ইয়াহয়া আল বালাজারী, *আনসাবুল আশরাফ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৩।

৯ আহমাদ আমীন, *হারুনুর রশীদ* (কায়রো: মুআসসাসাতু হিন্দাবী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৯; মাহমূদ শাকির, *আত তারিখুল ইসলামী*, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫১।

১০. ড. শাওকী আবু খলীল, হারুনুর রশীদ (দামেস্ক: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১৫।

১১. *https://en.wikipedia.org/wiki/Harun_al-Rashid* (লগইন তারিখ: ২০-০১-২০২১)

১২ জুরজী যায়দান, ‘*আব্বাসা*, অনুবাদ: তাসনীম আলম (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৩ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৩২।

১৩ *তদেব*, পৃষ্ঠা: ২০২।

১৪. *তদেব*, পৃষ্ঠা: ১৫১।

১৫ খলীফা হারুনুর রশীদের ব্যাপারে ইসলাম বিদ্বেষী পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মানসুর আব্দুল হাকিম বলেন:

أحاط هارون الرشيد نفسه بكبار العلماء والقادة في عصره، ولكن أعداء الإسلام أشاعوا عنه أن مجلسه كان مجلس أنس وغناء وطرب ولهو وخمر. فإذا ذكر هارون ذكرت الليالي الحمراء والجواري والغلمان تحيط به.

দ্রষ্টব্য: মানসুর আব্দুল হাকিম, *হারুনুর রশীদ: আল খলীফাতুল মুফতারা আলাইহি* (দামেস্ক: দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, প্রথম সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৭।

১৬ মাশহুর বিন হাসান, *কুতুবুন হাজ্জারা মিনহাল ‘উলামা* (রিয়াদ: দারুল সুমাই‘য়ী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৩।

১৭ বুতরুস বুসতানী তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা করেন:

وعاشت العباسة خمسين سنة، وتوفيت سنة 210 وقيل 209 هجرية، وصلى عليها المأمون ابن أخيها، وقيل كان سبب وفاتها، أن المأمون ضمها إليه وجعل يقبل رأسها وكان وجهها مغطى، فشرقت من ذلك وسعلت، ثم حمت أياما يسيرة وماتت.

দ্রষ্টব্য: বুতরুস বুসতানী, *দায়িরাতুল মা‘আরিফ* (বৈরুত: মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯০০ খ্রি.), ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮৮।

১৮. ইবনু খালদুন, *আল মুকাদ্দিমা* (দামেস্ক: দারু ইয়ারাব, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০২।

১৯ শাওকী আবু খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মীযান* (দামেস্ক: দারুল ফিকর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১৬৬।

২০. নাবীজ: নাবীজ (نبيذ) আরবী শব্দ, অর্থ আঙ্গুরের রস। নাবীজ এর আভিধানিক সংজ্ঞা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়:

الماء الذي **ينبذ** فيه التمر أو الزبيب أو نحوهما ما لم ينقلب إلى مسكر ، فإذا صار مسكرا فهو خمر.

নাবীজ ঐ পানীয়কে বলা হয় যার মধ্যে খেজুর, আঙ্গুর বা এ জাতীয় দ্রবাদি ভিজিয়ে রাখা হয়। তবে শর্ত হলো নেশার উপকরণ হিসেবে যেন রূপান্তরিত না হয়, কেননা যদি নেশার উপকরণে রূপান্তরিত হয় তাহলে সেটা মদ হিসেবে গণ্য হবে।

দ্রষ্টব্য: *https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ النَّبِيذُ-نَبِيذٌ* (লগইন তারিখ: ২২-০১-২০২১)

২১. নাবীজ পান করার ব্যাপারে ইসলামী গবেষক ও পণ্ডিতদের মন্তব্য নিম্নরূপ:

وأما النبيذ فهو الذي يؤخذ من ماء الزبيب إذا طبخ أو في طبخ يحل شربه ما دام حلوا، فإذا غلا واشتد وقذف بالزبد يحل شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

দ্রষ্টব্য: আহমাদ কাত্তান ও মুহাম্মাদ তাহির যাইন, *হারুনুর রশীদ: আল খলীফাতুল মাযলুম* (আলেকজান্দ্রিয়া-মিসর: দারুল ঈমান, সং. বি, ২০০১ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ২১৮।

২২ *তদেব*, পৃষ্ঠা: ২১৯।

২৩ শাওকী আবু খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মীযান*, পৃষ্ঠা: ১৬৬।

২৪. আহমাদ কাত্তান ও মুহাম্মাদ তাহির যাইন, *হারুনুর রশীদ: আল খলীফাতুল মাযলুম*, পৃষ্ঠা: ২২৪।

২৫ *তদেব*, পৃষ্ঠা: ২২৩।

২৬ শাওকী আবু খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মীযান*, পৃষ্ঠা: ১৬৫।

২৭ ইবনু হাযাম আল আন্দালুসী, *জামহারাতু আনসাবিল ‘আরাব* (কায়রো: দারুল মা‘আরিফ, পঞ্চম সংস্করণ, তা. বি), পৃষ্ঠা: ২২; ইবনু কুতাইবা দিনাওয়ারী, *আল মা‘আরিফ* (কায়রো: দারুল মা‘আরিফ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৩৮০।

২৮. মানসুর আব্দুল হাকিম, *হারুনুর রশীদ: আল খলীফাতুল মুফতারা 'আলাইহি*, পৃষ্ঠা: ৬৮।

২৯. আহমাদ বিন ইয়াহয়া আল বালাজারী, *আনসাবুল আশরাফ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭২।

৩০. *https://en.wikipedia.org/wiki/Abbasa_bint_al-Mahdi* (লগইন তারিখ: ২৪-০১-২০২১)

৩১. ইবনু হাযাম আল আন্দালুসী, *জামহারাতু আনসাবিল 'আরাব*, পৃষ্ঠা: ২২।

৩২. ইবনু জারীর তাবারী, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৭।

৩৩. আহমাদ বিন ইয়াহয়া আল বালাজারী, *আনসাবুল আশরাফ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৭৪।

৩৪. আব্দুস সালাম তিরমানিনী, *আযমিনাতুত তারীখিল ইসলামী*, (কুয়েত: আল মাজলিসুল ওয়াতানী লিস সিকাফাহ ওয়াল ফুনুন ওয়াল আদাব, সং. বি. ১৯৮২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৪; মানসুর আব্দুল হাকিম, *হারুনুর রশীদ: আল খলীফাতুল মুফতারা 'আলাইহি*, পৃষ্ঠা: ৭২।

৩৫. *https://en.wikipedia.org/wiki/Abbasa_bint_al-Mahdi* (লগইন তারিখ: ২৪-০১-২০২১)

৩৬. উমার রিযা কাহ্হালা, *আ'লামুন নিছা ফী আ'লামাইল 'আরাব ওয়াল ইসলাম* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, সং. বি, তা. বি.), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৪।

৩৭. জুরজী যায়দান, *'আব্বাসা*, অনুবাদ: তাসনীম আলম, পৃষ্ঠা: ৩৪।

৩৮. তারীখুত তাবারী গ্রন্থে বর্ণিত বিবরণ নিম্নরুপ:

وقد حدثني أحمد بن زهير أحسبه عن عمه زاهر بن حرب أن سبب هلاك جعفر والبرامكة أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدي، وكان يحضرهما إذا جلس للشرب. وذلك بعد أن أعلم جعفرا قلة صبره عنه وعنها وقال لجعفر: أزوجكما ليحل لك النظر إليها إذا أخضرتها مجلسي. وتقدم إليه ألا يمسها ولا يكون منه شيئ مما يكون للرجل إلى زوجته، فزوجها منه على ذلك. فكان يحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب. ثم يقوم عن مجلسه ويخليهما فيثملان من الشراب وهما شابان. فيقوم إليها جعفر فيجامعها، فحملت منه وولدت غلاما. فخافت على نفسها من الرشيد إن علم بذلك. فوجهت بالمولود مع حواضن له من مماليكها إلى مكة، فلم يزل الأمر مستورا عن هارون حتى وقع بين عباسة وبين جواريها شر. فأنهت أمرها وأمر الصبي إلى الرشيد وأخبرته بمكانه ومع من هو من جواريها وما معه من الحلى الذي كانت زينته به أمه. فلما حج هارون هذه الحجة أرسل إلى الموضع الذي كانت الجارية أخبرته أن الصبي به من يأتيه بالصبي وبمن معه من حواضنه. فلما أحضروا سأل اللواتي معهن الصبي فأخبرنه بمثل القصة التي أخبرته بها الرافعة على عباسة. فأراد (فيما زعم) قتل الصبي ثم تحوب من ذلك.

দ্রষ্টব্য: ইবনু জারীর তাবারী, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৪।

৩৯. আবুল হাসান মাসউদী, *মুরুজুজ জাহাব*, (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৯-৩১২।

৪০. ইবনু খালদুন, *আল মুকাদ্দিমা*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০০।

৪১. এ প্রসঙ্গে মানসুর আব্দুল হাকিম শায়েখ আহমাদ কাত্তানের যুক্তি উপস্থাপন করেন:

أما من ناحية العقل فإن رواية الطبري لا تصدق لأنه ذكر أن الرشيد لا يصبر على فراقها، وهذا حق وصحيح. ولا يصبر على فراق جعفر البرمكي. ويذكر كذلك أنها حملت من جعفر وولدت صبيا أرسلته إلى مكة. ومقتضى كلامه أن تداوم على مجالسة الرشيد ومنادمته مع جعفر، فكيف لم يلحظ كبر بطنها وزيادة حجمه بسبب الحمل ولفترتين متتاليتين؟

দ্রষ্টব্য: মানসুর আব্দুল হাকিম, *হারুনুর রশীদ: আল খলীফাতুল মুফতারা 'আলাইহি*, পৃষ্ঠা: ৭৩।

৪২. ইবনু কুতাইবা দিনাওয়ারী, *আল মা'আরিফ*, পৃষ্ঠা: ৩৮০।

৪৩. আহমাদ কাত্তান ও মুহাম্মাদ তাহির যাইন, *হারুনুর রশীদ: আল খলীফাতুল মাযলুম*, পৃষ্ঠা: ২১৩-২১৪।

৪৪. *https://en.wikipedia.org/wiki/Jafar_ibn_Yahya* (লগইন তারিখ: ২৫-০১-২০২১)

৪৫. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা* (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১১তম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৬১।

৪৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জাহশায়ারী, *কিতাবুল উযারা ওয়াল কুত্তাব* (বৈরুত: দারুল ফিকরিল হাদিস, সং. বি. ১৯৮৮ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫১; ড. হানী আবু রব, *আল বারামাকাহ ওয়া দাওরুহুম ফিল হায়াতিল আম্মাহ ফিদ দাউলাতিল 'আব্বাসিয়্যাহ কাবলা নাকবাতিহিম*, (ফিলিস্তিন: মুজাল্লাতু জামিয়াতুল কুদস আল মাফতুহা লিল আবহাস ওয়াদ দিরাসাত, সংখ্যা: ৩০, ১ম খণ্ড, জুন-২০১৩ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ২২৮-২৩০।

---

৪৭. জুরজী যায়দান, *'আব্বাসা*, অনুবাদঃ তাসনীম আলম, পৃষ্ঠাঃ ২২৩।
৪৮. ইবনু কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৮৯-১৯১।
৪৯. ইবনুল আসীর জাযারী, *আল কামিল ফিত তারিখ* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩২৭-৩৩০।
৫০. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.), ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২২-২৭।
৫১. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃষ্ঠাঃ ২২৭।
৫২. জুরজী যায়দান, *তারীখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী* (কায়রোঃ মুআসসাসাতু হিন্দাবী, প্রথম সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৭৭।
৫৩. ইবনু খালদুন, *আল 'ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খাবার* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, সং. বি. ২০০০ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২৭৯।
৫৪. ইবনু খালদুন, *আল মুকাদ্দিমা*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৯৫।
৫৫. ইবনুল জাওযী, *আল মুন্তাজাম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১২৬-১৩৩।
৫৬. ড. সাদী দান্নাবী, *মাউসুআতু হারুনুর রশীদ* (বৈরুতঃ দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৭০৩।
৫৭. জুরজী যায়দান, *আল 'আব্বাসাঃ উখতুর রশীদ*, পৃষ্ঠাঃ ১১।
৫৮. ইবনু খালদুন, *আল মুকাদ্দিমা*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১১৫।
৫৯. ইবনুল জাওযী, *আল মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম*, ১৪ তম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৮৫।
৬০. খতীব আল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদী* (বৈরুতঃ দারুল গারব আল ইসলামী, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), ১৩ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৯-৩৪০।
৬১. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ যাহাবী, *মিযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা, প্রথম সংস্করণ, তা. বি.), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১২৪।
৬২. ইবনু হাজার আসকালানী, *লিসানুল মীযান* (বৈরুতঃ মাকতাবাতুল মাতবুআতুল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৫২৬।
৬৩. মাশহুর বিন হাসান, *কুতুবুন হাজ্জারা মিনহাল উলামা*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৭২।
৬৪. শাওকী আবু খলীল, *জুরজী যায়দান ফিল মীযান*, পৃষ্ঠাঃ ১৬৬।
৬৫. আহমাদ কাত্তান ও মুহাম্মাদ তাহির যাইন, *হারুনুর রশীদঃ আল খলীফাতুল মাযলুম*, পৃষ্ঠাঃ ২১৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

কবি আশ শানফারার জীবনী ও তাঁর কাব্য প্রতিভা

ড. মুহা. বিলাল হুসাইন*

Abstract: Bedouin poet As Shanfara was a great poet in the Jahili era. His memory was astonishing. Despite being a member of the band of robbers, he gained a reputation for his poetry. He is best known for his poem "Lamiyatul Arab". An authentic image of individual life is beautifully reflected in his poems. Moreover, various patterns of Arab culture are found in his poems, including descriptions of mountains, waterfalls, ghosts, desert nights, forests and camels. This article focuses on a short biography of the poet and his poetic genius.

ভূমিকা

জাহিলী যুগে একদল দৌড়বিদ দস্যুকবির আবির্ভাব ঘটেছিল, শানফারা ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি তৎকালীন যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইয়ামানের বানূ আয্দ গোত্রে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়ায় কাব্যচর্চায় তিনি অতি দ্রুত পরিচিতি লাভ করেন। 'লামিয়্যাতুল আরব' কাব্য সংকলন তাঁকে গোটা আরবভূমিতে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। তাঁর এই কাব্যটিতে মরু আরবের নিখুঁত চিত্র অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া ভূত-প্রেত, নির্ভীক আত্মা, শাণিত তরবারী, পর্বত, ঝর্ণা, মরু প্রান্তরের দৃশ্য, তীর ধনুক, বাহন উষ্ট্রী, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতির বর্ণনাসহ আরব সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শনও বিলাসী জীবন বিমুখ মরুচারী শানফারার কবিতায় সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। নিম্নে আশ শানফারার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর কাব্য প্রতিভার উপর আলোকপাত করা হলো:

নাম ও বংশ পরিচয়

কবির প্রকৃত নাম ছাবিত ইবন 'আউস আল-'আযদী। আর উপাধী হলো 'শানফারা'। মোটা অধরবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁকে এ নামে অভিহিত করা হয়।[১] প্রখ্যাত সাহিত্যিক শাওকী দায়ফ (১৯১০-২০০৫) ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী (১৬২০-১৬৮২) কবির প্রকৃত নাম শানফারা বলে উল্লেখ করেছেন।[২] কবির ঘনিষ্ট দোসর তা'আব্বাতা শাররান এর নাম ছিল ছাবিত। ছাবিতের সাথে কবির অতিরিক্ত সখ্যতার কারণে কোন কোন ঐতিহাসিক ও গবেষক ভুলবশত: দু'জনকে একই ব্যক্তি মনে করতেন। জাহিলী যুগে যে কয়জন দৌড়বিদ দস্যু কবির জন্ম হয়েছিল, শানফারা ছিলেন তাদের অন্যতম।[৩] দস্যু, চৌর্যবৃত্তি ও লুণ্ঠন কর্মে শানফারার ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন কবি তা'আব্বাতা শাররান। সম্পর্কে তারা মামা-ভাগ্নে ছিলেন। শানফারার বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ: ছাবিত ইবন 'আউস ইবন হুজর আল আয্দী আল ইয়ামানী।[৪]

জন্ম ও শৈশব

কাহতানী বংশের দস্যুকবি শানফারা ইয়ামানের বানূ আয্দ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সন ও স্থান সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর বয়স ঘনিষ্ট সহযোগী তা'আব্বাতা শাররান এর চেয়ে বেশী ছিল এবং তাঁর আগেই মৃত্যুবরণ করেন। বন্ধুর মৃত্যুতে কবি তা'আব্বাতা শাররান অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েন এবং তাঁর স্মরণে শোকগাঁথা রচনা করেন।[৫]

কবি গোত্রের সাথে জন্মগ্রহণ করলেও বানূ ফাহ্ম গোত্রের বৈরী সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন ধরে। ফলে বানূ ফাহ্ম গোত্রের শাখাগোত্র বানূ সালামান গোত্র বানূ আযদ গোত্রের কিছু লোককে বন্দী করে নিয়ে আসে। তন্মধ্যে আশ শানফারা, তাঁর মাতা ও এক ভাইও ছিল। বানূ সালামান গোত্রের জনৈক এক ব্যক্তি শানফারাকে মুক্ত করে তাকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন থেকে তিনি নিজেকে এই পরিবারের একজন ভাবতে শুরু করেন। একদিন তাঁর প্রতিপালকের

---

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কন্যাকে বোন সম্বোধন করে পানি ঢেলে গোসল করিয়ে দেয়ার আবেদন করেন। এতে উক্ত বোন রাগান্বিত হয়ে শানফারাকে ভাই বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁর উপর চড়াও হন। কবি সত্য ঘটনা জানার জন্য তাঁর তত্ত্বাবধায়কের কাছে নিবেদন করেন। তিনি প্রকৃত সত্য তাকে জানালে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ফেটে পড়লেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, বানূ সালামান গোত্রের একশত লোককে হত্যা না করে শান্ত হবেন না। এরপর থেকে সুযোগ বুঝে বানূ সালামান গোত্রের লোকদের হত্যা করতে শুরু করলেন এবং একশত লোককে হত্যা করে তাঁর মিশন সমাপ্ত করেন।[৬]

তিনি তাঁর মিশন সফলভাবে সমাপ্ত করে কবিতার মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন এভাবে-

جَزَيْنَا سَلاَمَانَ بْنَ مُفْرِجَ قَرْضَهَا ☼ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمُ وَأَزَلَّتِ

وهُنِّئَ بى قَوْمٌ وَمَا إِنْ هَنَأْتُهُمْ ☼ وأَصْبَحْتُ فِيْ قَوْمٍ وَلَيْسُوْا **بِمَنْبِتِىْ**

شَفَيْنَا **بِعَبْدِ** اللّهِ بَعْضَ غَلِيْلِنَا ☼ وَعَوْفٍ لَدَى الْمَعْدَى أَوَانَ اسْتَهَلَّتَ

وَإِنِّى لَحُلُوٌ إنْ أُرِيْدَتْ حَلاوَتِىْ ☼ ومُرٌّ إذَا نَفْسُ الْعَزُوْفِ اسْتَمَرَّتِ[৭]

[সালামান গোত্রের কৃতকর্মের প্রতিদান আমি তাদেরকে দিয়ে দিয়েছি।

আমাকে স্বাগত জানাল এমন এক গোত্র যাদেরকে আমি সাদরে গ্রহণ করতে পারলাম না। আর আমি হয়ে গেলাম ঐ গোত্রভূক্ত যারা আদৌ আমার উৎসমূল নয়।

রণাঙ্গনে যুদ্ধ মহূর্তে আমি সালামান গোত্রের ‘আব্দুল্লাহ ও ‘আউফকে নিহত করে আমার হত্যা তৃষ্ণা কিছুটা নিবৃত্ত করেছি।

যদি আমার থেকে মিষ্টতা প্রত্যাশা করা হয় তবে আমি মিষ্টি। আর যদি আমার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আচরণ অব্যাহত রাখা হয় তবে আমি তিক্ত।]

যৌবনে পদার্পণ ও দস্যুবৃত্ত জীবন

যৌবনের উন্মাদনা তার জীবনটা এলোমেলো করে দেয়। এ জীবনের পুরো সময়টা নানা অপরাধমূলক ঘটনায় পরিপূর্ণ। দস্যুবৃত্তির জন্য তিনি তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা তা’আব্বাতা শাররান এর বাহিনীতে যোগ দেন।[৮] তাদের এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল অনেক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সুলায়ক ইবন সালাকা, ’উসাইদ ইবন জাবির, উরওয়া ইবনুল ওয়ারদ, ‘আমর ইবন বাররাকা প্রমুখ।[৯] লুণ্ঠন কর্মে শানফারার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলো তা’আব্বাতা শাররান। তাঁরা মরু প্রান্তর, দুর্গম উপত্যকা, নির্জন গিরিগুহা ও ঘন অরণ্যে বসবাস করে বাণিজ্য কাফেলা ও পথিকদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[১০] তাঁর বেপরোয়া আচরণে উত্ত্যক্ত হয়ে তাঁর গোত্র তাঁকে ত্যাগ করে। স্বগোত্র ত্যাগের সময় তিনি বলেছিলেন-

لاَ تَقْبُرُوْنِى إِنَّ قَبْرِىْ مُحَرَّمٌ ☼ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ اَبْشِرِيْ أُمَّ عَامِرِ

إِذَا احْتَمَلُوْا رَأْسِيْ وَفِى الرَّأْسَ أَكْثِرْىْ ☼ وَغُوْدِرَ عِنْدَ الْمُلْتَقَى ثُمَّ سَائِرِىْ

هُنَالِكَ لاَ أَرْجُوْ حَيَاةً تَسُرُّنِيْ ☼ سَجِيْسُ اللَّيَالِىْ مُبْسِلاً بالْجَرَائِرِ[১১]

[আমাকে তোমরা কবর দিও না, তোমাদের কোন অধিকার নেই আমাকে কবর দেওয়ার; বরং হে হায়নার দল, তোমরা আমার মৃত্যুতে আনন্দ করবে।

শত্রুরা আমার দেহের সেরা অংশ মস্তকটি আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবে আর বাকীটুকু তোমাদের জন্য ফেলে দিয়ে যাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে।

কারণ আমি আমার গোত্রের মাথায় বিপদের বোঝা তুলে দিয়ে সুখে জীবন যাপন করতে চাই না।]

প্রাচীন আরবের মধ্যে কবি শানফারা ছিলেন সবচেয়ে ক্ষীপ্রগতি সম্পন্ন পুরুষ। উষ্ট্রীর গতির চেয়েও তাঁর গতি ছিল তীব্রতর। দৌড়ের ক্ষেত্রে দ্রুতগামী ঘোড়াও তাঁর নাগাল পেত না। প্রাচীন আরবে তিনি দ্রুতগামী মানব হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবী ভাষায় এরকম একটি প্রবাদ রয়েছে- أعدى من الشنفرى (শানফারার চেয়েও গতি সম্পন্ন)।[১২]

কবি শানফারার জীবন নানা অপরাধমূলক বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। সুযোগ বুঝে তিনি বিভিন্ন মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠন করতেন। আবার কখনো নিভৃত কোন গ্রামে আক্রমন পরিচালনা করে তাদের সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আসতেন। তাদের আক্রমন থেকে বৃদ্ধ, নারী ও শিশু কেউই রেহাই পেত না। যেসব অপকর্মের কথা নির্দ্ধিধায় তার স্বরচিত কবিতা 'লামিয়্যাতুল আরবে' স্ববিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[১৩] তিনি বলেন-

فَأَيَّمْتُ نَسْوَانًا وَأَيْتَمْتُ إِلْدَةً — وَعُدْتُ كَمَا أَبْدَأْتُ وَاللَّيْلُ أَلْيَلُ.[১৪]

[আমি বহু নারীকে বিধবা করেছি এবং বহু শিশুকে অনাথ করেছি। আর আমি যেরূপ যাত্রা করেছি সেরূপেই ফিরে এসেছি; অথচ রাত তখনো অন্ধকার।]

মৃত্যু

জীবনের উন্মাদনায় বানূ সালামান গোত্রের লোকদের হত্যার নেশায় সদা ব্যস্ত সময় পার করেন। একে একে উক্ত গোত্রের ৯৮জন লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। কবির এহেন আচরণে বানূ সালামান গোত্রের বুদ্ধিদীপ্ত লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তারা কবিকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শানফারার কৌশলের কাছে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।[১৫] অবশেষে তৎকালীন আরবের আরেক গতিসম্পন্ন ব্যক্তি উসাইদ ইবন জাবিরকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। একদিন কবি এক সংকীর্ণ গিরি উপত্যকায় পানি পান করার জন্য উপস্থিত হলে উসাইদ স্বদলবলে তাঁর উপর আক্রমণ করে। উক্ত আক্রমণে কবির একটি হাত আহত হয়ে স্বীয় দেহ হতে পৃথক হয়ে যায়। শানফারা নিজ দেহের বিচ্ছিন্ন হাত দিয়ে আঘাত করে বানূ সালামানের আরো একজনকে হত্যা করে ৯৯ সংখ্যা পূর্ণ করেন।[১৬] অবশেষে উসাইদের হাতে তিনি বন্দি হন। বানূ সালামান গোত্রের লোকেরা কবিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে মরু প্রান্তে রেখে আসে। উক্ত গোত্রের কোন এক ব্যক্তি পথ অতিক্রম করার সময় ক্রোধবশত: কবির লাশের মাথার অংশে লাথি মারলে মাথার হাড় পায়ে বিদ্ধ করে। পরবর্তীতে লোকটি মারা যায়। এভাবে কবির ১০০ ব্যক্তিকে হত্যার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়।[১৭]

কাব্য প্রতিভা

কবি শানফারা তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। দস্যুবৃত্তিদলের সকল সদস্য কবি ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তবে শানফারার কাব্য প্রতিভা ছিল অন্যান্য সদস্যের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁর কাব্য কীর্তি কালের করাল গ্রাস হতে মুক্ত হয়ে আমাদের হাতে সম্পূর্ণ পৌঁছেনি। তথাপিও নানা সংকলন গ্রন্থ হতে ও অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত তাঁর কিছু কবিতারাজি একত্রিত করে একটি দীওয়ান আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।[১৮] দীওয়ানুল হামাসাহ, আল-মুফাদদালিয়াত, খাযানাতুল আদাব ও কিতাবুল আগানীতে উল্লিখিত কবির কবিতামালাকে নিয়ে ১১৯ পৃষ্ঠার একটি দীওয়ান সংকলিত হয়। যা মিসরের লাজনাহ আত তা'লীফ ওয়া আত তারজামাহ ওয়া আন নাশর হতে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া S. De. Sacy ফরাসী ভাষায়, Reuss জার্মান ভাষায় এর অনুবাদ করেছেন। Rcuss এর অনুবাদটি ১৮৫৩ সালে পূর্ব জার্মনী হতে প্রকাশিত হয়।[১৯] নিম্নে কাব্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো-

কবিতায় আরব সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা

তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কঠোর অধ্যবসায়ী ছিলেন। আরবীয় ব্যক্তি স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। স্বগোত্রীয় অধীনতা ও আনুগত্য হতেও তিনি মুক্ত ছিলেন। ব্যক্তি জীবনের নিখুঁত প্রামানিক চিত্র তাঁর

কবিতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।[২০] তাছাড়া পর্বত, ঝর্ণা, ভূত-প্রেত, অন্ধকার রজনীতে মরু প্রান্তরের দৃশ্য, অরণ্য, বাঘ ও বাহন উষ্ট্রী, তীর ধনুক ও কোষমুক্ত তরবারী প্রভৃতির বর্ণনাসহ আরব সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। শানফারার কবিতায় খাঁটি আরব অনুভূতি সফলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।[২১] যেমন কবি বলেন-

ثَلاَثَةُ أَصْحَابٍ فُؤَادٌ مَشِيْعٌ ✻ وأَبْيَضُ إِصْلَيْتٌ وَصَفْرَاءُ عَيْطَلُ

هَتُوْفٌ مِنَ الْمَلْسِ الْجِيَادِ يُزِيْنُهَا ✻ رَصَائِعُ قَدْ نِيْطَتْ إِلَيْهَا وَمَحْمَلُ[২২]

[(উপর্যুক্ত ব্যক্তির পরিবর্তে আমার একান্ত কাম্য হচ্ছে) নির্ভীক আত্মা, কোষমুক্ত শাণিতশুভ্র তরবারী ও সুদীর্ঘ ধনুক এই তিন সহচর আমার জন্য যথেষ্ট।

সেই ধনুক শব্দকারী ও মসৃণপৃষ্টবিশিষ্ট, যাকে গ্রথিত মণিমুক্তা ও বেল্ট সুশোভিত করে রেখেছে।]

লামিয়্যাতুল আরব কাব্যের বিশ্লেষণ

শানফারা মূলত স্বীয় রচনা 'লামিয়্যাতুল 'আরবের' জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন। ৬৮ ছত্র বিশিষ্ট بحر الطويل ছন্দের এই কাসীদাহটি লাম বর্ণে রচিত। লাম কাফিয়াতে আরো অনেক কবির কাব্য থাকা সত্ত্বেও আরব-মানষ বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হওয়ায় শানফারার এই কাব্যটিই 'লামিয়্যাতুল 'আরব' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২৩] এই কবিতায় তিনি আরব বেদুঈনের বীরত্ব, সাহস ও কার্য ক্ষমতার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাছাড়া মরু আরবের সত্যিকার চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। যে কারণে আরব গবেষকদের একটা বড় অংশ এটাকে 'নাশীদুস সাহ্‌রা' বা 'মরুসঙ্গীত' নামে আখ্যায়িত করেছেন।[২৪] কবি 'লামিয়্যাতুল 'আরবে' এভাবে বর্ণনা করেন-

وَكُلٌّ أَبِيٌّ بَاسِلٌ غَيْرَ أَنَّنَى ✻ إِذَا عَرَضَتْ أُولَى الطَّرَائِدِ أَبْسَلُ

وَلاَ جُبَّأٍ أَكْهَى مُرَبٌّ بِعْرْسِهِ ✻ يُطَالِعُهَا فِيْ شَأْنْهِ كَيْفَ يَفْعَلُ[২৫]

[তারা প্রত্যেকেই দুরন্ত ও সাহসী; তবে আমি ততোধিক সাহসী যখন অগ্রগামী অশ্বারোহী বীরযোদ্ধা মুখোমুখি হয়।

আমি এমন মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ নই, যে গৃহকোণে বসে স্বীয় করণীয় সম্পর্কে নববধুর সাথে পরামর্শ করে।]

দীওয়ানু শানফারায় বর্ণিত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ

কবি শানফারার অসাধারণ এক সৃষ্টিকর্ম 'দীওয়ানু শানফারা'। কেননা এ দীওয়ানে তৎকালীন আরব সমাজের প্রচলিত সমাজ মূল্যবোধ ও স্বগোত্রীয় সমাজ প্রতিবেশের সাথে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ করার ঘোষণা দেন। যেটা তাঁর জীবনের কবি মানসকে প্রচণ্ডরূপে প্রভাবিত করেছে।[২৬] স্বজনকে বিদায় জানিয়ে পর্বত, উপত্যকা, অরণ্য ও গভীর বনজঙ্গলের হিংস্র পশুর সাথে জীবন যাপিত করার কথা তার এ দীওয়ানের বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্ত করেন। সভ্য ও বিলাসী জীবনবিমুখ মরুচারী শানফারার কবিতায় খাঁটি বেদুঈন জীবনের স্বার্থক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।[২৭]

কবি শানফারার গৃহত্যাগী জীবন ছিল অত্যন্ত অযত্ন, অবহেলা ও কষ্ট দ্বারা বেষ্টিত। দৈন্যতা তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। প্রচন্ড ক্ষুধা ও যন্ত্রণা তাকে ব্যথা দিয়েছে কিন্তু তিনি ধৈর্যহারা হননি। যেটি তাঁর দীওয়ানে সুন্দরভাবে এসেছে। তাছাড়া স্বেচ্ছাচারিতা, দ্রুতগতি, নিদ্রা, ধনাঢ্যতা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের চিত্র অংকিত হয়েছে এ দীওয়ানে।[২৮] গভীর রাত্রিতে দস্যুবৃত্তি ও বানূ সালামান গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ, প্রচন্ড উষ্ণতা, সাইমুম ঝড় কিংবা বর্ষণমুখর অন্ধকার রজনী কোন কিছুই কবির স্বাভাবিক কর্মতৎপরতায় বাঁধা সৃষ্টি করতে পারেনি। এ সবই যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয়েছে লামিয়্যার শব্দ ভান্ডারে।[২৯] তিনি যথার্থই বলেছেন-

فَإِنِّى لِمَوْلَى الصَّبْرِ أَجْبَابُ بَزَّهُ ✻ عَلَى مِثْلِ قَلْبِ السِّمْعِ وَالْحَزْمَ أَفْعَلُ

وأعْدِمُ أحْيَانًا وأَغْنَى وَإِنَّمَا * يُنَالُ الْغِنَى ذُو الْبُعْدِةِ الْمُتَبَذِّلُ

فَلاَ جَزِعٌ مِنْ خُلَّةٍ مُتَكَشّفٌ * وَلاَ فَرِحٌ تَحْتَ الْغِنَى أَتَخَيَّلُ[৩০]

[আমি কখনো নিঃস্ব হয়ে যাই আবার কখনো বিত্তশালী। বস্তুত আত্মপ্রত্যয়ী ও (দানের ক্ষেত্রে) বেপরোয়া ব্যক্তিই সমৃদ্ধি লাভ করে।

সুতরাং আমি অভাবের কারণে অধৈর্য্য হয়ে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করি না। আবার ঐশ্বর্যের সময় আনন্দে ডগমগ হই না এবং দম্ভও করি না।

মূর্খরা আমার সহিষ্ণুতাকে খাটো করে দেখে না। আলাপ আলোচনার পশ্চাতে আমাকে অধিক প্রশ্নকর্তা হিসেবে দেখা যায় না এবং আমি চোগলখোরী করি না।]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি কবি শানফারা অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর 'লামিয়্যাতুল আরব' দু:সাহসী ও বেপরোয়া বেদুঈন জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি নির্ভর বক্তব্য, সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা, সাবলীল উপমা, সুখপাঠ্য ছন্দ মাত্রা এ দীওয়ানকে আরো জনপ্রিয় ও পাঠক সমীপে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখেছেন তাঁকে আরবী সাহিত্যাকাশে চির ভাস্বর করে রাখবে।

তথ্যনির্দেশ

১ আশ শানফারা, *লামিয়্যাতুল 'আরাব* (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৫; ফুয়াদ আফরাম আল বুসতানী, *আশ শি'রুল জাহিলী* (বৈরূত: আল মাতবা'আহ আল কাছুলীকিয়্যাহ, ১৯২৮ খ্রি.), পৃ. ৪৫; ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, আল 'আসরুল জাহিলী* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), পৃ. ৩৭৯।

২ আশ শানফারা, *আদ দীওয়ান* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯; ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, আল 'আসরুল জাহিলী*, পৃ. ৩৭৯।

৩ জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দার মাকতাবাতিল হায়াহ, ১৯৮৩খ্রি.)পৃ. ১৪১; আবদ আল কাদির আল বাগদাদী, *খাযানাহ আল আদাব*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, তা. বি.), পৃ. ১৬; আশ শানফারা, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ৯; ড. মো. নিজাম উদ্দীন, *কবি আল শানফারা ও তাঁর লামিয়্যাহ আল-'আরাব কাব্য: একটি পর্যালোচনা*, ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১ম সংখ্যা, ২০০০, পৃ. ৭৩।

৪ আল-মুফাদ্দাল আদ দাব্বী, *আল-মুফাদ্দালিয়্যাত* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), পৃ. ১০৮; ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন* (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩৫।

৫ *জুরজী যায়দান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৪১; কার্ল ব্রুক্যালমান, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ড. 'আবদুল হালীম আন নাজ্জার কর্তৃক আরবী অনূদিত, ১ম খণ্ড (ইরান: দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা. বি.), পৃ. ১০৫; আশ শানফারা, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ১০।

৬ মাহমূদ শুকরী আল-'আলুসী, *বুলূগুল 'আরাব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আরাব*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ১৪৫; আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ২১শ খণ্ড (বৈরূত: মু'আসসাহ জাম্মাল, তা. বি.), পৃ. ১৭৯-১৮০; R. A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), p. 79; *জুরজী যায়দান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১; আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১০৭।

৭ আশ শানফারা, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ৩৭-৩৮।

৮ ড. মো. নিজাম উদ্দীন, *কবি আল-শানফারা ও তাঁর লামিয়্যাহ আল-'আরাব কাব্য: একটি পর্যালোচনা*, পৃ. ৭৪।

৯ *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৩৩৪।

১০ *আল-'আসরিল জাহিলী*, পৃ. ৩৮০।

১১ আশ শানফারা, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ৪৭।

১২ *আল-আগানী*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ১৭৯।

১৩ বুতরুস আল বুসতানী, *’উদাবা’উল ‘আরাব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়া সাদরিল ইসলাম* (বৈরূত: দারু নাযীর ‘আববূদ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৮৮।

১৪ আশ শানফারা, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ৭০।

১৫ *আল-আগানী*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

১৬ *তদেব*।

১৭ ‘উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল ‘আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ‘ইলম লিল মালাঈন, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ১০২; R. A. Nicholson, p. 79; *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬; জুরজী যায়দান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১।

১৮ *জুরজী যায়দান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০; *‘উমার ফাররূখ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; *আল ‘আসরিল জাহিলী*, পৃ. ৩৮০।

১৯ *‘উমার ফাররূখ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; *জুরজী যায়দান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০ ।

২০ *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৩৩৬; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৩শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৪৬৫; *আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন*, পৃ. ১০৭।

২১ *তদেব*।

২২ আশ শানফারা, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ৬০।

২৩ *তদেব*, পৃ. ৬০।

২৪ *‘ড.উমার ফাররূখ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০; *শাওকী দায়ফ*, পৃ. ৩৮৫; *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৩৩৬; *আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন*, পৃ. ১০৭।

২৫ আশ শানফারা, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ৫৯-৬১।

২৬ *তদেব* ।

২৭ *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন*, পৃ. ৩৩৮; *আশ শি‘রুল জাহিলী*, পৃ. ৫৪।

২৮ *তদেব পৃ. ৫৫* ।

২৯ *আশ-শি‘রুল জাহিলী*, পৃ. ৫৪; ড. নিজাম উদ্দীন, *কবি আল-শানফারা ও তাঁর লামিয়্যাহ আল-‘আরাব কাব্য: একটি পর্যালোচনা*, পৃ. ৭৮।

৩০ আশ শানফারা, *আদ দীওয়ান*, পৃ. ৬৯।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN ১৮১৩-0402

Jihad Versus Terrorism: A Comparative Study

Mohidul Islam[*]

Abstract: Non Muslims equate Jihad with Terrorism. Eventually, Jihad and Terrorism are two different concepts. As Muslims it is our prime duty to explain the true essence of Jihad, its basic aims and objectives as described in the teachings of Islam so as to have a clear picture of differences between terrorism and Jihad. Jihad eradicates violence, oppression and injustice but terrorism creates torment, fierceness and ferocity in society. Thw aim and objective of terrorism is worldly achievement. On the other hand, the purpose of Jihad is to earn the satisfaction of the almighty Allah and Jannah in the hereafter. Terrorists are misleading Muslims against human beings in the name of Jihad. But those terrorists have no understanding about the true sense and significance of Jihad in Islam. It is certainly true that no religion and moral norms support terrorists.Terrorism of different kinds and Jihad is also divided into different catagories. But no catagory of Jihad is similar to the kinds of terrorism perpetrated in human history. So, undoubtedly there is no room for Religious Terrorism in the name of Jihad.]

Keywords: Kinds of Jihad, Fi Sabil-e-Allah, controversial issue, violent, bio-chemical wars.

Introduction

One can find countless interpretations of Jihad which differ from its true spirit and the meaning that Allah intended it to have in the Holy Quran and in the narrations of the prophet. On the contrary, people are using the term Jihad in this time in a way that suits their own whims without realizing the damage that they are causing Islam and Muslims. Today there are many individuals who study Islam from a superficial point of view and emerge with their own ideas and imaginary interpretations which often diverge greatly from the established legislation. Because of such studies there is a lacking of true basis in Islamic jurisprudence. Many non-Muslims are given a bad understanding about Islam and are thus confusing Jihad with Terrorism. Jihad and Terrorism are completely opposite concepts. Terrorism is a curse for society whereas Jihad is regarded as a blessing. This article strived to show, the true sense and significance of Jihad and terrorism and their disparity with a reasonable analysis **The meaning of Jihad and its use in different aspects**

Jihad means- struggle, try, attempt, force, apply full energy etc as a general description. It (جهاد) derives from the Arabic word الجهد, which means- sorrow, fatigue, trouble. It is said that,

جهدت جهادا أي بلغت مشقة.[১]

“I have sufferred great sorrow”

Muhammad (PBUH) sought in Allah like this,

أني أعوذ بالله من جهد البلاء.[২]

“I seek shelter from Allah from the sufferings of trouble.”

---

[*] Ph.D Fellow, Department of Arabic, University of Rajshahi.

Allah, the most merciful says,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ.[৩]

> "And strive hard (Jahidu) in (the way of) Allah, (such) a striving is due to Him, He has chosen you."

In its broadest sense, Jihad is a struggle: ১) against oneself to achieve a higher level of purity, and ২) against enemies in times of war.[8] Personal jihad includes (in decreasing order of frequency) references to: "a commitment to hard work and achieving one's goals in life, struggling to achieve a noble cause, promoting peace, harmony or cooperation, and assisting others and living the principles of Islam."[৫]

The Holy Quran declares,

"Jihad is a holy fighting in the cause of Allah or any other kinds of effort to make Allah's word superior."[৬]

Allamah Ibn Al-Humam (R) said,

الجهاد غلب في عرف الشرع على جهاد الكفار و دعوتهم إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا.[৭]

> "In the terminology of Islamic Shariah, The meaning of the word 'Jihad' as to fight against the disbelievers has been given priority. It is to call the disbelievers to the true path of religion and to fight against them if they do not accept it."

Hafiz Ibn Hajar Asqalani (R) said, هو بذل الجهود في قتال الكفار.[৮]

> "Jihad is to make efforts against the disbelievers in war."

Al-Kashani (R) said, هو الدعوة إلى الإسلام وإلى الدين ودفع شر الكفار وقهرهم.[৯]

Jihad is to call people to Islam, make religion well established, resist evil attempts of disbelievers and finally suppress them.

Dr. Wahbatuz Zuhaili said,

هو بذل الجهد والكفاح بالوسائل السليمة أولا، ثم عند اقتضاء الأمر للمحافظة على الدعاة وتحصين البلاد يلجأ إلى القتل لتحقيق السعادة الشملة للبشرية فى دنياهم وأخراهم كما الرتضاها الإله الحكيم، وكل جهد يبذل فى هذا المضمار فهو في سبيل الله وحده ولإرضائه فقط.[১০]

> "Jihad is to attempt or spend labour and defense firstly in a peaceful way, then get ready for war and struggle to protect country and summoner so that people can obtain the satisfaction of Allah and establish peace of human beings, their prosperity and welfare both worldly and spiritually. In this case, all the efforts will be in the path of Allah and only for his satisfaction."

In short , Jihad is the effort by life, wealth, speech, strength and ability to establish and uplift the code of almighty Allah.

The Prophet Muhammad (PBUH) said,

إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم وقد وضع رجله في الغرز : أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر[১১]

A man (companion of the prophet) asked the Prophet "Which Jihad is best?" The Prophet said, "The most excellent Jihad is to speak the truth in front of a tyrant."

According to another Hadith, supporting one's parents is also an example of jihad.[১২] The meaning of Jihad is very widespread. The purpose of Jihad is the abolition of all untrue, wrongdoings, tyrannies, evils and superstitions. It helps to ensure welfare, justice and rights by facing unfavorable situations. The bleeding at war and the struggle to obtain power and kingdom is not Jihad. Rather the highest kind of Jihad is to stop all wrongs, oppressions and absorptions by sacrificing life and wealth. Jihad does not only mean the way of armed forces, but also refers to the resistance of the words and works of enemies through proper sayings, writings and organizational activities.

Kinds of Jihad

Generally Jihad is divided into two parts. These are: Jihad al-Akbar (the greater Jihad) and Jihad al-Asghar (the lesser Jihad). Jihad in the sense of personal moral struggle is called al-Jihad al-Akbar (the greater Jihad). It is divided into what is called "Jihad against the self" and "Jihad against the devil".[১৩]

Jihad in the sense of an armed, state struggle is called al-Jihad al-Asghar (the lesser Jihad) and falls into two main kinds: international and domestic Jihad. International Jihad, the most commonly referred to, is what the jurists sometimes call Jihad against al-kuffar (unbelievers) or Jihad fi sabil Allah (Jihad in the path of Allah), i.e., war with the non-Muslim states. In fact, by the very nature of the structure of the Islamic state, any armed jihad against al-kuffar is an international war.[১৪]

Domestic jihad is divided into four types: (১) fighting against bughah (rebels, secessionists); (২) fighting against muharibun/qutta al-tariq (bandits, highway robbers, pirates); (৩) fighting against ahl al-riddah (apostates) and (৪) fighting against khawarij (roughly translated as violent religious fanatics).[১৫]

Objectives of Jihad

Jihad is only for the benefit of the Muslims alone, in fact Jihad is for humanity at large, irrespective of any religion. As the Quran clarifies,

> فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلأَرْضُ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ[১৬]
>
> "So they routed them by Allah's leave and David slew Goliath; and Allah gave him the kingdom and wisdom, and taught him of that which He willeth. And if Allah had not repelled some men by others the earth would have been corrupted. But Allah is the Lord of Kindness to (His) creatures".

Islam is against all kinds of evil like, injustice, immorality, lawlessness, hatred, terrorism, nepotism and similar trends which no society consider useful for their people and, therefore, it says to settle matters in peaceful and polite means like persuasion and counseling; if these fail to deliver, then force may be used as an option. Allah says,

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.[১৭]

> “Those who have been driven from their homes unjustly only because they said: Our Lord is Allah. For had it not been for Allah's repelling some men by means of others, cloisters and churches and oratories and mosques, wherein the name of Allah is oft mentioned, would assuredly have been pulled down. Verily Allah helpeth one who helpeth Him. Lo! Allah is Strong, Almighty”.

Simultaneously Islam also forbids its followers from crossing limits or committing excesses, even if it is a situation of war with an enemy. Allah narrates,

وَقَاتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ.[১৮]

> “Fight in the way of Allah against those who fight against you, but begin not hostilities. Indeed, Allah does not like aggressors.”

From the above mentioned discussion it is quite clear that in Islam, there is no justification for killing in anguish the weak, the aged, the weaker sex, unarmed people who are not associated with war, neither is there any room for bombing at the places of worship or other assets meant for the welfare of public. Chemical or biological weapons for killing or diseases, or weapons of mass destruction (WMD) are also in contrast with the holy teachings of Islam.

The objectives of Jihad Fi Sabil-e-Allah are prevention of lawlessness, injustice terrorism, agitation, aggression and things like these. In situations, in where military action becomes necessary, Islam allows Jihad of the Qitaal type which is in its narrow sense, while in its broader sense, Jihad is always permitted to fight against all major and minor evils.[১৯]

The blood of the martyr is so sacred that on its first drop falling on the battlefield, Allah forgives all the sins of the martyr. Those who die in this cause are not deemed dead but alive before Allah, The Almighty with special blessings. Allah declares,

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِى سَبيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَـٰكِن لاَّ تَشْعُرُونَ.[২০]

> “Do not say that those who are killed in Allah’s cause are dead; they are alive, though you do not realize it.”

The Meaning of Terrorism

The Arabic term of Terrorism is- الإرْهَاب. The verbal meaning of terrorism is violence, oppression, injustice, torment, fierceness, ferocity, cruelty, extreme fear etc. The word *Dahshat Gardi* is a combination of Urdu and Persian words meaning to spread panic and harassment. The corresponding word in English for ‘dahshat’ is ‘terror’ while the word for ‘dahshatgardi’ is ‘terrorism’.[২১]

However, scientists have claimed the impossibility of defining terrorism by stating that ‘one man’s terrorist is another man’s freedom fighter’. In other words, it would be impossible to agree upon an objective definition on terrorism, because the defining process ‘depends entirely on the subjective outlook of the definer’.[২২] Terrorism is however a broad concept that has its origins in the French Revolution of ১৭৮৯.[২৩]

However, although researchers have come up with over ২০০ definitions to describe the phenomenon of terrorism, there is actually a growing consensus among scientists about its core meaning.[২৪] The objective of terrorism is capturing of lands by bloodshed, usurping power, acquiring wealth and establishing supremacy and authority by plundering and killing people.

Zayd Bin Muhammad Bin Haadee Al-Madkhalee narrated,

> **الإِرْهَابُ كَلِمَةُ مُبْنِيّ لها مَعْنَى ذو صور متعددة يجمعها الاخافة والترويع للأمن، وقد تجازوز الإخافة والترويع إلى ازعاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المعصومة أو هبها، وهتك الأعراض الوصونة وشق عصا الجماعة.**[২৫]
>
> "Irhab, terrorism is an established word that possesses a lot of synonymous words, such as to horrify an innocent man, sometimes to kill a person by unlimited fear, to destroy protected resources."

It is mentioned in the book titled *Al-Maosuatul Arabiyyahtul 'Alamiyyah* **(اَلْمَوْسُوْعَةُ الْعَرَبِيَّةْ اَلْعَالَمِيَّة)**

الإِرْهَابُ : اِسْتِخْدَام الْعُنُفُ أَو التَّهْدِيْدُ بِهِ لِإِثَارَةِ الرعب.[২৬]

"Terror is to apply force upon the fearsome or create fear through force."

It is composed in the new Encyclopedia Britannica,

> "Terrorism: The systematic use of violence to create a general climate of fear among people and thereby to bring about a particular political objective."[২৭]

According to FBI (Federal Bureau of Investigation),

"Terrorism is the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce a government. The civilian population or any segment there of in furtherance of political or social objectives."[২৮]

In brief, terrorism is a condition that terrifies people and generates panic among them. On the other hand, terrorists are those who are involved with misanthropist activities.

Kinds of Terrorism

Terrorism is not a phenomenon of recent years and is certainly not exclusively related to Islam. Schmid's typology of terrorism illustrates its broad character. He distinguishes between five types of terrorism: a) Social-revolutionary terrorism (left-wing), b) Right-wing and racist terrorism, c) Single issue terrorism, d) Nationalist and separatist terrorism (including ethnic terrorism), and finally, e) Religious terrorism.[২৯]

We find different types of terrorism. These are:

১. Civil terrorism , ২. Colonial terrorism, ৩. State terrorism, ৪. International terrorism, ৫. Religious terrorism, ৬ Cyber terrorism

Methodology of Terrorism

Terrorism is conducted in a planned way with inhuman attitude. A variety of methods are adopted by terrorists. These are discussed below:

a) Assassination: It is a clean murder by an interested individual, group or party for gaining rewards. It is carried out by sudden attack and secrecy is maintained till its execution. It is the oldest and the most frequently adopted method by terrorists.

b) Kidnapping: It is another most frequently used method by terrorists. The main purpose of kidnapping is to extort ransom.

c) **Hostage Barricade:** In the case of hostage barricade, kidnappers do not take the hostages to a hideout. Rather they are prevented from doing so. They, along with the hostages, stand surrounding a public place.

d) **Hijacking:** Hijacking is one of the top most methods of terrorists. Terrorists have started hijacking in airplanes, trains, buses and ships as well.

e) Expropriation: It is another tool in the hands of terrorists. Bank robberies and robberies of trains and vans which carry large sums of money are examples of expropriation. Huge amounts are collected mainly to finance the terrorist activities.

f) **Bombs and Explosives:** It is also the oldest but strong weapon of the terrorist. The recent bomb explosions in Madrid and London have shaken the governments of Spain and UK.

g) Mass Killings: Terrorists menace the people by mass killing. Though it is not commonly used but, at times four large-scale murders were also reported. [৩০] Sometimes terrorists use this brutal method to take revenge.

Difference between Jihad and Terrorism

Jihad and Terrorism are very controversial issues. Non-Muslims and a Muslim of superficial knowledge can not differentiate between Jihad and Terrorism. They equalize Jihad with Terrorism. But, both of these are entirely different concepts. Actually, there are lots of differences between them. Some of the differences between Jihad and Terrorism are given below:

১) Jihad is basically meant for the eradication of harmful trends and developing society, while terrorism directs to destruction of the people and society. Terrorism involves committing crimes against humanity with physical and mental torture of army personals as well as civilians, destruction of public and private property and infrastructure, to inject fear and harassment among the masses, while Jihad is against these things. In other words, Jihad is obligatory against such actions.

২) Unlike terrorism, Jihad is never done to fulfill any human desires or worldly objectives. It aims only at the establishment of an Islamic order according to Allah's commandment. Nothing can fill the gap between two, no matter how one tries to portray the actions of individuals and groups as Jihad as it is highly unjust and misleading to equate the wrong actions of a few with the noble concept of Jihad.[৩১]

৩) Atomic, bacterial, and bio-chemical wars are strictly prohibited by Islam. These weapons are also strictly prohibited in the doctrine of Jihad. The use of such dangerous weapons on the battlefield is naturally against morality and the principles derived from Islamic doctrines. Jihad strictly prohibited atomic, bio-chemical and bacterial weapons.[৩২] On the other hand, terrorists use these weapons to implement their conspiracy.

Although such destructive weapons were not invented at the time of the leaders of the Muslims (the Prophet and his successors), yet a tradition (hadith) is narrated by Imam Jafar al-Sadiq who quoted the first Imam Ali as saying "the messenger of God has already prohibited the use of poison in the towns of the heathens (by the Muslims)." The late Allamah Hilli has mentioned the prohibition of the use of poisons to destroy the enemy in his book Tabsiratul Muta'alimin. Khalil, the Maliki jurist, also emphasizes that poisons are prohibited in the engagement of war.[৩৩]

৪) The term Jihad 'Fi Sabil-e-Allah' stands to exclude elements of revenge, ambition for territorial expansion, fulfillment of personal desires, attainment of wealth and property, winning fame and popularity or gaining political supremacy. So, Jihad Fi Sabil-e-Allah therefore means "To make optimum effort for Allah i.e. doing the utmost for the pleasure of Allah one is capable of, and doing all efforts for establishing paramountcy of Allah i.e. Islam. On the other hand, terrorists focus on winning fame and popularity or gaining political supremacy, fulfillment of personal desires and to attain wealth and property.

৫) Aims and objectives of terrorism are influence, military supremacy or political sovereignty, worldly achievement and other material benefits which may take the shape of territorial expansion, economic benefits, reducing power of certain group or people or to serve as agents and proxies of the superpowers.[৩৪] But the aim of Jihad is to obtain the gratification of the almighty Allah and Jannah in the hereafter.

৬) If we take Jihad first, its main aim is elimination of social evils but in case of terrorism it supports evils and acts related to evil. Jihad is virtue and a praiseworthy concept, terrorism is harmful and ugly.

৭) In Jihad there is an absence of personal aims and objectives, only supremacy of the will of Allah which is a noble cause, while in terrorism, all worldly aims and objects remain focus of attention.

৮) In Terrorism, there is no limit, no restriction, no discrimination between the innocent and the guilty, it is blunt application of coerce tactics, that include the use of arms and torturous measures against the innocent. While in Jihad, these are neither allowed in theory nor in practice. Jihad (Qitaal) is allowed only as a last resort in situations, as the modern world would also allow such an option.

৯) Jihad does not support killing non combatants or killing combatants after ceasefire, burning enemies, killing by torture, loot and plunder, destruction and spreading agitation, killing envoys, taking personal revenge, declaring through deception etc. The Main rule in Jihad is the obedience of the Muslims towards their ruler otherwise no war will remain Jihad Fi Sabil-e-Allah.

১০) Jihad guidelines are: restrain from mass killing, rioting, desecrating dead bodies, respecting and protecting the honour of women, no destruction of worship places etc.It is clear that, Jihad, being for nobler causes, that aims at the improvement and betterment of society. On the contrary, for the terrorist, the golden principle is, "everything is fair in love and war", and this mindset does not believe in any respect for higher human values.There is no doubt that terrorism is a heinous crime against humanity without any justification no matter who is involved in it. For the terrorist, "the end justifies the means" but for the Mujahid, both the end and the means have to be justified and be lawful according to Islam.

১১) Jihad, unlike terrorism, is not blind or violent in using force against humans, rather it is a disciplined use of force on aims and objectives and such aims are achieved in accordance with

the norms of war, there is no further revengeful act against combatants, their relatives, what to talk of common citizens.[৩৫]

Terrorism, on the other hand is sheer destruction, disorder, fear, chaos and insecurity. The populace is wiped out, properties are destroyed, even the flora and fauna bear the brunt at times. Business and social activities are affected. In short, life becomes a standstill and the world becomes a living hell.

১২) None can declare Jihad against others except Islamic leaders or the supreme leader (i.e: government) of a country. Besides that, nobody can announce Jihad against the government of a Muslim country. On the other hand, terrorists have no need to terrify people or to create anarchy. They can fight against the government and Islamic leaders of a country.

Conclusion

Muslims throughout the ages have discussed, debated and disagreed about the meaning of jihad, its defensive and expansionist, legitimate and illegitimate forms. From that analysis we can say, terrorists are like cancer affected part of body, as soon as it is operated out it will be better for the rest of body. Jihad is a means of eliminating those diseased organs of human body in the best interests of mankind.

Jihad includes the struggle to build the nation through material development and progress, whereas terrorism ravages our society. Jihad excludes elements of revenge, ambition for territorial expansion, fulfillment of personal desires, attainment of wealth and property, winning fame and popularity or gaining political supremacy but terrorism includes these. So, terrorism in the name of Jihad is nothing but a hypocrisy, devilry, intrigue and antipathy to Islam and the Muslims.

Notes & References

১ Muhammad Nasiruddin Albani, *Sahih At-Targib Wat Tarhib*, Vol.২ (Riyadh: Maktabatul M‘arif, ১st ed., ২০০০), p.৬৪.

২ Imam Bukhari, *Sahihul Bukhari* (Kayro: Maktabatus Safa, ২০০৩), H.No.২৪৫৭.

৩ Surah Al-Hajj, ২২: ৭৮.

৪ Abdulla Rasha, “Islam, jihad, and terrorism in post-৯/১১ Arabic discussion boards”, *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol.১২ (United States: Oxford University Press on behalf of International Communication Association, April ২০০৭), p.১০৭৫; http://jcmc.indiana.edu/vol১২/issue৩/abdulla.html (Accessed in: ৩০ March ২০২০).

৫ John L Esposito, “Islam and Political Violence”, *Religions* (Washington: Prince Alwaleed Bin Talal Center, ১০ September ২০১৫), p.১০৭০.

৬ Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr. Muhammad Muhsin Khan, *The Noble Quran*, (Madinah: King Fahad Complex for the printing of the holy Quran, ১৪০৪ H), p.৮৭১.

৭ Ibnul Humam, *Fathul Kadir*, Vol.৫ (Qyota: Al Maktabatul Halabiyah, N.D), p.১৮৭

৮ Ibn Hajar Asqalani, *Fathul Bari*, Vol.৬(Bairut: Darul Kutubil ‘Ilmiyah, ১৯৭৯), p.০৩.

৯ Al-Kashani, *Bada-i-Al-Sana-i Fi Tartib Al-Shara-i*, Vol.৭ (Bairut: Darul Kitabil Arabi, N.D), p.৯৮.

১০ Dr. Abdur Rahman Ibn Ma‘ala Al-Luayhique, *Al-Irhab Wal Gulu Al-Furkan* (Kuwait: April, ২০০৮), p .৩৯.

১১ Imam Nasayee, *Sunanu An-Nasayee*, Vol. 7 (Bairut: Darul Kitabil ‘Ilmiyah, ১৯৯১), H. No. 4209.

১২ Dr. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, Vol. ১ (Cairo: Wahba Bookshop), pp. ৫২, ১৪৩; Abdur Rahman Muhammad Alsumaih, *The Sunni Concept of Jihad in Classical Fiqh and Modern Islamic Thought* (England: University of Newcastle Upon Tyne, PhD thesis, ১৯৯৮), pp. ৬, ২৫৭, ৩৬৯.

---

[১৩] Al-Qaradawi, *op.cit.*, pp. ৫২, ১৪৩.

[১৪] *Ibid*.

[১৫] Muhammad Ibrahim ʿAbd Allah al-Twijri, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami* (Riyadh: Dar al-Maʿraj al Dawliyyah, ২০০০/১৪২১H), p. ৮৩৭.

[১৬] Surah Al-Baqara, ২: ২৫১.

[১৭] Surah Al-Hajj, ২২:৪০.

[১৮] Surah Al-Baqara, ২:১৯০.

[১৯] Amir Latif and Hafiza Sabiha Munir, "Terrorism and Jihad, An Islamic Perspective", *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. ২ (Washington, D.C: American Research Institute, March ২০১৪), pp.৭৫,৭৬

[২০] Surah Al Baqara ২:১৫৪

[২১] *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. ২, *op.cit.,* p.৭২.

[২২] B. Ganor, "Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?", *Police Practice and Research*, Vol.৩ (New York: Routledge, ২০০২), p. ২৮৭.

[২৩] A. Giddens, *Sociology*, (Oxford: Blackwell Publishers, ৫th ed., ২০০৬), p. ৮৮১.

[২৪] T. Bjorgo, *Root Causes of Terrorism: Myths reality and ways forward*, (New York: Routledge, ২০০৫), p. ০১.

[২৫] Zayd Bin Muhammad Bin Haadee Al-Madkhalee, *Al-Irhab wa Athaaruhu Fil Afraad Wal Mujtamiah*, (Dammam: Daru Sabilil Mu'minin, ১st ed., ১৪১৮H.), p. ১০.

[২৬] Shayakh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ash-Sheikh, "Al-Irhab Asbabuhu Wa Wasailul Ilaj", *Majallatul Buhuth Al-Islamiyah*, (Saudi Arabia: Central Darul Iftah, Rajob- Shawal ১৪২৪ H.), pp. ১০৮-109.

[২৭] *The New Encyclopaedia,* Vol.১১ (USA: ২০০২), p. ৬৫০.

[২৮] Forkan Ali, *Santrashbad: Khomotar Laraiyer Hatear,* Dainik Inqilab, ২৫ June ২০০৭, p.১৪.

[২৯] A.P. Schmid, *Root Causes of Terrorism*, (New York: Routledge, ২০০৫), p. ২২৪.

[৩০] http://gafhs.com/index.php?option=com_content&view=article&id=৪৯&Itemid=৫৬© 2009 GLOBAL ALLIANCE FOR HOMELAND SECURITY (Accessed in: ০৩ April, ২০২০).

[৩১] *Journal of Islamic Studies and Culture,* Vol. ২, *op.cit.*, p.৭৪

[৩২] Byung-Ock Chang, "Islamic Fundamentalism, Jihad, and Terrorism", *Journal of International Development and Cooperation*, Vol.১১ (Seoul: Korea Convergence Society, ২০০৫), p.৬৪.

[৩৩] Dawood Ilhami, *The Doctrine of Jihad In Islam*, Trans. by Sayyid Saeed Arjmand (Iran: Islamic Research Foundation of Astan Quds Razavi, ১৯৯১), p.৮১.

[৩৪] *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. ২, *op.cit.*, p.৭৭.

[৩৫] *Ibid*, p.৭৮.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

ইসলামী শরী'আতে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা : একটি পর্যালোচনা

মো. ওবাইদুল্লাহ*

Abstract: A variety of goods and services are required to meet the daily basic needs of human life. The essentials are basically resources.In order to balance the production and distribution of wealth; various economic functions have to be performed. The number of people is infinite but resources are limited. Therefore, there are various economic activities in deferent countries of the world to meet the shortage of resources. In particular, various strategies have to be adopted to ensure the proper utilization of resources and to sustain its usefulness in the long run. For this reason it is very important to save resources. Again there is a need for special management for conservation. These conservation measures and strategies vary in different economies. Capitalist economics, socialist economics and Islamic economics have their own methods. The present article attempts to discuss on æAsset conservation Management in Islamic sharia". In particular, the nature of this management has been highlighted.

ভূমিকা

এ বিশ্ব চরাচরে যত প্রাণী আছে মহান আল্লাহ তাদের সবারই রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন।[১] কিন্তু এ পৃথিবীর শাসক হিসেবে মানুষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেন তারা এই রিযিক বা সম্পদকে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করে। তবে মানুষ স্বাধীন সৃষ্টি হওয়ায় এ বিধান মানা না মানা তার ইচ্ছাধীন হয়ে আছে। তাই দেখা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা চালু করেছে। যেখানে ব্যক্তিকে মালিকানার ক্ষেত্রে এমন একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে, যাতে করে সে তার ইচ্ছামত আয় বা ব্যয় করতে পারে। তার উপার্জিত সকল সম্পদ যদি সমুদ্রে ফেলে দেয়, বা আগুনে পুড়িয়ে দেয় তাতে কারো বলার কিছু নেই। ফলে এখানে সম্পদ সংরক্ষণের সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে আবার কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চালু করেছে। যেখানে সম্পদের মালিকানায় ব্যক্তির জন্য কোন প্রকার অধিকারই স্বীকার করা হয় না। তাই এখানে ব্যক্তি তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। ফলে সম্পদ সংরক্ষণে ব্যক্তি কোন আগ্রহই খুঁজে পায় না। এসবের বিপরীতে ইসলাম মনে করে যে, সকল সম্পদের একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ। মানুষ কিছু ন্যায়ানুগ ও বাস্তবসম্মত শর্ত সাপেক্ষে এই সম্পদ ভোগ করার সকল সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করতে পারে।

সম্পদ সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের এমন ব্যবহার যাতে ঐ সম্পদ যথাসম্ভব অধিক লোকের দীর্ঘ সময়ব্যাপি সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। সম্পদের ব্যয়, হ্রাস, সম্পদের পূনর্ব্যবহার এবং সম্পদের পূননবায়ন এই তিন পদ্ধতিতে সম্পদ সংরক্ষণ হয়ে থাকে। যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হলে এই তিনটি পদ্ধতির সুষ্ঠ অনুসরণ করা দরকার। যে অর্থব্যবস্থায় উক্ত সব কয়টি পদ্ধতিকে পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করে সেটি উত্তম ও আদর্শ অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় উক্ত পদ্ধতিগুলো পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করা হয় কি না এবং হয়ে থাকলে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি কিরূপ তা আমাদের অনেকেরই জানা প্রয়োজন। **আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী শরী'আতে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে** আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানাস্বত্ব

ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র ও সুসমন্বিত মধ্যমপন্থী অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় সম্পদের উৎপাদনকারী, ব্যবহারকারী, আমানতদার এবং বণ্টনকারী। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিকে যে কোন পন্থায় অর্থ উপার্জনের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। কিছু কিছু পন্থাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, আবার কতিপয় পন্থাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় সম্পদ ভোগের সীমাহীন

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, **ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাধীনতা বা রাষ্ট্র কর্তৃক নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ কোনটাই সমর্থন করে না বরং এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। ইসলামী শরী'আতে মানুষকে প্রয়োজন অনুপাতে বিনা বাধায় সম্পদের ভোগ ও ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে এবং অপচয়-অপব্যয়কে হারাম ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে এ ব্যবস্থা ব্যক্তিকে স্বীয় ইচ্ছেমতো সম্পদ পুঞ্জিভূত করার অবাধ স্বাধীনতা দেয়নি। অর্জিত সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশকে নিজের ও পরিবারের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে অবশিষ্ঠাংশ সমাজ কল্যাণে ব্যয়ের উৎসাহ ও তাগাদা দিয়েছে। উক্ত ব্যবস্থাপনায় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে রয়েছে ইনসাফভিত্তিক এক বৈপল্লবিক কর্মসূচী। এ ব্যবস্থাপনায় কোন জাতি-গোষ্টি, গোত্র-বংশের উন্নতির জন্য কোন পক্ষপাতিত্ব নেই বরং সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধনই এ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। স্বজন প্রীতি ও বর্ণবাদের কোন স্থান নেই এ অর্থব্যবস্থায়।

সম্পদ সংরক্ষণ কী ও কেন?

সম্পদ সংরক্ষণের অর্থ প্রাকৃতিক সম্পদের এমন ব্যবহার যাতে ঐ সম্পদ যথা সম্ভব অধিক লোকের দীর্ঘ সময়ব্যাপি সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। সংরক্ষণ ধারনার অন্য নাম জীবনাচরণ। শিক্ষা, মানবিক বৃত্তি, সদাচরণ, ন্যায়বিধান, সত্যানুসন্ধান, কর্তব্যপরায়নতা বা প্রকৃতির প্রতি ভালবাসার অন্য নাম সংরক্ষণ। কেউ আবার সংরক্ষণ বলতে- 3R: Reduce, Reuse, Recycle তথা সম্পদ সংরক্ষণে সম্পদের ব্যবহার হ্রাস, সম্পদের পূর্ণব্যবহার ও সম্পদের পূণনবায়ন এই তিন পদ্ধতিকে বুঝায়।[১] বর্তমানে সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে রেখে সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা মানুষের অবাধ ও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ফলেই জনজীবনে বিরাট সংকট দেখা দেয় এবং অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। তাই সম্পদ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সম্পদ সংরক্ষণের বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়তা অনুভাব করা হয়ে থাকে।

ইসলামী শরী'আতে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

কোন কিছুর টেকসই হওয়ার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন কিছু সংরক্ষণ করা যায় না। সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় নিয়ম-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ থাকলে সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অটুট-অক্ষুন্ন থাকে, দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং যত্ন ও নিরাপদে থাকে। তাই ইসলামী শরী'আত সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা দিয়েছে। আমরা এখন তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকগুলি আলোচনা করব।

ইসলামী শরী'আত সম্পদ সংরক্ষণের জন্য যেসব ব্যবস্থাদি দিয়েছে তা মোটামোটি দুধরনের। যথা:

ক. পদ্ধতিগত সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

খ. আইনগত সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

- **পদ্ধতিগত সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা**

এ ব্যবস্থাপনার তিনটি দিক রয়েছে। যথা:

ক. লেখনির মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ: (**حفظ المال بالكتابة**)

খ.স্বাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ: (**حفظ المال بالشهادة**)

গ. বন্ধক রাখার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ: (**حفظ المال بالتوثيق العيني**)

নিম্নে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো :

ক. লেখনির মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ (حفظ المال بالكتابة)

লেখনির মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ করা ইসলামী শরী'আতের অন্যতম একটি নির্দেশনা এবং বাস্তবসম্মত পন্থা। লেখনির মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا[২]

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রাখ; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখিতে অস্বীকার করবে না। যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়াছেন, সতুরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়'। এ আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, 'এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের জন্য একটা স্পষ্ট নির্দেশনা যে, তারা যখন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা বিলম্বে পরিশোধযোগ্য লেনদেন করবে, তখন তারা যেন লেনদেনের বিষয়টি লিখে রাখে। কেননা এটা তাদের চুক্তিকৃত অর্থের পরিমান ও চুক্তির মেয়াদের ক্ষেত্রে অধিক সংরক্ষক হবে'।[৩]

এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূল (স.) তাঁর কাজকর্মে-লেখা-লেখির উপর অনেক গুরুত্ব দিতেন। ইবন ওহাব থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আদ্দা ইবনে খালিদ ইবন হাওয়া (রা.) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই পত্র পড়ে শুনাবো না, যা রাসূল (স.) আমাকে লিখেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। অতএব তিনি আমার সামনে একখানা পত্র বের করলেন, যাতে লেখা ছিল: ''আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়া আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের নিকট থেকে যা ক্রয় করেছেন এটা তার দলীল। সে তাঁর নিকট থেকে একটি গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করেছে, যার কোন রোগ-ব্যাধি নেই, যা চুরিকৃতও নয় এবং হারাম মালও নয়। এ হলো দু' মুসলমানের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়''।[৪]

'ওয়াকফ কিভাবে লেখা হবে' এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ.) একটি পরিচ্ছেদই নির্ধারণ করেছেন। ইবন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর রা. খায়বারে কিছু জমি লাভ করলেন। তিনি রাসূল (স.) এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি, যা ইতোপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি (স.) বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে আসল জমিটি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন দ্রব্য সাদকা করতে পার। ওমর রা. এটি গরীব, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহর পথে, মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সাদকা করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবে না। কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তবে যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সংগত পরিমাণ খেতে বা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে সঞ্চয় করবে না।[৫]

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রা.) ওমার (রা.) এর সাদকা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: আমাকে আব্দুল হামীদ বিন 'আব্দুল্লাহ ইবন ওমর ইবন খাত্তাব এরূপ লিখে দিয়েছেন: বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এ হলো ঐ বর্ণনা, যা আব্দুল্লাহ ইবন ওমার (রা.) সামাগ[৬]সম্পর্কে লিখেছিলেন। অতঃপর রাবী নাফী' (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন যে, ধন-সম্পদ জমাকারী হবে না। আর যে ফল তাতে পতিত হবে, তা হবে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অংশ। অতঃপর বর্ণনাকারী এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন: যদি ঐ বাগানের মুতাওয়াল্লী চায়, তবে সে বাগানের ফল বিক্রি করে সে মূল্য দিয়ে বাগানের কাজের জন্য গোলাম খরিদ করতে পারে। আর মুআয়কিব এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন এবং আব্দুল্লাহ ইবন আরকাম এর সাক্ষী হন।[৭]

লেখনির মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ করার তাৎপর্য

১. সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটানো

ইসলামী শরী'আত যে লিখে রাখার ব্যবস্থা করেছে তার দ্বারা দীর্ঘদিনের লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেনকারীদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটে। যখন লেনদেনকারীদের মধ্য হতে যে কোন একজন হস্তান্তরের পরিমাণ অথবা সময়ের পরিমাণ নিয়ে সন্দেহের প্রশ্ন তুলবে, তখন তারা লিখিত প্রমাণের আশ্রয় নিবে। তেমনভাবে তাদের উভয়ের মৃত্যুর পরে তাদের প্রত্যেকের উত্তরাধিকারীগণের সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হবে। বিশেষ করে এই যামানায়, যেখানে আমানতদারিতা উঠে গেছে ও যিম্মাদারীর গুণ মানুষের মধ্য থেকে চলে গেছে'।[৮]এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا[৯]

'আল্লাহর নিকট এটি ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর'।

২. সম্পদ সংরক্ষণের তাগিদ সৃষ্টি

ইসলামী শরী'আত আমাদের সম্পদ সংরক্ষণ করতে যেমন নির্দেশ দিয়েছে তেমন সম্পদ নষ্ট ও অপচয় করতেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আর এসবের বাস্তবায়ন নথিভূক্তকরণ ও রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যা আল্লাহ তা'আলা করতে বলেছেন। যেমন কেউ বন্ধক নিলে তার জন্য সাক্ষী রাখতে হয়। তেমন এটাও একটি দলীল।[১০]

৩. বিরোধ বা ঝগড়া রোধ করা

আমরা জানি লেনদেনের কার্যক্রমটা নথিভূক্ত হয়ে থাকলে লেনদেনকারীগণ ঝগড়া ও বিতর্ক থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। এটা ফিতনাকে প্রশমিত করার অন্যতম কারণ। উভয়ের কেউই লিখিত প্রমাণের কারণে অস্বীকার করতে পারবে না। তখন জনসাধারণের নিকট তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।[১১]

৪. ত্রুটিপূর্ণ চুক্তি থেকে বেঁচে থাকা

সম্পদের চুক্তি যদি লিখিত হয়, তাহলে লেনদেনকারীগণ ত্রুটিপূণ কার্যক্রম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। কারণ লেনদেনে ত্রুটি দেখা দিলেই উভয়ে লিখিত প্রমাণের দিকে প্রত্যাবর্তণ করলে সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।[১২]

তাই আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, সম্পদ ও মানবাধিকারসহ অধিকারের সকল দিক সংরক্ষণের জন্য উপরে উল্লেখিত শরয়ী তাৎপর্যগুলোর পরিধি যথেষ্ঠ ব্যাপক ও সূদুরপ্রসারী। কেননা লেখনির দ্বারা সত্য অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এমনকি এর দ্বারা স্বভাবগত বা প্রকৃতিগত আচরণ থেকে বের হয়ে সামাজিক নাগরিক জীবনের পরিধিতে প্রবেশ করা সম্ভব হয়।

খ. স্বাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ (حفظ المال بالشهادة)

সম্পদ সংরক্ষণ করার পদ্ধতিগত দ্বিতীয় মাধ্যম বা পন্থা হলো স্বাক্ষ্য। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى-[১৩]

'সাক্ষীদের মধ্যে তোমরা যাদের উপর রাযী তাদের মধ্যে দুইজন সাক্ষী রাখবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে'।

স্বাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের তাৎপর্য

অধিকার রক্ষা

স্বাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ করাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সম্ভাব্য ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং বাড়াবাড়ী, অস্বীকৃতি,অবজ্ঞা, অমান্য করা থেকে দূরে থাকা যায়।

তাছাড়া লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলে অন্যায়-অত্যাচার দূরীভূত হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى-[১৪]

এ আয়াতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন[১৫] এভাবেই ইসলামী শরী'আত স্বাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

গ. বন্ধক (Mortgage) রাখার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ (حفظ المال بالتوثيق العيني)

প্রকৃত বা বাস্তব অনুমোদন ও প্রত্যয়ন পদ্ধতিতে সম্পদ সংরক্ষণ করা ইসলামী শরী'আতের অন্যতম একটি নির্দেশনা। এর দ্বারা সম্পদ সংক্রান্ত সকল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর বিশেষত এটা رهن তথা বন্ধকের মাধ্যমে হয়ে থাকে।[১৬] ঋণ বা বিনিয়োগের নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, বিশ্বস্ততা অথবা চুক্তি পালনের জন্যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির স্বার্থ হস্তান্তর করাকে মূলতঃ বন্ধক (Mortgage) বলে। বন্ধক রাখার মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দিয়ে সম্পদ সংরক্ষণ করা একটি অতি উত্তম পন্থা। বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছে-

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ-[১৭]

'যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে'। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে'।

বন্ধক রাখার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণের তাৎপর্য

ইসলামী শরী'আতে সুদের পথ বন্ধ করার জন্যে ব্যবসা ও ঋণের পথকে উন্মুক্ত করেছে। দুস্থ- অসহায়জনদের ঋণ দিয়ে সহায়তা করতে বলা হয়েছে। যাকাতের একটি বিশেষ খাত হিসেবে 'ঋণগ্রস্থদের সহায়তা দান'কে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এই ঋণের পথকে সুগম করার জন্যে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পদ বন্ধক রাখাকে বৈধ করেছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, ঋণদাতা বন্ধকী সম্পদ নিজের কাছে রাখার অধিকার পাবে। তবে তা ব্যবহার করার অধিকার তার নেই।[১৮] এমনকি স্বয়ং রাসূল স. স্বীয় লৌহবর্মটি এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখে কিছু খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করেছিলেন।[১৯] কিন্তু যেহেতু ইসলামী শরী'আতে ঋণের বিপরীতে মুনাফা ভোগ সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে এমনকি রাসূল স. এটাকে সুদ বলেছেন তাই সুদ তো দূরের কথা, সুদের কোন গন্ধকেও আশ্রয় দেয়নি ইসলামী শরী'আত। আর এ জন্যই বন্ধক হিসেবে প্রদত্ত বস্তু ব্যবহারকেও নিষিদ্ধ করেছে। কেননা বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী জিনিসের দখল লাভ করার পর ক্ষতিসাধন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে যদি তার মূল্য ও ঋণের পরিমাণ সমান সমান হয়, তাহলে বন্ধকগ্রহীতা তার পাওনা সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে বলে গণ্য হবে। কেউ কারো নিকট কোন পাওনা দাবী করতে পারবে না। দখলের দিন বন্ধকী জিনিসের যে মূল্য ছিল সে মূল্যই ধর্তব্য হবে। এভাবেই বন্ধকী লেনদেন সম্পদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে থাকে। আবার অন্যদিকে বন্ধকদাতা বন্ধকী জিনিস ধ্বংস বা নষ্ট করলে বন্ধকদাতাকে তার জরিমানা দিতে হবে এবং বন্ধকদাতাকেই এর দায়িত্ব বহন করতে হবে। ফলে সম্পদ বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচতে সহায়ক হয়। তাছাড়া ঋণ বা ক্রয়ের বিপরীতে জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর, দোকান, ফ্যাক্টরি ইত্যাদির দলিলপত্র কিংবা স্বর্ণ-রৌপ্য বন্ধক হিসেবে জমা থাকলে বন্ধকদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃংখলা এড়ানো সহজ হয়। যেমনটি আমাদের প্রিয় রাসূল (স.) করেছিলেন।

- **আইনগত সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা**

আইনগত ব্যবস্থাপনা বলতে সম্পদ নষ্ট বা ক্ষতি না করার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বা সম্পদ রক্ষার জন্য বিধি-নিষেধ জারী করার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ- অব্যবস্থাপনার কারণে প্রচুর সম্পদ অজান্তেই নষ্ট বা ক্ষতি হয়ে থাকে। এমন বিষয়ের উপর ইসলামী শরী'আত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে; যাতে করে তা সম্পদ সংরক্ষণে সহায়ক হয়। এ প্রসঙ্গে ইসলামী শরী'আতের কিছু বিধি-নিষেধ উল্লেখ করা হলোঃ

এক.সম্পদ অপচয় বা বিনষ্ট করা হারাম

অপচয়ের মাধ্যমে সম্পদ নষ্ট করা ইসলামী শরী'আতে হারাম করা হয়েছে। কারণ অপচয় বা নষ্ট করলে কখনোই সম্পদ সংরক্ষণ হয় না বরং তা ধ্বংস হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেছেন-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ-[২০]

‘হে বনী আদম ! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না ’। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না’। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন-

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا-[২১]

‘আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না’।

হাদীসে এসেছে-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ[২২]

“রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া আর অপছন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা”। সহীহ বুখারীর প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবন হাজার আল- আসকালানী (রহ.) বলেন- “সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে এই জন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা সম্পদকে বান্দার কল্যাণের উপকরণ ও জীবনের খুঁটি হিসেবে নিযুক্ত ও নির্ধারণ করত: সরবরাহ করেছেন। আর সম্পদ নষ্ট বা অপচয়ে বান্দার কাংখীত কল্যান সাধন ব্যহত হয়”।[২৩]

দুই. নির্বোধদের হাতে সম্পদ হস্তান্তর না করা

নির্বোধদের হাতে সম্পদ ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকায় তা সংরক্ষণের স্বার্থে তাদের হাতে তাদের সম্পদ হস্তান্তর না করতে বলা হয়েছে। নির্বোধ মালিকের হাতে যদি তার সম্পদ দেয়া হয়, তাহলে সে সম্পদ সংরক্ষণ না হয়ে বরং ধ্বংস হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا-[২৪]

‘তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধ মালিকগণের হাতে অর্পণ করো না; তা থেকে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সঙ্গে সদালাপ করবে’।

তিন. চুরি করা হারাম

ইসলামী শরী‘আতে চৌর্যবৃত্তির নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কেননা তা হারাম। চৌর্যবৃত্তির কারণে সম্পদ অরক্ষিত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। এই কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যই আল্লাহ তা‘আলা চোরের শাস্তি হিসেবে হাত কাটার বিধান আরোপ করেছেন। তিনি বলেন-

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -[২৫]

‘পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, ইসলামী শরী‘আতে চৌর্যবৃত্তি নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে সম্পদকে বিশেষভাবে নিরাপদ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাযী আয়ায (রহ.) বলেন-

صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق فعظم أمرها واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها[২৬]

‘আল্লাহ তা‘আলা চোরের শাস্তি হিসেবে তার হাত কাটার মাধ্যমে সম্পদসমূহকে নিরাপদ করেছেন’।

চার. ডাকাতি ও ছিনতাই করা হারাম

রাস্তায় বা পথিমধ্যে মানুষের সম্পদ জোরপূর্বক লুণ্ঠন বা ডাকাতী করা ইসলামী শরী'আত নিষিদ্ধ করেছে। আর মানুষের সম্পদ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্যই উক্ত অপরাধের বিপরীতে ইসলামী শরী'আত কঠোর শাস্তির ঘোষনা করেছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ-[২৭]

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটি তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে'।

পাঁচ. অবৈধভাবে সম্পদ আহরণ করা হারাম

অন্যায়-অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা ও আহরণ করা ইসলামী শরী'আত নিষিদ্ধ করেছে। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে এসেছে-

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ-[২৮]

'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না'। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন কাসীর (রহ.) বলেন- আলী ইবনে আবী তালহা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, এটি এমন একজন ব্যক্তির ব্যাপারে যার কাছে অর্থ আছে কিন্তু তার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, সুতরাং সে অর্থকে অস্বীকার করে এবং বিচারকের সাথে মতবিরোধ করে, এবং সে জানে যে তার উপর সত্য রয়েছে এবং সে জানে যে, সে একজন হারাম ভক্ষণকারী পাপী'।[২৯]

ছয়. সরকারী সম্পদ নষ্ট করা হারাম

ইসলামী শরী'আতে সরকারী সম্পদ বা জনগণের সম্পদ ধ্বংস করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এরকম সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে ইসলামী শরী'আত স্বয়ং গ্যারান্টার হয়েছে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ-[৩০]

'রাসূল (স.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি পরিশোধের নিয়তে কারো সম্পদ গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যদি ধ্বংস বা নষ্ট করার নিয়তে কেউ কারো সম্পদ গ্রহণ করে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ধ্বংস করে দেন'।

ইবন কুদামাহ (রহ.) ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মাসআলা ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্ত নীতি বা সূত্রের আলোকে- **الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل والمتقوم بالمتقوم** 'বস্তুর পরিবর্তে বস্তু বা মূল্যের পরিবর্তে মূল্য'। তিনি আরো বলেন যে- যে ব্যক্তি কোন কিছু অপহরণ বা জবরদখল করল, তার উপর তা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি কেউ কোন কিছু ধ্বংস করে তাহলে তার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক।[৩১] এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ[৩২]

‘পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। যার পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয় তার অবমাননা সকলের জন্য সমান। সুতরাং যে কেহ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকিনদের সঙ্গে থাকেন’। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কেউ যদি কোন সম্পদ অপহরণ বা জবরদখল করে তাহলে তাকে হুবহু ঐ শ্রেণির সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক। কেননা গুণে ও মানে কিছু ঘাটতি হলেও তা মূল্যের চেয়ে বেশি নিকটবর্তি।

এভাবেই বিভিন্ন কলা-কৌশল ও নিয়ম-নীতি এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী শরী‘আতে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা ঘোষনা করে বাস্তবায়নও করেছে। যা আজও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে বর্তমান আছে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইসলামী শরী‘আত অত্যন্ত ন্যায়ানুগ এবং বাস্তবসম্মত ব্যবস্থাপনা দিয়েছে। এ আলোচনা থেকে আরো স্পষ্ট যে-

- সম্পদ সংরক্ষণ বলতে সম্পদের এমন ব্যবহারকে বুঝায়, যেন ঐ সম্পদ যথাসম্ভব অধিক সংরক্ষণ ও দীর্ঘ সময়ব্যাপি সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়।
- সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইসলাম অত্যন্ত ফলপ্রসু ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে। ইসলাম এই সংরক্ষণের উপায়-উপকরণ গুলো দুই স্তরে বিন্যস্ত করেছে। (১) পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা (২) আইনগত বা বিধি-নিষেধমূলক ব্যবস্থাপনা।
- ইসলামী শরী‘আতের দেয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমরা যদি কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারি তাহলে একদিকে যেমন সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যাবে তেমন এর দ্বারা মানুষের উপকৃত হওয়ার বিষয়টিও সহজ ও সুগম করা যাবে।

অতএব, সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য এবং অনাগত ভবিষ্যতে মানব জাতির উপকারার্থে যাবতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করা আমাদের উচিৎ। এক্ষেত্রে আমরা ইসলামী শরী‘আতের দেয়া ব্যবস্থাপত্র কাজে লাগাতে পারি।

তথ্যনির্দেশ

১ আল-কুরআন, ২:২৮২

২ ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুআনীল আযীম* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০১১ খ্রি), খ.১,পৃ.৩৩৪

৩ دَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ، أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: «هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ» (ইবন মাজাহ, হা: ২২৫১, মাকতাবাতুশ শামেলাহ, ২য় সংস্করণ দ্র:)

৪ পরিচ্ছেদ: ওয়াকফ কিভাবে লেখা হবে (ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, ঢাকা: তাওহীদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি:), খ.৩, পৃ.১০৫

৫ সামাগ: ওমার রা. এর মদীনাস্ত বা খায়বারের ওয়াকফকৃত মাল বা ধন-সম্পত্তি। وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ ، وَكَانَ نَخْلاً (*আস-সহীহ লিল বুখারী*, হা:২৭৬৪ দ্র:)

৬ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، " عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَسَخَهَا لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ فِي ثَمْغٍ، فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نَافِعٍ، قَالَ: «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ». قَالَ: وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ: وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ. وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ، وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ (সুনানু আবি দাউদ, পূর্বোক্ত, হা:২৮৭৯ দ্র:)

৭ আব্দুল লতিফ আস-সাবকী, *নাযরাতু ফি তাওসীকিল মুআমেলাতিল মালিয়াহ: উদ্ধৃত; সম্পাদনা পরিষদ: মাজাল্লাতুল আজহার* (কায়রো: আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯ খ্রি:) মুহাররম সংখ্যা, পৃ.১১৪

৮ আল-কুরআন, ২:২৮২।

৯ ইমাম কুরতুবী, *আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন*, (দামেস্ক: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, ১৯৯৫ খ্রি:), খ.৩, পৃ.৩৮৩

১০ ইবনুল আশূর, *আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর* (বৈরুত: দারুল কলম, ২০১৪ খ্রি:), খ.৩, পৃ.১০০
قطع المنازعة؛ فإن الكتاب يصير حكما بين المتعاملين ويرجعان إليه عند المنازعة، فيكون سببا لتسكين الفتنة ،فلا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن يخرج الكتاب، وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناس

১১ আশ-শাফেয়ী, *আহকামুল কুরআন* (দেমাস্ক: মাকতাবা নাশরুস সাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৫৩ খ্রি.), খ.১, পৃ.১৩৭

১২ আল-কুরআন, ২:২৮২

১৩ আল-কুরআন, ৪:১৬৬

১৪ আলী মূসা হুসাইন, *মাকসাদু হিফযিল মাল ফিত তাসাররফাতিল মালিয়া যাওয়াবিতুহু ওয়া আসারুহু*, পিএইচ.ডি থিসিস পাণ্ডুলিপি (আলজেরিয়া: বাতনা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০ খ্রি:), পৃ.১৬৪-১৬৬

১৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭১-১৭৩

১৬ আল-কুরআন, ২:২৮৩

১৭ বিস্তারিত দেখুন: আল-কুরআন, ২:২৮৩
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

১৮ ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, হা:২৫০৯, ২৫১৩
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

১৯ আল-কুরআন, ৭:৩১

২০ আল-কুরআন, ১৭:২৬

২১ ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, হা:২৪০৮

২২ ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী* (বৈরুত: দারুল মা'রেফা, ১৩৭৯ হি:), খ.১০, পৃ.৪০৮

২৩ আল-কুরআন, ৪:৫। ইবনু সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন- "নির্বোধ বোকা সেই, যে সুষ্ঠ, সুন্দর ও পরিকল্পিতভাবে সম্পদ খরচে অক্ষম। হতে পারে তার জ্ঞানের ঘাটতির কারণে অথবা বয়োপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে। অতঃপর একারণেই আল্লাহ নির্বোধদের অভিভাবকদের তাদের সম্পদ দিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, শুধুমাত্র সে সম্পদ নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকায়"। (*তাইসীরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীরি কালামিল মান্নান*, (দাম্মাম: দারু ইবনে জাওযী, ১৪২৬ হি:) পৃ.১৬৪ দ্র:)

২৪ আল-কুরআন, ৫:৩৮

২৫ ইমাম নববী, *আল-মিনহাজ শারহু সহীহ মুসলীম* (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৩৯২ হি:), খ.১১, পৃ.১৮০

২৬ আল-কুরআন, ৫:৩৩

২৭ আল-কুরআন, ২:১৮৮

২৮ *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, তাহকীক: সামী ইবন মুহাম্মাদ সালামাহ্ (দারুত তাইয়্যেবাহ, ১৯৯৯ খ্রি:), খ.১, পৃ.৫২১

২৯ ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত হা:২৩৮৭

৩০ *ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী* (মাকতাবাতুল কাহেরাহ, তাবি), খ.৮, পৃ.৩০১,৩১৭

৩১ আল-কুরআন, ২:১৯৪

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন: বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*

Abstract: The book *'Al-Itqan fi Ulumil Quran'* written by Jalaluddin As-Suyuti (R) is an impeccable book on Ulumul Quran. In it, the descriptions of various sciences of the Quran have been presented in a neat and beautiful manner. The book is divided into eighty chapters. Almost all the subjects of Ulumul Quran have been briefly described in this book. The book is characterized by various features. Students, teachers and readers of Ulumul Quran will be benefited immensely from this book. Realizing the importance and necessity of the book, it has been included in the syllabus of higher educational institutions in India, Pakistan, Bangladesh and Arab world. The book has been translated into various languages including English, Urdu, Turkish and Bengali. We have discussed the book *'Al-Itqan fi Ulumil Quran'* in this article in a rational way.

ভূমিকা

জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী[১] (র) (মৃত ৯১১ হি.) ছিলেন হিজরী নবম শতাব্দীর[২] একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি ছিলেন একাধারে হাফিয, ইমাম, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, ফকীহ্, আদীব, নাহুবীদ, রিজাল শাস্ত্রবিদ, ইতিহাস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। তিনি প্রায় ছয়শত উস্তাদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যাও ছিল অনেক। তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ, আরবী সাহিত্য, নাহু ও ইতিহাস শাস্ত্র সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয়শত। এসকল কারণেই তিনি পরবর্তী যুগের মনীষীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে রয়েছেন। আস্-সুয়ূতী (র) উলূমুল কুরআন বিষয়ক সর্বমোট তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। যথা- ক. আত্-তাহবীর ফী উলূমিত্-তাফসীর (**اَلتَّحْبِيْرُ فِىْ عُلُوْمِ التَّفْسِيْرِ**), খ. কিতাবুল ইতকান ফী উলূমিল-কুরআন (**كِتَابُ الْاِتْقَانِ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْآنِ**), গ. মু'তারাকুল আকরান ফী ই'জাযিল-কুরআন (**مُعْتَرَكُ الْاَقْرَانِ فِىْ اِعْجَازِ الْقُرْآنِ**)। উলূমুল কুরআন বিষয়ে উপর্যুক্ত তিনটি গ্রন্থের মধ্যে *'আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন'* সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থটির বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থ রচনার ইতিহাস

জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) ছাত্রকাল থেকে এ বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলেন যে, মুতাকাদ্দিমীন আলিমগণ উলূমুল হাদীছ বিষয়ে যেভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন উলূমুল কুরআন বিষয়ে তেমনটি করেননি। এরপর যখন তিনি আল-বুলকায়নী (র) (মৃত ৮২৪ হি.) কর্তৃক রচিত *'আত-তায়সীর ফী কাওয়াইদি ইলমিত-তাফসীর'* ও *'মাওয়াকিইল উলূম মিন মাওয়াকিইন নুজূম'* গ্রন্থদ্বয় দেখলেন, তখনই তাঁর মনে এমন একটি গ্রন্থ রচনার আকাঙ্ক্ষা জন্মায় এবং তিনি *'আত্-তাবহীর ফী ইলমিত-তাফসীর'* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এরপর তাঁর মনে এমন চিন্তার উদয় হয় যে, উলূমুল কুরআন বিষয়ে এর চেয়ে অধিক বিস্তৃত এমন একটি গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন, যাতে সকল বিষয় সন্নিবেশিত থাকে। এ চিন্তাটি দীর্ঘদিন মনে বাসা বেঁধে ছিল। একসময় তিনি বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন বাহাদুর ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আয্-যারাকশী (র) (মৃত ৭৯৪ হি.) কর্তৃক রচিত *'আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন'* গ্রন্থটি সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করেন। এতে তার প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা আরো দৃঢ় হয়। ফলে তিনি ৮৭৮ হিজরীতে মাত্র ঊনত্রিশ (২৯) বছর বয়সে *'আল-ইতকান ফী উলূমিলি কুরআন'* নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন।

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থের পরিচয়

এ বিশাল জ্ঞানকোষে আল-কুরআনে বিধৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- আল-কুরআনের আয়াতসমূহ, অবতীর্ণ হওয়ার স্থানসমূহ, সময় ও সে সময়ের ঘটনা, কিরাআতসমূহ ও কুরআন রিওয়ায়াতের সনদসমূহ, কুরআনী শব্দসমূহ ও তাজবীদ, কুরআনের হুকুমসমূহ; যেমন- আম-খাস, মুবায়্যা-মুজমাল, মুতলাক-

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুকায়্যাদ, নাসিখ-মানসূখ ইত্যাদি কুরআন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান। পাশাপাশি এসকল বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও উদাহরণের জন্য কিছু শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অত্র গ্রন্থটিকে এ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও আলোচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা অতীতে উলূমুল কুরআন বিষয়ে রচিত সকল বিষয়সমূহকে তিনি এ গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। গ্রন্থটিতে উলূমুল কুরআনের আশিটি (৮০) প্রকার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর প্রত্যেক প্রকারের আলোচনার পর তিনি বলেছেন, "যদি গ্রন্থে সকল বিষয়সমূহকে পৃথক পৃথক প্রকারে বর্ণনা করতাম, তাহলে এর প্রকারের সংখ্যা তিন শতাধিক হতো।"

আস্-সুয়ূতী (র) (মৃত ৯১১ হি.) তাঁর সুবৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ *'মাজমাউল বাহ্রায়ন ওয়া মাত্লা'উল বাদ্রায়ন'* গ্রন্থের ভূমিকায় উলূমুল-কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি আল-কুরআনুল কারীমের একশত দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। এই গ্রন্থের মূলভিত্তি আল-বুলকায়নী (র) (মৃত ৮২৪ হি.) কর্তৃক প্রণীত মাওয়াকি'উল 'উলূম মিন মাওয়াকি'উন্-নুজূম (**مَوَاقِعُ الْعُلُوْمِ مِنْ مَوَاقِعِ النُّجُوْمِ**) গ্রন্থ। এর দুটি পাণ্ডুলিপি কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৩]

গ্রন্থটি রচনার কাজ সমাপ্ত করার পর জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) (মৃত ৯১১ হি.) আয্-যারকাশীর *'আল-বুরহান ফী উলূমিল-কুরআন'* গ্রন্থটি সম্পর্কে অবহিত হলেন, তিনি উক্ত গ্রন্থটিকে সামনে রেখে পুনরায় প্রথম থেকে *'মাজমা'উল বাহ্রায়ন'*-এর ভূমিকা লিখতে শুরু করেন। গ্রন্থটি ৮৭৮ হিজরীতে পূর্ণতা লাভ করে। এই ভূমিকাই *'আল-ইতকান ফী উলূমিল-কুরআন'* নামে প্রসিদ্ধ। আস্-সুয়ূতী (র) তাঁর গ্রন্থে আরও ৩৩টি বিষয় সংযোজন করেন। গ্রন্থটিতে তিনি আশিটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'আমি আলোচনা সংক্ষিপ্ত করেছি।'[৪] জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ সম্পর্কে বলেন,

فَهَذِهِ ثَمَانُونَ نَوْعًا عَلَى سَبِيلِ الْإِدْمَاجِ وَلَوْ نَوَّعْتُ بِاعْتِبَارِ مَا أَدْمَجْتُهُ فِي ضِمْنِهَا لَزَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِمِائَةِ وَغَالِبُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فِيهَا تَصَانِيفُ مُفْرَدَةٌ وَقَفْتُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهَا. وَمِنَ الْمُصَنَّفَاتِ فِي مِثْلِ هَذَا النَّمَطِ وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ مِثْلَهُ وَلَا قَرِيبًا مِنْهُ وَإِنَّمَا هِيَ طَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ ونبذة قصيرة وفنونِ الْأَفْنَانِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ لِابْنِ الجوزي وجمال الْقُرَّاءِ لِلشَّيْخِ عَلَمِ الدِّينِ السَّخَاوِيِّ والمرشد الْوَجِيزُ فِي عُلُومٍ تَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ الْعَزِيزِ لِأَبِي شامة والبرهان فِي مُشْكَلَاتِ الْقُرْآنِ لِأَبِي الْمَعَالِي عَزِيزِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَعْرُوفُ بِشَيْذَلَةَ وَكُلُّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَوْعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ كَحَبَّةِ رَمْلٍ فِي جَنْبِ رَمْلٍ عَالِجٍ وَنُقْطَةِ قَطْرٍ في حيال بَحْرٍ زَاخِرٍ.[৫]

"এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয় আশি প্রকারে বিভক্ত। যদি তার সবগুলো প্রকার আকারে বিন্যস্ত করতাম তাহলে এ সকল প্রকারের সংখ্যা তিনশত অতিক্রম করত। এসকল প্রকারের অধিকাংশ বিষয়কে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, যার অধিকাংশ বিষয়ে আমি অবগত হয়েছি। এ ধরনের (আল-ইতকান গ্রন্থের মতো) গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে, বাস্তবে গ্রন্থগুলি অত্র গ্রন্থের মত তো নয়ই; বরং এর ধারেকাছেরও নয়, এগুলো হলো (অত্র গ্রন্থের) খুবই সামান্য অংশ বিশেষ। ইবনুল জাওযী (র) (মৃত ৭৫১ হি.) কর্তৃক রচিত *'ফুনূনুল আফনান ফী উলূমিল কুরআন'*, শায়খ আলিমুদ্দীন (র) কর্তৃক রচিত *'জামালুল কুররা'*, আবূ শামাহ (র) (মৃত ৬৬৫ হি.) কর্তৃক রচিত *'আল-মুরশিদুল ওয়াজিয ফী উলূমিন তাতা'আল্লাকু বিল-কুরআনিল আযীয'*, শায়যালাহ নামে প্রসিদ্ধ আবুল মা'আলী আযীযি ইব্‌ন আব্দিল মালিক (র) কর্তৃক রচিত *'আল-বুরহান ফী মুশকিলাতিল কুরআন'*। আল-ইতকান গ্রন্থের তুলনায় এসকল গ্রন্থের উদাহরণ এরূপ যেমন মরুভূমির পাশে এক মুঠো বালু বা উত্তাল সাগরের পাশে এক ফোটা পানি। এসকল গ্রন্থাবলীর নাম যেগুলো আমি গ্রন্থটি রচনার পূর্বে দেখেছি এবং সেগুলো থেকে সংক্ষিপ্ত করেছি।"

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থ রচনায় সহায়ক গ্রন্থবালী

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থটি রচনায় জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বহুসংখ্যক গ্রন্থের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন[৬], **وَهَذِهِ أَسْمَاءُ الْكُتُبِ الَّتِي نَظَرْتُهَا عَلَى هَذَا الْكِتَابِ وَلَخَّصْتُهُ مِنْهَا.** -'এই গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে আমি যে সব গ্রন্থের উপর দৃষ্টি দিয়েছি, সেগুলোর নাম নিম্নরূপ।'

ক. আন্-নাকলিয়্যাহ্ তথা কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্ভর গ্রন্থসমূহ

তাফসীর বিষয়ে ইব্ন জারীর (মৃত ৩১০ হি./৯২৩ খ্রি.), ইব্ন আবী হাতীম (মৃত ৩২৭ হি./৯৩৮ খ্রি.), ইব্ন মুরুদিয়া (মৃত ৪১০ হি./১০১৯ খ্রি.), আবূ শেখ ইব্ন হায়্যান (মৃত ৭৪৫ হি.), আল-ফিরয়াবী (মৃত ৩০১ হি./৯১৩ খ্রি.), আব্দুর রায্যাক (মৃত ২১১ হি.), ইবনুল মুনযির (মৃত ৩১৭ হি.), সা'দ ইব্ন মানসূর (এটি মূলত তাঁর রচিত আস-সুনান গ্রন্থের অংশ বিশেষ), তাফসীরুল হাকিম (এটি মূলত তাঁর রচিত আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থের অংশ বিশেষ), হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাছীর (র) (মৃত ৭৭৪ হি.)-এর ফাযাইলুল কুরআন, আবূ উবায়দ (মৃত ২২৪ হি.)-এর ফাযাইলুল কুরআন, ইবনুদ-দারীসের ফাযাইলুল কুরআন, ইব্ন আবী শায়বাহ (র) (মৃত ২৩৫ হি./৮৫০ খ্রি.)-এর ফাযাইলুল কুরআন, ইব্ন আবী দা'উদ (মৃত ৩১৬ হি./৯২৯ খ্রি.)-এর আল-মাসহাফ, ইব্ন আশতাত-এর আল-মাসাহিফ, আবূ বকর ইবনুল আম্বারী (মৃত ৫৭৭ হি.)-এর আর-রাদ্দু আলা মান খালাফা মুসহাফ উছমান, আল-আজুরীর আখলাকু হামালাতিল কুরআন, নববী (মৃত ৬৭৬ হি./১২৭৮ খ্রি.)-এর আত্-তিবইয়ান ফী আদাবিল হামালাতিল কুরআন এবং ইব্ন হাজার (মৃত ৮৫২ খ্রি.)-এর শারহুল বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উৎস গ্রহণ করা হয়েছে।[৭]

খ. জাওয়ামি' ও মুসনাদ বিষয়ক হাদীছ গ্রন্থ

এই গ্রন্থটি রচনায় অসংখ্য ও অগণিত মুসনাদ এবং জামি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে।

গ. কিরাআত সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ

আস্-সাখাভী (র) (মৃত ৬৪১ হি.)-এর জামালুল কুরআন, ইবনুল জাযারীর (মৃত ৮৩৩ হি./১৪২৯ খ্রি.) আন্-নাশরু ওয়াত্-তাকরীব, আল-হুযাল্লীর আল-কামিল, আল-ওয়াসতীর আল-ইরশাদু ফিল কিরাআতিল আশার, ইব্ন গালবূন (মৃত ৩৮৯ হি.)-এর আশ্-শাওয়ায, ইব্নুল আম্বারী (মৃত ৩২৮ হি.), আন্-নাহ্হাস (মৃত ৩৩৮ হি.), আদ্-দানী (মৃত ৪৪৪ হি./১০৫৩ খ্রি.), আস্-সাজাওয়ানদী (মৃত ১১৭৬ খ্রি.), আল-আম্মানী ও ইব্নুন্-নাকযাভী (র)-এর আল-ওয়াক্ফু ওয়াল ইবতাদা। ইবনুল কাসিহ্ (মৃত ৭১৬ হি./১৩৯৯ খ্রি.)-এর কুর্রাতুল আয়নি ফিল-ফাত্হি ওয়াল ইমালাতি বায়নাল্-লাফযায়ন।[৮]

ঘ. আরবী অভিধান ও ই'রাব সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহ

আর্-রাগিব আল-ইস্পাহানী (র.) (মৃত ৫০২ হি./১১০৮ খ্রি.)-এর আল-মুফরাদাত, ইব্ন কুতায়বাহ্ (মৃত ২৭৬ হি./৮৮৯ খ্রি.) ও আল-গুযায়যীর গারীবুল কুরআন, ইব্ন আব্দিস সামাদ ও আন্-নায়সাপূরীর আল-ওযূহু ওয়ায্-যানাইর, ইবনুল হুসায়ন আল-আখফাশ (মৃত ৩১৫ হি.)-এর আল-ওয়াহিদু ওয়াল-জাম'উ ফিল কুরআন, ইব্নুল আম্বারী (মৃত ৩২৮ হি.)-এর আয্-যাহিরু, আবূ হায়্যান (মৃত ৭৪৫ হি.)-এর শারহুত্-তাসহীল ওয়াল-ইরতিশাফ, ইব্ন হিশাম (মৃত ২১৩ হি./৮২৮ খ্রি.)-এর আল-মুগনী, ইব্ন উম্মিল কাসিম (র)-এর আল-জানাইদ্-দানী ফী হুরূফিল মা'আনী, আবুল বাকা (মৃত ৬০১ হি./১২৮৫ খ্রি.)-এর ই'রাবিল কুরআন।[৯]

ঙ. আহ্কাম সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহ

কাযী ইসমা'ঈল, বাক্র ইব্নিল আলা, আবূ বকর আর-রাযী (মৃত ৩৭০ হি./৯৮০ খ্রি.), আল-কিয়া আল-হুর্রাসী, ইবনুল আরাবী (মৃত ৫৪৩ হি./১১৪৮ খ্রি.), ইবনুল ফারাস ও ইবনিল খুওয়ায মানদাদা (র)-এর আহ্কামুল কুরআন, ইবনুল হাস্সার, সা'ঈদী, আবূ জা'ফর আন্-নুহ্হাস (মৃত ৩৩৮ হি.), আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী (মৃত ৩৩০ হি.), আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (মৃত ২২৪ হি./৮৩৮ খ্রি.), আবূ মানসূর আব্দিল কাহির ইব্ন তাহির আত্-তামীমী ও শায়খ ইয্যুদ্দিন ইব্ন আব্দিস সালাম (র)-এর আন্-নাসিখ ওয়াল মানসূখ।[১০]

চ. উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থসমূহ

আল-কারমানী (মৃত ৫০০ হি.)-এর আল-বুরহান ফী মুতাশাবিহিল কুরআন, আবূ আব্দির রায্যাক (মৃত ২১১ হি.)-এর দুররাতুত্-তানযীল ওয়া গুররাতুত্-তা'বীল ফিল মুতাশাবিহী, কাযী বদরুদ্দিন ইব্ন জামা'আতের কাশফুল মা'আনী আন মুতাশাবিহিল মাছানী। আল-মাওয়ারদী (মৃত ৪৫০ হি.)-এর আমছালুল কুরআন, ইব্নুল কায়্যিম (মৃত ৭৫১ হি./১৩৫০ খ্রি.)-এর আকসামুল কুরআন, আল-গাযালী (মৃত ৫০৫ হি./১১১১ খ্রি.)-এর জাওয়াহিরুল কুরআন, আস্-সুহায়লীর আত্-তা'রীফ ওয়াল আ'লাম ফীমা ওয়াকা'আ ফিল-কুরআন মিনাল আসমাই ওয়াল আ'লাম। ইব্ন আসাকির (মৃত ৫৭১ হি./১১৭৬ খ্রি.)-এর আয্-যায়ল, কাযী বদরুদ্দীন ইব্ন জামা'আতের আত্-তিবইয়ান ফী

মুবহামাতিল কুরআন। ইব্নুল লাবানের শারহু আয়াতিস্ সিফাত, আল-ইয়াফি‘ঈ (মৃত ৭৬৮ হি./১৩৬৭ খ্রি.)-এর আদ্-দুররু আন্-নাযীমু ফী মানাফি‘ঈল কুরআনিল আযীম।[১১]

ছ. রাস্ম সম্পর্কিত গ্রন্থ

আদ্-দানী (মৃত ৪৪৪ হি./১০৫৩ খ্রি.)-এর আল-মুতান্না‘উ, আস্-সাখাভী (মৃত ৬৪১ হি.)-এর শারহুর রাইয়াহ্ এবং ইব্ন জুবারাহ্র শরাহ্ গ্রন্থ।

জ. জামি‘ সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ

ইবনুল কায়্যিমের বাদাই‘উল ফাওয়াইদ, শায়খ ইয্যুদ্দীন ইব্ন আব্দিস সালামের কানযুল ফাওয়াইদ, শারীফ আল-মুরতাদার আল-গুরার ওয়াদ্-দুরার, ইব্নুস্ সাহিবের তাযকিরাতুল বাদ্র, ইব্ন শাবীব আল-হাম্বলীর জামি‘উল ফুনূন, ইব্নুল জাওযীর আন্-নাফীস ও আবুল লায়ছ আস্-সামারকান্দীর আল-বুস্তান।

ঝ. মুহাদ্দিছ নন এমন আলিমগণের তাফসীর গ্রন্থসমূহ

আত্-তায়্যিবির আল-কাশ্শাফ ও হাশিয়াহ্, ফখরুদ্দীন আর-রাযী (মৃত ৬০৬ হি./১২১০ খ্রি.)-এর তাফসীর, আল-ইস্পাহানী (মৃত ৫০২ হি./১১০৮ খ্রি.), আল-হাওয়াফী, আবূ হায়্যান (মৃত ৭৪৫ হি.), ইব্ন আতিয়্যাহ্ (মৃত ৭২৮ হি.), আল-কুশায়রী, আল-মুরসী, ইবনুল জাওযী (মৃত ৫৯৭ হি.), ইব্ন আকীল, ইব্ন রাযীন, আল-ওয়াহিদী, আল-কাওয়াশী, আল-মাওয়ারদী (মৃত ৪৫০ হি.), ইমামুল হারামাইন সুলায়ম আর-রাযী, ইব্ন বার্রাহান, ইব্ন বাযীযাহ, ইব্নুল মুনীর (র)-এর তাফসীর গ্রন্থ। আর-রাফি‘ঈর আল-আমালী, ইবনুন্-নাকীবের তাফসীরু ফাতিহার মুকাদ্দামাহ্।[১২]

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেকটি গ্রন্থই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমাদৃত। তদ্রূপ জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) রচিত ‘আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন’ গ্রন্থটির দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এ গ্রন্থটিও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ পর্যন্ত উলূমুল কুরআন বিষয়ে যতগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে ‘আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন’ গ্রন্থটি অসাধারণ ও স্বতন্ত্র মর্যাদায় উপনীত হয়েছে। নিম্নে গ্রন্থটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

১. গ্রন্থটি উলূমুল কুরআন বিষয়ে অনবদ্য একটি গ্রন্থ। এতে উলূমুল কুরআনের কিছু কিছু বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- মাক্কী, মাদানী, নাসিখ, মানসূখ, আম, খাস ও মুফাস্সিরগণের তাবাকাত এর বিবরণ।
২. গ্রন্থটিকে দিরাসাতুল কুরআন বিষয়ে উম্মাহাতুল কুতুব বা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রন্থকার কুরআনের এমন সংকলনে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। কেননা এমন সংকলন অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠকবৃন্দ আত্মতৃপ্তি লাভ করেন এবং মুগ্ধ হয়ে থাকেন।
৩. গ্রন্থটির অধ্যায় বিন্যাস অত্যন্ত চমৎকার। গ্রন্থকার অধিকাংশ অধ্যায়ের আলোচনা আরম্ভ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা দ্বারা।
৪. গ্রন্থটির আলোচনায় সকল বিষয়ের বর্ণনায় প্রথমে আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহ গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে সকল মাসআলার প্রয়োজনীয়তা নেই এমন অলোচনা থেকে সাধারণত দূরে থাকা হয়েছে।
৫. আস্-সুয়ূতী (র) উলূমুল কুরআন বিষয়ের অধিকাংশ স্থানে আহলুল ইলমগণের বাণীসমূহ সহজ ও সাবলীল ভাষায় সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন।
৬. গ্রন্থটিতে আয্-যিরাক্শী (র) রচিত ‘আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন’ গ্রন্থ থেকে বহুসংখ্যক তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এজন্য আস্-সুয়ূতী (র) বহু স্থানে আয্-যিরাকশী (র) ও তাঁর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে আলোচনা উত্থাপন করেন। আল-বুরহান ব্যতিত অন্যান্য উলূমুল কুরআন, তাফসীর, তারীখুত্ তাফসীর, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন গ্রন্থ থেকেও বহুসংখ্যক বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. এতে সিহাহ সিত্তাহর হাদীছ গ্রন্থসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ থেকেও উৎসাবলী গ্রহণ করা হয়েছে। সিহাহ সিত্তাহ্ ব্যতিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আল-মুওয়াত্তা, আল-মুসনাদ, আল-মুসতাদরাক, বায়হাকীর দালালুন্ নুবুওয়্যাত, শু'আবুল ঈমান, তাবারানীর আল-মু'জামুল আওসাত, আল-মু'জামুল কাবীর, ইব্‌ন হিব্বানের সহীহ ইব্‌ন হিব্বান।

৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ গ্রন্থে উদ্ধৃত বক্তব্যের সমালোচনা করা হয়েছে। মতামতগুলো দুর্বল, সনদ বিহীন ও ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় এরূপ সমালোচনা করা হয়েছে।

৯. গ্রন্থটিতে আশিটি শিরোনাম নির্ধারণ করে তার অধীনে বিষয়বস্তুসমূহের আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটি তাঁর পূর্বের ও পরের উলূমুল কুরআন বিষয়ক রচিত সকল গ্রন্থ থেকে উত্তম হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কেননা পরবর্তীতে উলূমুল কুরআন বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সে সকল গ্রন্থের লেখকবৃন্দ 'আল-ইতকান' গ্রন্থ থেকে সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন-এর বিষয়বস্তু পর্যলোচনা ও মূল্যায়ন

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থে এমন সকল বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা কুরআনের সঠিক মর্মার্থ বুঝতে সহায়তা করে থাকে। কুরআনের মমার্থ উদ্‌ঘাটনে গবেষকগণের নিকট গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। গ্রন্থটিকে সর্বমোট আশিটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের জন্য পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে গ্রন্থটির অধ্যায় ভিত্তিক পর্যালোচনা করা হলো:

প্রথম অধ্যায়: মাক্কী ও মাদানী আয়াতসমূহের পরিচিতি (فِي مَعْرِفَةُ اَلْمَكِّيُّ وَالْمَدَنِيُّ): এ অধ্যায়ের প্রথমে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) আল-মাক্কী ও আল-মাদানী সূরার পরিচয় প্রদানে আলিমগণের তিনটি মতামত বর্ণনা করেছেন। তা নিম্নরূপ:

أَشْهَرُهَا: أَنَّ الْمَكِّيَّ مَا نَزَلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَالْمَدَنِيَّ مَا نَزَلَ بَعْدَهَا سَوَاءٌ نَزَلَ بِمَكَّةَ أَمْ بِالْمَدِينَةِ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ أَمْ بِسَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ.

-'প্রসিদ্ধ মতে, হিজরতের পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাই মাক্কী এবং হিজরতের পর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাই মাদানী। হিজরতের পর যা অবতীর্ণ হয় তা মক্কায় অবতীর্ণ হলেও মাদানী বলে গণ্য হবে। যেমন- মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার অবতীর্ণ আয়াতসমূহ। বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হওয়া আয়াতসমূহ অথবা বিভিন্ন সফরে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ।'

এরপর তিনি উছমান ইব্‌ন সা'ঈদ আদ্-দারিমী (র)-এর সনদে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সালাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

مَا نَزَلَ بِمَكَّةَ وَمَا نَزَلَ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَهُوَ مِنَ الْمَكِّيِّ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَسْفَارِهِ بَعْدَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَهُوَ مِنَ الْمَدَنِيِّ وَهَذَا أَثَرٌ لَطِيفٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا نَزَلَ فِي سَفَرِ الْهِجْرَةِ مَكِّيٌّ اصْطِلَاحًا.

-'মক্কায় যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায় পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত মদীনায় গমনের সময় যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মাক্কী। আর মদীনায় আগমনের পর নবী করীম (সা)-এর বিভিন্ন সফর অবস্থায় যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মাদানী। হিজরতের সময় যা অবতীর্ণ হয়, পরিভাষাগত দিক থেকে তা মাক্কী।'

الثَّانِي: أَنَّ الْمَكِّيَّ مَا نَزَلَ بِمَكَّةَ وَلَوْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَالْمَدَنِيُّ مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ وَعَلَى هَذَا تَثْبُتُ الْوَاسِطَةُ فَمَا نَزَلَ بِالْأَسْفَارِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَكِّيٌّ وَلَا مَدَنِيٌّ.[১৩]

-'দ্বিতীয়ত মক্কায় যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মাক্কী। যদিও তা হিজরেতর পর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর কুরআনের যে অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে তা মাদানী। এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে মাক্কী ও মাদানীর মাঝামাঝি আরো একটি অবস্থা সাব্যস্ত হয়। আর তা হলো সফরে অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের অংশকে মাক্কীও বলা যায় না এবং মাদানীও বলা যায় না।'

সুয়ূতী (র) এ প্রসঙ্গে একটি হাদীছ উল্লেখ করেন। হাদীছটি তাবারানী (র) তাঁর সনদের মাধ্যমে 'আল-কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আবূ উমামা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,[১৪] أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي ثَلَاثَةِ أَمْكِنَةٍ: مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَالشَّامَ -'আল-কুরআন তিনটি স্থানে অবতীর্ণ হয়। মক্কা, মদীনা এবং শাম।' ওয়ালীদ (র) বলেন, يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ -'এখানে শাম বলে বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন কাছীর (র)-এর মতে, بَلْ تَفْسِيرُهُ بِتَبُوكٍ أَحْسَنُ-'এর দ্বারা তাবূক' বুঝাই উত্তম।'

সুয়ূতী (র) বলেন, 'ঐ সকল আয়াতও মাক্কী বলে গণ্য হয়, যা মক্কার আশেপাশে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- মিনা, আরাফাত ও হুদায়বিয়ায় অবতীর্ণ আয়তসমূহ। আর ঐ সকল আয়াত মদানী বলে গণ্য হয়- যা মদীনার আশেপাশে নাযিল হয়েছে। যেমন- বদর, উহুদ এবং সালা উপত্যকায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহ।'

الثَّالِثُ: أَنَّ الْمَكِّيَّ مَا وَقَعَ خِطَابًا لِأَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدَنِيَّ مَا وَقَعَ خِطَابًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَحُمِلَ عَلَى هَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْآتِي.

-'তৃতীয়ত যেসব আয়াতে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাক্কী। আর যেসব আয়াতে মদীনাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তা মাদানী। এ প্রসঙ্গে তিনি ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-এর হাদীছ উদ্ধৃত করেন।'

ইমাম বুখারী (র) এ হাদীছটি ইব্ন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ.[১৫]

-'শপথ ঐ পবিত্র সত্তার! যিনি ব্যতিত উপযুক্ত কোনো উপাসক নেই। পবিত্র কুরআনের এমন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি যা সম্পর্কে আমরা জানি না যে, উক্ত আয়াত কোথায় এবং কোন ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।'

আস্-সুয়ূতী (র) বলেন, 'এ বিষয়ে ইব্ন সা'দ (র)-এর 'আত্-তাবাকাত' গ্রন্থে আবূ সালমাহ্ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি উবায় ইব্ন কা'ব (রা)-কে আল-কুরআনের কোন কোন অংশ মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, শুধু ২৭টি সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশিষ্ট সম্পূর্ণ কুরআনই মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

সুয়ূতী (র) এরপর কোন সূরাগুলো মাক্কী এবং কোন সূরাগুলো মাদানী তা উল্লেখ করেছেন। মাক্কী সূরা উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম বায়হাকী (র)-এর দালাইলুন্-নুবুওয়্যাত গ্রন্থের বর্ণনাটি উল্লেখ করেন। এরপর মাদানী সূরাগুলো উল্লেখ করেন।

মতভেদপূর্ণ সূরাসমূহের শিরোনাম উল্লেখ করে তাতে মক্কা ও মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত সূরাসমূহের তালিকা উল্লেখ করেন। এরপর মাক্কী, মাদানী সূরা ও আয়াতসমূহ চিহ্নিতকরণের নিয়মাবলী, শিরোনাম ও কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: হাযারী ও সাফারী আয়াতসমূহের পরিচিতি (فِي مَعْرِفَةِ الْحَضَرِيِّ وَالسَّفَرِيِّ): এ অধ্যায়ে হাযারী ও সাফারী সূরাসমূহের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাযারী ঐ সব আয়াত বা সূরাকে বলা হয়, যা মক্কা অথবা মদীনায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। আল-কুরআনে এ বিষয়ে বহুসংখ্যক উদাহরণ এসেছে। সুয়ূতী (র) হাযারী ও সাফারী সূরা বিষয়ে বর্ণনা প্রদান করতে গিয়ে সাফারী সূরার উদাহরণ প্রদান করেছেন। কিন্তু হাযারী সূরার কোনো উদাহরণ প্রদান করেননি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ অধিকাংশ সূরাই হলো হাযারী। অল্পসংখ্যক সাফারী সূরার উদাহরণ পেশ করে অবশিষ্টগুলোকে হাযারী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সাফারী সে সমস্ত আয়াত ও সূরাকে বলা হয়, যা মক্কা-মদীনা ব্যতিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভ্রমণকালীন অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন-[১৬] وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى। সুয়ূতী (র) মাক্কী সূরার ক্ষেত্রে প্রায় সকল সূরার মধ্যে থেকেই অন্তত একটি করে উদাহরণ উল্লেখের পাশাপাশি হাদীছ থেকে উদাহরণ পেশ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়: নাহারী ওয়াল লায়লী আয়াতসমূহের পরিচিতি (مَعْرِفَةُ النَّهَارِيِّ وَاللَّيْلِيِّ): জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ে দিবাকালীন ও নৈশকালীন অবতীর্ণ আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছেন। যেমন-

আল-কুরআনের সে সমস্ত অংশকে নাহারী বলা হয়, যা দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কিত বহু সংখ্যক উদাহরণ রয়েছে। সুয়ূতী (র) ইব্ন জাবির (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আল-কুরআনের অধিকাংশ আয়াত দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়। এজন্য তিনি এসব উদাহরণ উল্লেখের প্রদান থেকে বিরত থাকেন।

আল-কুরআনের সে সমস্ত অংশকে লায়লী বলা হয়, যা রাত্রি বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সূরা থেকে উদাহরণ পেশ করেন। যেমন- আয়াতে তাহ্বীলুল কিবলা তথা কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত আয়াত। এ বিষয়ে তিনি বহু হাদীছ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়: আস্-সায়ফী ও আশ্-শিতাই অবতীর্ণ আয়াতসমূহের বর্ণনা (الصَّيْفِيُّ وَالشِّتَائِيُّ): এ অধ্যায়ে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সময়ে অবতীর্ণ আয়াত ও সূরাসমূহের আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বলেন, 'আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত এবং সূরাসমূহ বছরে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন এ দুসময়ে অবতীর্ণ হতো। গ্রন্থকার এ বিষয়ে ওয়াহিদী (র)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃতি করে বলেন যে, কালালা বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা দুটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। একটি হচ্ছে শীত মৌসুমে, যা সূরা নিসার প্রথমে এসেছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন সময়ে, যা সূরা নিসার শেষভাগে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি সায়ফী ও শিতাই আয়াতের উদাহরণ পেশ করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়: আল-ফারশী ওয়ান নাওমী অবতীর্ণ আয়াতসমূহের বর্ণনা (الفراشي والنومي): জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ে শয়নকালীন ও নিদ্রাকালীন সময়ে অবতীর্ণ আয়াতের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বলেন, ফারাশী দ্বারা আল-কুরআনের সে সমস্ত অংশ উদ্দেশ্য, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর স্বীয় স্ত্রীগণের হুজরাতে থাকাকালীন জাগ্রত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি এতদসংক্রান্ত কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। নাওমী দ্বারা আল-কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াতকে বুঝানো হয়, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিদ্রাকালীন অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- সূরা আল কাওছার।

ষষ্ঠ অধ্যায়: আসমান ও জমিনে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের বর্ণনা (الْأَرْضِيُّ وَالسَّمَائِيُّ): আল-কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ কখনো আসমান ও কখনো জমিনে অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কখনো এতদুভয়ের মধ্যস্থলে, কখনো পাহাড়ের চূড়ায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল-ইতকান গ্রন্থে এ সম্পর্কিত আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। ইবনুল আরাবী (র)-এর বর্ণনায় এসেছে, তামীমী (র)-কে হিবাতুল্লাহ্ আল-মুফাস্সির বর্ণনা করেন যে, পুরো কুরআন মক্কা এবং মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে ছয়টি আয়াত এমন রয়েছে যে, তা জমিনেও অবতীর্ণ হয়নি, আবার আসমানেও অবতীর্ণ হয়নি। তন্মধ্যে তিনটি আয়াত এই,[১৭]

"وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ."

সূরা আয্-যুখরুফ এর একটি আয়াত। আর সূরা আল বাকারার সর্বশেষ দুই আয়াত। এ আয়াতগুলো মি'রাজের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) উদাহরণ হিসেবে সূরা আল-মুরসালাতের উল্লেখ করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়: সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতের পরিচিতি (مَعْرِفَةُ أَوَّلِ مَا نَزَلَ): এ অধ্যায়ে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতসমূহের উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি পাঁচটি অভিমত উল্লেখ করেন। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অভিমত উল্লেখ পূর্বক আয়াত ও সহীহুল বুখারীর হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

অষ্টম অধ্যায়: সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতের পরিচিতি (مَعْرِفَةُ آخِرِ مَا نَزَلَ): এতে আল-কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে এগারটি মতামত বর্ণনা করা হয়েছে। এ মতামতগুলোতে সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীছ সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদু আহমাদ ও আল-মুসতাদরাক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়: সাবাবুন্ নুযূল পরিচিতি (مَعْرِفَةُ سَبَبِ النُّزُولِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের শানে নুযূল তথা কুরআনের অবতীর্ণের কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বিশদ বর্ণনা প্রদান করেন। এ প্রসেঙ্গ তিনি আল-ওয়াহিদী (র) ও আবুল ফযল ইব্ন হাজার (র)-এর গ্রন্থদ্বয় থেকে মতামত গ্রহণ করেন। আস্-সুয়ূতী (র) লিখেছেন,

وَقَدْ أَلَّفْتُ فِيهِ كِتَابًا حَافِلًا مُوجَزًا مُحَرَّرًا لَمْ يُؤَلَّفْ مَثْلُهُ فِي هَذَا النَّوْعِ سَمَّيْتُهُ: لُبَابُ النُّقُولِ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ.[১৮]

-'এ বিষয়ে আমার রচিত গ্রন্থটি একটি বিরল গ্রন্থ। এটির নাম লুবাবুন্ নুকূল ফী আসবাবিন্ নুযূল।'

এরপর আল-জা'বারী (র)-এর মতটি উদ্ধৃত করে তাঁর বর্ণিত দুটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি মোট পাঁচটি মাসআলা উল্লেখ করেন।

দশম অধ্যায়: কতিপয় সাহাবীর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী অবতীর্ণ আয়াতসমূহের বর্ণনা (فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى لِسَانِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ) : এতে সাহাবায়ে কিরামের মনের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা অনুযায়ী অবতীর্ণ আয়াতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এ প্রকারের আয়াত আসবাবুন্ নুযূল-এর অন্তর্ভুক্ত। এ অধ্যায়ে চারজন সাহাবী তথা উমার (রা), যায়দ ইব্ন হারিছা (রা), আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা) ও মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। সুয়ূতী (র) এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীছ উল্লেখ করে তা বর্ণনা করেন। যেমন- উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,[১৯] **إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ** -'আল্লাহ্ তা'আলা উমার (রা)-এর মনোবাসনা অনুযায়ী প্রকৃত হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'

একাদশ অধ্যায়: এগুলো একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েছে (مَا تَكَرَّرَ نُزُولُهُ): এতে আল-কুরআনের সে সকল আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এগুলোকে মুশাব্বাহ্র আয়াত বলা হয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাস্সিরগণের মত অনুযায়ী এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, আল-কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত ও সূরা একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- সূরা আন্-নাহলের শেষাংশ, সূরা আর-রূমের প্রথমাংশ। এ সম্পর্কে তিনি ইব্ন কাছীর (র)-এর মত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,[২০] **مِنْهُ آيَةَ الرُّوحِ. وَذَكَرَ قَوْمٌ مِنْهُ الْفَاتِحَةَ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ قَوْلَهُ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الْآيَةَ.** -'আয়াতুর রূহ্-এর অন্তর্ভুক্ত; কারো কারো মতে, সূরা ফাতিহা, কারো মতে, মাকানা লিন্-নাবিয়্যি ওয়াল্লাযীনা আমানূ।'[২১]

আয্-যিরাকশী (র) এ সম্পর্কে লিখেছেন,

قَدْ يَنْزِلُ الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ وَتَذْكِيرًا عِنْدَ حُدُوثِ سَبَبِهِ خوف نِسْيَانِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهُ آيَةَ الرُّوحِ وَقَوْلَهُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ الآيَة.[২২]

-'কোনো বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য এবং সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একাধিকবার অবতীর্ণ করা হয়। যেমন- **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ**।'

এছাড়া সূরা আল আস্র ও সূরা হূদ উভয়টি মক্কা এবং মদীনায় উভয় স্থানে দুবার অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা আল ইখলাস এবং মাকানা লিন্-নাবিয়্যি ওয়াল্লাযীনা আমানূ আয়াতটি কুরআনের এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে পড়া হয়। এগুলো মূলত একাধিকবার অবতীর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম বাগাভী (র) কিছু সংখ্যক আলিমের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে বলেন, 'এ ধরনের বিধান তথা হুকুমের পূর্বে আয়াত অবতীর্ণ হওয়া বৈধ এবং এক্ষেত্রে তিনি আল-কুরআনের তিনটি আয়াত দলীল হিসেবে পেশ করেন।'[২৩]

দ্বাদশ অধ্যায়: এ আয়াতের বর্ণনা, যার হুকুম আয়াত অবতীর্ণের পরে এবং যার নুযূল (অবতীর্ণ হওয়া) এর বিধানের পর হয়েছে (مَا تَأَخَّرَ حُكْمُهُ عَنْ نُزُولِهِ وَمَا تَأَخَّرَ نُزُولُهُ عَنْ حُكْمِهِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের ঐ সকল আয়াতের আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে, যার হুকুম উক্ত আয়াত অবতীর্ণের পর এবং যার অবতীর্ণ হওয়াটা হুকুমের পরে

হয়েছে। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ সম্পর্কিত আলোচনায় আয্-যিরাকাশী (র)-এর মতামত গ্রহণ করে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

قَدْ يَكُونُ النُّزُولُ سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾[২৪]

-'কখনো কখনো কুরআনের কোনো অংশ তার হুকুমের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, নিশ্চয় সাফল্য লাভ করে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, এরপর সালাত আদায় করে।'

সে সকল আয়াতের উদাহরণ যা হুকুম জারির পর অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- আয়াতুল ওযূ (ওযূর বিধান সম্বলিত আয়াত), আয়াতুল জুমু'আ (জুমু'আর সালাতের বিধান সম্বলিত আয়াত)। অনুরূপভাবে যাকাতের বিধান সম্বলিত আয়াতকেও তিনি এ প্রকারের বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২৫]

ত্রয়োদশ অধ্যায়: পৃথক পৃথকভাবে অবতীর্ণ এবং একত্রিতভাবে অবতীর্ণ আয়াতের বর্ণনা (مَا نَزَلَ مُفَرَّقًا وَمَا نَزَلَ جَمْعًا): এ অধ্যায়ে বর্ণনা প্রদান করেছেন সে সকল আয়াত, যা পৃথক পৃথকভাবে, আবার একসাথে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রথম প্রকার. আল-কুরআনের এমন আয়াতাংশ (সূরা), যা ভিন্ন ভিন্নভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- সূরা আল আলাক ও সূরা আদ্-দুহা।

দ্বিতীয় প্রকার. আল-কুরআনের এমন সকল আয়াত ব সূরা, যা একই স্থানে একসাথে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- সূরা আল ফাতিহা, আন্-নাস, আল-ফালাক, আল-ইখলাস, আল-লাহাব, আল-কাউছার, আল-বায়্যিনাহ্, আন্-নাস্র, মাউ'যাতান, সূরা আস্-সাফ্ফ, আল-আন'আম। এ সম্পর্কে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরা থেকে অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করেন। এছাড়া নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বিভিন্ন হাদীছের উদ্ধৃতিও প্রদান করেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়: ফেরেশতাগণের ধ্বনি ও নিঃশব্দের মাধ্যমে অবতীর্ণ আয়াতের বর্ণনা (مَا نَزَلَ مُشَيَّعًا وَمَا نَزَلَ مُفْرَدًا): আল-কুরআনের সে অংশের বর্ণনা, যা ফেরেশতাগণের সমুচ্চারিত ধ্বনির মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে অংশের বর্ণনা, যা নিঃশব্দে কেবল একজন ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এ অধ্যায়ে হযরত জিবরাঈল (আ) ও অন্যান্য ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ওহী অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ সম্পর্কে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র)-এর একটি বর্ণনা নিম্নরূপ:

مِنَ الْقُرْآنِ مَا نَزَلَ مُشَيَّعًا وَهُوَ سُورَةُ الْأَنْعَامِ شَيَّعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ نَزَلَتْ وَمَعَهَا ثَمَانُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ نَزَلَتْ وَمَعَهَا ثَلَاثُونَ أَلْفَ مَلَكٍ.[২৬]

-'আল-কুরআনের যে অংশগুলো ফেরেশতাগণের প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়, তা হচ্ছে সূরা আল-আন'আম। এ সূরা অবতীর্ণের সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রতিধ্বনির মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সূরা আল-ফাতিহা অবতীর্ণের সময় আশি হাজার ফেরেশতার অভিনন্দনসূচক প্রতিধ্বনি করেন। আয়াতুল কুরসী অবতীর্ণ হয় ত্রিশ হাজার ফেরেশতার অভিবাদনসূচক প্রতিধ্বনির মাধ্যমে।'

এছাড়া আল-কুরআনের অবশিষ্ট ফেরেশতাগণের কোনোরূপ প্রতিধ্বনি ছাড়াই জিবরাঈল (আ) একাই ওহী বহন করে নিয়ে আসেন। সুয়ূতী (র) এ সম্পর্কে আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত সম্পর্কে হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়: আল-কুরআনের ঐ সমস্ত অংশের বর্ণনা, পূর্ববর্তী কতিপয় নবী রাসূলের প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে সমস্ত অংশের বর্ণনা, যা মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে অন্য কোনো নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি (مَا أُنْزِلَ مِنْهُ عَلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا لَمْ يُنَزَّلْ مِنْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): এ অধ্যায়ে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে কিছুসংখ্যক নবী-রাসূলের ওপরও অবতীর্ণ হয়েছে, পাশাপাশি তিনি সে সকল অংশের বর্ণনাও দিয়েছেন যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে অন্য কোনো নবীর উপর অবতীর্ণ হয়নি। এক্ষেত্রে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুসতাদরাকের হাদীছ দলীল হিসেবে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়: আল-কুরআন অবতীর্ণের পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা (فِي كَيْفِيَّةِ إِنْزَالِهِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআন কীভাকে এবং কোন কোন পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এতদসম্পর্কিত কিছুসংখ্যক প্রয়োজনীয় বিষয় তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন-

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾[২৭] وَقَالَ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾.[২৮]

জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ বিষয়গুলো মাসআলা আকারে পেশ করেন। এ অধ্যায়ে সর্বমোট চারটি মাসআলা তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি মাসআলার ক্ষেত্রে দলীল উপস্থাপন করা হয়েছেন। এ অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওহী। এতে ওহী নাযিলের পাঁচটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এরপর আল-কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণের আলোচনা পেশ করা হয়েছে।[২৯]

সপ্তদশ অধ্যায়: আল-কুরআনের নামসমূহ এবং সূরার নামসমূহের পরিচিতি (فِي مَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ وَأَسْمَاءِ سُوَرِهِ): এ অধ্যায়ে সুয়ূতী (র) আল-কুরআন ও সূরাসমূহের নাম উল্লেখ করেছেন। আজ-জাহিয (র) বলেন,

سَمَّى اللَّهُ كِتَابَهُ اسْمًا مُخَالِفًا لِمَا سَمَّى الْعَرَبُ كَلَامَهُمْ عَلَى الجملة وَالتَّفْصِيلِ. سَمَّى جُمْلَتَهُ قُرْآنًا كَمَا سَمَّوْا دِيوَانًا وَبَعْضُهُ سُورَةٌ كَقَصِيدَةٍ وَبَعْضُهَا آيَةٌ كَالْبَيْتِ وَآخِرُهَا فَاصِلَةٌ كقافية.[৩০]

-'আরববাসীগণ তাদের সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত বাক্যাবলীর যে ধরনের নাম রাখত, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের নাম এর বিপরীত শব্দ দিয়ে রেখেছেন 'আল-কুরআন'। পক্ষান্তরে আরববাসীগণ তাদের বাক্যাবলীর সমষ্টিকে 'দিওয়ান' নামে আখ্যায়িত করত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবের অংশকে 'সূরা' বলে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে আরববাসীগণ সে ধরনের অংশ বিশেষকে 'কাসীদাহ্' বলে অভিহিত করেছেন।'

জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) তাঁর 'আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থে আয্-যিরাকশী (র)-এর 'আল-বুরহান' গ্রন্থে উল্লিখিত আল-কুরআনের পঞ্চান্নটি নামের উল্লেখ করেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়: আল-কুরআন সংকলন ও এটি বিন্যস্তকরণ সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي جَمْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনুল কারীম একত্রিতকরণ ও ক্রমবিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। এতে লেখক বেশ কয়েকটি হাদীছের উল্লেখ করেন। সাথে সাথে এ সম্পর্কিত কয়েকটি অভিমতও প্রদান করেন। যেমন- যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছ। নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোথাও সংকলিত হয়নি। আল-খাত্তাবী (র) বলেন,

نَّمَا لَمْ يجمع الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ لِمَا كَانَ يَتَرَقَّبُهُ مِنْ وُرُودِ نَاسِخٍ لِبَعْضِ أَحْكَامِهِ أَوْ تِلَاوَتِهِ فَلَمَّا انْقَضَى نُزُولُهُ بِوَفَاتِهِ أَلْهَمَ اللَّهُ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ذَلِكَ وَفَاءً بِوَعْدِهِ الصَّادِقِ بِضَمَانِ حِفْظِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ فَكَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ عَلَى يَدِ الصِّدِّيقِ بِمَشُورَةِ عُمَرَ.[৩১]

-'রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল-কুরআনকে গ্রন্থাকারে এজন্য লিপিবদ্ধ করেননি, যেহেতু তখন পর্যন্ত আল-কুরআনের কিছুসংখ্যক বিধানাবলী এবং তিলাওয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে তাঁর [মুহাম্মদ (সা)]-এর ওফাতের পর আল-কুরআন অবতীর্ণের ধারা বন্ধ হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা মোতাবেক তাঁর উম্মতের তথা খোলাফায়ে রাশিদীনের হৃদয়পটে কুরআন সংকলনের বাসনা সৃষ্টি করেন। অনন্তর এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উমার (রা)-এর পরামর্শক্রমে আবূ বকর (রা)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।'

আল-হাকিম (র) 'আল-মুসতাদরাক' গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

جُمِعَ الْقُرْآنُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: إِحْدَاهَا: بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الثَّانِيَةُ: بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، الْجَمْعُ الثَّالِثُ هُوَ تَرْتِيبُ السُّوَرِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ.[৩২]

-'আল-কুরআন তিনটি পর্যয়ে সংকলিত হয়েছে। প্রথমত. নবী করীম (সা)-এর যুগে, দ্বিতীয়ত. আবূ বকর (রা)-এর যুগে এবং তৃতীয়ত. উছমান (রা)-এর যুগে।'

এরপর আল-কুরআনের সূরাসমূহের ক্রমবিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা উল্লিখিত হয়েছে। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বলেন, অধিকাংশ আলিমের অভিমত যা আয্-যিরাকশী (র) তাঁর 'আল-বুরহান' গ্রন্থে আবূ জা'ফর ইব্‌নুয্ যুবায়র থেকে লিপিবদ্ধ করেন,

تَرْتِيبُ الْآيَاتِ فِي سُوَرِهَا وَاقِعٌ بِتَوْقِيفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي هَذَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.[৩৩]

-'সূরাসমূহের মধ্যে আয়াতসমূহের ক্রমবিন্যাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশানুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষীগণের কোনো মতপার্থক্য নেই।'

এ পর্যায়ে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) একটি পরিশিষ্ট লিপিবদ্ধ করেন। এতে তিনি কয়েকটি সূরাকে বিন্যস্ত করেন। আয়াত সংখ্যার দিক থেকে কোনটি বড়, কোনটি ছোট এবং কোনটি মধ্যম আকারের? তা দলীলসহ উপস্থাপন করেছেন।

উনবিংশ অধ্যায়: আল-কুরআনের সূরা, আয়াত এবং হরফের সংখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي عَدَدِ سُوَرِهِ وَآيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَحُرُوفِهِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের সূরা, আয়াত ও অক্ষরের সংখ্যা বিষয়ে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। সুয়ূতী (র) বলেন, 'নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুসারে আল-কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৪টি। অপর মতে সূরার সংখ্যা ১১৩টি। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরা আনফাল এবং সূরা বারাআত একই সূরা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, একদল আলিম ও উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর মত হলো, **سِتَّ عَشْرَةَ لِأَنَّهُ كَتَبَ فِي آخِرِهِ سُورَتَي الْحَفْدِ وَالْخُلْعِ** -'আল-কুরআনের সূরার সংখ্যা ১১৬টি। কেননা তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপির শেষাংশে সূরা আল-হাফ্‌দ ও আল-খুল'উ নামে দুটি সূরা সংযোজন করেছেন।' তবে এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অভিমত হলো এর মধ্যে ১১৫টি সূরার উল্লেখ আছে। কেননা তাতে সূরা ফীল এবং সূরা কুরায়শ এ দুটি সূরাকে একই সূরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আস্-সুয়ূতী (র) আরো উল্লেখ করেন, **مِائَةٌ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ سُورَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكْتُبِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ،** -'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর মাসহাফের মধ্যে ১১২টি সূরার উল্লেখ রয়েছে। কেননা তিনি তাঁর গ্রন্থে আল-মু'আওয়িযাতান-এর উল্লেখ করেননি।'[৩৪]

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-কুরআনের সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬৬১৬টি এবং অক্ষর সংখ্যা ৩২৩৬৭১টি। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত উল্লেখ করেন,

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ سِتَّةُ آلَافِ آيَةٍ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَزِدْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَمِائَتَا آيَةٍ وَأَرْبَعُ آيَاتٍ وَقِيلَ: وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ: وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَقِيلَ: وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَقِيلَ: وَسِتٌّ وَثَلَاثُونَ[৩৫]

-'আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজার। এ সংখ্যার অধিক হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কিছু সংখ্যক এ সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে নয়। আবার কিছুসংখ্যকের মতে ২০৪টি আয়াত। উক্ত সংখ্যা কম বেশি রয়েছে তা ২০০ থেকে বেশি হওয়ার ব্যাপারেও অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ১৪টি, কারো কারো মতে ১৯টি, কারো কারো মতে ২৫টি আবার কারো কারো মতে ৩৬টি।

বিংশ অধ্যায়: আল-কুরআনের হাফিয এবং রাবীগণের পরিচিতি (فِي مَعْرِفَةِ حُفَّاظِهِ ورواته): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের হাফিয এবং বর্ণনাকারীগণের নাম, তাঁদের সংখ্যা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্ধারিত চারজন সাহাবী- যাঁরা আল-কুরআনুল কারীম শিক্ষা প্রদান করতেন তাঁদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখক আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা)-এর হাদীছ উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ:[৩৬]**مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ**

-'আল-কুরআনের হাফিয চার জন। তারা হলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'ঊদ, সালিম, মু'আয ও উবায় ইব্‌ন কা'ব।'

এতে আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীছ, হাদীছটির ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন। তিনি এ অধ্যায়ে সে সব প্রসিদ্ধ সাহাবী (রা) ও তাবি'ঈ (র)-এর নামও উল্লেখ করেছেন, যারা কিরাআত শাস্ত্রে এবং কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন।

একবিংশ অধ্যায়: আল-কুরআনের ঊর্ধ্বতম সনদ ও নিম্নতম সনদের পরিচিতি (فِي مَعْرِفَةِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ مِنْ أَسَانِيدِهِ): এ অধ্যায়ে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআনের সনদের সর্বোচ্চ স্তর এবং সর্বনিম্ন স্তরের উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি হাদীছের ইমামগণের সর্বোচ্চ স্তর পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেন। সাথে সাথে সনদের সর্বনিম্নতা অবগত হওয়ার পদ্ধতিও বর্ণনা করেন।

২২শ থেকে ২৭শ অধ্যায়: আল-কুরআনের মুতাওয়াতির, মাশহূর, আহাদ, শায, মাওযূ' এবং মুদরাজ কিরাআতসমূহের বর্ণনা (مَعْرِفَةُ الْمُتَوَاتِرِ وَالْمَشْهُورِ وَالْآحَادِ وَالشَّاذِّ وَالْمَوْضُوعِ وَالْمُدْرَجِ): এ অধ্যায়ে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআনের বিভিন্ন প্রকার কিরাআত তথা পঠনরীতি মুতাওয়াতির, মাশহূর, আহাদ, শায, মাওযূ' ও মুদরাজ সম্পর্কে বিষদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ পর্যায়ে সুয়ূতী (র) কাযী জালালুদ্দীন আল-বালকীনী (র)-এর কিরাআতের প্রকার ও ইবনুল জাযারী (র)-এর কিরাআতের মতামত এবং বাতিল কিরাআতসমূহ আইম্মায়ে সাব'আ তথা সাত কিরাআতের পর্যালোচনা করেছেন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) আরো উল্লেখ করেন যে, আল-কুরআনের ক্ষেত্রে সনদের বিশুদ্ধতার উপরই কিরাআতের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে।

২৮শ অধ্যায়: আল-কুরআনের ওয়াক্‌ফ এবং ইবতিদা-এর পরিচিতি (فِي مَعْرِفَةِ الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ): এ অধ্যায়ে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআন তিলাওয়াতের মাঝে ওয়াক্‌ফ তথা বিরতি দানের পদ্ধতি, প্রকারভেদ, এ সম্পর্কে সাহাবীগণের গুরুত্বারোপ, ওয়াকফের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা, ইব্‌তিদা তথা আরম্ভকরণ সম্পর্কে ইমামগণের মতামত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বলেন, 'ওয়াক্‌ফ ও ইবতিদা সম্পর্কে আলিমগণের বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যাঁরা এ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ইমাম আবূ জা'ফর আন্-নাহ্‌স, ইবনুল আম্বারী, আয্-যুজাযী আদনানী, আল-আম্মানী, আস্-সাজাওয়ান্দী (র) প্রমুখ।'

২৯শ অধ্যায়: সে সমস্ত আয়াতের বর্ণনা, যা শব্দগতভাবে সংযুক্ত কিন্তু অর্থগতভাবে বিচ্ছিন্ন (فِي بَيَانِ الْمَوْصُولِ لَفْظًا المفصول معنى): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এমন কিছুসংখ্যক আয়াতের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, যেগুলো শব্দগতভাবে সম্পৃক্ত কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ ধরনের আয়াতসমূহের উপমা দিয়ে আলোচনা প্রদান করেছেন। যেমন-

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾[৩৭] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾[৩৮]

এখান থেকে উপর্যুক্ত আয়াতের প্রথমাংশ হযরত আদম (আ) এবং হওয়া (আ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতের শেষাংশ প্রথমাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তা অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।[৩৯]

৩০শ অধ্যায়: আল-ইমালা, আল-ফাত্‌হ এবং তন্মধ্যস্থিত অবস্থার বর্ণনা (فِي الْإِمَالَةِ وَالْفَتْحِ وَمَا بَيْنَهُمَا): এতে আল-কুরআনে ব্যবহৃত ইমালা ও ফাত্‌হ বিষয়ে আরবী সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধতম ও প্রসিদ্ধতম দুটি উচ্চারণ ইমালাকে সাতটি হরফের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইমালার পঠন পদ্ধতি, ইমালার পরিচিতি, প্রকার, প্রয়োজনীয়তা, স্থান ও এ সম্পর্কে কতিপয় আলিমের আপত্তি সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। ফাত্‌হের পরিচিতি ও প্রকার বর্ণিত হয়েছে। ইমালা ও ফাত্‌হ বিষয়ে কতিপয় কারী স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থ হলো 'কুররাতুল আয়নি ফিল ফাত্‌হি ওয়াল ইমালা'। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) ইমালা ও ফাত্‌হ সম্পর্কিত আলিমগণের বিভিন্ন মতামত এবং এর প্রয়োজনীয়তা, সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের উচ্চারণ রীতি এ অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমন- তিনি ইমাম আদ্-দানী (র)-এর মতামত উল্লেখ করে

বলেন, 'ফাত্হ এবং ইমালা সম্পর্কিত আরবী সাহিত্যিকগণের দুটি উচ্চারণ রীতি রয়েছে, যে উচ্চারণ নীতিতেই আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।' এ সম্পর্কে হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

اقرؤوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَأَصْوَاتَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ[৪০]

-'তোমরা আল-কুরআনকে আরবের ভাষায় এবং তাদের সুরে তিলাওয়াত করবে। সাবধান! কোনো ফাসিক এবং আহলুল কিতাবীদের সুরে কিংবা তাদের ভঙ্গিতে তিলাওয়াত করবে না।'

৩১শ অধ্যায়: ইদ্গাম, ইয্হার, ইখ্ফা ও ইক্লাব সম্পর্কিত আলোচনা (فِي الْإِدْغَامِ وَالْإِظْهَارِ وَالْإِخْفَاءِ وَالْإِقْلَابِ): এ অধ্যায়ে ইলমুত্ তাজভীদের বিষয়সমূহ তথা ইদ্গাম, ইয্হার, ইখ্ফা ও ইক্লাব-এর পরিচিতি, প্রকার, শর্ত, হরফের সংখ্যা উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- ইদগাম দুই প্রকার। ইদ্গামু কাবীর ও সাগীর। এতে ইয্হারের অক্ষর ১৬টি এবং ইখ্ফার অক্ষর ৪৫টি উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১]

৩২শ অধ্যায়: আল-মাদ্দ ও আল-কাস্র সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي الْمَدِّ وَالْقَصْرِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন শব্দকে মাদ্দ ও কাস্র অর্থাৎ টেনে পড়া ও দ্রুত পড়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাদ্দের ও কাস্রের পরিচিতি, প্রকার, সবব উদাহরণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৩শ অধ্যায়: হামযাকে তাখফীফ করা সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي تَخْفِيفِ الْهَمْزِ): এ অধ্যায়ে হামযাহকে তাখ্ফীফ অর্থাৎ সহজবোধ্যভাবে উচ্চারণ করার পদ্ধতি ও বিধান সম্পর্কিত আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ সম্পর্কে আহলুল হিজাযের নীতিমালা, তাখফীফে হামযাহ্র প্রকরণ, এ ধরনের উচ্চারণের কারণ, হরকতে হামযার পরিবর্তন ও স্থানান্তরিতকরণ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ الْهَمْزَ لَمَّا كَانَ أَثْقَلَ الْحُرُوفِ نُطْقًا وَأَبْعَدَهَا مَخْرَجًا تَنَوَّعَ الْعَرَبُ فِي تَخْفِيفِهِ[৪২]

-'হামযাহ্ এমন একটি অক্ষর, যা উচ্চারণের দিক থেকে এবং মাখরাজের দিক থেকে কঠিনতর, এজন্যই আরববাসীগণ তা উচ্চারণ করার সহজতর পদ্ধতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে।'

৩৪শ অধ্যায়: আল-কুরআন সংরক্ষণ, পঠন ও শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা (فِي كَيْفِيَّةِ تَحَمُّلِهِ): এ অধ্যায়টি দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে কুরআন সংরক্ষণের বিষয়টি উম্মতের জন্য ফরযে কিফায়াহ্ হিসেবে উল্লেখ করে এ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের মতামত, পদ্ধতি ও নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। উস্তাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। তিনি এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন,[৪৩] **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ** -'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।' দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুরআনের কিরাআত বা পঠন রীতি তিন প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন। যথা- আত্-তাহকীক, আল-হাদ্‌র ও আত্-তাদবীর। এরপর মাখরাজের হরূফের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষে কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

৩৫শ অধ্যায়: আল-কুরআন তিলাওয়াতের আদব ও লিখনের শিষ্টাচার (فِي آدَابِ تِلَاوَتِهِ وَتَالِيهِ): জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ে আল-কুরআন তিলাওয়াত করার আদব তথা রীতিনীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এরপর কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন- আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لاَ حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الكِتَابَ، وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ[৪৪]

-'দুই প্রকার ব্যক্তির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়। এক. যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে সারা রাত সে জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত থাকে। দুই. যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিন-রাত আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে।'

ইবন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন[৪৫], مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. -'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পড়ে তার জন্য সে সাওয়াব পায়। আর এ সাওয়াব হবে তার দশগুণ হিসাবে।'

এছাড়া জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) আরো যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা হলো- আল-কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ওযূ করা মুস্তাহাব, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র স্থানে আল-কুরআন তিলাওয়াত করা সুন্নাত, কুরআন পাঠের সময় বিনম্রতার সাথে কিবলামুখী হয়ে সম্মানের সাথে মাথা নিচু করে বসা। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার নিমিত্তে মিসওয়াক করা সুন্নাত। কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ পড়া সুন্নাত, সূরা তাওবা ব্যতিত অন্য সকল সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্ পড়া। আল-কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নিয়্যাত করার প্রয়োজন নেই। তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা সুন্নাত। কুরআন তিলাওয়াতে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা সুন্নাত। এভাবে আল-কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়ে প্রায় ত্রিশটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

৩৬শ অধ্যায়: আল-কুরআনের অপরিচিত শব্দসমূহ (فِي مَعْرِفَةِ غَرِيبِهِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনে ব্যবহৃত এমন সকল শব্দাবলীর আলোচনা করা হয়েছে, যা আরবী ভাষায় অপরিচিত। এসকল শব্দাবলীর উপর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীও রচিত হয়েছে। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) 'গারাইবুল কুরআন' তথা আল-কুরআনের অপরিচিত শব্দাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, মুফাস্সিরগণের জন্য এ ধরনের শব্দাবলী জানার অপরিহার্যতা এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) কর্তৃক সকল শব্দাবলীর সূরাভিত্তিক তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৪৬]

৩৭শ অধ্যায়: হিজাযী বহির্ভূত শব্দাবলী সম্পর্কিত বর্ণনা (فِيمَا وَقَعَ فِيهِ بِغَيْرِ لُغَةِ الْحِجَازِ): আল-কুরআনে ব্যবহৃত হিজাযী তথা হিজাযের অধিবাসী নয় এমন গোত্র ও সম্প্রদায়ের আরবী শব্দাবলীর বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতানুযয়ী গায়রি হিজাযী তথা অপরাপর গোত্রগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁদের প্রচলিত শব্দাবলী আল-কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। গোত্রগুলো হলো, ১. বনূ কিনানা, ২. বনূ হুযায়ল, ৩. বনূ হুমায়র, ৪. বনূ জুরহাম, ৫. বনূ আযদশনুয়া, ৬. বনূ মাযহিজ, ৭. বনূ খাছ'আম, ৮. বনূ কায়স আয়লান, ৯. বনূ সা'দ আল-আশীরাহ্, ১০. বনূ আযরাহ্, ১১. বনূ গাস্সান, ১২. বনূ মুযায়নাহ্, ১৩. বনূ লাখাম, ১৪. বনূ জুযাম, ১৫. বনূ হানীফাহ্, ১৬. বনূ আল-ইয়ামামাহ্, ১৭. বনূ সাবা, ১৮. বনূ সুলায়ম, ১৯. বনূ আম্মারাহ্, ২০. বনূ তাই, ২১. বনূ খুযা'আহ্, ২২. বনূ আম্মান, ২৩. বনূ তামীম, ২৪. বনূ আনমার, ২৫. বনূ আল-আশ'আরীন, ২৬. বনূ আওস, ২৭. বনূ খাযরাজ, ২৮. বনূ মাদইয়ান।

৩৮শ অধ্যায়: আল-কুরআনে অনারবী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কিত বর্ণনা (فِيمَا وَقَعَ فِيهِ بِغَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ): জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ে আল-কুরআনে ব্যবহৃত অনারবী শব্দের বিশদ বর্ণনা ইমামগণের মতভেদসহ আলোচনা করেছেন। এসকল শব্দের সমাহার সম্পর্কে তিনি প্রয়োজনীয় প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ে আনারবী শব্দের একটি তালিকা প্রদান করেন। শব্দগুলো হলো, ১. আবারিক, ২. আবলা'ঈ, ৩. আখলাদ, ৪. আল-আরাইক, ৫. আযার, ৬. ইসতাবরাক, ৭. ইসরা, ৮. আকওয়াব, ৯. আলীম, ১০. ইনাহু, ১১. আওয়াহ্, ১২. আওয়াব, ১৩. আল-মিল্লাতু আল-আখিরা, ১৪. বাতাইনুহা, ১৫. বি'ঈর, ১৬. বায়', ১৭. তাবরীর, ১৮. আল-জিব্‌ত, ১৯. জাহান্নাম, ২০. হাসাব, ২১. হিত্তাহ্, ২২. দুররী, ২৩. রাসিনা, ২৪. রিব্‌বিউন, ২৫. আর-রহমান, ২৬. আর-রাস, ২৭. আর-রাকীম, ২৮. রামযান, ২৯. রাহ্ওয়া, ৩০. আর-রূম, ৩১. আস্-সিজিল্ল, ৩২. সিজ্জীন, ৩৩. সাফারাহ্, ৩৪. সাকার, ৩৫. সুজ্জাদান, ৩৬. সানা, ৩৭. সুন্দুস, ৩৮. সায়্যিদুহা, ৩৯. আস্-সিরাত, ৪০. ফিরদাউস, ৪১. কিনতার, ৪২. কাফ্‌ফার, ৪৩. কিফলাতায়ন, ৪৪. কান্‌য, ৪৫. মিস্‌ক ইত্যাদি।

৩৯শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত দ্ব্যর্থবোধক এবং সমার্থবোধক শব্দাবলীর বর্ণনা (فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوهِ وَالنَّظَائِرِ): এ অধ্যায়ে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) উজূহ্ ওয়ান্-নাযাইর-এর পরিচিতি, পার্থক্য, কুরআনে এ শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের লেখকগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী (র) এ বিষয়ে 'মু'তারিকুল আকরাম ফী মুশতারিকিল কুরআন' শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

৪০শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত আদাওয়াত সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي مَعْرِفَةِ مَعَانِي الْأَدَوَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُفَسِّرُ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত আদাওয়াত তথা হরফমালা, হরফানুরূপ বিশেষ্য ক্রিয়াসমূহের মর্মার্থ, এর পরিচিতি, উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন স্থানে এর বিভিন্ন অর্থ নির্ণয়করণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

৪১শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত ই'রাব সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي مَعْرِفَةِ إِعْرَابِهِ): আল-কুরআন বোঝার জন্য ই'রাবুল কুরআন বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আস্-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ের প্রথমে ই'রাবুল কুরআন বিষয়ের গুরুত্ব ও উপরকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি ই'রাব দানকারী অক্ষর, ইসম এবং ফি'লসমূহ উল্লেখ করেন। সাথে সাথে হরফে যায়দ তথা ই'রাব প্রদান করে না এরূপ অক্ষরের তালিকাও প্রদান করেছেন।

৪২শ অধ্যায়: আল-কুরআনের তাফসীরকারকের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা সম্পর্কিত আলোচনা (فِي قَوَاعِدَ مُهِمَّةٍ يَحْتَاجُ الْمُفَسِّرُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا): এ অধ্যায়ে তাফসীরকারকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো- যমীর (সর্বনাম), মারজা' (সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল), যমীরের প্রকারভেদ, তাযকীর, তানীছ, তা'রীফ, তানকীর, ইফরাদ, তাছনিয়া, জমা', ক্রিয়ামূল, কাল, কারক, বিশেষ্য, আত্ফ প্রভৃতি।

৪৩শ অধ্যায়: আল-মুহ্কাম ও আল-মুতাশাবিহ্ সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ): এ অধ্যায়ে আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআনের দুই প্রকার আয়াত তথা মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ্ শিরোনামে আলোচনা করেছেন। প্রথমে মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ্-এর পরিচয়, প্রকার, মুতাশাবিহ্ আয়াতের হিক্মত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করেছেন। দ্বিতীয়ত মুতাশাবিহ্ আয়াতের উদাহরণ ও তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়ত সূরাসমূহের প্রারম্ভিকাকে মুতাশাবিহ্-এর অন্তর্ভুক্তিকরণ, হরূফে মুকাত্তা'আতসমূহ, এর রহস্য, উদ্দেশ্য এবং মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ্র ফযীলত সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করেছেন।

৪৪শ অধ্যায়: আল-মুকাদ্দাম ও আল-মুওয়াখ্খার সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي مُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ): পূর্বাপর উল্লিখিত বিষয়কে মুকাদ্দাম ও মুওয়াখ্খার নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ বহুসংখ্যক আয়াত আল-কুরআনে বর্ণিত আছে। আস্-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ে এ বিষয়ের প্রকার, গুরুত্ব ও কিছু আপত্তি উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে মুকাদ্দাম করার ১০টি কারণও উল্লেখ করেছেন। যেমন- ১. তাবাররুক, ২. তা'যীম, ৩. তাশরীফ, ৪. মুনাসাবাত, ৫. হিম্মাত ও শাওক, ৬. সাবাকাত, ৭. সাবাবিয়্যাত, ৮. কারসাত, ৯. আদনা থেকে আওলা ও ১০. আওলা থেকে আদনা।

৪৫শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত আম ও খাস সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي خَاصِّهِ وَعَامِّهِ): আম ও খাস উলূমুল কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআনুল কারীমে এ দুধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে আম শব্দের প্রয়োগ বেশি। আস্-সুয়ূতী (র) প্রথমত আমের পরিচয় প্রদান করেন। এরপর প্রকারভেদ ও উদাহরণ প্রদান করেছেন। তিনি আমকে তিন প্রকারে বিভিক্ত করেছেন। যেমন- ১. الْعَامُّ الْبَاقِي عَلَى عُمُومِهِ "যে আমের স্বকীয়তা ও সার্বজনীনতা অবশিষ্ট থাকে।" ২. الْعَامُّ المراد به الخصوص "যে আম দ্বারা সম্পূর্ণরূপে খাস উদ্দেশ্য হয়। এটি মাজাযের মতো আম থেকে বের হয়ে খাসে চলে আসে। ৩. الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ "যে আম দ্বারা তার প্রত্যেক সদসস্যকে খাসভাবে বুঝানো হয়। এমন নয় যে, এটি তার কোনো এক সদস্যেরে জন্য নির্দিষ্টভাবে খাস হবে; বরং প্রত্যেক সদস্য খাস হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তবে এ আমটি ব্যক্তির জন্য হাকীকাত অবশিষ্ট থাকবে। এ জাতীয় আমসমূহ মানসূখের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এরূপ আমকে যা খাস করে তা মুত্তাসিল বা মুনফাসিল হতে পারে। আর মুত্তাসিল হলো পাঁচটি। তৃতীয়ত তিনি আল-কুরআনে ব্যবহৃত আমের ধারণা ও প্রয়োগ বিধি এবং তদ্দ্বারা বিভিন্ন মাস'আলা-উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেন। যেমন- يَا أَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা সকল উম্মত সম্বোধিত কি না, অথবা يَا أَيُّهَا النَّاسُ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ দ্বারা রাসূল (সা) অন্তর্ভুক্ত হবে কি না এবং يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا দ্বারা মু'মিনগণ আবার يَا أَهْلَ الْكِتَابِ দ্বারা আহলুল কিতাবগণ শামিল কি না? ইত্যাদি।

৪৬শ অধ্যায়: আল-কুরআনের মুজমাল এবং মুবায়্যান সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي مُجْمَلِهِ وَمُبَيَّنِهِ): মুয়ূতী(র.) এ অধ্যায়টিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে মুজমালের পরিচয়, আল-কুরআনে এটির

ব্যবহার, মুজমালের কারণ ইত্যাদি। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মুবায়য়্যানের পরিচয়, প্রকারভেদ, আল-কুরআনে বর্ণিত কিছুসংখ্যক আয়াত মুজমাল হওয়া সম্পর্কিত মতভেদ, মুজমাল, মুহ্তামিল এবং মুবহাসের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ক আলোচনা করেছেন।

৪৭শ অধ্যায়: আন্-নাসিখ ও আল-মানসূখ সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ): নাসিখ ও মানসূখ উলূমুল-কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইসলামের শত্রুরা এটাকে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। তারা নুস্খকে অস্বীকার করত এ বিষয়ে নানা ধরনের সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। নাসিখ ও মানসূখের জ্ঞান শরীয়তকে বুঝতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে শরীয়তের আহকাম ও তার হিকমত অনুধাবন করা সহজ হয়। পরস্পর বিপরীত বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। আস্-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ে উপর্যুক্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের প্রথমে তিনি সাতটি মাসআলার মাধ্যমে নাসিখ ও মানসূখের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। এরপর নাস্খের প্রকারভেদ সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এছাড়া যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা হলো, ১. নাসিখ-মানসূখ পদ্ধতি, ২. ইজমা‘ দ্বারা মানসূখ প্রত্যাখ্যান, ৩. সূরা মায়িদার মধ্যে কোনো মানসূখ আয়াত না থাকা, ৪. আল-কুরআনের সর্বপ্রথম মানসূখ আয়াত, ৫. নাসিখ প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য রিওয়ায়াত জরুরী, ৭. তিলাওয়াত মানসূখকরণ, ৭. খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে তিলাওয়াত মানসূখকরণ এবং এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ, ৮. আয়াতে রজমের আলোচনা, ৯. রহিত মানসূখ বিধানের স্থলাভিষিক্ত বদল বিধান সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত ইত্যাদি।

৪৮শ অধ্যায়: আল-কুরআনে মুশকিল, মতভেদপূর্ণ ও বৈপরিত্বমূলক বিষয়ের আলোচনা (فِي مُشْكِلِهِ وَمُوهِمِ الاِخْتِلَافِ وَالتَّنَاقُضِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের সাদৃশ্যপূর্ণ ও বাহ্যিক বৈপরিত্বমূলক আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈপরিত্বমূলক আয়াত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব এবং হাদীছের আলোকে এরূপ বাহ্যিক বৈপরিত্বমূলক আয়াতসমূহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সমাধান বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যকার বাহ্যিক বৈপরিত্বের কারণ এবং এ বৈপরিত্বের সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪৯শ অধ্যায়: আল-মুতলাক ও আল-মুকায়্যাদ সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي مُطْلَقِهِ وَمُقَيَّدِهِ): আল-কুরআনের কিছু সংখ্যক আয়াত রয়েছে, যার বিধান মুতলাক তথা শর্তহীন। আর কিছুসংখ্যক আয়াত রয়েছে মুকায়্যাদ বা শর্তযুক্ত। এ অধ্যায়ে আস্-সুয়ূতী (র) মুতলাক ও মুকায়্যাদের পরিচয়, মুতকালাককে মুকায়্যাদে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি, এর প্রকারভেদ, আহলুল লুগাতের দৃষ্টিতে এ বিষয়টির বৈধতা ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন।

৫০শ অধ্যায়: আল-কুরআনের মানতূক এবং মাফহূম সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي مَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ): এ অধ্যায়ে মানতূক তথা আক্ষরিক অর্থ ও মাফহূম তথা ভাবার্থ সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে মানতূকের পরিচয়, প্রকারভেদ তথা নস, যাহির, তা’বীলসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মাফহূমের পরিচয়, প্রকারভেদ ও এতদসম্পর্কিত বিষয় দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে।

৫১শ অধ্যায়: আল-কুরআনের শ্রোতাদের প্রকরণ সম্পর্কিত আলোচনা (فِي وُجُوهِ مُخَاطَبَاتِهِ): এ অধ্যায়ে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআনের সম্বোধন রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের চৌত্রিশটি সম্বোধন পদ্ধতির বিষয় উল্লেখপূর্বক কুরআনের আয়াত দ্বারা আলোচনা উপস্থাপন করেন। সর্বশেষে আল-কুরআনের বিভিন্ন দিক ও বিষয় সম্পর্কে উদাহরণ পেশ করেছেন।

৫২শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত হাকীকত ও মাজায-এর বর্ণনা (فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ): হাকীকত ও মাজায উলূমুল কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাকীকত ও মাজায অলংকার শাস্ত্রের অংশ। সম্বোধনের মাঝে এ দুটি উপাদান বিদ্যমান না থাকলে বাক্যের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে না। সাহিত্যের চূড়ায় অবস্থিত আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মাজায ব্যবহৃত হয়েছে। এ অধ্যায়টি চারটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথমে হাকীকতের পরিচয়, প্রকারভেদ ও এর উদাহরণ এবং হাকীকত ও মাজাযের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মাজায সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন মতভেদ প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে মাওযূ‘আতে শার‘ঈয়্যাহ্ তথা শরীয়তের জন্য গঠিত বিষয়াবলী যেমন- যাকাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো মূলত হাকীকত

হিসেবেও পরিগণিত হয় এবং আভিধানিক দিক থেকে মাজায হিসেবেও পরিগণিত হয়। চতুর্থ হাকীকত এবং মাজাযের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষে মাজাযুল মাজায সম্পর্কেও বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

৫৩শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত তাশবীহ্ ও ইস্তি'আরা সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي تَشْبِيهِهِ وَاسْتِعَارَتِهِ): এ অধ্যায়ে তাশবীহের পরিচয়, প্রকার, আদাওয়াতে তাশবীহ্, তাশবীহের বিভিন্ন দিক যেমন মাদ্হ (প্রশংসা) ও যাম্ম (নিন্দা)-এর মধ্যে তাশবীহের পদ্ধতিসমূহের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ইস্তি'আরার পরিচয়, উপকারিতা, হিকমত এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষে তাশবীহ, ইস্তিআরা ও কিনায়ার মধ্যে পার্থক্য আলোচিত হয়েছে।

৫৪শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত কিনায়া ও তা'রীদ সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي كِنَايَاتِهِ وَتَعْرِيضِهِ): কিনায়া এবং তা'রীদ মূলত আল-কুরআনের অন্যতম সাহিত্য-মাধুর্য ও অনুপম রচনাশৈলী। এ অধ্যায়ে আল-কুরআনে ব্যবহৃত কিনায়া (ইঙ্গিত) এবং তা'রীদ (সূক্ষ্ম ইঙ্গিত)-এর পরিচয়, এ দুটির মধ্যে পার্থক্য, প্রকারভেদ ও আলিমগণের মতপার্থক্য সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

৫৫শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত হাসর এবং ইখতিসাস সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي الْحَصْرِ وَالِاخْتِصَاصِ): এ অধ্যায়ে হাসর (নির্দিষ্টকরণ)-এর পরিচয়, প্রকার, পদ্ধতি, এর শব্দাবলী এবং হাসর ও ইখতিসাসের মধ্যকার পার্থক্য দলীলসহ তুলে ধরা হয়েছে।

৫৬শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত ঈজায এবং ইত্নাব সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي الْإِيجَازِ وَالْإِطْنَابِ): ঈজায (সংক্ষিপ্ত) এবং ইতনাব (বিস্তারিত) এ দুটি বালাগাত ও ফাসাহাতের অন্যতম বিষয়। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বিষয় দুটিকে উলূমুল কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত রেখে ঈজায, ইতনাবের পরিচয়, প্রকারভেদ ও এতদসম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করেছেন।

৫৭শ অধ্যায়: আল-কুরআনে খবর ও ইন্শা সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ): এ অধ্যায়ে আরবী ভাষার দুটি বাক্যরীতি তথা খবর (সংবাদসূচক বাক্য) এবং ইনশা (অনুজ্ঞাসূচক বাক্য) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি দশটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত।

৫৮শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত ইলমুল বাদী' সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي بَدَائِعِ الْقُرْآنِ): এ অধ্যায়ে বাদাই'উল কুরআন তথা আল-কুরআনে ব্যবহৃত ইলমুল বাদী' সম্পর্কে ১০০টি বিষয়ের আলোচনা প্রদান করা হয়েছে।

৫৯শ অধ্যায়: আল-কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যকার পৃথকীকরণ সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي فَوَاصِلِ الْآيِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনে বর্ণিত ফাসিলা তথা অন্তমিল সম্পর্কিত বিষয় পাঁচটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো- ফাসিলার পার্থক্য, চেনার পদ্ধতি, নামকরণের সার্থকতা, আয়াতের শেষ শব্দাবলীর মধ্যকার সম্পর্কের নির্ণয়ের পদ্ধতি, অন্তমিলের উৎস, সাজা' ও ফাসিলার মধ্যে পার্থক্য ও প্রকারভেদ এবং ফাসিলার সাথে ইলমুল বাদী'র অপরাপর প্রকরণ সম্পর্কে আলোচনা প্রদান করা হয়েছে।

৬০শ অধ্যায়: আল-কুরআনের সূরাসমূহের প্রারম্ভিকা সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي فَوَاتِحِ السُّوَرِ): আস্-সুয়ূতী (র) ইবন আবুল আসবা রচিত গ্রন্থের সারমর্ম এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন। সুয়ূতী (র) বলেন, দশটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আল-কুরআনের সূরাসমূহের সূচনা তথা উপক্রমণিকা (ফাওয়াতিহ্) সাজানো হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো তিনি একটি ছন্দের মাধ্যমে এভাবে উল্লেখ করেন,

أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ سُبْحَانَهُ بِثُبُوتِ الْحَمْدِ وَالسَّلْبِ لَمَّا اسْتَفْتَحَ السُّوَرَا وَالْأَمْرِ شَرْطِ النِّدَا والتعليل وَالْقَسَمِ
الدُّ عَا حُرُوفِ التَّهَجِّي اسْتَفْهِمِ الْخَبَرَا[৪৭]

এরপর সুয়ূতী (র) সূরাসমূহের প্রারম্ভিকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সর্বশেষে আল-কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয়কে চার ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করেন। যেমন- ১. ইলমুল উসূল বা নীতি শাস্ত্র, ২. ইলমুল ইবাদত বা ইবাদতের জ্ঞান, ৩. ইলমুস সুলূক বা আচরণমালা, ৪. ইলমুল কাসাস বা অতীত জাতির ইতিহাস।

৬১শ অধ্যায়: সূরাসমূহের পরিশিষ্ট সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي خَوَاتِمِ السُّوَرِ): আল-কুরআনের প্রত্যেক সূরার একটি প্রারম্ভিকা ও সমাপ্তি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে আল-কুরআনের উচ্চাঙ্গ সাহিত্য ও লালিত্য মাধুর্য তুলে ধরেছেন, যা কোনো মানুষের পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআনের সূরাসমূহের সমাপ্তি তথা উপসংহারের বৈশিষ্ট্য, এর গুরুত্ব এবং সূরা ফাতিহাসহ কিছুসংখ্যক সূরার উপসংহারের উপর পর্যালোচনা করেছেন।[৪৮]

৬২শ অধ্যায়: আয়াতসমূহের সম্পর্কীকরণ 'মুনাসাবাত' সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي مُنَاسَبَةِ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ): এ অধ্যায়ে আয়াতসমূহের পূর্বাপর মুনাসাবাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৬৩শ অধ্যায়: আল-কুরআনের সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতসমূহের আলোচনা (فِي الْآيَاتِ الْمُشْتَبِهَاتِ): এ অধ্যায়ে মুতাশাবিহাত আয়াত সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এরপর মুতাশাবিহাত আয়াতের হিকমত ও রহস্য উদাহরণসহ আলোচনা প্রদান করা হয়েছে।

৬৪শ অধ্যায়: আল-কুরআনের মু'জিযা ও ই'জায সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي إِعْجَازِ الْقُرْآنِ): আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। মু'জিযা দ্বারা তাঁদেরকে শক্তিশালী করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চিরন্তন মু'জিযা হলো আল-কুরআন। এ গ্রন্থ তাঁর শব্দচয়ন, পদগঠন, বাক্যবিন্যাস, রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্তু, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি, বহুবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ইত্যাদি ক্ষেত্রের দিক থেকে নজিরবিহীন। ফলে সর্বকালের এবং সর্বযুগের মানুষ কুরআনের অনুরূপ একটি কুরআন এমনকি এর সর্বকনিষ্ঠ সূরার ন্যায় একটি সূরা রচনা করতে অক্ষম। আর এটাই হচ্ছে ই'জাযুল-কুরআন। আস্-সুয়ূতী (র) ই'জাযের পরিচয় দিয়ে বলেন,

الْمُعْجِزَةَ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ مقرون بالتحدي سالم عن الْمُعَارَضَةِ[৪৯]

-'মু'জিযা হলো এমন একটি কাজ, যা মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত এবং চ্যালেঞ্জ সম্বলিত, তার মোকাবিলা থেকে মুক্ত। যা মানুষের অসাধ্য কাজ এবং যা দ্বারা মানুষকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ তার মোকাবিলা বা অক্ষম করতে পারে না এরূপ বস্তুকে মু'জিযা বলা হয়।'

আস্-সুয়ূতী (র) এরপর মু'জিযার প্রকরণ, কুরআনের মু'জিযা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দলীলাদি, সূরাসমূহের মু'জিযা, মু'জিযার উপকারিতা, মু'জিযার ধরণ সম্পর্কে ইমাম কাযী আয়াযের পর্যালোচনা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াদি তুলে ধরেছেন।

৬৫শ অধ্যায়: আল-কুরআনে লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي الْعُلُومِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنَ الْقُرْآنِ): আল্লাহ্ তা'আলা সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিমালা আল-কুরআনুল কারীমে আমানত রেখেছেন অতি স্বযত্নে। যুগ যুগ ধরে মানুষ এগুলো খুঁজে বের করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, **مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ**[৫০] -'আমি কিতাবে কোনো বস্তুর বর্ণনা ছেড়ে দেয়নি।' বায়হাকী (র) হাসান (র) থেকে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

انْزَلَ اللهُ مِائَةً وَّ ارْبَعَةِ كُتُبٍ وَأَوْدَعَ عُلُوْمَهَا ارْبَعَةَ مِنْهَا التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيْلُ وَالزَّبُوْرُ وَالْفُرْقَان، ثُمَّ أَوْدَعَ عِلْمَ الثَّلَاثَةِ الْفُرْقَانَ.[৫১]

-'আল্লাহ্ তা'আলা ১০৪টি কিতাব নাযিল করেছেন এবং এগুলোর ইলম ৪টি কিতাবে আমানত রেখেছেন। সেগুলো হলো, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর এবং ফুরকান। এরপর তিনি ফুরকান তথা আল-কুরআনে আমানত রাখলেন উল্লিখিত তিনটির সকল জ্ঞান।'

আস্-সুয়ূতী (র)-এর আল-ইতকান গ্রন্থে আল-কুরআনের ২০ (বিশ) প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। সাথে সাথে আল-কুরআন থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিধান উদ্ভাবন করার পদ্ধতিও উল্লেখ করেছেন।

৬৬শ অধ্যায়: আমছালুল কুরআন সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي أَمْثَالِهِ): আল-কুরআনে ব্যবহৃত আমছালের জ্ঞান উলূমুল কুরআনের একটি বড় জ্ঞান; কিন্তু মানুষ এ বিষয়ে উদাসীন। কারণ তারা শুধু উপমা নিয়েই মগ্ন; কিন্তু যে বিষয়ে উপমা দেওয়া হয়েছে সে বিষয় সম্পর্কে তারা উদাসীন। অথচ শুধু উপমা এমন, যেমন লাগামহীন ঘোড়া এবং রশিহীন

উষ্ট্রী। এ অধ্যায়ে আস্-সুয়ূতী (র) উপর্যুক্ত সংজ্ঞার পর আমছালুল কুরআনের গুরুত্ব, প্রকারভেদ, কুরআনের কিছু আয়াত দ্বারা উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তিনি হাসান ইবনুল ফাদাল থেকে আরব এবং অনারবীয় প্রবাদ বাক্যের অনুরূপ আল-কুরআন থেকে উৎকলিত বহু উপমার উল্লেখ করেছেন।

৬৭শ অধ্যায়: আকসামুল কুরআন সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي أَقْسَامِ الْقُرْآنِ): আল-কুরআনে আল্লাহ্তা'আলা তাঁর গুণাবলী, নিদর্শনাবলী এবং কতিপয় সৃষ্টির নামে কসম তথা শপথ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনের সাতস্থানে তাঁর নিজ সত্তার নামে শপথ করেছেন। ইব্ন আবী আসবার বর্ণনা উল্লেখ পূর্বক আস্-সুয়ূতী (র) বলেন,

اَلْقَسْمُ بِالْمَصْنُوْعَاتِ يَسْتَلْزِمُ الْقَسْمَ بِالصَّانِعِ. لاَنَّ ذِكْرَ الْمَفْعُوْلِ يَسْتَلْزِمُ ذِكْرَ الْفَاعِلِ، اِذْ يَسْتَحِيْلُ وَجُوْدُ مَفْعُوْلٍ بِغَيْرِ فَاعِلٍ[৫২]

-'সৃষ্টির নামে কসম করা হলে স্রষ্টার নামেই কসম করা হয়। কেননা কর্মের উল্লেখের দ্বারা কর্তার উল্লেখ করা হয়। কারণ কর্তা ব্যতিত কর্মের অস্তিত্বই অসম্ভব।'

কুরআন মাজীদ অন্বেষণ করলে দেখা যায় তাতে বহুসংখ্যক বস্তুসমূহের শপথ করা হয়েছে। এরপর আস্-সুয়ূতী (র) কস্মের প্রকার, তাৎপর্য ও রহস্য, কস্মের ধরণ, প্রকরণ, কস্মের বিষয় প্রভৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত অর্থবহ আলোচনা এ অধ্যায়ে প্রদান করেছেন।

৬৮শ অধ্যায়: জাদালুল কুরআন সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي جَدَلِ الْقُرْآنِ): আল-কুরআন বাতিলপন্থীদের মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। এছাড়া এমন পদ্ধতিতে তাদের মোকাবিলা করেছে এবং এমন শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ উত্থাপন করেছে, যাতে তারা সত্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সহজ-সরল ও স্পষ্ট ভাষায় যিনি দলীল উপস্থাপন করতে অক্ষম তিনিই জটিল বক্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি অধিকাংশ লোকের বোধগম্য করে স্পষ্ট কথা বলতে সক্ষম তিনি এমন জটিল বক্তব্যের অবতারণা করেন না, যা নগণ্য সংখ্যক লোকই বুঝতে সক্ষম হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মাখলূকের সাথে বিতর্কমূলক সম্বোধনে অতি স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন। যাতে সাধারণ মানুষ তা অনুধাবন করে সন্তুষ্ট হতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত দলীলও প্রমাণিত হয়। আর বিশেষ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও সে সকল খবর হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।[৫৩]

এ অধ্যায়ে আস্-সুয়ূতী (র) জাদালুল কুরআনের ধরণ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, নীতিমালাসমূহ আল-কুরআনের আয়াত ও যুক্তি দ্বারা উপস্থাপন করেছেন।

৬৯শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত নাম, উপনাম ও উপাধিসমূহের আলোচনা (فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَالْأَلْقَابِ): আস-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ে আল-কুরআনে উল্লিখিত নবী-রাসূলগণের নাম, উপমা, উপাধি, সাহাবীগণের নাম, কতিপয় ফেরেশতার নাম, উপাধি, কতিপয় নবীর নাম, কাফির ও পশু-পাখীর নাম প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

৭০শ অধ্যায়: আল-কুরআনে ব্যবহৃত সন্দেহপূর্ণ বিষয়াবলীর আলোচনা (فِي مُبْهَمَاتِهِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের সংশয়পূর্ণ আয়াত ও শব্দাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। আস্-সুয়ূতী (র) এ ধরনের সংশয় ও অস্পষ্টতার কারণ ও হিকমত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ বিষয়ের উপর কয়েকজন গ্রন্থকারের নামও উল্লেখ করেছেন।

৭১শ অধ্যায়: আল-কুরআনের উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের আলোচনা (فِي أَسْمَاءِ مَنْ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ): আস্-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ে আল-কুরআনে যে সকল মহান সাহাবী (রা) সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন, হামযাহ্ (রা), যায়দ (রা), আলী (রা), সা'দ (রা), রিফা'আ (রা) ও হাবীব ইব্ন সিবা (রা)।

৭২শ অধ্যায়: আল-কুরআনের ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ): আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত অপরিসীম। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা) আমাদেরকে আল-কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন[৫৪], **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ** 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।' জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ অধ্যায়ে আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলতসমূহ কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীছ দ্বারা পর্যালোচনা করেছেন।

৭৩শ অধ্যায়: আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা বিষয়ক আলোচনা (فِي أَفْضَلِ الْقُرْآنِ وَفَاضِلِهِ): আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়ে ইমামগণের মতামত বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে দুটি দল ইমামের বিপরীতমুখী মত পোষণ করেন। যাদের একদল মনে করেন যে, আল-কুরআন সম্পূর্ণই আল্লাহ্‌র কালাম। এক্ষেত্রে এক অংশের উপর অপর অংশের প্রাধান্য পাওয়া সঙ্গত নয়। এ মতের প্রবক্তা হলেন, আবুল হাসান আল-আশ'আরী, কাযী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী প্রমুখ। অপরপক্ষ মনে করেন যে, হাদীছের আলোকে প্রমাণিত আল-কুরআনের একাংশের উপর অপর অংশের প্রাধান্য রয়েছে। এ মতরে প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন, আবূ বকর ইবনুল আরাবী, ইমাম গাযালী, ইমাম কুরতুবী (র) প্রমুখ।

৭৪শ অধ্যায়: আল-কুরআনের একক শব্দাবলীর বিষয়ের বর্ণনা (فِي مُفْرَدَاتِ الْقُرْآنِ): এ অধ্যায়ে মুফরাদাতিল কুরআন বিষয়ের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আয়াতগুলো আলোচনা করা হয়েছে। তিনি এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) কর্তৃক রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এ অধ্যায়ে বিভিন্ন আয়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- সবচেয়ে ভীতিকর আয়াত হলো-[৫৫] وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ -'এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।'

৭৫শ অধ্যায়: আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোচনা (فِي خَوَاصِّ الْقُرْآنِ): আল-কুরআন স্বীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যার সাথে কোনো কিতাবেরই তুলনা হয় না। এ অধ্যায়ে আস্-সুয়ূতী (র) আল-কুরআনের বিশেষত্ব, বিভিন্ন আয়াত ও সূরার বিভিন্ন গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। বিশেষত তিনি মানবজাতির দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান, বিভিন্ন বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আল-কুরআনের আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।[৫৬]

৭৬শ অধ্যায়: আল-কুরআনের লিখন পদ্ধতি ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي مَرْسُومِ الْخَطِّ وَآدَابِ كِتَابَتِهِ): এ অধ্যায়ে আল-কুরআনের রাসমুল খাত তথা আল-কুরআনের লিখন নীতি এবং কুরআন লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে শিষ্টাচারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে আল-কুরআনের লিখন পদ্ধতির সূচনা ও ক্রমবিকাশ, কুরআন লিখনের প্রকরণ, কুরআন লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৭]

৭৭শ অধ্যায়: তাফসীর এবং তা'বীল বিষয়ক আলোচনা (فِي مَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَتَأْوِيلِهِ وَبَيَانِ شَرَفِهِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ): তাফসীর মানব জাতির কল্যাণের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। এটি আল-কুরআন অনুধাবনের অন্যতম মাধ্যম। রচনাশৈলী, বাকপদ্ধতি, বাচনভঙ্গি, ভাষা অলংকার এবং এর বহুমুখী জ্ঞানের উন্মোচনকারী হচ্ছে তাফসীর শাস্ত্র। সর্বোপরি তাফসীর আল্লাহ্‌র কালামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) তাফসীরের শাব্দিক অর্থ প্রসঙ্গে বলেন,

التَّفْسِيرُ "تَفْعِيلٌ" مِنَ الْفَسْرِ، وَهُوَ الْبَيَانُ وَالْكَشْفُ، وَيُقَالُ: هُوَ مَقْلُوبُ السَّفَرِ، تَقُولُ: أَسْفَرَ الصُّبْحُ إِذَا أَضَاءَ[৫৮]

-'তাফসীর শব্দটি বাবে তাফ'ঈল থেকে ফাস্‌রুন শব্দমূল থেকে গঠিত। এর অর্থ, বর্ণনা করা ও স্পষ্ট করা। বলা হয়, উহা **السَّفَر**-এর পরিবর্তিত বা উল্টানো রূপ। যেমন বলা হয়, **أَسْفَرَ الصُّبْحُ** (প্রভাত আলোকিত হয়েছে) থেকে নিষ্পন্ন।' জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) তাফসীরের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেন এভাবে,

قَالَ بَعْضُهُمْ: التَّفْسِيرُ فِي الاِصْطِلَاحِ علم نزول الآيات وشئونها وَأَقَاصِيصِهَا، وَالْأَسْبَابِ النَّازِلَةِ فِيهَا ثُمَّ تَرْتِيبِ مَكِّيِّهَا وَمَدَنِيِّهَا، وَمُحْكَمِهَا وَمُتَشَابِهِهَا، وَنَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا، وَخَاصِّهَا وَعَامِّهَا، وَمُطْلَقِهَا وَمُقَيَّدِهَا، وَمُجْمَلِهَا وَمُفَسَّرِهَا، وَحَلَالِهَا وَحَرَامِهَا وَوَعْدِهَا وَوَعِيدِهَا، وَأَمْرِهَا وَنَهْيِهَا، وَعِبَرِهَا وَأَمْثَالِهَا.[৫৯]

-'কেউ কেউ বলেন, পরিভাষায় তাফসীর বলা হয় এমন বিদ্যা বা জ্ঞানকে, যার দ্বারা আল-কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার ইতিহাস এবং এ সম্পর্কিত ঘটনাবলী, মক্কী-মাদানী সূরা ও আয়াতের ধারাবাহিকতা,

মুহ্‌কাম, মুতাশাবিহ, নাসিখ, মানসূখ, খাস, আম, মুত্‌লাক, মুকায়্যিদ, মুজ্‌মাল, মুফাস্‌সির, হালাল, হারাম, ও'য়াদ, শাস্তির ভীতি, আদেশ, নিষেধ, ইবার (শিক্ষা), আমছাল আয়াতের জ্ঞান লাভ করা যায়।'

এরপর তা'বীলের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন,

التَّأْوِيلُ أَصْلُهُ مِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ الرُّجُوعُ، فَكَأَنَّهُ صَرَفَ الْآيَةَ إِلَى مَا تَحْتَمِلُهُ مِنَ الْمَعَانِي[৬]

-'আত্‌-তা'বীল শব্দটি মূলত আল-আওয়াল শব্দ থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। যেন মুফাস্‌সির বিভিন্ন অর্থের মধ্যে সম্ভাব্য কোনো একটি অর্থ ফিরিয়ে আনেন।'

এরপর তাফসীর ও তা'বীলের পার্থক্য এবং এগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে দলীল দ্বারা উপস্থাপন করেছেন।

৭৮শ অধ্যায়: আল-কুরআনের তাফসীরকারকগণের শর্তাবলী এবং শিষ্টাচারিতা সম্পর্কিত বর্ণনা (فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ الْمُفَسِّرِ وآدابه): আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সত্য দীনের পক্ষে কুরআন একটি অকাট্য দলীল। এর প্রতিটি শব্দ মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও হিদায়াতের উৎস। আর এর হিদায়াত নির্ভর করে এর সঠিক উপলব্ধির ওপর। ফলে যিনি এর তাফসীরকারক হবেন তার জন্য রয়েছে বেশ কিছু শর্ত ও গুণের আবশ্যকতা। এ প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী (র) বলেন, 'কোনো কোনো আলিমের মতে এমন ব্যক্তির জন্যেই তাফসীর করা বৈধ, যিনি ১৫টি জ্ঞানের অধিকারী।' সেগুলো হলো- (১) লুগাহ বা আরবী ভাষার শব্দ বিশ্লেষণের জ্ঞান, (২) ইলমুন্‌-নাহু বা আরবী ব্যাকরণের জ্ঞান, (৩) ইলমুস্‌-সরফ বা আরবী শব্দের রূপান্তর জ্ঞান, (৪) ইলমুল-ইশতিকাক বা শব্দের মূলধাতুর জ্ঞান, (৫) ইলমুল-মা'আনী, (৬) ইলমুল-বায়ান, (৭) ইলমুল-বাদী', (৮) কিরাআত বা কুরআনের পঠনরীতি, (৯) উসূলুদ-দীন, (১০) উসূলুল-ফিক্‌হ, (১১) আসবাবুন্‌-নুযূল ও কাসাস বা নাযিলের কারণ ও ঘটনাবলী, (১২) নাসিখ-মানসূখ বা খণ্ডনকারী ও খণ্ডিত আয়াত, (১৩) আল-ফিক্‌হ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র, (১৪) সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট শব্দ ও আয়াতের ব্যাখ্যাকারী হাদীসের জ্ঞান এবং (১৫) ইলমুল-মুহাবাহ বা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত জ্ঞান।[৬]

এরপর কিছুসংখ্যক তাফসীরকারকের তাফসীর যথা- সাহাবায়ে কিরামের তাফসীর, তাবি'ঈগণের তাফসীর, বিভিন্ন শব্দ ও আয়াত তাফসীরকরণের পন্থা, সূফীগণের তাফসীরের রূপরেখা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের আলোচনা প্রদান করা হয়েছে।

৭৯শ অধ্যায়: গারাইবুত্‌-তাফসীর সম্পর্কিত আলোচনা (فِي غَرَائِبِ التَّفْسِيرِ): এ অধ্যায়ে কতিপয় দুর্বোধ্য ও অপছন্দনীয় তাফসীর সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী (র) মাহমূদ ইব্‌ন হামযাতুল বারমানী রচিত গ্রন্থের উল্লেখ করে বলেন, 'আল-কুরআনের কতিপয় আয়াতের মর্মার্থ তথা তাফসীর এমন অপছন্দনীয় ও ঘৃণ্যভাবে করা হয়েছে যে, এর উপর বিশ্বাস করা অবৈধ। আর এ তাফসীরগুলো উল্লেখ করার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যেন তা থেকে পাঠক বিরত থাকতে পারে।'

জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী (র) এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী, **حم-عسق** হা-মীম, আইন-সীন, কাফ-এর তাফসীর। কেননা এর মধ্যকার 'হা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে মারওয়ানের হুকুমত, 'আইন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে আব্বাসীয় শাসন, 'সীন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে সুফইয়ান (উমাইয়া) শাসন এবং 'কাফ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইমাম মাহ্‌দী (আ)-এর নেতৃত্ব।[৬]

৮০শ অধ্যায়: তাফসীরকারকগণের স্তর বিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা (فِي طَبَقَاتِ الْمُفَسِّرِينَ): এ অধ্যায়ে আস্‌-সুয়ূতী (র) তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন তথা তাফসীরকারগণের স্তর বিশেষত সাহাবী ও তাবি'ঈগণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতী (র) এ প্রসঙ্গে দশ জন প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সসির সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

اشْتُهِرَ بِالتَّفْسِيرِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَشَرَةٌ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ.[৬]

-'তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, চারজন খলীফা, ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা), উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা), যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইব্‌নুয্‌ যুবায়র (রা)।'

তাবি'ঈগণের যুগে তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এ যুগে কতিপয় বিশিষ্ট তাফসীরকারকের অভ্যুদয় ঘটে। ইব্ন তায়মিয়্যাহ (র) বলেন, তাফসীরে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ছিলেন মক্কাবাসীগণ। কারণ তাঁরা ছিলেন ইব্ন আব্বাস (রা)-এর শিষ্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মুজাহিদ (র), আতা ইব্ন আবী রাবাহ (র), ইকরামা (র), সা'ঈদ ইব্ন যুবায়র (র) এবং তাউস (র)। অনুরূপভাবে কূফা নগরীর ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর শিষ্যগণও তাফসীরশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। মদীনার আলিমগণও ছিলেন তাফসীর বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে যায়দ ইব্ন আসলাম (র) ছিলেন অন্যতম। তাঁর থেকে তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ এবং মালিক ইব্ন আনাস (র)।

তাফসীর চর্চায় সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের অবদান শীর্ষে। পরবর্তী স্তরের তাফসীরবিদগণ তাঁদের থেকেই বর্ণনা ও মতামত গ্রহণ করে তাফসীর গ্রন্থ সংকলন করেছেন। যেমন- সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ, ওয়াকী' ইব্নুল-জাররাহ, ইয়াযীদ ইব্ন হারুন, আব্দুর-রায্যাক প্রমুখ তাফসীর সংকলক। এর পরবর্তী স্তরে আগমন করেন ইব্ন জারীর তাবারী, ইব্ন আবী হাতিম, ইব্ন মাজাহ, হাকিম, ইব্ন মারদূয়াহ, ইব্ন হিব্বান এবং ইব্নুল-মুনযির। তাঁদের তাফসীর ছিল সাহাবী, তাবি'ঈ এবং তাবি'ঈ-তাবি'ঈগণ থেকে বর্ণিত তাফসীরের ওপর নির্ভরশীল। তবে ইব্ন জারীর তাবারী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন মত উল্লেখ করে সেগুলোর সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেছেন এবং কোনো একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এছাড়া ই'রাব ও কিরাআত বর্ণনা করেছেন এবং ইস্তিম্বাত করেছেন। এজন্য ইব্ন জারীর (র)-এর তাফসীর গ্রন্থ এ শাস্ত্রের একটি মহান ও শ্রেষ্ঠ তাফসীর হিসেবে বিবেচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) তাঁর 'আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থে যে সকল বিষয় আলোচনা করেছেন তা আল-কুরআন বুঝার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু উক্ত বিষয়সমূহ আমাদের এ ছোট প্রবন্ধের মাধ্যমে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এটি একটি ব্যাপক বিষয়। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআনে উল্লিখিত আশিটি বিষয়ের শিরোনাম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের চেষ্টা চালানো হয়েছে।

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থটির সংস্করণ

আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, তাই বিশ্বের প্রসিদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে এটি বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সাথে সাথে বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। নিম্নে গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ উল্লেখ করা হলো-

১. হিন্দের আল-মাতবা'আহ্ আল-মাদানিয়্যাহ্ থেকে ১২৭১ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
২. কায়রোর উছমান আব্দুর রায্যাক থেকে ১২৭৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
৩. কায়রোর আল-মাওসূইয়্যাহ্ থেকে ১২৭৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
৪. কায়রোর আল-মাতবা'আতুল মায়মানিয়্যাহ্ থেকে ১৩১৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
৫. কায়রোর আল-মাতবা'আতুল আযহারিয়্যাহ্ থেকে ১৩১৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
৬. কায়রোর মাকতাবাতু মাহমূদ তাওফীক থেকে ১৩৬০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
৭. কায়রোর হিজাযের আল-মাকতাবাতুত্-তিজারিয়্যাহ্ আল-কুবরা প্রকাশনী থেকে ১৩৬৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
৮. মিসরের মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাভী থেকে ১৩৭০ হি./১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এক জুযে দুই খণ্ডে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর হাশিয়াতে বাকিল্লানীর ই'জাযুল কুরআন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৯. দিল্লীর কুতুবখানাহ্ ইশা'আতে ইসলাম প্রকাশনী থেকে এক জুযে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর হাশিয়াতে বাকিল্লানীর ই'জাযুল কুরআন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
১০. পাকিস্তানের লাহোরের সুহায়ল একাডেমি থেকে এক জুযে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর হাশিয়াতে বাকিল্লানীর ই'জাযুল কুরআন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
১১. কায়রোর আল-মাশহাদ আল-হুসায়নী প্রকাশনী থেকে ১৩৭৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
১২. বৈরূতের দারু ইহ্ইয়াইল উলূম ও রিয়াদের মাকতাবাতুল মা'আরিফ থেকে মুহাম্মদ শারীক সুকার ও মুস্তাফা আল-কাসাস-এর তাহ্কীকসহ ১৪০৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
১৩. দিমাশকের দারু ইব্ন কাছীর প্রকাশনী থেকে মুস্তাফা দীবুল বুগা-এর তাহ্কীকসহ ১৪০৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

১৪. দারুল কিতাবিল আরাবী থেকে ফুওয়ায যুমালীর সম্পাদনায় ১৪১৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।
১৫. কায়রোর আল-মাক্তাবাতুত্-তাওফীকিয়্যাহ থেকে তোয়াহা আব্দুর রঊফ সা'দ-এর সম্পদনায় তারিখ বিহীন দুই খণ্ডে চার জুয়ে প্রকাশিত হয়।
১৬. আল-মামলাকাতুস্ সাউদিয়্যার রিয়াদের মাকতাবাতু নাযার মুস্তাফা আল-বায থেকে আব্দুল মুন'ঈম ইবরাহীমের সম্পাদনায় চার খণ্ডে ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটিকে যিনি সবচেয়ে সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্ত আকার দান করেছেন ও উত্তমভাবে অধ্যায় বিন্যাস করেছেন তিনি হলেন উস্তায আমির বুহায়রী (র)। তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'আল-মুখতার মিন কিতাবিল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন'।

উপর্যুক্ত সংস্করণগুলোর মধ্যে সর্বশেষ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটি সর্বোৎকৃষ্ট সম্পাদনামূলক গ্রন্থ। এতে আল-কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠার ফুটনোটে হাদীছের তাখরীজ করা হয়েছে। এছাড়া দুর্বোধ্য শব্দের কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটির সংস্করণ চার খণ্ডে বিভক্ত এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৯৭।

পরবর্তী যুগের রচনাবলীতে 'আল-ইতকান' গ্রন্থের প্রভাব

আল-ইতকান গ্রন্থটি উলূমুল কুরআন বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক বৃহৎ গ্রন্থ। আলিমগণ গ্রন্থটির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন বেশ কয়েকটি কারণে। তা নিম্নরূপ-

১. ব্যাপক আলোচনা ও উলূমুল কুরআনের বহু প্রকার এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া।
২. গ্রন্থকার ব্যাপক প্রসিদ্ধি হওয়া।
৩. আল-বুরহান গ্রন্থটি (পূর্বে রচিত হওয়া সত্ত্বেও) আল-ইতকান গ্রন্থ প্রকাশের ১০৬ বছর পরে প্রকাশিত হওয়া, আর এ সময়ের মধ্যে আল-ইতকান গ্রন্থের প্রভাব সকল মহাদেশে পৌঁছে যাওয়া।

যে সকল গ্রন্থে আল-ইতকান গ্রন্থের প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে

১. ইবন উকায়লাহ আল-মাক্কী (র) (মৃত ১১৫০ হি.) কর্তৃক রচিত 'আয্-যিয়াদাহ ওয়াল ইহ্সান ফী উলূমিল কুরআন'। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের উলূমুল কুরআনের অধিকাংশ বিষয় রচনায় আল-ইতকানের উপর নির্ভর করেছেন।
২. তাশ কুবরা যাদাহ নামে পরিচিত আহমাদ ইবন মুস্তাফা (র) (মৃত ৯৬৮ হি.) কর্তৃক রচিত 'মিফতাহুস-সা'আদাহ ওয়া মিসবাহুস-সিয়াদাহ'। এটি এমন একটি গ্রন্থ, যাতে বিভিন্ন উলূমের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু যখন উলূমুত-তাফসীরের শাখা-প্রশাখার বিষয় এসেছে তখন তিনি আল-ইতকান থেকেই সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করেছেন। আর উলূমুল কুরআনের প্রকারসমূহ জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র)-এর বর্ণনানুসারে উপস্থাপন করেছেন।
৩. শায়খ তাহির আল-জাযাইরী (র) (মৃত ১৩৩৮ হি.) কর্তৃক রচিত 'আত-তিবইয়ান লি-বা'দি মাইবাহিছিল মুতা'আল্লাকাতি বিল কুরআন আলা তারীকিল ইতকান'। গ্রন্থটিকে আল-ইতকান গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

আল-ইতকান গ্রন্থের সমালোচনা

আল-ইতকান গ্রন্থটির প্রসিদ্ধতা পাঠকমহলে সমাদৃত হওয়ার পরও কিছুসংখ্যক সমালোচক এর সমালোচনা করেছেন। উক্ত সমালোচনাগুলো নিম্নরূপ:

১. বেশ কিছু মাসআলা সালফে সালিহীনের মতের সাথে অমিল হওয়া।
২. ওয়াহিয়্যাত বর্ণনা ও অশুদ্ধ বর্ণনার উল্লেখ থাকা।
৩. ইসরাঈলী বর্ণনা আনয়নের ক্ষেত্রে তার তাওয়াস্সু' বিশেষ করে মুবহামাতের বর্ণনার ক্ষেত্রে।
৪. কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বিপরিতধর্মী ও অসঙ্গতিপূর্ণ মতামত চাপিয়ে দিয়েছেন।
৫. কিছু ভুল ও শরীয়ত বিবর্জিত বিষয় উপস্থাপন।

৬. কিছু কিছু ক্ষেত্রে অধ্যায় বিন্যাসে ধারাবাহিকতা বর্জন।
৭. কোনো কোনো মাস'আলার ক্ষেত্রে তারজীহ বর্জন।
৮. উলূমুল কুরআনের কিছু কিছু বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান না করা।
৯. উলূমুল কুরআন ও উলূমুত-তাফসীর বিষয়ে এমন কিছু কাওল আনয়ন, যা মারদূদ।
১০. এমন অনেক কথা উপস্থাপিত হয়েছে, যে কথাগুলোর কথক নির্দিষ্ট করা হয়নি।
১১. কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে ওয়াহাম হয়েছে।

যদিও সমালোচকগণ জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র)-এর 'আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' সম্পর্কে কিছু সমালোচনা করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এ গ্রন্থটি সকল সমালোচনার অনেক উর্ধ্বে। কারণ সমালোচনা করা যত সহজ, এমন একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করা তত সহজসাধ্য বিষয় নয়। তাই সবার পূর্বে জ্ঞান বিতরণের প্রতি নিজেদের মনোযোগ প্রদান করতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে যে, এটি কতটা দুর্বোধ্য ও কঠিন কার্য। আমাদেরকে সকল সমালোচনা থেকে দূরে থেকে এ ধরনের রচনার প্রতি মনোনিবেশ করা, প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই কেবল জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার

জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (র) ছিলেন একজন প্রখ্যাত তাফসীর, উলূমুল কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ, ইতিহাস, বালাগাত, তাসাওউফ, নাহুসহ বিভিন্ন বিষয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে উলূমুল কুরআন বিষয়ে রচিত তাঁর আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থটি অন্যতম। গ্রন্থটিকে উলূমূল কুরআনের জ্ঞানকোষ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এতে আল-কুরআনে বিধৃত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহ অতীব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- ওহী, আল-কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়, কিরাআত, কুরআন রিওয়ায়াতের সনদ, কুরআনের শব্দাবলী ও তাজবীদ, কুরআনের হুকুম তথা আম-খাস, মুবায়্যান-মুজমাল, মুহকাম-মুতাশাবিহ, মুতলাক-মুকায়্যাদ, নাসিখ-মানসূখ, ই'জায, আমছাল, আকসাম, জাদলসহ প্রভৃতি কুরআন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান। এর শেষ তিনটি অধ্যায়ে তাফসীর ও তা'বীলের আলোচনা, মুফাসসিরগণের শর্তাবলী ও শিষ্টাচারিতা, গারায়িবুত্-তাফসীর এবং মুফাস্‌সিরগণের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া এসকল বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও উদাহরণের জন্য কিছু শর্তও বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে গ্রন্থটির মধ্যে উলূমুল কুরআন বিষয়ে রচিত সকল বিষয়সমূহকে মোট আশিটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। গ্রন্থটির আলোচনা ও উপস্থাপনাভঙ্গি খুবই সহজ ও সাবলীল। ফলে পাঠকবর্গ সহজেই গ্রন্থটি থেকে উলূমুল কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হন। গ্রন্থকার এতে আল-কুরআনের আয়াত ব্যতিত বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমেও দলীল উপস্থাপন করেছেন। তাই গ্রন্থটিকে এ বিষয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। এজন্য পরবর্তী যুগের উলূমুল কুরআন বিশারদগণ ও বর্তমান যুগের মনীষীগণ এ গ্রন্থটির সাহায্যে উলূমুল কুরআন রচনায় আরও সমৃদ্ধকরণে এগিয়ে যাচ্ছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র)-এর প্রকৃত নাম আব্দুর রহমান। উপাধি জালালুদ্দীন, কুনিয়াত আবুল ফযল। পিতার নাম আবূ বকর মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন কামালুদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বকর উছমান ফখরুদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মাদ নাযিরুদ্দীন ইব্‌ন সায়ফুদ্দীন খাদার ইব্‌ন আবিস্-সালাহ আয়্যূব নাজমুদ্দীন ইব্‌ন মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন ইব্‌ন হুমামুদ্দীন আল-খুযায়রী আত্-তাওলুনী আল-মিসরী আল-জা'ফরী আশ্-শাফি'ঈ আস্-সুয়ূতী। ইমাম সুয়ূতী (র) ৮৪৯ হিজরীর ১ রজব মোতাবেক ১৩ অক্টোবর ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে মাগরিবের নামাযের পর মিসরের নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত সুয়ূত শহরের ফিযারিয়্যা অথবা খিজর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ বছর ৭ মাস বয়সে তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। ৮ বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। এরপর তিনি পিতার আধ্যাত্মিক বন্ধু প্রসিদ্ধ আলিম শায়খ কামালুদ্দীন ইব্‌নুল হুমাম আল-হানাফী (র)-এর তত্ত্বাবধানে জ্ঞানচর্চা করেন। এরপর ইমাম সুয়ূতী (র) হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। তাঁর পিতার ব্যক্তিগত একটি গ্রন্থাগারে গুরুত্বপূর্ণ প্রচুর গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। তিনি গ্রন্থাগারটিতে তখন থেকেই ব্যাপক জ্ঞানচর্চা শুরু করেন। এ সময়

তিনি একে একে উমদাতুল-আহকাম, আলফিয়্যাহ, মিনহাজুল-ফিকহ, উসূল ও অন্যান্য কিতাব মুখস্থ করেন। এরপর ইমাম সুয়ূতী (র) মিসরের কায়রোর শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের নিকট জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি তাঁদের থেকে গুরুত্বপূর্ণ সকল জ্ঞান আহরণ করেন। আল-বালকীনীর সাহচার্যে তিনি অত্যন্ত উপকৃত হন। তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সর্বান্তকরণে সচেষ্ট হন এবং তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত হয়ে অনুপ্রাণিত হন। ইমাম সুয়ূতী (র) অসংখ্য শিক্ষকের নিকট জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁদের থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, তাঁর এরূপ শিক্ষকের সংখ্যা ছিল প্রায় ছয়শত। ইমাম সুয়ূতী (র) মাত্র সতের বছর বয়সে শিক্ষকতা ও রচনা কর্মে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞান অর্জন করার পর ৮৭১ হিজরী থেকে ফাতাওয়া ও ৮৭২ হিজরী থেকে কিতাব রচনার কাজ শুরু করেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দারস ও তাদবীনের কাজ করেন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র)-এর ছাত্র সংখ্যা ছিল অগণিত। তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৫০০ থেকে ১০০০ গ্রন্থাবলী রচনা করেন বলে জানা যায়। ইব্‌নুল ইমাদ (র)-এর মতে, ইমাম সুয়ূতী (র) ৫০০টি গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম সুয়ূতী (র) ৭ দিন কঠিন রোগে অসুস্থ থাকার পর ৯১১ হিজরীর ১৮ মতান্তরে ১৯ জমাদিউল উলা মোতাবেক ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দের১ ১৭ অক্টোবর শুক্রবার সকালে রওযাতুল মিকাইয়াস নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর।

দ্র. কাযী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী আশ্-শাওকানী, *আল-বাদরুত্-তালী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২২৯; ড. হুসায়ন আয্-যাহাবী, *আত্-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন*, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা স্থান ও তারিখ বিহীন), পৃ. ২৫১; নাজমুদ্দীন আল-গিযমী, *আল-কাওয়াকিবুস সায়িরা*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: আল-মাতবা'আতুল আমীরিকানিয়্যাহ, ১৯৪৫ খ্রি.), পৃ. ২২৬; মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আকিল মূসা, *ই'জাযুল কুরআনিল কারীম* (জেদ্দা: দারুল আন্দালুস আল-খাদারা, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২১৯; উমার রিযা কাহহালাহ, *মু'জামুল-মুআল্লিফীন*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৮২; খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ইলম লিল-মালাউন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩০১।

২ বুতরুস আল-বুস্তানী, *কিতাবু দাইরাতিল মা'আরিফ*, ১০ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৩৫৮।

৩ *ফিহ্‌রিসতুল মাক্‌তাবা আল-আযহারিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, (১৩৭১ হি. সংস্করণ), পৃ. ১৬৮।

৪ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম আয্-যুরকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৩৭; সম্পাদিত, *কুরআন পরিচিতি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৩৯২।

৫ আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, আব্দুল মুন'ঈম ইবরাহীম সম্পাদিত, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতু নাযার মুস্তাফা আল-বায, ২য় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮), ভূমিকা, পৃ. ১৬-১৭।

৬ পূর্বোক্ত।

৭ পূর্বোক্ত।

৮ পূর্বোক্ত।

৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

১১ পূর্বোক্ত।

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২০।

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

১৪ আত্-তাবরানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০১।

১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (রিয়াদ: দারুস্-সালাম, ২য় সং., ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), ফাযাইলুল কুরআন, ৮ম খণ্ড, পৃ. পৃ. ৬৬৩; আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

১৬ সূরা আল-বাকারা, ২ : ১২৫।

১৭ সূরা আস্-সাফ্‌ফাত, ৩৭ : ১৬৪-১৬৬।

১৮ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত্-তিরমিযী, *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবুন ফী মানাকিবি আবী হাফ্‌স উমারা ইব্‌নিল খাত্তাবি (রা) (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্‌ন হাজার, ১ম সং., ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), হাদীছ নং ৩৬৮২।

২০ সূরা আত্-তাওবাহ্, ৯ : ১১৩।

২১ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।

২২ মুহাম্মাদ আয্-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৯।

২৩ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।
২৪ *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২; *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২।
২৫ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২।
২৬ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮।
২৭ সূরা আল-বাকারাহ্, ২ : ১৮৫।
২৮ সূরা আল-কাদর, ৯৭ : ১।
২৯ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬-১৭৭।
৩০ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮।
৩১ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২।
৩২ আল-হাকিম আন্-নায়সাপূরী, *আল-মুসতাদরাক*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), কিতাবুত্-তাফসীর, হাদীছ নং ২৯০১, পৃ. ২৪৯।
৩৩ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১১-২১২।
৩৪ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।
৩৫ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩২।
৩৬ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪।
৩৭ সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৮৯।
৩৮ সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৯০।
৩৯ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯।
৪০ ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বাবু ফাযলুন ফী তারকিত্-তা'ম্মুকি ফিল কুরআন, হাদীছ নং ২৪০৬; *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৩।
৪১ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩-৩৩২।
৪২ *পূর্বোক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
৪৩ *সহীহুল বুখারী*, বাবুন খায়রুকুম মান তা'আল্লামাল কুরআনা ওয়া-আল্লামাহু, হাদীছ নং, ৫০২৭; সুলায়মান ইব্নুল আশ'আশ আস্-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইবন হাজার, ১ম সং., ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), বাবুন ফী ছাওয়াবি কিরাআতিল কুরআন, হাদীছ নং ১৪৫২; *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মাজাআ ফী তা'আলীমিল কুরআন, হাদীছ নং ২৯০৭, ২৯০৯; *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
৪৪ *সহীহুল বুখারী*, বাবু ইগতিবাতি সাহিবিল কুরআন, হাদীছ নং, ৫০২৫; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ফাযলি মান ইয়াকূমু বিল কুরআন, ওয়া ইউ'আল্লিমুহু ওয়া ফাযলি মান তা'আল্লামা হিকমাতান মিন ফিকহি ... হাদীছ নং (৮১৫) ২৬৭।
৪৫ *জামি'উত্-তিরমিযী*, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু মা জাআ ফী তা'লীমিল কুরআন, হাদীছ নং ২৯১০, পৃ. ৮০২।
৪৬ *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩-১০৫।
৪৭ পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।
৪৮ পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।
৪৯ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩।
৫০ সূরা আল-আন'আম, ৬ : ৩৮।
৫১ *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮।
৫২ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫।
৫৩ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০।
৫৪ *সহীহুল বুখারী*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং ৪৬৫৩, পৃ. ৬৪৯; *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল বিত্‌র, বাবু ইসতিহাবুত্-তারতীল ফিল কিরাআত, হাদীছ নং ১৪২৫, পৃ. ৩০৮; *জামিউত্-তিরমিযী*, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু মাজাআ ফী তা'লীমিল কুরআন, হাদীছ নং ২৯০৯, পৃ. ৮০২।
৫৫ সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১৩১।
৫৬ *আল-ইতকান ফী উলূমিল-কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
৫৭ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৭।
৫৮ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯২।
৫৯ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪।
৬০ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯২।

৬১ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০২।
৬২ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩০।
৬৩ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৩।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

ইসলামের আলোকে উশরের বিধান

মো. আশরাফুল ইসলাম*

Abstract: Islam is a complete code of life. In this system of life various mankind problems, alongside laying dawn well-founded religious rules and regulations, have been resolved very easily. Economics is an essential part of material world. Islam is the only way of life that controls the overall dynamics of the economy where a balance has been struck between the savings and expenditure of the individual. Zakat is a basic pillar of Islam as well as an important part of Islamic economics. It is a provision that is eternally beneficial for mankind. The main feature of this provision is the proper distribution of financial resources among the poor and deprived people in the community. by regularly collecting a certain portion of the surplus wealth of the rich and affluent people of the society. Ushr is an important basic action of worship in islam like Zakat. It involved in the most essential elements of human life the economy. Since the idea of its provision is very limited among the Muslims, This article provides a brief introduction of Ushr and also offers an analytical discussion of its provision for a better understanding.

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিধি-বিধানের পাশাপাশি বৈষয়িক বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান প্রদান করা হয়েছে অত্যন্ত সুচারুরূপে। বৈষয়িক বিষয়াদির মধ্যে অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অর্থনীতির সার্বিক গতিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তির অর্থ সঞ্চয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হচ্ছে যাকাত। এটি মানবজাতির জন্য চিরকল্যাণকর একটি বিধান। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উদ্বৃত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই এ বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বিধান বৈষম্য ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার বিধায় একে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ বা রুকন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এটি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামের অন্যতম মৌলিক ইবাদত হিসেবেও গণ্য। আর ইসলামে উশর ব্যবস্থা যাকাতের অনুরূপ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান। কিন্তু যাকাতের তুলনায় এ বিধানটি মুসলিম সমাজে কম প্রচলিত বিধায় এর বিধি-বিধান সম্পর্কে মুসলিম সমাজের ধারণা কিছুটা সীমিত। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে উশরের পরিচয় উল্লেখপূর্বক উশর আদায়ের বিধান সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

উশরের পরিচয়

উশর (**عُشْر**) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে **عُشُوْر** ও **أَعْشَار**।[১] শব্দটি আরবী আশারাতুন (**عَشَرَةٌ**) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ দশ। উশর (**عُشْر**) শব্দটি আভিধানিক অর্থে দশ ভাগের এক ভাগ,[২] এক-দশমাংশ, জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ,[৩] খণ্ড, দশম অথবা নবম দিনে উটের পানি পান প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৪] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, one tenth, tenth part, tithe,[৫] A tenth, one part of ten parts[৬] ইত্যাদি।

আরবী উশর (**عُشْر**) শব্দটি আসিরীয় ভাষার ইশরু‘উ (Ish-ru-u) শব্দ এবং হিব্রু ভাষার মা‘আশির (Maasher) শব্দের অনুরূপ। ইশরু‘উ (Ish-ru-u) শব্দের অর্থ কর, যা জমিনে উৎপাদিত শস্য, খেজুর প্রভৃতি ফসল দ্বারা আদায় করা হয়। আর মা‘আশির (Maasher) শব্দের অর্থ হচ্ছে এক-দশমাংশ কর, যা রাজাগণ কর্তৃক ধার্যকৃত মন্দির বা পবিত্র স্থানসমূহের প্রাপ্য ছিল।[৭] হাদীসে ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে সর্বদা উশর (**عُشْر**) বা এক-দশমাংশ ও নিসফুল উশর (**نِصْفُ الْعُشْرِ**) বা এক-দশমাংশের অর্ধেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[৮]

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উশর (عُشْر) শব্দটির প্রকৃত অর্থ এক-দশমাংশ হলেও কখনো কখনো এটি ভূমির যাকাত ও ইবাদত অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া শব্দটি ভূমির খাজনা বা কর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। উশরের মধ্যে ইবাদত ও কর উভয় দিক বিদ্যমান থাকায় একে زَكَاةُ الْأَرْض বা ভূমির যাকাত নামেও অভিহিত করা হয়।[৯] এতদ্ব্যতিত বিভিন্ন গ্রন্থে উশরকে সাদাকাহ (صَدَقَةٌ) ও যাকাত (زَكَاة) নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১০]

পরিভাষায়, দরিদ্রদের সাহায্যার্থে মুসলমানদের জমিতে ইসলামী শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে উশর (عُشْر) বলা হয়।

উমার ইব্‌ন আব্দিল আযীয (র) (৬১-১০১ হি.) বলেন,

فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ الْعُشْرُ[১১]

-‘জমি থেকে কমবেশি যা উৎপন্ন হয়, তার দশভাগের একভাগ যাকাত প্রদানকে উশর (عُشْر) বলে।’

ইব্‌নুল আছীর (র) (৫৪৪-৬০৬ হি.) বলেন,

هُوَ زَكَاةُ مَا سَقَتْه السَّمَاء[১২]

-‘আসমানের পানি দ্বারা উৎপাদিত শস্যের যাকাতকে উশর (عُشْر) বলে।’

ড. ইবরাহীম মাদকূর (১৯০২-১৯৯৬ খ্রি.) ও অন্যান্যরা বলেন,

مَا يُؤْخَذ من زَكَاة الأَرْض الَّتِي أسلم أَهلهَا عَلَيْهَا[১৩]

-‘মুসলমানদের জমি থেকে উৎপন্ন ফসলে যে যাকাত আদায় করা হয় তাকে উশর (عُشْر) বলে।’

মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (র) (১৩২৯-১৩৯৫ হি.) বলেন,

الْعشْر علم لما يَأْخُذ الْعَاشِر وَالْجمع عشور وَأَيْضًا وَاحِد أَجزَاء الْعشْرَة أَو نصفه يُؤْخَذ من الأَرْض العشرية[১৪]

-‘উশরী জমির উৎপাদিত ফসলের আশির (উশর সংগ্রহকারী) যা সংগ্রহ করে তাকে উশর (عُشْر) বলে। এর বহুবচন হলো উশূর (عُشُوْر)। এছাড়া উশরী জমি থেকে এক-দশমাংশ বা এক-বিশমাংশ যে মাল আদায় করা হয় তাকেও উশর (عُشْر) বলে।’

ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক বলেন,

مَا يُؤْخَذُ مِن زَكَاةِ الزُّرُوْعِ[১৫]

-‘উৎপন্ন ফসলে যে যাকাত আদায় করা হয় তাকে উশর (عُشْر) বলে।’

Thomas Patrick Hughes বলেন,

USHR. A tenth or tithe given to the Muslim State or *Baitul-Mal*.[১৬]

-‘ইসলামী রাষ্ট্র অথবা বায়তুলমালে খাজনারূপে প্রদেয় এক-দশমাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ ফসলকে উশর (عُشْر) বলে।’

মোটকথা, মুসলমানদের জমিতে উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাতকে উশর (عُشْر) বলা হয়। উশর আরোপিত ভূমি উশর ও নিসফুল-উশর দুভাগে বিভক্ত[১৭] হলেও ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় উভয় শ্রেণির ভূমির ওপর আরোপিত যাকাতকেই উশর নামে অভিহিত করা হয়।[১৮]

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে যাকাত অন্যতম। আর উশর যাকাতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর যাকাতের ন্যায় উশরের বিধানও আবশ্যক। উশরের বিধান ইসলামী শরী‘আতের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনে সরাসরি উশর (عُشْر) শব্দটি ব্যবহৃত না হলেও বিভিন্ন আয়াতে উশর প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾[১৯]

-'আর তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা মাচার ওপর তুলে দেয়া হয় ও যা মাচার ওপর তোলা হয় না এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যেসবের স্বাদবিশিষ্ট, আর যায়তূন ও আনার সৃষ্টি করেছেন একে অন্যের সাদৃশ্যশীল ও সাদৃশ্যহীন। (বৃক্ষ) যখন ফলন্ত হয় তখন এগুলোর ফল খাও এবং কর্তনের সময় হক দান করো। আর অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾[২০]

-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জমিতে উৎপাদিত ফল-ফসলের যাকাত তথা উশর আদায় করা মুসলমানদের ওপর ফরয।

উশর আদায়ের বিধান

উশরের নিসাবের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও তা আদায়ের হার সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সকল ফকীহর মতে, যে জমি সেচ ব্যবস্থা ব্যতিত স্বাভাবিক আদ্রতা, বৃষ্টি, ঝর্ণা বা প্রবাহিত নদী-নালার পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে ফসল উৎপন্ন করে তাতে উশর বা এক-দশমাংশ (১০%) যাকাত আবশ্যক। পক্ষান্তরে যে জমি মানবীয় প্রচেষ্টা তথা বড় বালতি বা পাত্র দ্বারা কূপ হতে উত্তোলনকৃত পানি কিংবা গভীর-অগভীর নলকূপ বা টিউবয়েল-এর পানির মাধ্যমে অথবা যন্ত্র বা জীব-জানোয়ারের মাধ্যমে সেচের পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে ফসল উৎপন্ন করে তাতে অর্ধ-উশর বা এক-বিশমাংশ (৫%) যাকাত আবশ্যক।[২১] কেননা এক্ষেত্রে ব্যয়ভার অধিক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বৃষ্টির পানি দ্বারা কিংবা খালের পানি দ্বারা সেচ দেয়া জমিতে ব্যয় কম হয়ে থাকে।[২২] উশর আদায়ের পরিমাণ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

১. আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ[২৩]

-'বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতিত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের ওপর উশর (এক-দশমাংশ) ফরয। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওপর অর্ধ-উশর (এক-বিশমাংশ) ফরয।'

২. জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি,

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ[২৪]

-'যে ভূমি নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে উশর (এক-দশমাংশ) ফরয। আর যে ভূমি সেচের পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়, তাতে অর্ধ-উশর (এক-বিশমাংশ) ফরয।'

৩. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ[২৫]

-'যে জমি ঝর্ণা ও বৃষ্টির পানির সাহায্যে সিক্ত হয়, সে জমিতে উশর (এক-দশমাংশ) ধার্য হবে। আর সেচের সাহায্যে যে জমি সিক্ত হয়, তাতে অর্ধ-উশর (এক-বিশমাংশ) ধার্য হবে।'

৪. আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي، أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ[২৬]

-'যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা যে ভূমিতে তলদেশ থেকে আপনা-আপনিই পানি সিঞ্চিত হয়, তাতে উশর (এক-দশমাংশ) আবশ্যক। আর যে ভূমি উষ্ট্রী, বালতি কিংবা সেচ যন্ত্র দিয়ে সিঞ্চন করা হয়, তাতে অর্ধ-উশর (এক-বিশমাংশ) আবশ্যক।'

৫. মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَمَا سُقِيَ بَعْلًا، الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ[২৭]

-'রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ইয়ামানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যে, আমি যেন বৃষ্টি এবং ঝর্ণার পানির সাহায্যে উৎপন্ন ফসলে উশর (এক-দশমাংশ) এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত জমিনের ফসলে অর্ধ-উশর (এক-বিশমাংশ) যাকাত হিসেবে গ্রহণ করি।'

৬. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ بِالسَّيْلِ وَالْغَيْلِ وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ[২৮]

-'বৃষ্টি অথবা প্রবাহিত পানি, ঝর্ণা ও বৃষ্টিসিঞ্চিত পানির মাধ্যমে সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের ওপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উশর (এক-দশমাংশ) ফরয করেছেন। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওপর অর্ধ-উশর (এক-বিশমাংশ) ফরয করেছেন।'

আলোচ্য হাদীসসমূহের আলোকে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সেচ ব্যবস্থা ব্যতিত উৎপাদিত ফল ও ফসলে এক-দশমাংশ যাকাত ফরয। আর কৃত্রিমভাবে সেচের পানি সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদিত ফল ও ফসলে এক-বিশমাংশ যাকাত ফরয। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন,

فَهٰذَا الْمجمع عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ عُلَمَائِنَا وَمَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ[২৯]

-'আমরা যে সকল আলিমকে পেয়েছি সবাই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং বিভিন্ন হাদীসে এভাবেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

আবূ উবায়দ (র) (১৫৭-২২৪ হি.) বলেন, মোটকথা যে জমি কোনোরূপ কৃত্রিম উপায় ও পন্থায় সিক্ত হয়, তাতে অর্ধ-উশর (এক-বিশমাংশ) ধার্য হবে। আর যে জমি কোনোরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছাড়াই সিক্ত হয়, তাতে উশর (এক-দশমাংশ) ধার্য হবে। হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে। কেননা স্বতন্ত্রভাবে দেয়া শ্রমের যাকাত ধার্যকরণে মোটামুটি একটা প্রভাব রয়েছে। যেমন- গবাদি পশুকে ঘাস কেটে এনে খাওয়ানো হলে তার যাকাত হয় না। তাই এক্ষেত্রে যাকাতের পরিমাণ হ্রাসকরণের সে প্রভাব অবশ্যই কার্যকর হবে। তাছাড়া যাকাত তো শুধু ক্রমবর্ধমান সম্পদে ফরয হয়ে থাকে। আর কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমানতা হ্রাসকরণে একটা বিশেষ প্রভাব রাখে। তাই ফরয পরিমাণে এই ক্রিয়াটা অবশ্যই কার্যকর হবে।[৩০]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হাদীসের আলোকে উশর আদায়ের পরিমাণ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. যে সমস্ত উৎপাদনশীল জমি সেচকার্যের প্রয়োজন ব্যতিত কেবল বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়ে ফসল উৎপন্ন করে, সেগুলোতে উশর (এক-দশমাংশ) আবশ্যক।

খ. আর যে সমস্ত জমি সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে পানি দ্বারা সিক্ত করতে হয়, পানি সেচ না দিলে জমিতে ফসল হয় না যেমন- আমন, ইরি ও বোরো ধান; এগুলোতে নিসফুল উশর (এক-বিশমাংশ) আবশ্যক। তবে এসকল জমি যদি কখনো সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন ব্যতিত শুধু আসমানের পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে ফসল উৎপন্ন করে, তখন তাতে উশর (এক-দশমাংশ) আবশ্যক হবে।

মূলত উশর ও অর্ধ-উশর নির্ধারণে পরিশ্রম ও ব্যয়ের বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে জমিতে ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও ব্যয় কম তাতে যাকাতের হার বেশি এবং যে জমিতে ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও ব্যয় বেশি তার

যাকাতের হার কম। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) (১৩১৪-১৩৯৬ হি.) বলেন, ইসলামী শরী'আতে যাকাত আইনের সর্বত্রই এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যে সকল ফসলে পরিশ্রম ও ব্যয় কম তাতে যাকাতের পরিমাণ বেশি এবং যে সকল ফসলে পরিশ্রম ও ব্যয় বেশি তাতে যাকাতের পরিমাণ কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি কোনো লুকায়িত ধন-সম্পদ লাভ করে কিংবা স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদির খনি আবিষ্কার করে, তবে তাতে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব। কেননা এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম; কিন্তু উৎপাদন বেশি। বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত ফসলে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম বিধায় এতে উশর (এক-দশমাংশ) ওয়াজিব। পক্ষান্তরে, সেচের মাধ্যমে পানি সিক্ত করা জমির ফসল উৎপাদনে খরচ ও পরিশ্রম বেশি বিধায় এতে নিসফুল-উশর (এক-বিশমাংশ) ওয়াজিব। আর সাধারণ স্বর্ণ-রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রী অর্জনে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যন্ত বেশি বিধায় এগুলোর যাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ এসকল দ্রব্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব।[৩১]

কিন্তু যে সকল জমির ফসল উৎপাদনে বছরের একাংশে সেচের মাধ্যমে পানি সিঞ্চন করতে হয় এবং অবশিষ্ট সময় করতে হয় না, সে সম্পর্কে ফকীহগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

ক. ইমাম মালিক (র) (৯৩-১৭৯ হি.), ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.) ও তাঁদের অনুসারীগণের মতে, যে জমিতে অর্ধেক বছর কৃত্রিম সেচ করতে হয় এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বছর সেচকার্য করার প্রয়োজন হয় না, উক্ত ফসল থেকে উশরের এক-চতুর্থাংশ যাকাত দিতে হবে। ইব্‌ন কুদামাহ (র) (৫৪১-৬২০ হি.) বলেন, এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ আছে বলে আমরা জানি না। কেননা যদি জমির সম্পূর্ণ বছরের অবস্থা একই রকম হতো, তাহলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। কিন্তু যখন অর্ধ বছর এক অবস্থা থাকে এবং বাকি অর্ধ বছর অন্য অবস্থায় থাকে, তখন সেই অর্ধ বছরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[৩২] ইমাম নববী (র) (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, পানি ক্রয় করে সেচ করা হলে তাও কৃত্রিম সেচ বলে গণ্য হবে।[৩৩]

খ. আতা (র) (২৫-১১৫ হি.), ছাওরী (র) (৯৭-১৬১ হি.), ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.) ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অন্য মতে, যদি বছরের দুটি অংশের এক অংশ অন্য অংশের তুলনায় অধিক সেচ প্রদান করা হয়, তাহলে এই অধিক সেচের অংশের ব্যবস্থাই গণ্য করা হবে এবং অপর অংশের অবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।[৩৪]

গ. ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.)-এর মতে, পরিমাণ জানা না গেলে উশর ধার্যকরণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা উশর ফরয করাটা মৌলিক ব্যাপার। কেবল কষ্ট থাকলেই তা প্রত্যাহার করা যেতে পারে। তাই যেখানে প্রত্যাহারকারী কিছু নেই, সেখানে মূল বিধান কার্যকর হবে। যেহেতু জমি চাষে প্রায়শই কষ্ট না থাকার কথা– সেটাই প্রকৃত অবস্থা। কেবল সন্দেহের কারণে তার অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা যাবে।[৩৫]

ঘ. বুরহান উদ্দীন আলী আল-মারগীনানী (র) (৫৩০-৫৯৩ হি.) বলেন, কোনো জমিতে যদি খাল ও চর্কি উভয় পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়, তাহলে বছরের অধিকাংশ সময় বিবেচনা করা হবে। যেমন- সাইমাহ (سَائِمَةُ)[৩৬] পশুর ক্ষেত্রে যাকাত নির্ধারণ করা হয়।[৩৭]

ঙ. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে সকল জমিতে চরকা বা সেচযন্ত্র দিয়ে পানি সেচ দেয়া হয়, তাতে নিসফুল-উশর (এক-বিশমাংশ) আবশ্যক। আর যে জমিতে কখনো নদীর পানি দিয়ে আবার কখনো বালতি দিয়ে সেচ দেওয়া হয়, সে জমির ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়ের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। কিন্তু যদি উভয় প্রক্রিয়া সমান হয়, তখন তাতে নিসফুল-উশর (এক-বিশমাংশ) আবশ্যক হবে।[৩৮]

চ. আলাউদ্দীন আল-কাসানী (র) (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন, বছরের কিছু সময় যদি কোনো জমি বৃষ্টির পানি অথবা নদীর পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং কিছু সময় যন্ত্র দ্বারা সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয়, তবে তাতে বেশির ভাগ সময় হিসাবে ধরতে হবে।[৩৯]

ছ. আশরাফ আলী থানূভী (র) (১২৮০-১৩৬২ হি.) বলেন, যদি বৃষ্টি ও সেচের পানি উভয়ই সমান হয় তাহলে উৎপাদিত মোট ফসলের অর্ধেকের ওপর উশর (এক-দশমাংশ) এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের ওপর নিসফুল-উশর (এক-বিশমাংশ) যাকাত আবশ্যক।[৪০]

মোটকথা, যে সকল জমিতে কখনো নদীর পানি দিয়ে আবার কখনো বালতি দিয়ে সেচ দেওয়া হয়, সে সকল জমির ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে উশর আদায় করতে হবে। কিন্তু উভয় প্রক্রিয়া যদি সমান হয়, তাহলে

উৎপাদিত মোট ফসলের অর্ধেকের জন্য এক-দশমাংশ এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের জন্য এক-বিশমাংশ হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

মূল্য দ্বারা উশর আদায়ের বিধান

উশর আদায়ের ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফল-ফসলের পরিবর্তে মূল্য প্রদান করা যাবে কি না? এ ব্যাপারে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, উশর আদায়ের ক্ষেত্রে ফল-ফসলের যাকাতের মূল্য প্রদান করা জায়েয। কেননা উশর আদায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী শ্রেণিকে সাহায্য করা। আর অনেক সময় অর্থ তাদের জন্য অধিক উপকারী হয়।[৪১]

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে, উৎপন্ন ফল-ফসলের অংশ দ্বারাই উশর আদায় করতে হবে, এর পরিবর্তে মূল্য প্রদান করা যাবে না। কেননা আল-কুরআন ও আল-হাদীসে উশরের ক্ষেত্রে সর্বদা উৎপন্ন ফল-ফসল প্রদানের কথাই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক শব্দের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, উশর আদায়ের জন্য মূল্য প্রদান না করে সরাসরি উৎপন্ন ফল-ফসল প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪২]

উপর্যুক্ত দুটি মতের মধ্যে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা মূল্য প্রদানের মাধ্যমে উশর আদায় করা হলে তা দরিদ্রদের জন্য অধিক উপকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার যেকোনো প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়।

উৎপাদন ব্যয় বনাম উশর

উশর প্রদানের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয়ের বিষয়টি কৃষকের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সার, কীটনাশক প্রভৃতির ব্যয় ছাড়াও শ্রমিক, মজুরী ইত্যাদির জন্য কৃষককে প্রচুর খরচ করতে হয়। স্বভাবতই মানবীয় দুর্বলতার কারণে এত কষ্ট ও ব্যয় দ্বারা উৎপন্ন ফসলের ১০% বা ৫% যাকাত প্রদান করা কিছুটা কষ্টের বিষয়। এজন্য অনেকের মনেই প্রশ্ন উদয় হয় যে, বর্তমান যুগের ন্যায় প্রাচীন যুগে কৃষি জমির উৎপাদন ব্যয় এত বেশি ছিল না বিধায় প্রাচীন যুগে উশর প্রদান করা সহজ ছিল। কিন্তু পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপাদন ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই উশর প্রদানের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় ধর্তব্য হবে কি না? এ ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত ফকীহগণের অভিমত উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অধিকাংশ ফকীহর মতে, ফল-ফসলের যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে ফসলের বীজ, চাষাবাদ, উৎপাদন ব্যয়, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিকের মজুরী ইত্যাদি বাদ দিয়ে উশরের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে না; বরং খরচ পৃথক না করেই মোট উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ বা এক-বিশমাংশ যাকাত আদায় করতে হবে।[৪৩] অধিকাংশ আধুনিক ইসলামী গবেষকগণও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৪৪] এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো:

এক. জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি,

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ[৪৫]

-'যে ভূমি নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে উশর (এক-দশমাংশ) ওয়াজিব। আর যে ভূমি সেচের পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়, তাতে নিসফুল-উশর (এক-বিশমাংশ) ওয়াজিব।'

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, উৎপাদন ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) উশরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তিনি সেচ ব্যবস্থাকে উৎপাদনের প্রধান খরচ হিসেবে গণ্য করেই উশরের হার নির্ধারণ করেছেন। কাজেই পুনরায় উৎপাদন ব্যয় বাদ দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়।[৪৬]

দুই. যাকাত একটি ফরয ইবাদত বিধায় এখানে অন্য কোনো খরচ হিসাব করে যাকাতের মধ্যে কম-বেশি করা যাবে না। কেননা সেচের কারণে মূলত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। বরং সেচের পানি বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক পানির অভাব পূরণ করে। এজন্য সেচের খরচের কারণে যাকাতের হারে কম-বেশি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য ব্যয়ের কারণে যাকাতের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। কৃষক যা ব্যয় করেন তার বিনিময়ে অতিরিক্ত উৎপাদন লাভ করেন। কাজেই এসকল ব্যয় বাদ দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়।[৪৭]

তিন. আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে যেমন সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়, তেমনি অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করাও সম্ভব হয়। অন্যদিকে এ ধরনের সেচের জন্য ইসলাম অর্ধ-উশর বা এক-বিশমাংশ যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। আর এটাই ন্যায়সঙ্গত বিচার।[৪৮]

চার. ইব্ন কুদামাহ (র) বলেন, পানি প্রবাহের জন্য খাল খননে যে কষ্ট বা অর্থ ব্যয় হয়, তা যাকাতের হার হ্রাসকরণে কোনো প্রভাব রাখবে না। কেননা জমিতে ফসল উৎপাদনের কাজের সাথে এ কাজগুলো জড়িত এবং তা প্রতি বছর বারবার করার প্রয়োজন হয় না।[৪৯] রাফি'ঈ (র)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন, খাল-ড্রেন খনন বা গর্ত খোদাই করার কষ্টটা জমি আবাদকরণ পর্যায়ে অবশ্যই বহন করতে হবে। আর যখন তা হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পানি পৌঁছতে থাকবে তখন তাতে উশর আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে, বলদ দ্বারা চাকা ঘুরিয়ে পানি তোলার ব্যবস্থা করা হলে ভিন্ন হুকুম প্রযোজ্য হবে।[৫০]

খ. পূর্ববর্তী কিছুসংখ্যক ফকীহর মতে, বীজ, শ্রমিক ও উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে যাকাতের হিসাব করতে হবে এবং অবশিষ্ট ফসলের যাকাত প্রদান করতে হবে। আধুনিক যুগের কিছু গবেষকও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন খরচ বাবদ রেখে অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের যাকাত প্রদান করতে হবে।[৫১] অর্থাৎ ১০০ মণ ফসল উৎপন্ন হলে উৎপাদন ব্যয় বাবদ ৩৩ মণ বাদ দিয়ে বাকি ৬৭ মণ ফসলের জন্য ১০% হিসাবে ৬.৭ মণ বা ৫% হিসাবে ৩.৩৫ মণ ফসল যাকাত প্রদান করতে হবে। এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো:

এক. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[৫২]

-'(বৃক্ষ) যখন ফলন্ত হয় তখন এগুলোর ফল খাও এবং কর্তনের সময় হক দান করো।'

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কর্তনের দিনে যা কর্তিত হবে তারই যাকাত দিতে হবে, এর পূর্বে যা কিছু খাওয়া বা খাওয়ানো হবে তার যাকাত দিতে হবে না। আর কৃষকের নিজের পরিশ্রম ছাড়া উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয় মূলত কর্তনের দিনের পূর্বে ভক্ষণ করা ফল-ফসলের অন্তর্ভুক্ত।

দুই. ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন,

يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ[৫৩]

-'জমির ওপর যা ব্যয় করা হয়েছে, প্রথমে তা আদায় করা হবে। অতঃপর অবশিষ্টাংশের যাকাত আদায় করতে হবে।'

তিন. জাবির ইব্ন যায়দ (র) বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا يُزَكِّيهَا وَقَالَ الْآخَرُ: يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ[৫৪]

-'যে ব্যক্তি তার ফল-ফসলের জন্য ব্যয় করেছে, তার বিষয়ে ইব্ন উমার ও ইব্ন আব্বাস (রা) দ্বিমত পোষণ করেছেন। একজন বলেন, সে ব্যক্তি উৎপাদিত সকল ফল-ফসলের যাকাত প্রদান করবে। আর অন্যজন বলেন, উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফল-ফসলের যাকাত প্রদান করবে।'

চার. আতা (র) বলেন,

ارْفَعْ الْبَذْرَ، وَالنَّفَقَةَ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ[৫৫]

-'তুমি বীজ ও চাষের খরচ তুলে নেবে এবং এরপর অবশিষ্ট ফল-ফসলের যাকাত প্রদান করবে।

পাঁচ. সায়রাফী (র) বলেন,

يَظْهَرُ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ جُزْءًا مِنْ الطَّعَامِ أَنْ تُجْعَلَ كَالْهَالِكِ وَيَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُضْطَرٌّ إِلَى إِخْرَاجِهِ[৫৬]

-'বাহ্যত বুঝা যায় যে, যদি চাষের খরচ উৎপন্ন ফল-ফসল থেকে দেয়া হয় তবে তা যাকাত প্রদানের পূর্বে নষ্ট হয়ে যাওয়া বা খেয়ে ফেলা ফল-ফসলের অনুরূপ বলে গণ্য হবে, যা উশরের হিসাব থেকে বাদ যাবে এবং অবশিষ্ট উৎপাদনের যাকাত দিতে হবে। কারণ কৃষক নিজে এসকল দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। এজন্য

তিনি শ্রমিক বা অন্যদের মাধ্যমে উক্ত কর্মসমূহ সম্পাদন করে তাদেরকে উৎপন্ন ফসল থেকে পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য হন।'

ছয়. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে খেজুর ও আঙ্গুরের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, গাছের খেজুর ও আঙ্গুর মোটামুটি পরিপক্ক হলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাকাত সংগ্রহকারীগণ গাছে থাকাবস্থায় এসকল ফলের পরিমাণ অনুমান করতেন। তাঁদের অনুমানের ভিত্তিতেই যাকাত নির্ধারণ করা হতো। আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা) বলেন,

كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ

-'নবী করীম (সা) লোকদের আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের পরিমাণ অনুমান করে নির্ধারণের জন্য লোক পাঠাতেন।'[৫৭] পরবর্তীতে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ফসল ঘরে তোলার সময় খেজুরের পরিমাণ কীরূপ ছিল তা জিজ্ঞাসা করা হতো না; বরং পূর্বের অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত যাকাত গ্রহণ করা হতো। এক্ষেত্রে অনুমানকারীর অনুমানে কিছু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমানের সময় এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফলের উশর নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিতেন। সাহল ইব্ন আবী হাছমাতা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ[৫৮]

-'তোমরা যখন অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করবে তখন গ্রহণ করবে এবং এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে। আর যদি এক-তৃতীয়াংশ বাদ না দাও তাহলে অন্তত এক-চতুর্থাংশ বাদ দিবে।'

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِيَةَ وَالأَكَلَةَ وَالْوَصِيَّةَ وَالْعَامِلَ وَالنَّوَائِبَ[৫৯]

-'তোমরা অনুমান করার সময় সহজ এবং হালকাভাবে (কিছু বাদ দিয়ে) অনুমান করবে। কেননা সম্পদের মধ্যে ঋণ, ভিখারী, খাদ্যদ্রব্য, ওয়াসিয়্যাত, শ্রমিক, বিপদাপদ (ইত্যাদির অংশ রয়েছে)।'

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে নফল দান, ভক্ষণ ইত্যাদির জন্য এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে ঔষধ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি আধুনিক অত্যাবশ্যকীয় খরচাদির জন্য অনুরূপ পরিমাণ ফল-ফসল বাদ দেয়া বৈধ হওয়া স্বাভাবিক।[৬০]

সাত. বিষয়টি একটি ইজতিহাদী বা গবেষণার বিষয়। কেননা এ সম্পর্কে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। তাই পূর্ববর্তী ফকীহগণের বক্তব্যকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা আবশ্যক নয়; বরং যুগ ও পরিবেশের কারণে এ বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। সুতরাং সেচের ভিত্তিতে যদি উশর বা অর্ধ-উশর যাকাত নির্ধারণ করা হয় এবং যাকাত প্রদানের পূর্বে উৎপাদিত ফল বা ফসল থেকে চাষাবাদের ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফল-ফসলের ওপর যাকাত ধার্য করা হয়, তাহলে তাতে ইসলামের কোনো মূলনীতি লঙ্ঘিত হয় না। এছাড়া এক্ষেত্রে কৃষকের জন্য উশর আদায় করা সহজসাধ্য হয়ে উঠে।[৬১]

ড. খোন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র) (১৯৬১-২০১৬ খ্রি.) বলেন, প্রথম মতটিই অধিক সতর্কতামূলক। কেননা যাকাত একটি ফরয ইবাদত। আর কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতিরেকে যাকাতের পরিমাণ হ্রাস করা যায় না। এছাড়া বর্তমান যুগে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে কিংবা তার চেয়েও বেশি ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে এবং উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে মূলত অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই উশর প্রদানের ক্ষেত্রে যারা উশরের নিসাব থেকে উৎপাদন খরচ বাদ দেওয়ার চিন্তা করেন, এটা নিছক তাদের মনের কৃপণতা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা চাষাবাদের খরচ ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের মধ্যে তুলনা করলে বুঝা যায় যে, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। এছাড়া উৎপাদন ব্যয় বাদ না দিলে সমাজের দরিদ্র শ্রেণি যাকাতের বেশি অর্থ লাভ করে থাকে। সুতরাং কোনোরূপ অজুহাত দেখিয়ে ১০% বা ৫% এর কম উশর প্রদানের কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।[৬২]

ঋণ বনাম উশর

উশর আদায়ের ক্ষেত্রে ঋণের ভূমিকা নিয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ উশরের নিসাব পূর্ণ করতে ঋণ পরিমাণ সম্পদ বাদ দিতে হবে কি না তা নিয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। যেমন-

ক. উমার (রা) (৪০ হি.পূ.-২৩ হি.) এক ব্যক্তিকে বলেন,

إِذَا حَلَبَ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ، وَمَا عِنْدَكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا، ثُمَّ زَكِّهِ[৬৩]

-'যদি তোমার ঋণ থাকে, তাহলে ঋণের খরচ বাদ দিয়ে যাকাতের হিসাব করতে হবে। অতঃপর যাকাত প্রদান করতে হবে।'

খ. ইব্ন উমার (র) (১০ হি.পূ.-৭৩ হি.) ও ইব্ন আব্বাস (রা) (৩ হি.পূ.-৬৮ হি.)-এর মতে, যাকাতের ক্ষেত্রে ঋণ প্রতিবন্ধক। তবে তাঁরা ব্যক্তির নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে ঋণ ও চাষাবাদের ব্যয়ভার বহনে ঋণ নিয়ে মতভেদ করেছেন। জাবির ইব্ন যায়দ (র) বলেন,

فِي الرَّجُلِ يَسْتَدِينُ، فَيُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ وَأَرْضِهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى أَرْضِهِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى أَرْضِهِ وَأَهْلِهِ[৬৪]

-'যে ব্যক্তি ঋণ করে নিজের পরিবারবর্গ ও চাষের জমির ওপর ব্যয় করে, তার সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যা জমির ওপর ব্যয় করা হয়েছে তাই আদায় করা হবে। আর ইব্ন উমার (রা) বলেন, তার পরিবার ও জমি উভয়ের ওপর ব্যয়িত অর্থই যাকাত দেয়ার সম্পদ থেকে বাদ দেয়া হবে। তারপর অবশিষ্টের যাকাত দিতে হবে।'

ইব্ন উমার (রা) অন্যত্র বলেন,

يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ[৬৫]

-'জমির জন্য যা ঋণ করা হয়েছে, প্রথমে তা আদায় করা হবে। অতঃপর অবশিষ্টাংশের যাকাত আদায় করতে হবে।'

গ. মায়মূন (র) বলেন,

مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا تَرْجُوهُ فَاحْسِبْهُ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ[৬৬]

-'যে সকল ঋণ পাওয়ার আশা আছে সেগুলো গণনা করো। অতঃপর ঋণ বাদ দিয়ে যাকাতের হিসাব করো এবং অবশিষ্টের যাকাত আদায় করো।'

ঘ. মাকহূল (র) (মৃ. ১১২ হি.)-এর মতে, কৃষি মালিক ঋণগ্রস্ত হলে সে ঋণ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করা যাবে না। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলেই কেবল যাকাত দিতে হবে। আতা (র), তাউস (র), সুফিয়ান ছাওরী (র) ও কতিপয় ইরাকী ফকীহও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[৬৭]

ঙ. ইমাম আহমাদ (র) থেকে দুটি মত বর্ণিত আছে। এক মতে, যে ব্যক্তি পরিবার ও কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের জন্য ঋণ করবে, তার প্রথমটির হিসাব গণ্য করা হবে না; বরং দ্বিতীয়টির হিসাব গণ্য করা হবে। কেননা তা কৃষি সংক্রান্ত ব্যয়। আর দ্বিতীয় মতে, সকল প্রকার সম্পদের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঋণ বাদ দেয়ার পরে যদি নিসাব পূর্ণ হয়, তাহলে যাকাত দিতে হবে। তাঁর মতে, উৎপাদন বিষয়ক ঋণ ছাড়া অন্য কোনো ঋণ এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।[৬৮] ইমাম আহমাদ (র) বলেন,

قَدْ اخْتَلَفَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُخْرِجُ مَا اسْتَدَانَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَأَهْلِهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ. وَقَالَ الْآخَرُ: يُخْرِجُ مَا اسْتَدَانَ عَلَى ثَمَرَتِهِ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ. وَإِلَيْهِ أَذْهَبُ أَنْ لَا يُزَكِّيَ مَا أَنْفَقَ عَلَى ثَمَرَتِهِ خَاصَّةً[৬৯]

-'ইব্ন উমার (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) মতভেদ করেছেন। ইব্ন উমার (রা) বলেন, কৃষক তার ফসলের জন্য যা ঋণ করেছে এবং নিজের পরিবারের জন্য যা ব্যয় করেছে তা প্রথমে পরিশোধ করবে। এরপর অবশিষ্ট উৎপাদনের যাকাত প্রদান করবে। আর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কৃষক তার ফসলের জন্য যা ঋণ করেছে তা পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ফসলের যাকাত প্রদান করবে। আমি এ দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণ করছি, তা হলো কৃষক তার ফসলের জন্য যা ঋণ করেছে শুধু সে ঋণ পরিমাণ ফসলের যাকাত দিতে হবে না।'

চ. ইব্ন কুদামাহ (র) বলেন, এ বর্ণনানুযায়ী সর্বপ্রকার ঋণই গণ্য ও হিসাব করা হবে। অতঃপর অবশিষ্ট কৃষি ফসল যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাতে উশর ধার্য হবে, অন্যথায় নয়। কেননা ঋণ তো যাকাত ধার্য হওয়ার পথে বড় বাধা। যেমন- গোপন মালের যাকাতের ক্ষেত্রে। আর খারাজ ও তার কৃষি কাজের ন্যায় এই ঋণও উশর ফরয হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। প্রথম বর্ণনানুযায়ী দুটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, যা কৃষি সংক্রান্ত ব্যয় হবে তার মোকাবিলায় অর্জিত ফসল ভিন্ন কাজে ব্যয় করা হবে, যেন তা অর্জিতই হয়নি।[৭০]

ছ. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা ও ব্যবসায়ের পণ্যের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়ে যাকাতের নিসাব হিসাব করতে হবে এবং অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে। কিন্তু পালিত পশু ও ফসলের যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঋণের কোনো ভূমিকা নেই। অর্থাৎ ঋণ থাকা সত্ত্বেও তাকে সম্পূর্ণ সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে।[৭১] ইমাম মালিক (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[৭২]

জ. ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আওযা'ঈ (র)-এর মতে, যাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঋণের কোনো ভূমিকা নেই। অর্থাৎ কারো নিকট যদি নিসাব পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি সম্পদ থাকে এবং ঠিক সে পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি যদি ঋণ থাকে তাহলেও তাকে যাকাত প্রদান করতে হবে। কেননা ঋণ কখনো যাকাত ফরয হওয়া রহিত করে না। তাই ঋণের দিকে কোনোরূপ দৃষ্টিপাত ছাড়াই যাকাত প্রদান করতে হবে।[৭৩]

ঝ. ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, ভূমিতে উৎপাদিত যে সকল ফসলে উশর ওয়াজিব হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে শ্রমিকের পারিশ্রমিক এবং চাষাবাদের খরচ হিসাব করা হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যয়ভারের তারতম্যের কারণে ওয়াজিব পরিমাণে তারতম্যের হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং ব্যয়ভার বাদ দেয়ার কোনো যুক্তি নেই।[৭৪]

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ফল-ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে ঋণের কোনো ভূমিকা নেই। অর্থাৎ যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বাদ দেয়া যাবে না; বরং উৎপাদিত সকল ফসলের যাকাত আদায় করতে হবে।

ভূমির শ্রেণিভেদে উশর আদায়ের বিধান

ইসলামী শরী'আতের বিধানানুযায়ী উশর আদায় করা ফরয। কিন্তু উশর তথা ভূমির যাকাত আদায়ের নিয়মাবলী যাকাতের বিধানের অনুরূপ নয়। কেননা যাকাত আদায় করা হয় সম্পদ থেকে আর উশর আদায় করা হয় ভূমি থেকে। আর ফকীহগণ উশর আদায়যোগ্য ভূমিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন- মালিক কর্তৃক আবাদকৃত ভূমি, বর্গা দেয়া ভূমি, ইজারা দেয়া ভূমি, যৌথ মালিকানাভুক্ত ভূমি, আরিয়াত ভূমি, ফল-ফসলসহ বিক্রিত ভূমি, ওয়াকফকৃত ভূমি, অবৈধ দখলী ভূমি ইত্যাদি। ভূমির উপর্যুক্ত পার্থক্যের ন্যায় বিভিন্ন ভূমিতে উৎপাদিত পণ্যে উশর আদায়ের নিয়মাবলীও ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ভূমি থেকে উশর আদায়ের বিধান আলোচনা করা হলো:

১. মালিক কর্তৃক আবাদকৃত ভূমি

ভূমির মালিক কর্তৃক নিজ জমি চাষ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত। তাই মালিক যদি কৃষিজীবী হয় এবং নিজ জমি নিজেই চাষাবাদ করে, তাহলে জমিতে উৎপাদিত ফসলের উশর বা অর্ধ-উশর তাকেই আদায় করতে হবে। কেননা ভূমি ও চাষাবাদ উভয়েরই মালিক সে নিজেই।[৭৫]

২. বর্গা দেয়া ভূমি

বর্গা প্রথা ভূমি ব্যবহারের একটি পুরাতন পদ্ধতি। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) এ প্রথার বিরোধিতা করেছেন। এমনকি তিনি বর্গা প্রদান ও গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[৭৬] পক্ষান্তরে অন্যান্য ফকীহ বিষয়টিকে জায়েয বলেছেন। নিম্নে বর্গা দেয়া ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত আদায়ের বিধান সম্পর্কে আলিমগণের মত উল্লেখ করা হলো:

ক. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) (১১৩-১৮২ হি.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) (১৩২-১৮৯ হি.)-এর মতে, ভূমির মালিক যদি জমি চাষাবাদ করতে অক্ষম হয় এবং অন্য কারও নিকট এ চুক্তিতে ভূমি বর্গা প্রদান করে যে, ভূমির মালিক ও চাষী উভয়ই উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ লাভ করবে। যেমন- উভয়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক লাভ করবে অথবা কেউ এক-তৃতীয়াংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করবে; এরূপ চুক্তি যদি সম্পাদিত হয়, তাহলে ভূমির মালিক ও বর্গা চাষী উভয়ের প্রাপ্ত ফসলের ওপর উশর ওয়াজিব।[৭৭] তবে শর্ত হলো, প্রাপ্ত অংশ নিসাব পরিমাণ হতে হবে। আর বর্গা চাষীর যদি নিজস্ব চাষাবাদের জমি থাকে, তাহলে তার সাথে মিলানোর পর নিসাব পরিমাণ হলে মোট প্রাপ্ত ফসল থেকে উশর আদায় করতে হবে। কিন্তু দুজনের মধ্যে একজনের অংশ যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং অন্যজনের নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে যার ফসল নিসাব পরিমাণে পৌঁছবে তাকেই তার নিজের অংশ থেকে যাকাত প্রদান করতে হবে, অপরজনকে যাকাত প্রদান করতে হবে না। কেননা সে ধনী বলে বিবেচিত নয়। আর ইসলামী শরী'আত তো কেবল ধনীদের ওপর যাকাতের বিধান আবশ্যক করেছে।[৭৮]

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র) ও ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, ভূমির মালিক ও বর্গা চাষী উভয়ের ওপর উশর ওয়াজিব। তবে ভূমির মালিক ও বর্গা চাষী উভয়ের ভাগের প্রাপ্ত ফসল যদি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে দেখতে হবে যে, উভয়ের ফসল একত্রিত করে নিসাব পরিমাণ হয় কি না? যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে

উভয়কে একজন ব্যক্তি ধরতে হবে এবং উভয়ের ফসলে উশর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ প্রত্যেককেই তাদের নিজ নিজ অংশ থেকে উশর আদায় করতে হবে।[৭৯]

গ. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, বর্গা প্রথা ইসলামী শরী'আতে বৈধ নয়। তবে যেহেতু অধিকাংশ ফকীহ তা জায়েয বলেছেন এবং সমাজে তা প্রচলিত এজন্য তিনি এ সম্পর্কিত কিছু বিধান বর্ণনা করেছেন।[৮০] তাঁর মতে, ভূমির মালিকের ওপর উশর ওয়াজিব হবে এবং বর্গাচাষীর অংশের বিষয়টি মালিকের ওপর ঋণ হিসেবে পরিগণিত হবে।[৮১]

বর্গা দেয়া ভূমির উৎপাদিত ফসল যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এর বিধান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, চাষী এবং মালিক উভয়ের ওপর থেকে উশর রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু নষ্টকারী ব্যক্তি যদি জরিমানা প্রদান করে, তাহলে ভূমির মালিক ও চাষী উভয়ের ওপর উশর ওয়াজিব হবে।

খ. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, ফসল কাটার পূর্বে নষ্ট হলে চাষী এবং মালিক উভয়ের ওপর থেকে উশর রহিত হয়ে যাবে। আর ফসল কাটা হয়ে গেলে চাষীর ওপর থেকে উশর রহিত হবে না, কিন্তু ভূমির মালিকের উশর রহিত হয়ে যাবে।[৮২]

বর্গা দেয়া ভূমির ফসল পাকার পর কাটার পূর্বে কোনো ব্যক্তি যদি তা নষ্ট করে অথবা চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলে চাষী ও মালিক কারো ওপরই উশর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু নষ্টকারী ব্যক্তি থেকে যদি জরিমানা আদায় করা হয়, তাহলে এর হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, ভূমির মালিককে উশর আদায় করতে হবে।

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, ভূমির মালিক ও চাষী উভয়কেই উশর আদায় করতে হবে।[৮৩]

৩. ইজারা দেয়া ভূমি

ভূমির মালিক যদি নগদ টাকা কিংবা কোনো বস্তুর বিনিময়ে তার জমিকে ভাড়া প্রদান করে, তাহলে উক্ত ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের যাকাত কে প্রদান করবে, অর্থাৎ ভূমির মালিক না ভাড়া গ্রহণকারী? এ ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। যেমন-

ক. জমহূর ফকীহগণের মতে, এরূপ ইজারা প্রদান করা জায়েয। এক্ষেত্রে জমি ভাড়া গ্রহণকারীকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত প্রদান করতে হবে। কেননা উশর হচ্ছে ফসলের হক, জমির হক নয়। এছাড়া জমির মালিক এখান থেকে কোনো ফল-ফসল লাভ করে না বিধায় তার ওপর উশর ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে জমি ভাড়া গ্রহণকারী ফসল লাভ করে বিধায় তার ওপর উশর ওয়াজিব।[৮৪]

খ. ইব্‌ন কুদামাহ (র)-এর মতে, উশর ফরয হয় কৃষি ফসলে। এজন্য ফসলের মালিককেই তা প্রদান করতে হবে। আর উশরকে জমির ব্যয় মনে করা ঠিক নয়। কেননা যদি তাই হতো তাহলে চাষাবাদ করা ব্যতিত তাতেই উশর ফরয হতো। যেমন ধার্যকৃত খারাজ বা কর সর্বাবস্থায় প্রদান করতে হয়।[৮৫]

গ. রাফি'ঈ (র)-এর মতে, জমি ভাড়া গ্রহণকারীকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত প্রদান করতে হবে। কেননা মালিকানাভুক্ত জমির ফসল এবং ভাড়ায় গ্রহণকারী জমির ফসলে উশর ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। এজন্য ভাড়া গ্রহণকারীর ওপর ভাড়া ও উশর উভয়ই একত্রিত হয়ে পড়ে। যেমন কেউ যদি ব্যবসায়ের জন্য কোনো দোকান ভাড়া নেয়, তাহলে তাকে ভাড়া ও ব্যবসার যাকাত উভয়ই বহন করতে হয়।[৮৬]

ঘ. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, জমির মালিককে উশর প্রদান করতে হবে।[৮৭] কেননা উশর ভূমির বর্ধনশীলতার হক এবং দেয়, কৃষিকাজের হক বা দেয় নয়। এছাড়া জমি যেমন কৃষি কাজে বর্ধনশীল হয়, তেমনি ভাড়া প্রদান করলেও বর্ধনশীল হয়। তাহলে তার ভাড়াটা ফল ও ফসলের মতই মূল লক্ষ্যবস্তু। মালিকের জন্য প্রবৃদ্ধির একটা তাৎপর্য থাকে, সেই সাথে মালিকানার নিয়ামতও সেই ভোগ করে। কাজেই উশর তার ওপরই ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৮৮] তবে উৎপাদিত ফসল যদি কাটার পূর্বে বা পরে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে উভয় অবস্থাতেই জমির মালিকের ওপর থেকে উশর রহিত হয়ে যাবে।[৮৯] ইবরাহীম আন্-নাখ'ঈ (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[৯০]

ঙ. ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, জমির ভাড়া গ্রহণকারীকে উশর প্রদান করতে হবে। আর যদি উৎপন্ন ফসল কাটার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর থেকে উশর রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কাটার পর নষ্ট হয়, তাহলে উশর রহিত হবে না।[৯১]

চ. ইব্‌ন রুশদ (র) (৫২০-৫৯৫ হি.)-এর মতে, কৃষি জমির ওপর ফরয ধার্যকরণটা কেবল জমি বা কৃষি ফসলের হক নয়; বরং উভয়েরই যৌথ হক। তাই জমির মালিক ও ভাড়া গ্রহণকারী উভয়কেই উশর প্রদান করতে হবে।[৯২]

ছ. আধুনিক কিছুসংখ্যক ফকীহর মতে, জমির মালিক ও জমির ভাড়া গ্রহণকারী উভয়ের নিকট থেকেই যাকাত গ্রহণ করতে হবে। তবে ভূমির মালিকের নিকট থেকে ভূমির কর-খাজনা ইত্যাদি খরচ বাদ দিয়ে এবং ভাড়া গ্রহণকারীর নিকট থেকে চাষাবাদের খরচ যেমন- শ্রমিক, বীজ, সার, কীটনাশক, পানি সেচ প্রভৃতি খরচ বাদ দিয়ে উশর গ্রহণ করতে হবে।[৯৩]

জ. ইউসুফ আল-কারযাভী (র) (জন্ম ১৯২৬ খ্রি.) বলেন, সুবিচারপূর্ণ নীতি হচ্ছে, জমি বাবদ দেয় যাকাতে উভয় পক্ষকে অংশীদার হতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই যা অর্জন করেছে, তা থেকে উশর আদায় করতে প্রত্যেককেই বাধ্য থাকতে হবে। আর এভাবেই ইমাম আবূ হানীফা (র) ও জমহূর ফকীহ উভয়ের মতই অনুসরণ করা হবে।[৯৪]

৪. যৌথ মালিকানাভুক্ত ভূমি

ইজমালী বা যৌথ মালিকানাভুক্ত জমিতে যদি শস্য চাষাবাদ করা হয়, তাহলে উক্ত জমিতে উৎপাদিত শস্য অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার পর প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে উশর প্রদান করতে হবে। আবার কোনো ব্যক্তির যদি ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন মাঠে জমি থাকে এবং এগুলোর সম্মিলিত উৎপাদন যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাকেও উশর প্রদান করতে হবে।[৯৫]

৫. আরিয়াত[৯৬] ভূমি

ইব্‌ন কুদামাহ (র) বলেন, জমির মালিক যদি অপর কোনো কৃষিজীবীকে তার জমি আরিয়াত তথা ধার দেয় এবং এর পরিবর্তে কোনো বিনিময় গ্রহণ না করে, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা খুবই প্রশংসনীয় কাজ। ইসলামে এরূপ কাজকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বিধান হলো, কেবল জমির চাষাবাদকারীকে যাকাত দিতে হবে। কেননা সে কোনোরূপ বিনিময় বা ভাড়া ব্যতিত জমি থেকে উপকৃত হয়েছে।[৯৭]

কোনো মুসলমানের নিকট হতে ভূমি আরিয়াত নিয়ে চাষাবাদ করলে উপর্যুক্ত বিধান কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে ভূমির মালিক যদি অমুসলিম হয়, তাহলে উক্ত আরিয়াত ভূমির উশর আদায়ের ব্যাপারে দুটি মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, আরিয়াত দাতার ওপর উশর ওয়াজিব হবে।

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, অমুসলিমের ওপর উশর ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, এক উশর ওয়াজিব হবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, দুই উশর ওয়াজিব হবে।[৯৮]

৬. ওয়াক্‌ফকৃত ভূমি

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, সকল প্রকার ওয়াক্‌ফকৃত জমির উৎপাদিত ফসলের ওপর উশর ফরয। কেননা উশর ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়; বরং উৎপাদিত ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। এছাড়া উশর ফরয হয় ফসলের ওপর, জমির ওপর নয়।[৯৯] তবে ইমাম শাফি'ঈ (র) ও অন্যান্য ফকীহ ওয়াক্‌ফকৃত জমির যাকাতের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন।[১০০]

৭. ফল-ফসলসহ বিক্রিত ভূমি

ভূমির মালিক যদি নিজ জমিতে ফসল চাষ করার পর তা বিক্রি করে দেন, তাহলে তাকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে উশর বা ফল-ফসলের যাকাত প্রদান করতে হবে:

ক. ভূমির মালিক যদি ফল-ফসল পরিপক্ক হওয়ার পরে তা বিক্রি করেন, তাহলে উশর প্রদানের দায়িত্ব বিক্রেতার। কারণ তিনি তার ওপর উশর ফরয হওয়ার পর যাকাতের পণ্য বিক্রি করেছেন। এরূপ অবস্থায় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে

বিক্রেতাকে উশরের হিসাব সামনে রেখে বিক্রি করতে হবে। সকল প্রকার ফল ও ফসলের ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য হবে।

খ. ভূমির মালিক যদি ফল-ফসল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই একেবারে কাঁচা থাকতে বিক্রি করেন এবং পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত তা জমিতে রাখার জন্য ক্রেতাকে সময় দেন, তাহলে উশর প্রদানের দায়িত্ব ক্রেতার ওপর। কারণ উশর ফরয হয় ফল-ফসল পরিপক্ক হওয়ার পর। আর এ সময় তা ছিল ক্রেতার মালিকানায়। তাই ক্রেতার কর্তব্য হলো ফল-ফসল কেটে ঘরে তুলে তার উশর আদায় করা।

গ. ভূমির মালিক যদি ফল-ফসল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই বিক্রি করেন এবং বিক্রয়ের পরে ক্রেতা তা কাঁচা অবস্থায় কেটে নেন, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতাকে উক্ত ফসলের যাকাত দিতে হবে। উক্ত অপরিপক্ক কর্তিত ফল বা ফসলেরই এক-দশমাংশ বা এক-বিশমাংশ বিক্রেতাকে উশর প্রদান করতে হবে।[১০১]

৮. অবৈধ দখলী ভূমি

কোনো ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে কোনো জমি দখল করে, সেটা হতে পারে জোর-জবরদস্তি বা এমনিতেই দখল করা, যা অবৈধ দখল বলে গণ্য; এরূপ জমিতে যদি চাষাবাদ করে ফল-ফসল উৎপন্ন করা হয়, তাহলে অবৈধ দখলকারীকে উৎপাদিত ফল-ফসলের উশর আদায় করতে হবে।[১০২]

উশর অনাদায়ের পরিণতি

উশর ইসলামী শরী‘আতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। উশর আদায়ের ব্যাপারে আল-কুরআন ও আল-হাদীসে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি উশর অনাদায়ে কঠোর শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[১০৩]

-‘আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে; বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের পরম স্বত্বাধিকারী। আর তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ জানেন।’

রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হাদীসে যাকাত অনাদায়ের কারণে দুর্ভিক্ষ দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ[১০৪]

-‘কোনো জাতি যাকাত দেয়া থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে আক্রান্ত করেন।’

যাকাত ত্যাগকারীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ[১০৫]

-‘আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতিত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। আর নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র ওপর অর্পিত।’

অন্যত্র যাকাত ত্যাগকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ[১০৬]

-‘যাকাত ত্যাগকারী কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে মূলত যাকাত অনাদায়ের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হলেও এ বিধান উশরের জন্যও প্রযোজ্য হবে। কেননা উশর প্রকারান্তরে যাকাতেরই একটি প্রকার।

উপসংহার

উশর যাকাতের অনুরূপ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান। উশরের মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থা গতিশীলতা লাভ করে বিধায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর সাথে মানবজীবনের অন্যতম একটি উপাদান তথা অর্থনীতি জড়িত। মূলত উশর একটি আর্থিক ইবাদত হলেও এর উপযোগিতা ও তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এজন্য উশরের বিধানকে ইসলামে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত হয়েছে। উশর আদায়ের জন্য উশর আদায়ের হার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। ফকীহগণ সেচ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে উশরকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। অর্থাৎ যে জমি সেচ ব্যতিত কেবল প্রবাহিত নদী-নালা বা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে ফসল উৎপন্ন করে তাতে উশর (এক-দশমাংশ) ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যে জমি কৃত্রিম সেচের পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে ফসল উৎপন্ন করে তাতে নিসফুল-উশর (এক-বিশমাংশ) ওয়াজিব। সুতরাং নিসাব পরিমাণ ফসলে অন্যান্য শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলে অবস্থাভেদে উশর বা নিসফুল-উশর আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।

তথ্যনির্দেশ

১ লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-'উলূম* (বৈরূত: আল-মাতবা'আতুল-কাছুলীকিয়্যাহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৫০৭; মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ* (করাচী: মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৭৯; Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of islam* (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 655.

২ ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল-আরব*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৫৭০; ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (মিসর: মাকতাবাতুশ্-শুরূক আদ্-দাওলিয়্যাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৬০২; ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত: দারুন্-নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩১২; ড. সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিক্হী লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান* (দিমাশক: দারুল ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৫১।

৩ সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩৬৩।

৪ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৪শ সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৬৯৫।

৫ *Dictionary of Islam*, p. 655; Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 614.

৬ Edward William Lane, *An Arabic English Lexicon,* Vol. 5 (London: 1874), p. 205.

৭ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১৫১।

৮ সালিম ইব্ন আব্দিল্লাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

-'বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতিত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের ওপর উশর (এক-দশমাংশ) ফরয। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওপর অর্ধ-উশর (এক-বিশমাংশ) ফরয।'

দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (বৈরূত: দারু ইব্ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবুল-'উশরি ফীমা ইয়ুসকা মিন মা-ইস্-সামাই ..., হাদীস নং ১৪৮৩; মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরমিযী, *সুনানুত্-তিরমিযী* (বৈরূত: দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.), আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু মা জাআ ফিস্-সাদাকাতি ফীমা ইয়ুসকা বিল-আনহারি ওয়া গায়রিহা, হাদীস নং ৬৪০।

৯ মুফতী মুহাম্মাদ শফী, *জাওয়াহিরুল-ফিক্হ*, ২য় খণ্ড (দেওবন্দ: মাকতাবাতু তাফসীরিল-কুরআন আরিফ কোম্পানী, তা.বি.), পৃ. ২৪৫-২৪৬; ড. মীর মোঃ আনোয়ার হোসেন, *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হি./২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৫০।

১০ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫১।

১১ আবুল হাসান নূরুদ্দীন মোল্লা আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১২৮০; আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ আল-মুবারকপুরী, *মির'আতুল মাফাতীহ শারহু*

মিশকাতিল মাসাবীহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বানারাস আল-হিন্দ: ইদারাতুল বুহূছিল ইলমিয়্যাহ ওয়াদ্-দা'ওয়াত ওয়াল ইফতা, আল-জামি'আতুস সালাফিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৬৮।

১২ ইব্নুল আছীর, *আন্-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছি ওয়াল আছার,* ৩য় খণ্ড (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ২৩৯।

১৩ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত,* পৃ. ৪৭৯; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা,* পৃ. ৬০২।

১৪ *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ,* পৃ. ৩৭৯।

১৫ *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা,* পৃ. ৩১২।

১৬ *Dictionary of Islam,* p. 655.

১৭ বুরহান উদ্দীন আলী আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী,* ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১০৮।

১৮ ইব্ন আবিদীন আদ্-দিমাশকী, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার,* ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩২৫।

১৯ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আন'আম, ৬ : ১৪১।

২০ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৬৭।

২১ ড. ওয়াহবাহ আয্-যুহায়লী, *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* ৩য় খণ্ড (দিমাশক: দারুল-ফিক্র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৪৭; আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই',* ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৬২; ইব্ন নুজায়ম আল-মিসরী, *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক,* ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল কিতাবিল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৫৬; নিযামুদ্দীন আল-বালখী, *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ,* ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৩১০ হি.), পৃ. ১৮৬; ইব্ন কুদামাহ আল-মুকাদ্দিসী, *আল-মুগনী,* ৩য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরাহ, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৩।

২২ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭-১০৮।

২৩ *সহীহুল-বুখারী,* কিতাবুয্-যাকাত, বাবুল-'উশরি ফীমা ইয়ুসকা মিন মা-ইস্-সামাই ..., হাদীস নং ১৪৮৩; *সুনানুত্-তিরমিযী,* আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু মা জাআ ফিস্-সাদাকাতি ফীমা ইয়ুসকা বিল-আনহারি ওয়া গায়রিহা, হাদীস নং ৬৪০।

২৪ মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-কুরায়শী আন্-নায়সাপুরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল-আরাবী, তা.বি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মা ফীহিল 'উশরু আও নিসফুল 'উশরি, হাদীস নং ৭ (৯৮১)।

২৫ *সুনানুত্-তিরমিযী,* আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু মা জাআ ফিস্-সাদাকাতি ফীমা ইয়ুসকা বিল-আনহারি ওয়া গায়রিহা, হাদীস নং ৬৩৯; মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইব্ন মাজাহ* (মিসর: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা.বি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু সাদাকাতিয-যুরূ'ই ওয়াছ্-ছিমারি, হাদীস নং ১৮১৬।

২৬ *সুনানু আবী দাঊদ,* কিতাবুয্-যাকাত, বাবু সাদাকাতিয্-যার'ই, হাদীস নং ১৫৯৬; আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ, *সুনানুন্-নাসাঈ* (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫-১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মা ইয়ূজিবুল-'উশরা ওয়ামা ইয়ূজিবু নিসফাল 'উশরি, হাদীস নং ২৪৮৮; *সুনানু ইব্ন মাজাহ,* কিতাবুয্-যাকাত, বাবু সাদাকাতিয্-যুরূ'ই ওয়াছ্-ছিমারি, হাদীস নং ১৮১৭।

২৭ *সুনানু ইব্ন মাজাহ,* কিতাবুয্-যাকাত, বাবু সাদাকাতিয্-যুরূ'ই ওয়াছ্-ছিমারি, হাদীস নং ১৮১৮।

২৮ আবূ বকর আল-বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কুবরা* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবু কাদরিস্-সাদাকাতি ফীমা আখরাজাতিল আরদি, হাদীস নং ৭৪৯৪; ইব্ন যানজুইয়াহ, *আল-আমওয়াল* (সৌদি আরব: মারকাযুল মুলক ফায়সাল লিল-বুহূছি ওয়াদ্-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), কিতাবুস্-সাদাকাতি ওয়া আহকামিহা ওয়া সুনানিহা, তাফসীরু মা ইয়াকূনু ফীহিল 'উশরু মিনাছ্-ছিমারি ওয়ায্-যার'ই ওয়ামা ইয়াকূনু ফীহি নিসফুল 'উশরি, হাদীস নং ১৯৬২।

২৯ আবূ ইউসুফ ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম আল-আনসারী, *আল-খারাজ* (মিসর: আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত্-তুরাছ, পরিমার্জিত সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৬২।

৩০ *আল-মুগনী,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯; ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিক্হুয্-যাকাত,* ১ম খণ্ড (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৩৭৮।

৩১ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন,* অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪৪৫।

৩২ *আল-মুগনী,* ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০।

৩৩ *ফিক্হুয্-যাকাত,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

৩৪ *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০।
৩৫ পূর্বোক্ত।
৩৬ **সাইমাহ:** সাইমাহ (سَائِمَةٌ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে سَوَائِمُ। সাইমাহ শব্দের অর্থ বিচরণশীল, মুক্তভাবে বিচরণকারী পশু ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায়, যে সকল পশু বছরের অধিকাংশ সময় বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চারণভূমিতে প্রতিপালিত হয়, তাদেরকে সাইমাহ (سَائِمَةٌ) বলা হয়। দ্র. *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭; *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫; সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।
৩৭ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২।
৩৮ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।
৩৯ *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২।
৪০ আশরাফ আলী থানূভী, *ইমদাদুল-ফাতাওয়া*, ২য় খণ্ড (দেওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ৬০।
৪১ *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩।
৪২ পূর্বোক্ত।
৪৩ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭; *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২।
৪৪ ড. খোন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২০০।
৪৫ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু মা ফীহিল 'উশরু আও নিসফুল 'উশরি, হাদীস নং ৭ (৯৮১)।
৪৬ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।
৪৭ *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, পৃ. ২০০।
৪৮ অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩০; *দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১৭৬।
৪৯ *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০।
৫০ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।
৫১ *আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬১।
৫২ সূরা আল-আন'আম, ৬ : ১৪১।
৫৩ *আস্-সুনানুল কুবরা*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুদ্-দায়নি মা'আস্-সাদাকাতি, হাদীস নং ৭৬০৮; *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।
৫৪ ইবন আবী শায়বা, *আল-কিতাবুল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীছ ওয়াল আছার* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), কিতাবুয্-যাকাত, মা কালূ ফির্-রাজুলি ইয়ুখরিজু যাকাতা আরদিহী ওয়া কাদ আনফাকা ফিল-বুযূরি ওয়াল-বাকারি, হাদীস নং ১০০৯৬।
৫৫ *আল-কিতাবুল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীছ ওয়াল আছার*, কিতাবুয্-যাকাত, মা কালূ ফির্-রাজুলি ইয়ুখরিজু যাকাতা আরদিহী ওয়া কাদ আনফাকা ফিল-বুযূরি ওয়াল-বাকারি, হাদীস নং ১০০৯৭।
৫৬ *রাদ্দুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯।
৫৭ *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু খারসিন নাখলি ওয়ান-'ইনাবি, হাদীস নং ১৮১৯।
৫৮ *সুনানুত্-তিরমিযী*, আবওয়াবুয্-যাকাত, বাবু মা জাআ ফিল খারসি, হাদীস নং ৬৪৩; *সুনানুন্-নাসাঈ*, কিতাবুয্-যাকাত, কাম ইয়াতরুকুল খারিস, হাদীস নং ২৪৯১।
৫৯ ইবন আব্দিল বার, *আত্-তামহীদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (আল-মাগরিব: ওয়াযারাতু উমূমিল আওকাফি ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৮৭ হি.), পৃ. ৪৭২; *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪।
৬০ *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, পৃ. ২০২-২০৩।
৬১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১।
৬২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৫।
৬৩ *আল-কিতাবুল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীছ ওয়াল আছার*, কিতাবুয্-যাকাত, ওয়ামা কানা লা ইয়াসতাকিররু ইয়ু'তীহিল ইয়াওমা ওয়া ইয়া'খুযু ইলা ইয়াওমায়নি ফালইয়ুযাক্কিহি, হাদীস নং ১০২৫৩।
৬৪ আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম, *আল-আমওয়াল* (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা.বি.), কিতাবুস্-সাদাকাতি ওয়া আহকামিহা ওয়া সুনানিহা, ওয়া আম্মাল-খাদিরু, হাদীস নং ১৫৪৫; *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১।
৬৫ *আস্-সুনানুল কুবরা*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুদ্-দায়নি মা'আস্-সাদাকাতি, হাদীস নং ৭৬০৮; *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।

৬৬ *আল-কিতাবুল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীছ ওয়াল আছার*, কিতাবুয্-যাকাত, ওয়ামা কানা লা ইয়াসতাকিররু ইয়ু'তীহিল ইয়াওমা ওয়া ইয়া'খুযু ইলা ইয়াওমায়নি ফালইয়ুযাক্কিহি, হাদীস নং ১০২৫৪।
৬৭ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১-৩৯২।
৬৮ *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৭-৬৮।
৬৯ পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৮।
৭০ *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০; *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯২।
৭১ পূর্বোক্ত; *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
৭২ *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, পৃ. ২০৭।
৭৩ *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৮; *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, পৃ. ২০৬।
৭৪ *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।
৭৫ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮।
৭৬ *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, পৃ. ২১২।
৭৭ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭; *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ্-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬; *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫।
৭৮ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮; *দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা*, পৃ. ১৭৮।
৭৯ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৬-৪২৭।
৮০ *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, পৃ. ২১২।
৮১ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭; *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫।
৮২ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।
৮৩ পূর্বোক্ত।
৮৪ *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮; *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০।
৮৫ *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০; *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০।
৮৬ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০১।
৮৭ *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮।
৮৮ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৯।
৮৯ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।
৯০ *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, পৃ. ২০৯।
৯১ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।
৯২ *ফিক্হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮; *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১।
৯৩ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪।
৯৪ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১।
৯৫ জাবেদ মুহাম্মাদ, *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৫ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১০০।
৯৬ **আরিয়াত:** আরিয়াত (عارية) শব্দটি একবচন, বহুবচনে 'আওয়ারী (عواري)। পরিভাষায়, বিনিময় ব্যতিত কোনো বস্তুর মালিকানা লাভের মাধ্যমে উপকৃত হওয়াকে আরিয়াত বলে। আর আরিয়াত ভূমি হলো, বিনিময় ছাড়া চাষাবাদের জন্য যে ভূমি চেয়ে নেওয়া বা ধার নেওয়া হয়। দ্র. *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৩০০।
৯৭ *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯; *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮।
৯৮ *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।
৯৯ *বাদাই'উস্-সানাই' ফী তারতীবিশ-শারাই'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬; *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ৯৯; সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১১০।
১০০ *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, পৃ. ২১৪।
১০১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১-২১২।
১০২ *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ১০০।
১০৩ সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮০।
১০৪ সুলায়মান ইবন আহমাদ আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত* (কায়রো: দারুল হারামায়ন, তা.বি.), বাবুল-'আয়ন, মান ইসমুহূ 'আবদান, হাদীস নং ৪৫৭৭।

---

১০৫ *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুল-ঈমান, বাবুন ফাইন তাবূ ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আতাউয যাকাতা ফাখাল্লূ সাবীলাহুম, হাদীস নং ২৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল-ঈমান, বাবুল আমরি বি-কিতালিন্-নাসি হাত্তা ইয়াকূলূঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, হাদীস নং ৩৬ (২২); *সুনানুন্-নাসাঈ*, কিতাবুল-জিহাদ, বাবু ওজূবিল জিহাদ, হাদীস নং ৩০৯৪; *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, ইফতিতাহিল কিতাবি ফিল-ঈমানি ওয়া ফাদাইলিস্-সাহাবাতি ওয়াল-'ইলম, বাবুন ফিল ঈমান, হাদীস নং ৭১।

১০৬ সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুস সগীর* (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), বাবুল-মীম, মান ইসমুহূ মুহাম্মাদ, হাদীস নং ৯৩৫।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জীবিকা উপার্জন

জয়নুল আবেদীন*

Abstract: The searching for and earning of proper livelihood is essential to every human being. It is compulsory for every person to strive for living based on individual merit. The world is the place or sphere of activities. Infirmity or indisposition is a form of death or suicide. Ar Razzak (Allah swt) has spread out ample livelihood in the world for all His creations. But to achieve those one has to explore and strive. In this regard a great emphasis is given and instructions are laid out in the Holy Quran and Sunnah. In the Quran Allah (swt) has instructed human beings to adhere to the principals and upright ways of livelihood; at the same time all relevant guidelines have been laid out in details by Prophet Muhammad (saw). Allah (swt) said, "After finishing salah, spread out in the land and search for your livelihood".[১] And Prophet Muhammad (pbuh) has implemented the above instruction throughout his life and made it an example for the world to follow. Human beings can follow his teachings to obtain the knowledge of lawful living which will bring success in earthly life and hereafter. The Prophet (saw) said, "Looking for lawful livelihood is another obligatory work after compulsory prayer (salah)".

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। যাতে রয়েছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ যাবতীয় বিষয়াবলির মানব জীবনের সকল দিকনির্দেশনা। তাই ইসলাম মানব জীবনে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনে জীবিকা উপার্জন কর্মে আত্মনিয়োগ করতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা দিয়েছে। কেননা, জীবিকা মানব জীবনে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জীবনধারনের দশটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে ভরণপোষণের নয়টি অংশ আর সকল কাজের জন্য একটি অংশ।[২] সুতরাং মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তা পূরণে কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা ও গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম কোন ব্যক্তির বেকারত্ব, কর্মহীন, অলসতা, অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া, নিষ্ক্রিয়তা ও নিষ্প্রভতা ও জীবিকার তাড়নায় অন্যের নিকট ভিক্ষা ও হাতপাতাকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় ও স্থান দেয়নি। রাফে বিন খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে পবিত্র ও উত্তম উপার্জন কোনটি? তিনি (স.) বললেন, মানুষের স্বহস্তে উপার্জিত বস্তু ও প্রত্যেক বৈধ ক্রয়-বিক্রয়।[৩]

জীবিকা উপার্জন পরিচিতি

জীবিকা (রিয্ক) এর আভিধানিক অর্থ: জীবিকা উপার্জন দু'টি বাংলা শব্দ। প্রথমটি 'জীবিকা' যা বিশেষ্য জ্ঞাপক শব্দ। যার বাংলা অর্থ জীবন ধারণের জন্য গৃহীত পেশা; বৃত্তি; জীবনোপায়।[৪] এর সমার্থক শব্দসমূহ রিয্ক, রুজি, সম্পত্তি, সম্পদ, খাদ্য, দান ইত্যাদি[৫] ও এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো, Livelihood, means of living, subsistence, property, possession, wealth,[৬] maintenance, daily bread, property,[৭] Gift of God, Allowance of soldiers, Means of living.[৮]আর আরবীতে জীবিকার সমার্থক শব্দ قوت، ررق، معيشة-مال- متاع- معاش- اسباب العيش- رزق ইত্যাদি[৯] শব্দ ব্যবহার হলেও জীবিকা অর্থে رزق শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। ইব্নে মানযূর (মৃ. ৭১১ হি.) বলেন, الرَّزق শব্দটির ر বর্ণে যবর ও যের দু'ভাবেই ব্যবহৃত হয়।[১০] প্রথমত: ر বর্ণে যবর দিয়ে বাবে ينصر - نصر এর মাসদারে হাক্বীক্বী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার আভিধানিক অর্থ দান করা, জীবিকার ব্যবস্থা করা, রিয্ক দেওয়া[১১] ও الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ বা এককালীন দেওয়া। এক্ষেত্রে এর বহুবচন

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হিসেবে الرَّزَقاتُ যার অর্থ هِيَ أَطماع الْجُنْدِ বা সৈন্যদের বেতন প্রদান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ‘আমি তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর।’ দ্বিতীয়ত: ر বর্ণে যের দিয়ে أَرزاق বিশেষ্যটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ ‘যার দ্বারা উপকার হাসিল হয়।’[১২] আর ر বর্ণে যের দিয়ে বিশেষ্যটিকে ক্রিয়ামূল এর স্থানে রেখে বলাও বৈধ।[১৩] আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতে الرَّزق শব্দটি মাসদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً ‘আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ‘ইবাদাত করে যা আকাশ ও জমিন থেকে তাদের জন্য রিয্‌ক দেওয়ার মালিক নয়, আর তারা এ কাজে সক্ষমও নয়।’[১৪]

জীবিকা (রিয্‌ক) এর পারিভাষিক অর্থ

জীবন ও জীবিকা যা ওতোপ্রোতভাবে পরস্পরে সম্পর্কিত বিষয়। প্রত্যেক জীব তার জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের জীবিকা গ্রহণ করে থাকে। আর তাদের প্রত্যেকের জীবন ধারণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সাধারণভাবে জীবিকা বলতে জীবনধারণের জন্য জীপনোপকরণ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করা যা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্জন করে থাকে। অভিধানবেত্তা মুহাম্মাদ ইব্‌নে হুসাইনী আয-যুবাইদী বলেন, هُوَ مَا يَسُوقُه اللهُ إِلَى الحَيَوانِ للتَّغَذي، أَي مَا بِهِ قِوامُ الجسمِ ونَماؤه ‘জীবিকা এমন জিনিস যা আল্লাহ তা‘আলা প্রাণীর খাদ্য হিসেবে সরবরাহ ও প্রদান করে থাকেন। যা দ্বারা শরীর গঠন, প্রবৃদ্ধি, বর্ধন ও উন্নয়ন সাধন হয়।’[১৫]

আল-মু‘জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতা বলেন, وَهُوَ كل مَا ينْتَفع بِهِ ‘যে সকল জিনিস দিয়ে উপকার সাধিত হয় তাই রিয্‌ক।’[১৬] ইমাম জুরযানী (রহ) (মৃ. ৮১৬ হি.) বলেন, ‘জীবিকা এমন একটি নাম যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিজীবকে খাদ্য হিসেবে দিয়ে থাকেন আর যে খাদ্য বৈধ এবং অবৈধ উভয়টি হতে পারে।’[১৭] জীবিকা কেবল খাদ্য হওয়া আবশ্যক না। বরং যা কিছু দ্বারা উপকার ও কল্যাণ অর্জিত হয় তাই জীবিকা হিসেবে পরিগণিত হয়।[১৮] প্রত্যেক মাসের শুরুতে সৈন্যবাহিনীদেরকে যে বেতন বা পরিশ্রমিক প্রদান করা হয়, তাকেই জীবিকা বলে অবহিত করা হয়।[১৯] আল-কুল্লিয়্যাত প্রণেতা বলেন, যা জাগতিক বা পারলৌকিক জীবনে চলমান ও ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয় তাই রিয্‌ক।[২০] ড. আহমাদ শিরবাস্বী বলেন, ‘খাবার, পরিধেয় এবং ব্যবহার্য্য সবকিছুই রিয্‌ক।’[২১] ড. আব্দুল কারীম যায়দান বলেন, ‘রিয্‌ক হলো প্রত্যেক উপকারী বিষয় যা দুভাবে হয়ে থাকে। যথা-বস্তুগত বিষয়াবলী যেমন, অর্থ-সম্পদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু-প্রাণী, ফল-ফসল ও ক্ষেত-খামার, খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র ও বাসস্থান ইত্যাদি। আবার অর্থগত বিষয়াবলী যেমন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব, খ্যাতি, জ্ঞান ও বিবেক, প্রতিভা, বিচক্ষণতা ও উত্তম আচরণ ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। হোক তা পার্থিব জগতে উপকারী বিষয়াবলী যা উপরে উল্লিখিত হলো কিংবা পরকালে উপকার হোক আর তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর সাওয়াব ও জান্নাতের নি‘আমত পাওয়া যার বর্ণনা আল্লাহ তা‘আলা দিয়েছেন।[২২]

সর্বোপরি, মানবজীবনে জীবন ধারনের জন্য যে সব বস্তু ও উপকরণ ব্যবহার করি তাহাই জীবিকা। তা হালাল হোক কিংবা হারাম হোক। সব কিছুই আল্লাহ প্রদত্ত। তবে আল্লাহর ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারাম বিবেচনা করে জীবন ধারণ করাই রবের দাবি।

উপার্জন (কাস্‌ব) এর আভিধানিক অর্থ

‘উপার্জন’ এর সমার্থক শব্দ আয়, রোজগার, কামাই, লাভ, প্রাপ্তি, সংগ্রহ, অর্জন ইত্যাদি।[২৩] এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Income, acquisition, earnings, gain, profit, getting, acpuiring, obtaining.[২৪] Earn[২৫] To gain, acquire, seek after[২৬] আরবীতে এর প্রতিশব্দ[২৭] الكسب যা শব্দটির কাফ বর্ণে যবর ও সীন বর্ণে সুকূন দিয়ে বাবে ضرب- يضرب এর মাসদার كَسَبَ يَكْسِبُ كَسْباً হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থে উপার্জন করা, রোজগার করা, অর্জন করা, লাভ করা, আয় করা[২৮], الجمع ও طلب এবং السعي في طلب الرزق والمعيشة ‘জীবিকা ও জীবিকা উপকরণ অর্জনে প্রচেষ্টা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।’ মুহাম্মাদ আয-যুবাইদী বলেন, কাস্‌ব বা উপার্জন

এর মূল অর্থ وأَصل الكَسْبِ الطَّلَبُ والسَّعْيُ فِي طلبِ الرِّزْق والمَعِيشَةِ 'রিয্‌ক ও জীবনোপকরণ উপার্জনে ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা করা।' যেমনভাবে হাদীসে এসেছে, أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ من كَسْبِهِ، ووَلَدُهُ من كَسْبِه 'সর্বোত্তম জীবিকা হলো এমন খাদ্য ভক্ষণ, যা নিজ হাতে কামাই করা হয় অথবা নিজের সন্তানের উপার্জিত খাদ্য।'[২৯] অপর হাদীসে বলা হয়েছে, نَهَى عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ 'ক্রীতদাসীর উপার্জন গ্রহণ করা নিষেধ।'[৩০] আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ 'তার সম্পত্তি ও যা সে উপার্জন করেছে তার কোন কাজেই আসেনি।' এখানে مَا كَسَبَ অর্থ সন্তানাদি।[৩১] সর্বোপরি, الكسب (কাস্‌ব) এর অর্থ হলো সঞ্চয় করা, একত্রিত করা, অর্জন করা, আয় করা ইত্যাদি।

উপার্জন এর পারিভাষিক অর্থ

জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পদ অর্জন, সংগ্রহ, সঞ্চয়, ও মিতব্যয় লক্ষ্যে প্রচেষ্টা করা এবং মানবজীবনে কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ প্রতিরোধে শ্রম ও শক্তি ব্যয় করা। ইবনুল আছীর (রহ) (মৃ. ৬০৬ হি.) বলেন, কাস্‌ব হলো জীবিকা ও জীবনযাপনের সামগ্রী উপার্জন ও অনুসন্ধানে ব্যাপক প্রচেষ্টা ও প্রয়াস চালান।[৩২] ড. আহমাদ শিরবাস্বী বলেন, الكسب هو الفعل المفضي إلى اجتلاب النفع، أو دفع ضر 'কল্যাণ আনয়ন অথবা অকল্যাণ প্রতিরোধে পরিচালিত কৃতকর্মই হলো 'কাস্‌ব' বা উপার্জন।'[৩৩]মুহাম্মাদ ইব্‌নে হাসান আশ-শায়বানী (রহ) বলেন, উপার্জন হলো, বৈধ উপায়ে সম্পদ লাভ।[৩৪] ইব্‌নে খালদূন (৭৩২-৮০৮ হি.) এর দৃষ্টিতে,

أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل، فلا بد في الّرزق من سعي وعمل، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه، قال تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾.

উপার্জন বলতে, কিছু অর্জন, সঞ্চয়, সংগ্রহ ও মিতব্যয় লক্ষ্যে প্রচেষ্টা করা। আর অবশ্যই প্রচেষ্টা ও কর্মের মধ্যেই রয়েছে রিয্‌ক যদি সে তার প্রচেষ্টায় আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার প্রত্যাশা করে।[৩৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট রিয্‌ক তালাশ কর, আর তাঁরই 'ইবাদাত কর, আর তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।'[৩৬]সর্বোপরি, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য যে শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হয় তাকেই 'কাস্‌ব' বা উপার্জন বলা হয়। তবে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে হালাল ও পবিত্র জীবিকা উপার্জন করাই উদ্দেশ্য।

আল-কুরআনুল কারীমে জীবিকা উপার্জন অর্থে ব্যবহৃত শব্দের পরিসংখ্যান

আল-কুরআনুল কারীমে জীবিকা উপার্জন পরস্পর শব্দ দু'টি ব্যবহার হয়েছে। প্রথমত: জীবিকা অর্থে বহুল ব্যবহৃত শব্দ الرزق যা ৪৪টি সূরায় ১২৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে মাক্কী আয়াত ৮০টি ও মাদানী আয়াত ৪৩টি।[৩৭] তবে আল-কুরআনে الرزق শব্দটি বিশেষ্য ও ক্রিয়া উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا 'যে সমস্ত হালাল ও পবিত্র জীবিকা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলো ভক্ষণ কর।'[৩৮] كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ 'আল্লাহ প্রদত্ত রিয্‌ক হতে তোমরা পানাহার কর।'[৩৯] আয়াতদ্বয়ে الرزق শব্দটি বিশেষ্য ও ক্রিয়া উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১০৯টি আয়াতে রিয্‌ক শব্দের নয়টি অর্থ পরিলক্ষিত হয়।[৪০] যথা- (১) العطاء বা প্রদান করা, পুরস্কার দেওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ : أي أعطيناهم 'আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।[৪১] (২) الطعام বা খাদ্য অর্থে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ 'তাদেরকে যখনই ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেওয়া হতো।'[৪২] (৩) المطر বা বৃষ্টি, বর্ষণ, বারিধারা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 'এবং আকাশে আছে তোমাদের রিয্‌ক আরো আছে যার অঙ্গীকার তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।'[৪৩] (৪) النفقة বা খরচ, ব্যয়, ভরণপোষণের ব্যয়, খোরপোশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'জনকের উপর দায়িত্ব হলো ভালোভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা।' অর্থাৎ সন্তানাদির ভরণপোষণের ব্যয় তার অভিভাবকের উপর ন্যস্ত।[৪৪] (৫) الثواب বা প্রতিদান, প্রতিফল, পুরস্কার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 'যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত ভেবো না, বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থেকে তারা রিয্কপ্রাপ্ত হচ্ছে।'[৪৫] (৬) الجنة বা জান্নাত, বেহেশত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'তোমার প্রতিপালকের দেওয়া রিয্কই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে বেশি স্থায়ী।'[৪৬] ইমাম বাগাভী (রহ) বলেন এখানে রিয্ক অর্থ জান্নাত।[৪৭] (৭) الشكر বা কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ অর্থে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ 'আর মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নিয়েছ।'[৪৮] (৮) الفاكهة বা ফল, মেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا 'যখনই যাকারিয়া (আ) মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করত, তার কাছে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত; জিজ্ঞেস করত- হে মারইয়াম! 'এসব কোথায় থেকে তোমার কাছে আসে'?[৪৯] (৯) الغداء والعشاء বা দুপুর ও রাতের খাবার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا 'আর সকাল-সন্ধ্যা সেখানে তাদের জন্য থাকবে জীবন ধারণের উপকরণ।'[৫০]

সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, আল-কুরআনে 'রিয্ক' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও শব্দটির ব্যবহারের পূর্বাপর লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থানে العطاء বা প্রদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু শব্দটির মৌলিক ও উৎসগতভাবে 'রিয্ক' বা জীবিকা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এ জাতীয় যত শব্দই আল-কুরআনে ব্যবহার হয়েছে প্রায় সকল শব্দই মৌলিকভাবে এই শব্দ হতেই উৎকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: আল-কুরআনুল কারীমে الكسب শব্দটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তা সর্বমোট ৬৭টি বার ব্যবহার হয়েছে। তন্মধ্যে বেশি সংখ্যক অতীতকাল ক্রিয়ারূপে ৩৮ বার এবং বর্তমান ও ভবিষৎকালরূপে ২৪ বার এবং সুলাসী মাযীদ ফীহ রূপে ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৫১] الكسب শব্দটি ব্যবহারিক অর্থে তিন ভাবে ব্যবহৃত হয়। কখনো ভালো উপার্জন অর্থে, কখনো মন্দ উপার্জন অর্থে আবার কখনো ভালো-মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৫২]

১. ভালো অর্থে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদ থেকে ব্যয় কর।'[৫৩]
২. মন্দ অর্থে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
'তবে হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে ঘিরে ফেলে তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।'[৫৪]
৩. ভালো-মন্দ উভয় অর্থে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ 'প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।'[৫৫] এখানে মানুষের উপার্জিত কর্মগুলো ভালো-মন্দ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

জীবিকা উপার্জনের শারঈ বিধান

আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য প্রাণী ও জীব দুনিয়ায় সৃষ্টি করে প্রেরণ করেছেন ও তাদের প্রত্যেকের জীবনধারণের জন্য জীবিকার দায়িত্ব নিয়েছেন। সকল প্রাণীর জীবনধারণ এক নয়। বিভিন্ন প্রাণীর জীবনধারণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তিনি তাদের জীবিকা উপার্জন, সঞ্চয় ও সংগ্রহ করার পথ ও পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন। মানব শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর জীবিকা উপার্জনে কোন মূলনীতি ও বিশেষ কোন বিধানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষকে জীবিকা উপার্জন করার জন্য তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) প্রদত্ত শরী'আহ অনুসারে উপার্জন করতে হয়। ইসলামী শরী'আয় জীবিকা উপার্জনের শারঈ বিধান কী হবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের মতামত পরিলক্ষিত হয়। জীবিকা উপার্জন একটি শরী'আহ অনুমোদিত বিষয়।[৫৬] এ কর্মকে শরী'আহ এর পরিভাষায় 'আল-হুকমুত তাকলীফী'[৫৭] এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে তা বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো ফরয বা ওয়াজিব[৫৮] আবার কখনো মুবাহ[৫৯] আবার কখনো মাকরূহ[৬০] ও হারাম[৬১] বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। নিজের জন্য বা তার পরিবারের ব্যয় বহন করা কিংবা ঋণ পরিশোধ এবং যাদের জন্য খরচ করা আপনার উপর আবশ্যক সেসব ক্ষেত্রে

চাহিদাপূরণ পূর্বক জীবিকা উপার্জন করা ফরয।[৬২] কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ. 'যাদের ভরণ-পোষণ করা, ব্যয়ভার বহন করা কর্তব্য তা না করে আটকে রাখাই কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'[৬৩] এছাড়াও কেউ যদি তার নিজ ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পরেও ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য সঞ্চয় করতে চায় তাহলে তার ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে।[৬৪] কেননা রাসূল (স.) বলেছেন, নাবী (স.) বনী নাযীরের বাগানের খেজুর বিক্রি করে দিতেন এবং স্বীয় পরিবারের জন্য এক বছরের (পরিমাণ) খোরাক সঞ্চয় করে রাখতেন।[৬৫] বেলাল (রা.) কে রাসূল (স.) লক্ষ্য করে বললেন, হে বেলাল! খরচ করো, এ আশংকা করো না যে, আরশের অধিপতি কমিয়ে দিবেন।[৬৬] আবার জীবিকা উপার্জন করা **মুস্তাহাব** হবে যখন মানুষের নূন্যতম চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সঞ্চয় ও সংগ্রহ করবে।[৬৭] আর গৌরব, খ্যাতি, প্রাচুর্য, বিলাসিতা, ব্যাপকতা ইত্যাদির জন্য হালাল জীবিকা উপার্জন করা **মুবাহ**। কেননা তা ধর্মীয় বিধান পালন, ব্যক্তিত্ব, সম্মান-মর্যাদ রক্ষা ও নিরাপত্তা জীবন যাপনে ব্যয় হয়ে থাকে। যেখানে থাকবে না কোন অপকর্ম ও অন্যায়।[৬৮] ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর নিকট পরস্পর গর্ব-প্রতিযোগিতা ও আধিক্যতা প্রকাশের জন্য বৈধ পন্থায় জীবিকা উপার্জন করলেও তা **মাকরূহ** হবে। আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, যদি পরস্পর অহংকার করার জন্য জীবিকা উপার্জন করে তবে তা **হারাম** হবে। কেননা তার এ অহংকার দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসে নিপতিত করে।[৬৯]

আল-কুরআনের আলোকে শারঈ বিধান

সামর্থবান ও সক্ষম সকল ব্যক্তির উপর জীবন ধারনের জন্য জীবিকা উপার্জন করা আবশ্যক। ইসলামী শরী'আয় জীবিকা উপার্জন কর্ম মু'আমালাহ এর অন্যতম একটি অংশ। আর এটি সাধারণভাবে উপার্জন করা বৈধ ও অনুমোদিত বিষয়। আল-কুরআনে কর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট অর্থে العمل শব্দটি পারিভাষিকভাবে ৩৬০ বার (السعي) প্রচেষ্টা ও সাধনা, (الكسب) উপার্জন, (الرزق) জীবিকা, (الجزاء) প্রতিদান ও (الأجر) পারিশ্রমিক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা ইসলামে কর্মের মর্যাদা ও মূল্যায়ন বিষয়ে আল-কুরআনে অনেক আয়াত প্রতিফলিত হয়েছে।[৭০] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا 'আর দিনকে করেছি জীবিকা সংগ্রহের মাধ্যম।'[৭১] এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করে যে সৃষ্টিজীব তাদের প্রয়োজনে জীবিকা উপার্জনে পদাচারণা ও ঘোড়াঘুরি করার সক্ষমতা রাখে। আর তারা তা উপার্জনে দিনের বেলায় নিয়োজিত হবে রাতে নয়।[৭২] অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।[৭৩] এখানে আল্লাহ তা'আলা জীবিকা উপার্জন করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াতে আদেশ করেছেন ও অবকাশ দিয়েছেন। ইহকাল ও পরকালে যার হাতে জীবিকার ভাণ্ডার রয়েছে তাঁর দেওয়া অনুগ্রহ অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষ কর্ম সম্পাদনের পথ উন্মুক্ত করেছেন।[৭৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 'আমি তোমাদেরকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করেছি; আর সেখানে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৭৫] এখানে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর ভূখণ্ডে জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য তাতে প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে মানুষেরা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ ও অন্যান্য সামগ্রী অর্জনে সক্ষম হয়। যা তাদের জীবন ধারণ ও তাঁর ইবাদত পালনে সহায়ক হবে।[৭৬]

ইমাম কুরতুবী (রহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا هُوَ أَمْرُ إِبَاحَةٍ،) 'জমীনে চলাচল করে জীবিকা উপার্জন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি বৈধ নির্দেশিত বিষয়।'[৭৭]

আস-সুন্নাহর আলোকে শারঈ বিধান

জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে সুন্নাহর মধ্যে কতেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা প্রত্যেক সামর্থবান ও সক্ষম মুসলিম ব্যক্তি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে উপার্জন করা ফরয। ইমাম মুহাম্মাদ 'আল-কাস্ব' কিতাবে বলেন, জ্ঞানান্বেষণ যেভাবে ফরয, জীবিকা অন্বেষণও সকল মুসলিমের উপর সেভাবে ফরয।[৭৮] ইব্নে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ على كل مُسلم 'জীবিকা অনুসন্ধান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য

ফরয।[৭৯] অপর হাদীসে বলা হয়েছে, طلب الْكسْب بعد الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة الْفَرِيضَة بعد الْفَرِيضَة 'ফরয সালাতের পর জীবিকা অনুসন্ধান হলো ফরযের পর ফরয।'[৮০] সুতরাং এ হাদীসের মূল বিষয়বস্তু হলো ইসলাম কর্মহীন বেকার সামর্থবান ও সক্ষম ব্যক্তির উপর চরম ঘৃণা করেছে। কর্মে আত্মনিয়োগ ও হালাল উপার্জনের প্রতি ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছে। আর বৈধ জীবিকা উপার্জনকে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর ফরয ও আবশ্যক বিধান পালনের পর এটিকে ওয়াজিব বা আবশ্যক করেছে। কেননা উপার্জনের মধ্যেই রয়েছে জীবন ও মানুষের জীবন ধারণের সর্বোত্তম পথ।[৮১] তিনি আরো বলেন, طلب الْحَلَال كمقارعة الأَبْطَال وَمن بَات نَاوِيا من طلب الْحَلَال بَات مغفورا لَهُ 'হালাল অন্বেষণ যুবকদের লড়াই-সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ন্যায়; যার রাত কাটে হালাল অন্বেষণে ক্লান্ত হয়ে, রাতের বেলায়ই তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[৮২]

ইমাম নববী (রহ) (মৃ. ৬৭৬ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'রাওযাতুত ত্বলেবীন' গ্রন্থে বলেন, 'আল-উলূমুল আক্বলীয়্যাহ' বা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান যেমন চিকিৎসা, হিসাব শাস্ত্র, অসীয়ত ও উত্তরাধীকারী সম্পদ বণ্টন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন এর শারঈ বিধান হলো ফরযে কিফায়া। ইমাম গাযালী (রহ) বলেন, ফরযে কিফায়া এর অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসা ও হিসাব শাস্ত্র এমন দু'টি বিষয় যা থেকে মানুষ দূরে থাকতে পারে না। আর পেশা ও শিল্প এমন বিষয় যা মানুষেরা তাদের জীবনধারণের জন্য তাতে নিযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন কৃষি কাজ করা ফরযে কিফায়া। তবে কৃষি কাজের চেয়ে চিকিৎসা ও হিসাব শাস্ত্র অধিকতর যোগ্য ও উত্তম হবে। আর উসূলুল আকাঈদ বিষয়ে যা কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে তা অর্জন করা ফরযে আইন এবং ইলমুল কালাম বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ফরযে আইন নয়। কেননা সাহাবীগণ এ বিষয়ে নিয়োজিত ছিলেন না।[৮৩]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইব্নে তাইমিয়্যাহ (রহ) (মৃ.৭২৮ হি.) বর্ণনা করেছেন, মানুষের জীবিকা উপার্জনের জন্য বিভিন্ন পেশা যেমন কৃষি কাজ, কাপড় বুনন, ভবন নির্মাণ ইত্যাদির প্রয়োজন অনুভব করত নিয়োজিত হয়ে থাকে। এসবের বিস্তারিত বর্ণনার পর তিনি এগুলোর শারঈ বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

فَلِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ: كَأَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ؛ وَأَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ هَذِهِ الصِّنَاعَاتِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ

আর এ জন্যই ফুকাহাগণের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (রহ) (মৃ. ১৫০-২০৪ হি.), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) (মৃ. ২৪১ হি.) ছাড়াও অন্যান্যগণ হলেন আবূ হামিদ গাযালী (রহ) (মৃ. ৪৫০-৫০৫হি.), আবূল ফারায ইবনুল জাওযিয়্যাহ (রহ) (মৃ. ৫১০-৫৯৭ হি.) প্রমুখ এ সব জীবিকা উপার্জনমুখী কর্ম সম্পাদন ও নিয়োজিত হওয়াকে ফরযে কিফায়া বলেছেন।[৮৪] এছাড়াও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইব্নে তাইমিয়্যাহ (রহ) বলেছেন, যেমনটি মাজমূ' ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে,

وَقَدْ ذَكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ أُصُولَ الصِّنَاعَاتِ كَالْفِلَاحَةِ وَالْحِيَاكَةِ وَالْبِنَايَةِ: فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهَا فَرْضٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا؛ وَأَمَّا مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا فَلَا تَجِبُ.

'আমাদের ওলামা ও অন্যান্যগণ বলেন, 'স্বনাআত' বা শিল্প কর্ম। যেমন- কৃষিকাজ, কাপড় বুনন শিল্প, অট্টালিকা ও ভবন নির্মাণ ইত্যাদি কর্মের মূল শারঈ বিধান হলো ফরযে কিফায়া। আর বাস্তব ও কার্যত কথা হলো যখন শিল্প কর্মের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থাকবে তখন তা পালন করা ফরয আর যখন প্রয়োজন ও চাহিদা থাকবে না, তখন তা পালন করা আবশ্যক হবে না।'[৮৫]

জীবিকা-অন্বেষার বিভিন্ন স্তর ও বিধান

ক. **যে সব অবস্থায় জীবিকা উপার্জন ফরযে আইন:** সাধারণভাবে জীবিকা উপার্জন করা শারঈ সম্মত একটি অনুমোদিত বিধান। যা সামর্থবান ব্যক্তিদের জন্য হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জন করা ফরযে কিফায়া। কিন্তু যখন দায়িত্বশীল ও সামর্থবান ব্যক্তিদের জন্য জীবনোপকরণ সঞ্চয়, সংগ্রহ ও অন্বেষণ করা আবশ্যক হয়ে যায়, তখন তা সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা ফরযে আইন হয়ে যায়। ঢালাওভাবে সব সময় উপার্জন কর্মে নিয়োজিত হওয়া ফরযে আইন নয় বরং বিশেষ কয়েকটি অবস্থার সম্মুখীন হলে তা পালন করা ফরযে আইন। যেমন-

১. **নিজ ব্যক্তিগত সত্তায়:** যখন ব্যক্তির নিজ আত্মাকে রক্ষা করা ও তার নিজের জন্য খরচ করা আবশ্যক হবে। কেননা, যেটুকু জীবিকা একান্ত না হলেই নয়, ততটুকু জীবিকা উপার্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরয। কারণ রাসূল (স.) বলেছেন,

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

'আপনার ওপর আপনার প্রতিপালকের হক আছে, আপনার নিজের আত্মার হক আছে এবং আপনার পরিবার-পরিজনেরও হক আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য দান করুন।'[৮৬] ইবনু হুবাইশ (রা.) কে উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূল (স.) বলেন, 'তোমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য এক লোকমা খাবার ও লজ্জাস্থানে ঢাকার জন্য এক টুকরো কাপড় (অনিবার্য)। এরপর তোমার কাছে যদি আশ্রয় নেওয়ার মতো একটি ঘর থাকে, তাহলে উত্তম আর যদি আরোহণ করার জন্য একটি বাহন থাকে, তাহলে তো সাবাশ সাবাশ।'[৮৭]

২. **নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য:** যখন কোন ব্যক্তির স্ত্রী ও ছোট ছেলে-মেয়ে থাকে, তখন তার জন্য ততটুকু উপার্জন করা ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয়ে যায়, যেটুকু দিয়ে সে তাদের জীবিকা নির্বাহ ও ব্যয়ভার বহন করতে পারবে। কারণ, স্ত্রী ও তার পরিবারে ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ('ইদ্দাতকালে) নারীদেরকে সেভাবেই বসবাস করতে দাও যেভাবে তোমরা বসবাস কর তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য তাদেরকে জ্বালাতন করো না। তারা যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে, তবে তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন কর।[৮৮] হাদীসে এসেছে,

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "كَفَى بالمرءِ إثماً أن يضيِّعَ مَنْ يَقُوتُ"

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, কেউ পাপী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার উপর নির্ভরশীলদের জীবিকা নষ্ট করে।[৮৯]

৩. **ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তির উপর:** যখন কারো উপর ঋণ থাকে অথবা কোন কাফ্‌ফারাহ থাকে যা তার উপর আদায় করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় তাকে তা পরিশোধ করার জন্য ততটুকু জীবিকা উপার্জন করা আহলে ইলমদের অগ্রাধিকার মতানুসারে ফরয, যেটুকু দিয়ে সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। কারণ, ঋণ পরিশোধ করা মানুষের উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয। রাসূল (স.) বলেছেন, আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে এরূপ বলতে শুনেছি, দেনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে এবং কেউ যদি কোন জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে তাকে দায়িত্বশীল হতে হবে।[৯০]

৪. **নিজ পিতা-মাতার জন্য:** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নি'আমত পিতা-মাতা। যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম ভালোবাসা, মায়া, মমতা, স্নেহ ও আদর দিয়ে নিজ সন্তানদের লালন পালন করে থাকে। তারা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন অনেক সময় অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ও অভাবে নিপতিত হয়। এমতাবস্থায় সন্তানেরাও যদি অসচ্ছল ও দরিদ্র হয় তাহলে পিতা-মাতার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য যতটুকু ব্যয় করা প্রয়োজন, ততটুকু তাদের জন্য উপার্জন করা ফরয। এক ব্যক্তি রাসূল (স.) এর নিকটে এসে বলল, আমি আপনার সঙ্গে জিহাদে যেতে চাই। তখন রাসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতা আছে? লোকটি হ্যাঁ বললে, রাসূল (স.) বললেন, ফিরে যাও এবং তাদের (সেবার) জন্য চেষ্টা-সাধনা কর।[৯১] অর্থাৎ উপার্জন করে তাদের ব্যয়ভার বহন করো।

খ. মানদূব পর্যায়ের উপার্জন

মানব জীবনে প্রয়োজনের অধিক জীবিকা উপার্জন করা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ। আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা, ফকীর, মিসকীন, অসহায়দের সহায়তা করা, বিধবা, ইয়াতীম, দুস্থ ও বিপদগ্রস্থ ইত্যাদি ব্যক্তিদের বিশুদ্ধ নিয়্যাত নিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে জীবিকা উপার্জন করা হলে, তাহলে তা শরী'আতের হুকুম মানদূব হিসেবে পরিগণিত হয়। এছাড়াও কেউ অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির প্রত্যয়ে কিংবা বাৎসরিক দূর্যোগ, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জীবিকা মওজুদ করলে এবং সামাজিক জীবনে নিজেকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন পরিচালনার জন্য উপার্জন করলে এ উপার্জনকে মানদূব হুকুমে সাব্যস্ত করা হয়।[৯২]

গ. মাকরূহ পর্যায়ের উপার্জন

এমন কতেক দোষ ও ত্রুটিপূর্ণ পেশা ও শিল্প রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে উপার্জন করাকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় মাকরূহ বলা হয়। আর মানুষেরা জীবিকা উপার্জনের এ ধরনের পদ্ধতিগুলোকে ঘৃণা ও হেয়জ্ঞান করে

এবং তাদের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকায়। যেমন শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে জীবিকা আহরণ।[৯৩] তবে এ মাসআলাটির বিষয়ে উলামাদের মাঝে তিনটি বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। এক. জমহুর বিদ্যানগণ বলেন, শিঙ্গা লাগান বৈধ পেশা। কেননা রাসূল (স.) শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। দুই. উসমান ইবনে আফফান (রা.), আবূ হুরায়রা (রা.), হাসান আল-বাসরী ও নাখায়ী (রহ) শিঙ্গার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনকে মাকরূহ বলেছেন। তিন. ইমাম কাযী (রহ) হাম্বলী মাযহাবের বরাত দিয়ে হারাম বলেছেন।[৯৪]

বস্তুতঃ যদি মানুষ মাকরূহ পর্যায়ের পদ্ধতি ছাড়া জীবিকা উপার্জনের অন্য কোন পথ না পায়, তাহলে তার জন্য মানুষের দারে দারে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে ঐ মাকরূহ পদ্ধতিতে উপার্জন করাই উত্তম হবে। অনুরূপ কতক সালাফ বিদ্যান বলেছেন।[৯৫]

ঘ. হারাম পর্যায়ের উপার্জন

মৌলিকভাবে যে সব পথ ও পন্থায় জীবিকা উপার্জন করা হারাম। যেমন- মদ, শূকর ও সুদ ইত্যাদি হারাম পন্থায় উপার্জন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।[৯৬] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছেন, সে সময় তিনি (স.) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শরাব, (মদ) মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন। এমন সময় বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? যা নৌকায় লাগানো হয়, চামড়ায় ঘষা হয় এবং লোকেরা তা জ্বালানির কাজে ব্যবহার করে। তিনি বললেন, না, তাও হারাম। তখন রাসূলাল্লাহ (স.) আরো বলেন, আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের জন্য মৃত জন্তুর চর্বি হারাম করেছেন, তা সত্ত্বেও তারা মৃত জন্তুর চর্বি গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে থাকে।[৯৭]

জীবিকা উপার্জন কর্মে আত্মনিয়োগে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম এমন এক চিরন্তন ধর্ম যা পরিশ্রম ও ব্যাপক উৎপাদন মুখর কর্ম সম্পাদনের সাথে ক্রমাগত সম্পর্কিত। যে কর্ম রাসূল (স.) নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে ও পরে নিজ হাতে সম্পাদন করতেন। তিনি ছাগল চারণ করতেন, কাষ্ঠ একত্রিত করতেন, ব্যবসা করতেন ও দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করতেন। তাই ইসলাম কর্মে নিয়োজিত হতে কতকগুলো মৌলিক উপাদানের কথা বর্ণনা করে থাকে। যেখানে মানুষ শুধুমাত্র উৎপাদন কর্মে নিয়োজিত থাকবে এমনটি নয় বরং মানুষকে আল্লাহ দুনিয়ায় উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর ওপর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে প্রাণীগুলোকে তাদের বশীভূত করেছেন, যেন তারা উপকার হাসিল করে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহান রবের আদেশ ও বিধানাবলী বাস্তবায়ন করতে পারে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদের জন্য জলে স্থলে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে পবিত্র রিয্ক দিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[৯৮]

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে মহান মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, যেন তারা দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তিনি তাদেরকে সম্মান, মর্যাদা, দয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে অন্যান্য সৃষ্টি জীবের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষকে সুন্দর আকৃতি, বিস্তৃতি অবয়ব, বিবেক শক্তি, স্বাধীনতা ও সুন্দর জীবন ধারণ দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানুষের জন্য অন্যান্য সৃষ্টিজীবকে তাদের অনুগত ও বশীভূত করেছেন। তিনি মানুষকে জীবনোপকরণ ও অর্থ-সম্পদ উপার্জনের যাবতীয় বৈধ ও পবিত্র পথ ও পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছেন। আর কর্ম সম্পাদনের সকল পথ সহজ ও সম্ভবপর করে দিয়েছেন যা অর্জনের প্রতিফল প্রদানের অঙ্গীকার দিয়েছেন যদি তারা তাদের কর্ম আল্লাহর আনুগত্য ও ভীতি বা তাকওয়া নিয়ে করে থাকে।[৯৯]

৩.৫. জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে জীবিকা উপার্জন করার প্রতি ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় জীবিকা উপার্জনের সকল উৎসসমূহকে স্বহস্তে অর্জনের জন্য সে পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যা কেউ কারো ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব দেখিয়ে এবং কেউ কারো উপর অন্যায়, অবিচার,

দুরাচার, বিদ্রোহ ও বাড়াবাড়ি করে তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষকে কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা ও প্রচেষ্টা করার জন্য ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তিনি অলসতা, অবসন্নতা, মন্থরতা, উদাসীনতা, নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মে অবহেলা করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বৈধ জীবিকা উপার্জনের সকল গুরুত্বপূর্ণ পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেক আবশ্যকীয় উৎপাদনীয় কর্ম সঞ্চয়ের পথ সহজলভ্য করেছেন। তিনি মানুষের জন্য আকাশ, সাগর ও স্থলভাগের প্রতিটি স্থানে জীবিকা সংগ্রহের পথ ও উৎসসমূহ বিন্যস্ত করেছেন। সুতরাং যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবে, সামগ্রিক অলসতা, মন্থরতা ও লাঞ্ছনা পরিহার করবে এবং কর্ম সম্পাদনার সূচনা ঘটাবে আর প্রবল আগ্রহ, উদ্দীপনা ও অবিচল সাধনা চালাবে, তারাই জীবিকা উপার্জনে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে। যে কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকবে ও অলসতা প্রকাশ করবে, সে গুনাহগার হবে আর যে প্রচেষ্টা, অধ্যাবসায় ও জীবিকা সংগ্রহে ধ্যান-ধারণা করবে, সে সওয়াব পাবে। বস্তুত যার কর্ম যত বেশি কঠিন ও কষ্টসাধ্য হবে, সে তত বেশি প্রতিদান ও প্রতিফল অর্জন করতে সক্ষম হবে। জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব কয়েকটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। নিম্নে সেগুলো আলোকপাত করা হলো।

১. **বেকারত্ব, কর্মহীনতা, অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ-ক্ষুধা হ্রাসকরণ:** হালাল রিয্ক উপার্জনে ব্যাপক প্রচেষ্টা, উদ্দীপনা ও সাধনা অবিচল রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষতা ও কর্মহীনতা হ্রাস করা। যদি সমাজের সকল সদস্য পবিত্র রিয্ক যেমন কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও উপার্জনমুখী কর্ম ইত্যাদি সন্ধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সামর্থ, ক্ষমতা ও সক্ষমতা বিনিয়োগ করে, তাহলে তারা প্রত্যেক কল্যাণমুখী অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সকল উপকারী পথ, পন্থা ও সম্ভাবনা পেতে সক্ষম হবে। সমাজ থেকে বেকার ও কর্মহীন লোকের হ্রাস হবে। বিলীন হয়ে যাবে সকল দরিদ্রতা। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম অভাব-অনটন মুক্ত থাকবে এবং সমাজে আর কোন অনাহার, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা ও কোন ধরনের ভিক্ষুক, দরিদ্র-অভাবী পাওয়া যাবে না। আর এ জন্য ইসলামী শরী'আহ জীবিকা উপার্জনে গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রদান করেছে।

২. **মানুষের নিকট থেকে অভাবমুক্ত হওয়া:** নিশ্চয় রিয্ক অনুসন্ধানকারী ব্যক্তির জীবিকা আহরণ ও সংগ্রহ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিজেকে নিবৃত, বিরত ও মানুষের কাছ থেকে অভাবমুক্ত রাখা। কেননা পেশাজীবী ব্যক্তি কাজ, কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৃত্তি ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করাই অধিক উত্তম। যা ব্যক্তিকে মানুষের লাঞ্ছনা, অপমান ও অপদস্থতা এবং ভিক্ষা করা থেকে বিরত রাখতে অভূত কল্যাণ আনয়ন করে থাকে। যদিও জীবিকা উপার্জনের পথ কঠিন ও কষ্টকর হয়, তবুও তা ক্ষুধা, দরিদ্রতা, অপদস্থতা, বঞ্চনা, ভোগান্তি ও অভাব থেকে মুক্ত থাকাটাই অধিকতর সহজতর ও কল্যাণকর। হাদীসে এসেছে,

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

'যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (স.) বলেছেন, তোমাদের কারো এক গোছা দড়ি নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠের বোঝা নিজের পিঠে করে নিয়ে এসে তা বিক্রি করা যার দ্বারা আল্লাহ তার সম্মান বাঁচান। এটা তার জন্য এমন কাজ হতে বেশি উত্তম যে, সে অপর ব্যক্তির নিকটে ভিক্ষা চাবে, আর তারা তাকে হয়ত দান করবে অথবা ফিরিয়ে দিবে।'[১০০] হাদীসে আরো এসেছে,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

নবী (স.) ইরশাদ করেছেন, উত্তম সাদাকাহ হলো যা দান করার পরে মানুষ অমুখাপেক্ষী থাকে। নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। নিকটাত্মীয়দের থেকে (দান খয়রাত) শুরু কর।[১০১] আর অবশ্যই কতেক সালাফবিদ্যান বলেন, মুমিনের সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি হলো মানুষের কাছ থেকে নিজেকে অভাবমুক্ত রাখা।[১০২]

৩. **জীবিকা উপার্জনে মানুষের কামনা করা ও যা তাদের হাতে রয়েছে তা প্রত্যাশা পরিহার করা:** মুসলিম ব্যক্তি বৈধ অর্থ-সম্পদ উপার্জন করবে এটাই তার প্রত্যাশা। কেননা এ উপার্জনকে সে অতি প্রিয় ও পছন্দ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। অপরদিকে তাদের হাতে যখন কোন অর্থ-সম্পদ আহরিত হয়, তখন তারা উদ্ধত হয়ে যায়। তাইতো হাদীসে এর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبّوكَ"

'সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা আমি করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।'[১০৩] অর্থাৎ মানুষ জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জীবিকা উপার্জন করবে। তাই বলে তারা কখনো দুনিয়ার মোহে অর্থ-সম্পদের লোভে প্ররোচিত না হয়। সুতরাং প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

৪. **জীবিকার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা:** আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত পালনে, তাঁর সান্নিধ্য, অভিলাষ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে বৈধ ও পবিত্র জীবিকা উপার্জন বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করে। মানুষ উপার্জনের মাধ্যমেই দরিদ্র, অসহায়, বিধবা ও ইয়াতীম শ্রেণির মানুষের প্রতি খরচ করতে পারে। আর দুর্বল, দুস্থ ও অভাবীদের সহযোগিতা করা যায়। এই জন্য রাসূল (স.) বলেছেন, সৎ মানুষের হাতে হালাল সম্পদ থাকা অতি উত্তম।[১০৪]

৫. **বৈধ উপার্জন জান্নাত লাভের অন্যতম উপয় ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার মাধ্যম:** ইহকালীন জীবনে মানুষের বৈধ উপার্জনের ফলে পরকালীন জীবনে জান্নাত লাভ করবে ও জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে অবৈধ উপার্জনকারী দুনিয়াবী জীবনে সম্পদের পাহাড় গড়লেও পরকালীন জীবনে তার জন্য ভয়াবহ ও কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। রাসূল (স.) বলেছেন, كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ 'যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত তার জন্য জাহান্নামের আগুনই উত্তম।'[১০৫] হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالحرَامِ

'আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, যে শরীর হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[১০৬] রাসূল (স.) কাব বিন উযরাহ (রা.) কে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে কাব বিন উযরাহ যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং তার জন্য জাহান্নামের আগুনই উত্তম।[১০৭] অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা.) কে তিনি (স.) লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুর রহমান! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এ অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যে শরীর হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হবে না। তার জন্য জাহান্নামের আগুনই উত্তম।[১০৮] অপর হাদীসে রাসূল (স.) বলেন, যে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করে ও সুন্নাহভিত্তিক আমল করে এবং তার অন্যায়-অবিচার থেকে অন্য মানুষেরা নিরাপদে থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.) বর্তমান সময়ে আপনার উম্মতে এ ধরনের অনেক মানুষ পাওয়া যাবে। তখন তিনি (স.) বললেন, অচিরেই আমার পরবর্তী যুগে এমন শ্রেণির লোকের উদ্ভব হবে।[১০৯]

৬. **বৈধ উপার্জন দুআ ও ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত**

মানুষের প্রাত্যহিক ও পার্থিব জীবনে চাহিদার কোন শেষ নেই। তবে এগুলো মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও বঞ্চিত হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কোন বিকল্প নেই। আর এজন্য তাঁর দরবারে একান্তে প্রার্থনা করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহও মানুষের ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নাই, এটি অন্যতম ইবাদাতও বটে। রাসূল (স.) বলেন, الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ দু'আ হচ্ছে ইবাদাত।[১১০] এ দু'আর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায় এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ সহায়ক হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হতে হলে উপার্জন অবশ্যই হালাল হতে হবে। কারণ আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। অতএব অবৈধ উপার্জনকারীর খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ অবৈধ হওয়ায় তাদের প্রার্থনা কবুল হয় না। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

আবূ হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত রাসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মু'মিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল জিনিস আহার কর এবং ভাল কাজ কর। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত।"[১১১] তিনি (আল্লাহ) আরো বলেছেন, "তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন! আমি তোমাদের যে সব পবিত্র জিনিস রিযক হিসেবে দিয়েছি তা খাও।[১১২]" অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দু'আ তিনি কী করে কবূল করতে পারেন?"[১১৩] সুতরাং হারাম খেয়ে দুআ করলে তা যেমন কবুল হয় না। তেমনি হারাম জীবিকা খেয়ে ইবাদত করলেও তা কবুল হয় না।

৭. **হালাল উপার্জনে বরকত লাভ হয়:** উপার্জনে বরকত লাভ করতে হলে একমাত্র হালাল পন্থায় হতে হবে। কেননা উপার্জনে বরকত দানের মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনি শুধু বৈধ উপার্জনকেই বরকতময় করেন আর যাবতীয় অবৈধ উপার্জনে বরকত নষ্ট করে দেয় ও অপচয় বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে হালাল উপার্জন কম হলেও তাতে বরকতের কারণে খুব স্বল্প সময়েই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[১১৪]

৮. **হালাল উপার্জন একটি অমোঘ বিধান:** ইসলাম মানুষের জন্য হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনার পাশাপাশি হালাল উপার্জনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। ফরয ইবাদতসমূহ আদায়ের পর এ মহতি কর্মে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল উপায় অবলম্বন করা সকল মানুষের উপর ইসলামের একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। যারা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদের উদ্দেশ্যে নবী কারীম (স.) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন, মানুষের জন্য এমন এক সময় আসবে, যখন সে তার ধন-সম্পদ হালাল না হারাম পথে উপার্জন করল তা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করবে না।[১১৫]

হালাল উপার্জনে রয়েছে বহু উপকারিতা

ভালো আর মন্দ যেমন সমান নয়, আলো ও আধার যেমন সমান নয়, হক ও বাতিল যেমন সমান নয় তেমনি হালাল-হারাম সমান নয়। আল্লাহ বলেন, বল, অপবিত্র আর পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্র বস্তুর প্রাচুর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে। কাজেই হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১১৬]সুতরাং হালাল উপার্জন মানব জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্ম। এ কর্ম ছাড়া আল্লাহর নিকট ভিন্ন কোন পদ্ধতিতে উপার্জ করলে তা গৃহীত হবে না।

জীবিকা উপার্জনে ইসলামের মূলনীতি

ইসলামী শরী'আহ এর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে কাউকে বল্গাহীন স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে জীবিকা উপার্জনের পরিশ্রম ও উদ্যোগ-আয়োজনের বেলায়ও কয়েকটি বিধান মেনে চলতে হবে। এসব নীতি বা বিধান একদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, অপরদিকে জীবিকা উপার্জনকারীকে আর্থিক সচ্ছলতার সাথে সাথে ধর্মীয় ও নৈতিক অগ্রগতিও দান করে। আর এ জন্যই ব্যক্তিগতভাবে জীবিকার অন্বেষণকালে সব সময় অনুসরণীয় ও বর্জনীয় দু'টি নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অনুসরণীয়

নীতি হলো, জীবিকা উপার্জন হালাল পন্থায় ও উপার্জিত জীবিকা তাইয়্যেব বা পবিত্র হওয়া । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

ওহে মনুষ্যজাতি! ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে হালাল উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শায়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বস্তুতঃ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১১৭] তিনি আরো বলেন, যে সমস্ত হালাল ও পবিত্র জীবিকা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলো ভক্ষণ কর।[১১৮]

অপরদিকে বর্জনীয় নীতি হলো সামগ্রিকভাবে যাবতীয় হারাম বস্তু ও হারাম পন্থায় জীবিকা উপার্জন বর্জন করা। কেননা রাসূল (স.) বলেছেন, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়-যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে।[১১৯] কিন্তু যদি মু'আমালাহ ও জীবিকা উপার্জন ক্ষেত্রে নিম্নের যে কোন একটি মূলনীতি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে।[১২০] (ক) যদি লেনদেন ও উপার্জন কর্মে সুদ যুক্ত হয় তাহলে তা হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল করেছেন ও সুদ কে হারাম করেছেন।[১২১] (খ) যদি লেনদেন ও উপার্জন কর্মে গারার ও জাহালাত তথা প্রতারণা ও অজ্ঞতা থাকে তাহলে তা হারাম হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় বৈধ।'[১২২] (গ) যদি লেনদেন ও উপার্জন কর্মে ধোঁকা ও ঠকবাজি থাকে তাহলে তা হারাম। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হাকীম ইবনু হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং বিক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি বলে দেয়, তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কে বরকত প্রদান করা হয়। কিন্তু যদি তারা মিথ্যা বলে এবং বিক্রীত দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখে, তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়।[১২৩]

উপসংহার

ইসলামে জীবিকা উপার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। যে জীবিকা মানব সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তা'আলা বান্দার ভাগ্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সাথে সাথে দুনিয়ায় তিনি জীবিকার ভাণ্ডার রেখে দিয়েছেন। সেখানে কর্ম করে প্রত্যেককে উপার্জন করা ও তাঁর একত্ববাদের ইবাদাত করাই মহান রবের দাবী। তাই বলে দুনিয়ায় কেবল হাত-পা গুটিয়ে থাকলেই জীবিকা পাওয়া যায় না। বরং জীবিকা উপার্জনের জন্য উপার্জন কর্মে আত্মনিয়োগ করাই ইসলামী শরী'আহ এর সুস্পষ্ট নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে যে কোনো ব্যক্তির জন্য মানুষের কাছে যাঞ্চা করার চেয়ে দড়ি নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি কুড়িয়ে জীবিকা অর্জন করা অনেক উত্তম।[১২৪] ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহ) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে ব্যক্তি বাড়ি বা মসজিদে কর্ম না করে জীবিকা পাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে। তখন তিনি বললেন, এ একজন জ্ঞানহীন ব্যক্তি। সে কি শ্রবণ করেনি রাসূল (স.) এর বাণী, নিশ্চয় রাসূল (স.) বলেছেন, জীবিকা আমার তীরের ছায়ার নিচে রয়েছে। সর্বোপরি, জীবন বাঁচার জন্য যতটুকু জীবিকা উপার্জন করা প্রয়োজন, ততটুকু জীবিকা সঞ্চয় ও সংগ্রহ করা আবশ্যক। তবে জীবিকা উপার্জনের পথ ও পদ্ধতি অবশ্যই যেন হালাল ও বৈধ পদ্ধতিতে হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হালাল ছাড়া হারাম জীবিকা গ্রহণ করেন না।

তথ্যনির্দেশ

১. আল-কুরআন, সূরা জুমু'আহ, ৬২:১০।

২ 'আলাউদ্দীন 'আলী ইবনে হিশামুদ্দীন, *কানযুল উম্মাল*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: মু'য়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৬, হাদীস নং ৯২০৮। العافية عشرة أجزاء، تسعة في طلب المعيشة، وجزء في سائر الأشياء

৩ *কানযুল উম্মাল*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৪, হাদীস নং ৯৮৬০; মুহাম্মাদ ইব্নে আব্দুল্লাহ আল-খত্বীত আত-তিবরযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১২৮, হাদীস নং ২৭৮৩।
عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور

৪. সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক *বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৪৭৪।

৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২৩শ সংস্করণ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৫১৩।

৬ Cowan, John Milton (ed): *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Third Printing, Macdonald & Evans Ltd., London, 1994, p. 337; DICTIONARY OF ISLAMIC TERMS, P.196

৭ Dr. ROHI BAALABAKI, *AL-MAWRID A MODERN ARABIC-ENGLISH DICTIONARY* (Beirut, Lebanon, DAR EL-ILM LILMALAYIN, Edition 21, 2007), p. 583; *N.S.DONIACH, THE OXFORD ENGLISH-ARABIC DICTIONARY* (OXFORD AT THE CLARENDOM PRESS, 1st Edition 1972), p. 711.

৮ *STUDENT`S ARABIC-ENGLISH DICTIONARY* (Beirut, Lebanon, CATHOLIC PRESS, 1ST Edition, 1955), p. 199

৯ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-কাফী*, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২৪০; *DICTIONARY OF ISLAMIC TERMS* (Damascus, Beirut, AL YAMAMAH PUBLICATION, 1ST EDITION 1425 HIJRI/2004), P. 196.

১০. মুহাম্মাদ ইব্ন মুকার্‌রাম বিন আলী আবূল ফযল জামালুদ্দীন ইবনুল মানযূর, *লিসানুল আরাব*, ১০ম খণ্ড (বৈরূত: দারু স্বদের, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ১১৫।

১১. *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, পৃ. ৫১৩। রিয্‌কের অর্থ সম্পর্কে আল-মুফরাদাত ফী গারীবুল কুরআনে বলা হয়েছে,
الرزق يقال للعطاء الجاري تارة دنيويا كان أم أخرويا، وللنصيب تارة ، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة يقال أعطى السلطان رزق الجند .

'রিয্‌ক হচ্ছে পার্থিব কিংবা পারলৌকিক স্বার্থে চলমান দান। কখনো তা প্রাপ্য সম্পদ হিসেবে দেওয়া হয়। আবার তা যখন পাকস্থলীতে পৌঁছে, তখন তাকে খাদ্য হিসেবে দেওয়া হয়। যেমন বলা হয়, সরকার তার বাহিনীকে ভরণপোষণ হিসেবে রিয্‌ক দিয়েছেন।' দ্র. আবূল কাসেম আল-হুসাইন বিন মুহাম্মাদ, *আল-মুফরাদাত ফী গারিবুল কুরআন* (বৈরূত: লেবানন, দারুল মারেফাহ, তা.বি.), পৃ. ১৯৪।

আল-মুফরাদাত ফী গারীবুল কুরআনে বলা হয়েছে, الرزقة ما يعطونه دفعة واحدة 'রিয্‌ক এমন বিষয় যা তাকে এককালীন দেওয়া হয়।' দ্র. *আল-মুফরাদাত ফী গারিবুল কুরআন*, পৃ. ১৯৪।

জুবরান মাসউদ বলেন, ما يُنتفع به من مال أو زرع أو غيرهما 'যা দ্বারা উপকার অর্জিত হয়; সেটা সম্পদ অথবা শস্য-ক্ষেত্র হোক কিংবা এগুলো ছাড়া যা কিছুই হোক তাই 'রিয্‌ক।' দ্র. জুবরান মাসউদ, *আর্ রায়েদ* (বৈরূত: লেবানন, দারুল ইলম লিল মালাইন, ৩য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪৩৭।

মুনীর বা'লবাকী বলেন, الرزق : أسباب العيش أو سبله 'রিয্‌ক হলো জীবনযাত্রার উপকরণ কিংবা জীবনপদ্ধতির উপায়সমূহ।' দ্র. Munir Ba`albaki, *AL-MAWRID A Modern English-Arabic Dictionary* (Beirut, Lebanon, DAR EL-ILM LILMALAYIN, 1st Edition, 1995), p. 535

১২ *লিসানুল আরাব*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৫; মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রায্‌যাক আল-হাসিনী আবুল ফায়েজ আয-যুবাইদী, *তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরিল ক্বমূস*, ২৫শ খণ্ড (লিবিয়া: দারুল হিদাইয়া, তা.বি.), পৃ. ৩৩৫; মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল'আজী, *মু'জামু লুগাতুল ফুকাহা*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুন নাফায়েস, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২২২; ইবরাহীম মুহাম্মাদ আল বাইয, *আল-মুনজেদ আবজাদী* (বৈরূত: লেবানন, দারুল মাশরেক, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৮ খৃ.), পৃ. ৪৮২।

১৩ আবু তাহের মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল-ফিরোয আবাদী, *আল-ক্বমুসুল মুহীত*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: লিবানন, মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৩৫; *লিসানুল আরাব*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

১৪. সূরা আন-নাহাল, ১৬:৭৩।

১৫ মুহাম্মাদ ইব্নে আব্দুর রায্‌যাক আল-হুসাইনী, *তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস*, ১৩শ খণ্ড (কুয়েত: দারুল হিদায়াহ, তা. বি.), পৃ. ১৬২; যায়নুদ্দীন মুহাম্মাদ আল-মাদউ আলা-মানাবী, *আত-তাওক্বীফ আলা মুহিম্মাতিত তাআরিফ ;* ১ম খণ্ড, (কায়রো: মিসর, আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ, খ্রি. ১৯৯০), পৃ. ১৭৭।

১৬ ইবরাহীম মুস্তফা, আহমাদ যাইয়্যাত, হামেদ আব্দুল ক্বদের ও মুহাম্মাদ নাজ্জার, আল-*মু'জামুল ওয়াসীত*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: সৌদিআরব, দারুদ দা'ওয়াহ, তা. বি.), পৃ. ৩৪২। وَهُوَ كل مَا يُنْتَفع بِهِ

১৭ اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، فيكون متناولًا للحلال والحرام. وعند المعتزلة: عبارة عن مملوك يأكله المالك،

فعلى هذا لا يكون الحرام رزقً
দ্র. আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী যায়েন আশ-শারীফ জুরযানী, *কিতাবুত তা'রিফাত* (বৈরূতঃ লেবানন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১০; মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান আল-বারকুনী, *আত-তারিফাতুল ফিক্বহিয়্যাহ* (বৈরূতঃ লেবানন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১০৪।

১৮. আইউব বিন মুসা আল-হুসাইনী আল-ক্বারীমী আল-কুফী আল-হানাফী, *আল-কুল্লিয়্যাত মুজাম ফীল মুস্তলাহাত ওয়াল ফুরুকুল লাগবিয়্যাহ* (বৈরূতঃ লেবানন, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তা.বি.), পৃ. ৪৭২।

১৯ আবূল ফাতাহ বুরহানুদ্দীন খাওয়ারিযমী আল-মুতার্‌রাযী, *আল-মাগরিব ফী তারতিবিল মুরাব*, ১ম খণ্ড (দামেস্কঃ লেবানন, দারুর কিতাবুল আরাবী তা.বি.), পৃ. ১৮৮; *আত-তারিফাতুল ফিক্বহিয়্যাহ*, পৃ. ১০৪।

২০. আইউব বিন মুসা আল-হুসাইনী আল-ক্বারীমী আল-কুফী আল-হানাফী, *আল-কুল্লিয়্যাত মুজাম ফীল মুস্তলাহাত ওয়াল ফুরুকুল লাগবিয়্যাহ* (বৈরূতঃ লেবানন, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তা.বি.), পৃ. ৪৭২।

২১. الرزق : كل ما يؤكل و يلبس و يستعمل দ্র. ড. আহমাদ শিরবাস্বী, *আল-মু'জামুল ইকদেসাদী আল-ইসলামী* (বৈরূতঃ লেবানন, দারুল জায়েল, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৯২।

২২ ড. আব্দুল কারীম যায়দান, *আস-সুনানুল ইলাহিয়্যাহ ফীল ইসমে ওয়াল জামা'আতে ওয়াল আফরাদে ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* (বৈরূতঃ লেবানন, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি.১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৬৪।

২৩ সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ৫ম পুনর্মুদ্রণ ২০০৩), পৃ. ১৭০।

২৪. A Dictionary of Modern Written Arabic, p.825; Dr. ROHI BAALABAKI, *AL-MAWRID A MODERN ARABIC-ENGLISH DICTIONARY*, p. 893; *STUDENT`S ARABIC-ENGLISH DICTIONARY*, p. 525

২৫ *N.S.DONIACH, THE OXFORD ENGLISH-ARABIC DICTIONARY*, p. 368

২৬ *DICTIONARY OF ISLAMIC TERMS*, P.448.

২৭. *আল-কাফী*, পৃ. ১১২।

২৮. *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, পৃ. ৮৩০; ড. মারযূক আল উমরী, *নাযরিয়াতুল কাস্‌ব ইনদাল 'আশায়িরাহ* (বৈরূতঃ লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৪৮।

আর-রা'য়েদ অভিধান প্রণেতা বলেন, الكسب শব্দটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- (ক) الشيء: جمعه 'কোন জিনিস একত্রিত করা' (খ) مالا و علما: طلبه و ربحه 'সম্পদ বা জ্ঞান অনুসন্ধান করা ও লাভবান হওয়া' (গ) لأهله: طلب المعيشة لهم'পরিবারের জন্য জীবনাপকরণ সন্ধান করা' (ঘ) علما أو مالا: أناله إياه 'জ্ঞান বা সম্পদ অর্জন করা' (ঙ) الإثم: تحمله 'পাপ বহন করা। দ্র. *রার-রা'য়েদ*, পৃ. ৭৩৭।

ইব্‌নে মানযূর বলেন, الكَسْبُ : طَلَبُ الرِّزْقِ ، وأَصلُه : الجمع 'জীবিক অনুসন্ধান যার মূল অর্থই হল একত্রিত করা।'
দ্র. *লিসানুল আরাব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭০; *মুখতারুস সিহাহ*, পৃ. ২৬৯;

২৯ তাজুল উরূস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১২; *সুনান ইবনে মাজাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯।

৩০. *মুসনাদে আহমাদ*, ১৪ শ খণ্ড, পৃ. ৫২৬, হাদীস নং ৮৯৬৯।

৩১. *তাজুল উরুস মিন জাওয়াহিরুল ক্বামুস*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

৩২ *আন-নিহায়া ফী গারীবুল হাদীস ওয়াল আসার*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭১।

৩৩ ড. আহমাদ শিরবাস্বী, *আল-মুজামুল ইকতেসাদী ওয়াল ইসলামী* (বৈরূতঃ লেবানন, দারুল জাবাল, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হি.), পৃ.৩৮৩।

আত-তা'রিফাতুল ফিকহিয়্যাহ প্রণেতা বলেন, الكَسب: هو الفعل المُفْضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر 'কাস্‌ব' এমন এক কর্মকে বলে যা কোন কল্যাণকর কিছু উপার্জন করতে অথবা কোন অকল্যাণ ও ক্ষতিকে প্রতিহত করতে সহায়তা করে। দ্র. *আত-তারিফাতুল ফিক্বহিয়্যাহ*, পৃ. ১৮২; *আত-তাওক্বীফ আলা মুহিম্মাতিত তাআরিফ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮১; *মু'জামুল মুস্তলাহাতিল মালিয়্যাহ ওয়াল ইকতিসাদিয়্যাহ ফী লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৩৭৯।

ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী, বলেন, 'কাস্‌ব' হলো মানুষ সৌভাগ্যের অংশ বিশেষ ও কল্যাণকর কিছু সঞ্চয়, সংগ্রহ ও উপার্জনে যে অনুসন্ধান ও প্রয়াস চালায়। যেমন অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা। দ্র. *আল-মুফরাদাত ফী গারিবিল কুরআন*, পৃ. ৭০৯।

৩৪. মুহাম্মাদ ইব্‌নে হাসান আশ-শায়বানী, *আল-কাস্‌ব* (বৈরূতঃ লেবানন, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ.৩২।

৩৫ ওয়াউদ্দীন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দামাহ ইবনে খালদুন* (বৈরূতঃ দিমাশক, দারু ইয়া'রাব, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৮০।

৩৬ সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:১৭।

৩৭. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী, *আল-মু'জামুল মুফাহ্‌রাস লিল আলফাযিল কুরআনিল কারীম* (আল-কাহিরাহ, দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩৮২-৩৮৪; ড. মুহাম্মাদ যাকী মুহাম্মাদ খিযর, *মু'জামু কালিমাতুল কুরআনিল কারীম*, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), ১২শ খণ্ড, পৃ. ০৮; www.al-mishkat.com.words
সূরা আল-মায়িদা, ৮৮; সূরা আল-আনআম, ১৪২, ১৫১; সূরা আল-আরাফ, ৫০, ১৬০; সূরা আন-নাহাল, ১১৪, ৭১, ৭৫, ৫৬; সূরা আর-রূম, ৪০, ২৮; সূরা ইয়াসীন, ৪৭; সূরা আল-আনফাল, ২৬, ৩; সূরা গাফের, ৬৪; সূরা আয-যারিআত, ২২; সূরা আল-ওয়াক্বিআহ, ৮২; সূরা আল-হাজ্জ, ২৮, ৩৪, ৫৮, ৩৫; সূরা আন-নিসা, ৩৯; সূরা আল-আনআম, ১৪০; সূরা মারইয়াম, ৬২; সূরা আল-বাকারা, ৫৭, ১৭২, ২৫৪, ৩; সূরা ত্বহা, ৮১, ১৩২; সূরা আল-মুনাফিকুন, ১০; সূরা হুদ, ৮৮; সূরা আলে ইমরাম, ২৭; সূরা বানী ইসরাঈল, ৩১; সূরা আত-ত্বলাক, ৩; সূরা আর-র'আদ, ২২; সূরা আল-ক্বসাস, ৫৪; সূরা আস-সাজদাহ, ১৬; সূরা আল-ফাতির, ২৯ প্রভৃতি।

৩৮. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৮৮।

৩৯. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২:৬০।

৪০. আব্দুল আযীয, *কুমূসুল কুরআন বা ইসলাহুল উযূহ ওয়ান নাযায়ের ফীল কুরআনিল কারীম* (বৈরূত: লেবানন, দারুল ইলম লিলমালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ.২০২।

৪১. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২:৩; *আইসারুত তাফাসীর* ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭; *আইসারুত তাফাসীর লিয যাযায়িরী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯; আবূ আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, *আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: দারু আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৭।

৪২. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২:২৫।

৪৩. সূরা আল-বাক্বারাহ, ৫১:২২।

৪৪. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২:২৩৩।

৪৫. সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৯।

৪৬. সূরা ত্ব-হা, ২০:১৩১।

৪৭. মুহীউস সুন্নাহ আবূ মুহাম্মাদ আল হুসাইন বিন মাসউদ আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড (রিয়াদ, দারুত তইয়্যিবাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩০৩।

৪৮. সূরা আল-আহযাব, ৫৬:৮২।

৪৯. সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৭।

৫০. সূরা মারইয়াম, ১৯:৬২।

৫১. ড.মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল-কারনী, *আল-ক্বযা ওয়াল ক্বদর ইনদাল মুসলিমীন* (বৈরূত: লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১০০।

৫২. *নাযরিয়াতুল কাস্‌ব ইনদাল 'আশায়িরাহ*, পৃ. ৪৭।

৫৩. সূরা আল-বাকারা, ২:২৬৭।

৫৪. সূরা আল-বাকারা, ২:৮১।

৫৫. সূরা আত-তূর, ৫২:২১।

৫৬. আবূ নসর ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ, *কাস্‌বুল হালাল আমালুল আবত্বল* (যিমার: ইয়ামান, মারকায দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ৬১।

৫৭. ইসলামী শরী'আয় তাকলীফ হলো, বান্দার উপর শরী'আতের আদেশ ও নিষেধজ্ঞাপক বিধানাবলী। ড. আব্দুল কারীম ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ আন্ নামলাহ, *ইতহাফু যাবীল বাসায়ির বিশারহি রওযাতুন নাযের ফী উসূলিল ফিকহ*, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: সৌদিআরব, দারুল আসিমাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১০৯। التكليف فى الشريعة: الخطاب بأمر أو نهى

৫৮. উসূলে ফিকহের উলামাবৃন্দ বলেন, ওয়াজিব হলো যে বিধান পালনে সওয়াব রয়েছে ও যা বর্জনে গুনাহ রয়েছে। যেমন যাকাত, সিয়াম ও সালাত ইত্যাদি বিধান পালন করা ওয়াজিব। الواجب فقال بعض علمائنا هو الذي في فعله ثواب وفي تركه عقاب (কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী আল-মু'আফিরী আল-মালেকী, আল-মাহসূল লি ইবনিল আরাবী, ১ম খণ্ড (আরদান, দারুল বায়ারেক, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২২।)

৫৯. যে বিধান পালন ও বর্জন উভয়টি সমান। দ্র. *আল-মাহসূল লি ইবনিল আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২। المباح هو الذي يستوي تركه وفعله

৬০. যে বিধান বর্জনে সওয়াব কিন্তু তা পালনে কোন সওয়াব নেই। যেমন, অপছন্দ সময়ে নামায পড়া। দ্র. *আল-মাহসূল লি ইবনিল আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২। المكروه هو الذي في تركه ثواب وليس في فعله عقاب

৬১. যে বিধান বর্জনে সওয়াব কিন্তু তা পালনে পাপ। যেমন, অপচয় করা, চুরি করা, জবর দখল করা, ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা। *আল-মাহসূল লি ইবনিল আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২; আব্দুল মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ আল-জুআইনী , *আল-ওরাকাত*, ১ম খণ্ড. পৃ. ৮। هو الذي في فعله عقاب وفي تركه ثواب

৬২. *আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কূয়িতিয়্যাহ*, ৩৪শ খণ্ড (মিসর: দারুস স্বফওয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪-১৪২৭ হি.), পৃ. ২৩৫; *আল-কাস্ব*, পৃ, ৩২।

৬৩. *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২, হাদীস নং ২২০২।

৬৪. মুহাম্মাদ ইবনে বুয়াইর আলী বুরকালী, *আল-বুরাইকাতুল মাহমুদীয়্যাহ* (বৈরূত: লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৬৮; *ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯, *আল-কাস্ব*, পৃ. ৫৮।

৬৫. *সহীহুল বুখারী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৩, হাদীস নং ৫৩৫৭।

৬৬ *মু'জামুত ত্বাবারানী আল-কাবীর*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২৪০, হাদীস নং ১০২৫। أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا -

৬৭. *ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯, *আল-কাস্ব*, পৃ. ৬০।

৬৮. *ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯; *আল-কাস্ব*, পৃ. ৬০; *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ লি ইবনিল মুফলিহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮।

৬৯. *ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯; *মাতালিবু আওলান নুহা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪২।

৭০. প্রফেসর ড. মুক্তাদির হামদান আব্দুল মাজীদ, *মাশরূ'ইয়্যাতুল কাস্ব* (বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১।

৭১. সূরা আন-নাবা, ৭৮:১১।

৭২ *তাফসীরে রাযী*, ৩১শ খণ্ড, পৃ. ১০। أَنَّ الْخَلْقَ إِنَّمَا يُمْكِنُهُمُ التَّقَلُّبُ فِي حَوَائِجِهِمْ وَمَكَاسِبِهِمْ فِي النَّهَارِ لَا في الليل.

৭৩ সূরা আল-জুমু'আ, ৬২:১০।

৭৪. *তাফসীরে ত্বাবারী*, ২৩ শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।
তাফসীরে বাগাবী প্রণেতা বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়। অর্থাৎ যখন নামায সমাপ্ত করবে, তখন তোমরা তোমাদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য জমিনে ব্যবসা ও কর্মে নিয়োজিত হও। তোমরা আল্লাহর দেওয়া জীবিকা অনুসন্ধান কর। আর এটা একটি বৈধ ও অনুমোদিত বিধান।' *তাফসীরে বাগাবী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৩; *আল-ওয়াজীয লিল ওয়াহিদী*, পৃ. ১০৯৬; *তাফসীরে বায়যাবী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২; *তাফসীরে কুরতুবী*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ১০৮; *তাফসীরে সা'দী*, পৃ. ৮৬৩; *আয়সারুত তাফাসীর লিয জাযায়িরী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫০; *আত্ তাফসীরুল মুয়াস্সার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৪; *সফওয়াতুত তাফাসীর*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

৭৫ সূরা আল-আরাফ, ৭:১০।

৭৬ *আয়সারুত তাফাসীর লিয জাযায়িরী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪; *তাফসীরে কুরতুবী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

৭৭ *তাফসীরে কুরতুবী*, ১৮ শ খণ্ড, পৃ. ২১৫; *ফাতহুর রহমান ফী তাফসীরুল কুরআন*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

৭৮. ইমাম মুহাম্মাদ '*আল-কাস্ব*' পৃ. ৩২।

৭৯ শামসুদ্দীন আস্ সারাখাসী, *আল-মাবসূত্ব*, ৩০শ খণ্ড (বৈরূত: লেবানন, দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৪৩৬; ইতহাফুস সাদাহ আল-মুতক্বীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, হাদীস নং ২৭৮১, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৯২৩১, কাশফুল খফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯, দাইলামী, *আল-ফিরদাউস বি মা'সূরিল খিতাব*, ৩৯১৮; আনাস বিন মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, হালাল জীবিকা উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। *মু'জামুল আওসাত*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭২, হাদীস নং ৮৬১০।

৮০. *তাবারানী*, *আল-মু'জামুল কাবীর*, ১০ম খন্ড, পৃ. ৭৪, *বাইহাকী*, *সুনানুল কুবরা* ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২৮পৃ.; আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, হালাল জীবিকা উপার্জন করা ফরয বিধান পালনের পর এটা একটি ফরয। *মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৭*, হাদীস নং ২৭৮১, সানাদ যঈফ।

৮১. শায়খ ড. মুহাম্মাদ স্বদক্বী ইবনে আহমাদ আল-বুরনূ আবূল হারেছ আল-গাযযী, *মাওসূআতুল কাওয়াঈদুল ফিকহিয়্যাহ*, ৫ম খণ্ড (দারু ইবনে হিযাম, তা.বি.), পৃ. ৩০৮।

৮২ *তাবারানী*, *আল-মু'জামুল আওসাত; জীবিকার খোঁজে*, পৃ. ২৩।

৮৩ ইমাম মুহীউদ্দীন আন-নববী (রহ), *রাওযাতুত ত্বালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৪২৫।

৮৪. শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ), *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, ২৮শ খণ্ড (মদীনা মুনাওয়ারাহ: সৌদিআরব, *মাজমাউল মুলক ফাহাদ লি ত্বাবাআতিল মাসহাফিশ শারীফ*, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭৯-৮০।

৮৫ *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, ২৯শ খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

৮৬ *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩, হাদীস নং ১৯৬৮।

৮৭. *আল-মাবসূত লিস সারাখাসী*, ৩০ শ খণ্ড, পৃ. ২৫৬।
৮৮. সূরা আত-তৃলাক, ৬৫:৬।
৮৯. *সূনান আবূ দাউদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮, হাদীস নং ১৬৯২; *মুসনাদু আহমাদ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৬, হাদীস নং ৬৪৯৫।
৯০. *সূনান আবূ দাউদ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭, হাদীস নং ৩৫৬৫।
৯১. *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮, হাদীস নং ৫৯৭২।
৯২. উমার আহমাদ আব্দুহু আল-মাকদুমী, *আল-কাস্ব ওয়াল ইনফাক* (সুদানঃ জামি'আতুল কুরআনিল কারীম ওয়াল উলূমীল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৬ হি./২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৪।
৯৩. *আল-কাস্ব ওয়াল ইনফাক*, পৃ. ১৪।
৯৪. *আল-মুগনী লি ইবনি কুদামাহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
৯৫. মানসুর ইবনে ইউনুস ইবনে সালাহুদ্দীন ইবনে হাসান ইবনে ইদরীস আল-বুহুতী আল-হাম্বলী, *কাশ্‌শাফুল কেনা' 'আন মাতনিল ইক্বনা'*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২১৪।
৯৬. সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৭৫।
৯৭. *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ২২৩৬।
৯৮. সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭:৭০।
৯৯. ইমাম কুরতুবী (রহ), *জামিউল আহকাম লিল কুরতুবী*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩-৩৯৬।
১০০. *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩, হাদীস নং ১৪৭১।
১০১. *সহীহুল বুখারী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৩, হাদীস নং ৫৩৫৫।
১০২. আবূল লাইস নাসর বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সামারকান্দী, তাহক্বীক্ব-তা'লিক্বঃ ইউসুফ আলী বাদাইবী, *তাম্বীহুল গাফীলিন বি আহাদীসু সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন* (বৈরূতঃ দিমাশক, দারু ইবনু কাসীর, ৩য় সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৫৩৭।
১০৩. *সুনান ইবনে মাজাহ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫, হাদীস নং ৪১০২।
১০৪. *মুসনাদু আহমাদ*, ২৯শ খণ্ড, পৃ. ১৬, হাদীস নং ১৭৭৬৩। نعم المال الصالح للرجل الصالح
১০৫. আবূ বাকার আহমাদ আল-বাইহাক্বী, *শুআবুল ঈমান*, ৭ম খণ্ড (রিয়াদঃ সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ লিন নাশার ওয়াত তাওযী', ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫০৫, হাদীস নং ৫৩৭৫।
১০৬. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৮, হাদীস নং ২৭৮৭।
১০৭. আবূ আব্দুল্লাহ আন-নিসাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৪১, হাদীস নং৭১৬৩।
১০৮. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪১, হাদীস নং৭১৬২।
১০৯. *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন লিল হাকিম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৮, হাদীস নং৭০
১১০. *জামে আত্ তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬১, হাদীস নং ২৯৬৯।
১১১. সূরা আল মু'মিনূন, ২৩ : ৫১।
১১২. সূরা আল বাক্বারাহ্‌, ২ : ১৭২।
১১৩. *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৩, হাদীস নং২২৩৬।
১১৪. ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, *হালাল জীবিকার্জনের গুরুত্ব* (রাজশাহীঃ বাংলাদেশ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৮ হি./২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১১।
১১৫. *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫, হাদীস নং ২০৫৯।
১১৬. সূরা আল-মায়িদা, ৫:১০০।
১১৭. সূরা আল-বাক্বারাহ, ২:১৬৮।
১১৮. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৮৮।
১১৯. *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০, হাদীস নং ৫২।
১২০. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ তুওয়াজারী (রহ), *মাওসূআতুল ফিকহুল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড (সৌদিআরবঃ বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৬৭।
১২১. সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫।
১২২. সূরা আন-নিসা, ৪:২৯।
১২৩. *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮, হাদীস নং ২০৭৯।
১২৪. *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ২০৭৫।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

বিশ্বজগৎ ও মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে ইকবালের চিন্তা-দর্শন

ড. রিজওয়ানা ইসলাম শাম্মী*

Abstract: Allamah Iqbal was a famous Persian and Urdu poet, scholar, thinker and philosopher of the Indian sub-continent in the 19th and 20th centuries. Dr Mohammad Iqbal attempted to rouse the Muslims to a new sense of their destiny. Iqbal was born on 9th November in 1877 at Sialkot in Pakistan. He was educated at Government College in Lahore. He lived in Europe from 1905 to 1908 to earn his degree in philosophy from Cambridge University. Iqbal also qualified as a Barrister in London and received a doctorate degree from the University of Munich. After a long period of ill health Iqbal died on 21 April in 1938 and was buried in front of the great Badshahi Mosque in Lahore. Dr. Mohammad Iqbal wrote many books in Persian, Urdu and English, like *Payame Mashriq, Javid Nameh, Asrare khudi, Ramuje bekhudi, Jabure Ajam, Musafire, Banggedara, Balezibril, Jarbe kalim, Ilmul Iqtisad, The Development of Metaphysics in Persia and The Reconstruction of Religious Thought in Islam.* His *Payame Mashriq* written in response to Goethe's *West-Ostriches Divan* affirmed universal validity of Islam. *Javid Nameh* is considered to be Iqbal's master piece. Its theme, reminiscent of *Dante's Divine Comedy*, shows the ascent of the poet. It is his poems which made him known throughout the world. Iqbal's philosophical position was articulated in *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Philosophy regarding the creation of the world and man is a very important theme in Iqbal's poetry; so I have discussed it in the light of Islam in this article.

ভূমিকা

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল উনবিংশ ও বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও কবি হিসেবে পাক-ভারতসহ সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইকবালের নাম আজ মানব ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বরং সারা দুনিয়ায় কবি-দার্শনিক ও চিন্তা-নায়কদের মধ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক মহত্বের দাবীদার। যে সময় বিশ্বের মুসলমানদের পতনের লক্ষণ ও নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, ঠিক সে সময় ইকবালের আবির্ভাব হয়েছিল। ড. মুহাম্মদ ইকবাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোর্টে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ সালের ২১ শে এপ্রিল সকাল পাঁচটায় লাহোরস্থ জাভেদ মঞ্জিলে ইন্তেকাল করেন। স্থানীয় বাদশাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ইকবাল নিজের প্রজ্ঞা ও দর্শনের সাহায্যে স্বদেশবাসীর সামনে মুক্তির পথ বাতলিয়ে দেন এবং তাদের মৃতপ্রায় অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলেন। তিনি জাতির ভবিষ্যৎ চলার পথের দিক নির্দেশ করেন। ড. ইকবাল ছিলেন একজন মুসলিম দার্শনিক। তাঁর চিন্তা-দর্শনে মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যে, তিনি আলোচনা করেননি। বিশেষ করে মুসলিমদের ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইকবাল বিচরণ করেছেন। ইকবালের চিন্তা-দর্শনের একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় হচ্ছে- বিশ্ব জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

বিশ্বজগৎ সৃষ্টি সর্ম্পকে ইকবালের চিন্তা-দর্শন

ড.মুহাম্মদ ইকবালের মতে, আল্লাহ বিশ্বজগতের শ্রষ্টা। মানব জাতি সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির গোটা ব্যবস্থাপনাই স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আর-রাহমানে বলা হয়েছে- الشمس والقمر بحسبان অর্থাৎ -'চন্দ্র-সূর্য নিয়মানুযায়ী তার গতিতে চলতে থাকে।' আল্লাহ মানুষের জন্য ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। নভোমণ্ডলের সৃষ্টিসমূহের মধ্যে

---

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশেষ করে চন্দ্র-সূর্য রয়েছে। আর এগুলো আল্লাহর নিয়মানুযায়ী চলতে থাকে। সুফি কবিদের মতে এমনি বিশ্বজগতের গোটা ব্যবস্থাপনাই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে 'কুন' শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তিনি বিশ্বজগতের সবকিছুই পর্যায়ক্রমে একটি অপরটির চাহিদানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টি রহস্যের মূলে রয়েছে স্রষ্টার অসীম হেকমত বা কৌশল। যেমনটি আল্লাহ ' কুন' শব্দ বললেই আদমকে (আ.) সৃষ্টি করতে পারতেন; কিন্তু তিনি আল্লাহ সেটি না করে আদমকে আগুন, পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ পৃথিবীকে আস্তে আস্তে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা আল আরাফে আল্লাহ বলেছেন-

انّ ربكم الله الّذى خلق السّموت والارض فى ستّة ايّم [১]

অর্থাৎ-' নিঃসন্দেহে তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।'

এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্ব প্রেমিক কবি রুমি বলেছেন:

یک گوهری چو بیضا جوشید و گشت دریا کف کرد و کف زمین شد و ز دود او سما شد[২]

'পরম দ্রব্য একটি ডিমের মত উদ্দিপ্ত হয়ে উঠে, একটি সমুদ্রে পরিণত হয়। তা হ'তে ফেনার উৎপত্তি হয়, ফেনা হ'তে পৃথিবীর উৎপত্তি হয় এবং উহার ধুঁয়া হতে আসমান সমূহ সৃষ্টি হয়েছে।'

রুমির মতে, পৃথিবী তথা বিশ্বজগৎ আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তিনি ছয় দিনে সাতটি স্তরে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। অপর দিকে দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, পৃথিবী চিরন্তন। আসলে আল্লাহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা রূপে পৃথিবীতে দেহ, প্রাণ ও গতি সঞ্চার করেছেন। দার্শনিক ইকবালের ভাষায়:

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائی کن فیکون[৩]

'এ বিশ্বজগত হয়তো এখনো রয়েছে অসমাপ্ত,
তাই এখনো শোনা যায়-কুন ফাইয়াকুন্' এর ধ্বনি; আর জন্ম লাভ করে তা।'[৪]

ইকবাল আরও বলেন:

جهان اور بهى هيں ابهى هے نمود كه خالى نهيں هے ضمير وجود [৫]

এ জগতের অনেক কিছু এখনো রয়েছে অপ্রকাশিত
অস্তিত্বের মন শূণ্য নয়, তাতে রয়েছে সৃষ্টির অনেক কল্পনা।

ঁজার্মান দার্শনিক নিটশের (জন্ম ১৮৪৪- মৃ.১৯০০ খ্রি.) মতে পৃথিবী তার উষালগ্ন থেকেই পরিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং সদা সর্বদা এর রূপের পুনরাবৃত্তি ঘটছে; এই প্রক্রিয়ার শেষ নেই।[৬] ইকবাল তা মনে করেন না, কেননা পবিত্র কুরআনের মতে এ জগত অসম্পূর্ণ ও গতিশীল এবং তা প্রতি নিয়ত নতুন নতুন রূপে পরিগ্রহ করছে। যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

اذا قضى امرا قائما يقول له كن فيكون .[৭]

অর্থাৎ-'যখন আল্লাহ কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন বলেন,' হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়।'

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: يسئله من فى السموت والارض ۀ كلُّ يوم هو فى شانٍ [৮]
'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোনোনা কোনো কাজে রত আছেন।'[৯] আর্থাৎ- তিনি আল্লাহ কোনোনা কোনো সৃষ্টি কাজে নিয়োজিত থাকেন।' সৃষ্টি এবং গড়ার মাধ্যমে এ পৃথিবীকে পরিপূর্ণতা দানের দায়িত্ব মানুষের। মানুষ বিশেষ প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীকে পূর্ণতা দান করবে। ইকবাল বলেন:

گمان مبر که بپایان رسید کار مغان هزار باده نا خورده در رگ تا ک است[১০]

'পীরের (গুরুর) কাজ শেষ হয়ে গেছে এমনটি ভেবো না,
স্বাদ নেয়া হয়নি এমন হাজারো আঙ্গুরের শরাব এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।'

তোমরা এমনটা মনে করো না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করেছেন। এখনো তোমাদের জীবনের বহু অজানা জিনিস সামনে রয়েগেছে। ইকবালের ভাষায়:

چشم بگشای اگر چشم تو صاحب نظر است　　زندگی در پی تعمیر جهان دگر است[১১]

'তোমার চোখ খুলো যদি তুমি চক্ষুষ্মান হয়ে থাকো
অন্য আরেকটি জগত বিনির্মাণের নামই হলো জীবন।'[১২]

এই বিশ্বের অপূর্ণ অসমাপ্ত সত্তা অগ্রসর হচ্ছে অব্যাহত ভাবে ক্রমবর্ধন ও ক্রমপ্রসারণের পথে এবং মানবকে দান করেছে মুক্ত স্বাধীন সৃষ্টিধর্মী কর্মতৎপরতার শক্তি; যা দ্বারা এক দিকে সে জয় করেছে প্রকৃতির বিশ্বকে এবং অপর দিকে পরিপূর্ণতায় আনয়ন করেছে তার ব্যক্তিত্বের ক্ষমতাকে। বিশ্বজগৎ ছিল বিশৃংখলাপূর্ণ, কঠোর এবং বন্যপশু ও দুর্দমনীয় প্রাকৃতিক শক্তির অধীন। মানুষই তার ভিতরে এনেছে শৃংখলা ও সৌন্দর্য । এমনকি স্বীকৃতির সীমানার বাইরে মানুষ সৃষ্টির উন্নতি বিধানের দাবী করছে। ইকবাল মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ নিয়ে *পায়ামে মাশরিক* কাব্যে মানুষ ও খোদার মধ্যে আমাদের কথোপকথোন (محاوره ما بین خدا و انسان) শিরোনামে একটি কবিতা রচনা করেছেন। কবিতাটি এখানে তুলে ধরা হলো-

خدا

جهان را ز یک آب و گل آفریدم　　تو ایران و تا تار و زنگ آفریدی
من از خاک پولاد ناب آفریدم　　تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی
تبر آفریدی نهال چمن را　　قفس ساختی طائر نغمه زن را

انسان

تو شب آفریدی چراغ آفریدم　　سفال آفریدی اياغ آفریدم
بیابان و کهسار و راغ آفریدی　　خیابان و گلزار و باغ آفریدم
من آنم که از سنگ آئینه سازم　　من آنم که از زهر نوشینه سازم [১৩]

খোদা

আমি (খোদা) পৃথিবীকে মাটি ও পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছি,
তোমরা (মানুষ) ইরান, তাতার ও ঘন্টা তৈরি করেছো,
আমি (খোদা) মাটি দিয়ে খাঁটি ইস্পাত সৃষ্টি করেছি,
তোমরা (মানুষ) তলোয়ার, ধনুক ও বন্ধুক তৈরি করেছো,
তোমরা (মানুষ) মাঠের গাছ কাটার জন্য কুড়াল তৈরি করেছো,
তোমরা (মানুষ) সুমিষ্ট গানের পাখিকে বন্ধী করার খাঁচা তৈরি করেছো।

মানুষ

তুমি (খোদা) সৃষ্টি করেছো রাত্রি, আর আমি (মানুষ) তৈরি করেছি প্রদীপ
তুমি (খোদা) সৃষ্টি করেছো মাটি, আর আমি (মানুষ) তৈরি করেছি মাটির পাত্র
তুমি (খোদা) সৃষ্টি করেছো মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত ও বন- জঙ্গল,
আর আমি (মানুষ) তৈরি করেছি রাস্তা-ঘাট, বাগ- বাগিচা ও ফুল বাগান
আমিই তৈরি করি পাথর থেকে আয়না
আমিই তৈরি করি বিষ থেকে পানিয় দ্রব্য।

ইকবালের এ কবিতার মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট জিনিস ব্যতিত কিছুই তৈরি করতে পারে না। কেননা আমরা যদি দেখি মানুষ মাটি দিয়ে পাত্র তৈরি করেছে, মূলতঃ মাটি আল্লাহর সৃষ্টি, আর মাটি না হলে মাটির পাত্র মানুষ কি করে তৈরি করতো! অনুরূপভাবে অন্যান্য বস্তুও তৈরি করা মানুষের সম্ভব নয়। শুধু মাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ব্যবহার করেই কেবল মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু থেকে নতুন নতুন জিনিসপত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ইকবাল এ কথাই উপোরোক্ত কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

ইকবাল কাব্যের মূল সুর হচ্ছে , মানুষকে এক বিশেষ জীবনাদর্শ ও সৃষ্টির উল্লাসে অনুপ্রাণিত করা; নতুন রূপে জগৎকে সাজিয়ে তোলা। মানুষকে পূর্ণ বিকশিত মানুষে পরিণত করার প্রেরণা ও দিকনির্দেশনা তাঁর কাব্যের পরতে পরতে পরিলক্ষিত হয়। ইকবাল কাব্যে রয়েছে মানব জীবনের রহস্য উদঘাটন এবং প্রকৃতির ওপর বিজয় অর্জনের উৎসাহ প্রদান। মানুষ নিজের থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বরং মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর সৃষ্টবস্তুতে সংযোজন-বিয়োজন ঘটাতে ও আরও উন্নত আকারে তা উপস্থাপন করতে পারে। ফলে মানুষ যতই কল্যাণকর ও সূক্ষ্মতর জিনিসকে আয়ত্ত করতে থাকে, ততই তার মনে ক্ষণে ক্ষণে আল্লাহর সৃষ্টির ওপর সংযোজনের আশা আকাঙ্খা জাগে। অপূর্ণ বিশ্বের বুকে অতৃপ্ত মানব , এই অপূর্ণতাই যে তার অন্তর্নিহিত সৃষ্টি-প্রতিভার প্রতিবন্ধক, তা উপলব্ধি করতে না পেরে হয়ে ওঠে উত্তেজিত। কবির ভাষায়:

صد جهان می روید از کشت خیال ما چو گل   یک جهان و آن هم از خون تمنا ساختی

طرح نو افگن که ما جدت پسند افتاده ایم   این چه حیرت خانهٔ امروز و فردا ساختی[১৪]

পুষ্পের মতো সুন্দর শতেক পৃথিবী জেগে ওঠে আমার কল্পনা থেকে;
কিন্তু তুমি তো সৃষ্টি করেছো একই বিশ্ব আর তাও নিমজ্জিত আকাঙ্খার শোণিতে (রক্তে),
প্রকাশ করো তুমি সত্তাকে নব নব রূপে, কারণ প্রকৃতি আমাদের কাছে আকাঙ্খা করে নতুন উপস্থাপনা;
কি এই যাদুগৃহ, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্টি করেছো তুমি আমাদের চার পাশে?

মানুষ সৃষ্টি ও তার পরিণাম সম্পর্কে ইকবালের চিন্তা-দর্শন

বিশ্বজগতে মানব সৃষ্টি ও তাদের পরিণাম সম্পর্কে ইকবালের দৃষ্টি ভঙ্গি কি? এর উত্তরে এ কথা বলাই শ্রেয় যে সকল মুসলিম দার্শনিক ও ইসলামে সূফি কবি এবং সাধকগণ মানব সৃষ্টি, তার মর্যাদা ও পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনের আয়াতকে অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাটি ও পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে রূহ বা আত্মা প্রদান করে মানব রূপে পরিণত করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

و اذ قال ربّک للملائکة انّی خالق بشرا مّن صلصال من حمأ مسنون . فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له سجدین . [১৫]

অর্থাৎ-'আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেস্তাদের বললেন, আমি পঁচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুদ্ধ ঠন ঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি একটি মানব জাতির পত্তন করবো। অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নিবো এবং আমার রূহ থেকে ফুঁক দিবো, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।'[১৬]

মানুষের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে সূফি কবি আত্তার বলেছেন-

چون ا دمی در گل دمد آدم کند   و ز کف دودی همه عالم کند

روح را در صورت پاک او نمود   این همه کار از کفی خاک او نمود.[১৭]

'মৃত্তিকার মধ্যে রূহ সঞ্চালনের মাধ্যমে যখন তিনি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন ধোঁয়ার চিহ্ন থেকে সমগ্র বিশ্বজাহান লাভ করে অস্তিত্ব। তার পবিত্র দেহের মাঝে তিনি রূহ সংস্থাপন করেন মৃত্তিকা থেকেই; এভাবে তিনি সকল কিছুকে অস্তিত্বশীল করেন।'

মানব জাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। আর সৃষ্টি জগতের সবকিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তিনি মানুষকে দান করেছেন রূহ বা আত্মা , আকল বা জ্ঞান এবং ওহী ধারণ ক্ষমতা। কেননা

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি মানুষের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়ে থাকে।[১৮] পবিত্র কুরআনে মানুষ সৃষ্টি ও তার মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم . ثم رددناه اسفل سفلین. [১৯]

' আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে।' অর্থাৎ কর্মগুণে কোনো মানুষ হয় মর্যাদাবান আবার কেউ হয় নিকৃষ্ট।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফি কবি রুমি বলেছেন:

آدم احسن و ملک ساجد شده همچو آدم باز معزول آمده [২০]

'আদমকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ফেরেস্তাকুল দ্বারা সেজদা করানো হয়েছে।
আদমকে যেমনি মর্যাদা দেওয়া হয়েছিলো, তেমনি আবার মর্যাদা খর্ব করা হয়েছে।'

উক্ত আয়াত ও রুমির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মানুষ প্রথম দিকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ থাকে। পরবর্তীতে সে কর্মগুণে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হয়ে যায়। মানুষকে যখন সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করা হয়, তখন সে থাকে নিষ্পাপ, কিন্তু আবার কোনো কোনো মানুষ তার অসৎকর্মের ফলে সে হয়ে যায় পাপী বা নিকৃষ্ট। ফলে কেহ সৎকর্মের গুণে হয় জান্নাতী , আবার কেহ অসৎকর্মের ফলে হয় জাহান্নামী। তাই মানুষকে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বলা হয়ে থাকে।

মহাকবি ইকবাল তাঁর পায়ামে মাশরিক (প্রাচের সুসংবাদ) কাব্যে বিশ্বে মানবের আত্মিক বির্বতনের চমকপ্রদ চিত্র তুলে ধরেছেন, তাসখিরে ফিতরাৎ (প্রকৃতি-বিজয়) শীর্ষক কবিতায় মীলাদে আদম (আদমের জন্ম) অধ্যায়ে। তিনি দেখিয়েছেন, কি করে আদম নিষ্ক্রিয় মৃত্তিকা জাত মানুষ, অথচ একাধারে সে সৃষ্টিধর্মী ও গতিবান শক্তির কেন্দ্র। মানুষের কর্ম, উপলদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রেমের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ - সৃষ্টি করে তোলে বিশ্বের শান্ত, সামঞ্জস্য ও স্থায়িত্বের মধ্যে একটা সুদূর প্রসারী পরিণাম সম্পন্ন কোলাহল। কারণ জড় প্রকৃতির নিষ্ক্রিয়তাকে পরাভূত করার ও বিশ্বকে পুনর্গঠন করে মন মতো গড়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে মাটি দিয়ে গড়া মানুষের ভিতরে। ইকবালের ভাষায়-

نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد
فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خود گری خود شکنی خود نگری پیدا شد
خبری رفت ز گردون به شبستان ازل حذر ای پرد گیان پرده دری پیدا شد
آرزو بیخبر از خویش بآغوش حیات چشم وا کرد و جهان دگری پیدا شد [২১]

প্রেম ঘোষণা করলো সত্তার জন্ম, রক্তাক্ত অন্তরে ;
দৃষ্টি ভংগীর ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ সত্তার জন্ম লাভে প্রকম্পিত হলো সৌন্দর্য।
প্রকৃতি ক্লিষ্ট হলো দেখে - অবশেষে জন্ম নিলো এক সত্তা নিষ্ক্রিয় কর্দম থেকে
আত্ম স্রষ্টা, আত্মধ্বংসী , আত্মশ্রদ্ধাবান সৃষ্টি হলো!
উর্ধ্বলোক থেকে ঘোষিত হলো বাণী চিরন্তন কালের নির্জনতায়;
হুঁশিয়ার ওগো অবগুণ্ঠিত যারা, জন্ম লাভ করলো অবশেষে,
অবগুণ্ঠ ছিন্নকারী! আত্ম সচেতন, তন্দ্রাচ্ছন্ন আকাঙ্খা
খুললো তার আঁখি জীবনের কোলে, অগ্নি নতুন বিশ্ব এলো অস্তিত্বে।[২২]

সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা দ্বারা মানুষ তার সকল বাধা-বন্ধনকে পরা ভূত করতে সক্ষম হয়েছে। বিশিষ্ট ফরাসি দার্শনিক বের্গসন (জন্ম ১৮৫৯ খ্রি. - মৃত্যু ১৯৪১খ্রি.) স্পষ্ট যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে, মোটরের কলকবজার ক্রমোন্নতি, ভাষার নতুন নতুন জোরালো গাঁথুনি আর সমাজ জীবনের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি দ্বারা মানুষ স্থান ও কালের উপর জয়ী হয়েছে এবং তার সৃষ্টি-ক্ষমতা অপরিমেয়রূপে বৃদ্ধি করেছে। ইকবাল বলেন:

ز طیاره ما بال و پر ساختیم سوی آسمان رهگزر ساختیم [২৩]

আমরা পাখা ও ডানা বিশিষ্ট বিমান তৈরি করেছি,
আর রচনা করেছি আমাদের পথ আকাশ লোকে।

সক্রিয় সংস্কার ও পরিবর্তনের ধারায় মানুষ হয় আল্লাহরই সহযোগী কর্মী এবং তার চারদিকের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক বিশ্বে আনয়ন করে পরিবর্তনের সূচনা। ইকবাল *জাভিদনামা* কাব্যে নেদায়ে জামাল (সুন্দরের বাণী) নামক কবিতায় মানুষের পরিণতি এবং সৃষ্টি-প্রবণতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে অমর বাণী উচ্চারণ করেছেন। ইকবালের ভাষায়:

زندگی هم فانی و هم باقی است　　این هم خلاقی و مشتاقی است
زنده ئی مشتاق شو خلاق شو　　هم چو ما گیرنده ی آفاق شو
در شکن آنرا که ناید سازگار　　از ضمیر خود دگر عالم بیار
بنده ی آزاد را آید گران　　زیستن اندر جهان دیگران
هرکه او را قوت تخلیق نیست　　پیش ما جز کافرو زندیق نیست
از جمال ما نصیب خود نبرد　　از نخیل زندگانی بر نخورد
مرد حق برنده چون شمشیر باش　　خود جهان خویش را تقدیر باش [২৪]

জীবন-মরন আর অমরত্ব দুই আছে
এই সবই সৃষ্টি-প্রতিভা ও ঔৎসুক্য।
জীবন্ত তুমি, উৎসুক হও, সৃষ্টিধর্মী হও;
আমার মতো সারা জাহান জয় করো।
চূর্ণ-বিচূর্ণ করো যা কিছু প্রতিকূল,
তোমার কল্পনা থেকে আরেক বিশ্ব জন্ম দাও।
স্বাধীন মানুষের কাছে ভারি
অপরের গড়া পৃথিবীতে অবস্থান।
যে হারিয়ে ফেলেছে সৃষ্টি ক্ষমতা,
সে আমাদের কাছে কাফের ও যিন্দিক (অগ্নিউপাসক) ছাড়া কিছুই নয়।
আমার সৌন্দর্য থেকে গ্রহণ করেনি সে তার অংশ,
আহার করেনি সে জীবন বৃক্ষের ফল।
হে সত্য পথিক মানব, হয়ে ওঠো তীক্ষ্ণ ও কর্তনকারী তরবারীর মতো;
হয়ে ওঠো তকদীর তোমার নিজস্ব বিশ্বের।

আল্লামা ইকবালের ইসলামী চিন্তা-দর্শনের মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পবিত্র কালাম ও মহানবীর জীবনাদর্শের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। কেননা পবিত্র কুরআন ও মহানবীর হাদিসের উপর ভিত্তি করেই ইকবালের চিন্তা-দর্শন প্রতিষ্ঠিত। ইকবাল বলেছেন:

گر تو می خواهی مسلمان زیستن　　نیست ممکن جز به قرآن زیستن [২৫]

তুমি যদি মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে চাও,
তবে কুরআন ব্যতীত তা কখনও সম্ভব নয়।

ইকবাল কুরআন ও হাদিসের মর্মবাণীর নিরিখে জাতিকে দিক নির্দেশনা দান করেছেন। আর মুসলিম জাতিকে নতুন পৃথিবী গড়ার তথা নব সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছেন। সৃষ্টির প্রেরণায় মানুষ যখন এগিয়ে চলে, তখনই অনুভব করে সে জীবনের স্পন্দন পলে পলে বা ক্ষণে ক্ষণে, নতুবা সে জড় পদার্থে সামিল হয়ে যায় । যে মানুষ আমানতের বোঝা নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছে, তার পক্ষে এরূপ হীনমন্যতা শোভনীয় নয়। ইকবাল বলেন:

فروغ آدم خاکی تازہ کاری ها ست　　مه و ستاره کنند آنچه پیش از این کردند [২৬]

মানুষের গৌরব তার নতুন নতুন সৃষ্টিতে,
চাঁদ, তারকা তাই করে যা প্রাচীনকাল থেকে করে আসছে।

প্রকৃত মানুষ চায় পরিবর্তন। মানুষ জীবনের একটানা এক ঘেয়েমী থেকে নিষ্কৃতি চায়। নতুনের প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ, অজানাকে জানার জন্য এক দুর্দমনীয় কামনা বাসনা নিয়ে তাকে দুর্গম গিরি কান্তর মরুপথে চালিত করে। নতুন করে নতুনতর সৃষ্টির প্রেরণা তাকে পাগল করে তোলে। ইকবাল দুনিয়ার সৃষ্টি কার্যকে সম্পূর্ণ করার জন্যে মানুষ খোদার দানকৃত জ্ঞানের পথে কাজ করে যাচ্ছে। তার মতে, সৃষ্টি চিরদিনের জন্য হয়ে যায়নি। সৃষ্টির কাজ পৃথিবী জুড়ে অব্যাহত ধারায় প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষ্যে বিচিত্রভাবে সংঘটিত হচ্ছে।

পৃথিবী জুড়ে ইকবালের চোখে ধরা পড়েছে মানুষের দুটি রূপ যথা- প্রাচ্যের মানুষ করেছে প্রতীচ্যের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের বর্ণনা। আর প্রতিচ্যের মানুষ করেছে নিছক ঐশ্বর্যের সাধ্যসাধনা ও আরাধনা। চারদিকে মনুষ মানুষকে করছে প্রতারণা, করছে বঞ্চনা। অথচ পৃথিবীর সর্বত্রই সাম্যের বুলি শুনা যায় সবার কণ্ঠে! এমনই মর্মান্তিক অথচ হাস্যস্পদ অবস্থা মানুষের। মানুষের এ অবস্থা তুলে ধরে কবি বালে জিব্রিল কাব্যে বলেছেন-

وہ کون سا آدم ہئے کہ تو جس کا ہے معبود ؟
وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات ؟
مشرق کے خداوند در سفیدان فرنگی !
مغرب کے خداوند درخشندۂ فلزّات !
یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبّر، یہ حکومت !
پیتئے ہیں لہو، دیتئے ہیں تعلیم مساوات ! [২৭]

(ও কুন ছা আদম হ্যায় কে তু জেসকা হ্যায় মাবুদ,
ও আদম খাকী কে যো হ্যায় যিররে ছামাওয়াত,
মাশরেক কে খোদাওয়ান্দ দর সাফেদান ফিরিঙ্গী,
মাগরেব কে খোদাওয়ান্দ দরাখ্সান্দায়ে ফুলুজাত,
ঈ ইলমে ঈ হিকমত ঈ তদবীর ঈ হুকুমত,
পিতে হ্যায় লহু দিতে হ্যায় তা'লিমে মুছাওয়াত।)[২৮]

অর্থাৎ -' হে খোদা, তুমি যে মানুষের প্রভু, সেই মানুষ কোথায়? আসমানের নীচে যে মাটির মানুষ সেই কি? প্রাচ্যের মানুষের দেবতা শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা, আর পাশ্চাত্যের মানুষের দেবতা ঝকঝকে মুদ্রা, বিদ্যা, বুদ্ধি আর রাজনীতি। সকলেই শোষণ চালায় , অথচ সাম্যের বুলি সবাই মুখে মুখে আওড়ায়।' এ সব অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপ থেকে ইকবাল চেয়েছিলেন মানুষের মুক্তি। খোদা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষ সৃষ্টি করে তাকে খেলাফত দান করেছেন। আর সেই মানুষ পৃথিবীকে করে তুলবে সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং দুনিয়ার সকল প্রকার অসুন্দর, অন্যায় অবিচার, অনাচার , গ্লানি ও মালিন্য থেকে মানুষ তাকে করবে মুক্ত। এই ছিল ইকবালের মানসিক কামনা। ইকবাল মনে করেন , বিশ্বের যেদিকে তাকাইনা কেন , সেদিকেই সংগ্রাম বা সংঘাতই কেবল চোখে পড়ে, বস্তু জগতেই সেই নানা খেলা প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে। সুতরাং মানুষ হয়ে সেই সার্বজনীন নীতির কেন ব্যতিক্রম করবে? এমনটি ইকবাল আশা করেন না। ইকবাল বলেন:

سر این فرمان حق دانی که چیست　　زیستن اندر خطرها زندگی ست [২৯]

খোদার বিধানের রহস্য কী জানো?
দুঃখ সংকটের মধ্যে জীবন যাপন করাই প্রকৃত জীবন।

আল্লাহর খলিফা মানুষ। তার আত্মশক্তিকে (খুদীকে) যখন উন্নত করে গড়ে তুলতে পারবে, তখনই সে হবে প্রকৃত খলিফা এবং খুদী তখনই হবে, যখন সে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। কারণ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্বগুণে গুণান্বিত এবং সকল শক্তি ও সামর্থের উৎস। চন্দ্র যেমন সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়, তেমনি আমরাও সেই মহান খোদার সত্তা থেকে পাই বল, বিক্রম, শক্তি ও সাহস। সেই অপরূপ সত্তাকেই আয়ত্ত করা হবে মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের খুদীকে বিকশিত ও বর্ধিত করতে হলে শুধু আমাদের পরিবেশ ও প্রকৃতিকে জয় করলেই চলবে না, জয় করতে হবে সেই পরম সত্তাকে যার গুণে নিজেদেরকে গুণান্বিত করতে না পারলে আমাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব খর্ব ও ক্ষুদ্র হয়ে থাকবে।

উপসংহার

ইকবাল তার কাব্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তা-ধারা বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে; বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে ইকবালের চিন্তা-দর্শন বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, ইকবাল-দর্শন মুসলমানদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্বে ইকবাল যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং তার সমগ্র কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে, তা যদি আমরা সঠিক ভাবে পালন বা অনুসরণ করতে পারতাম তা হলে বর্তমান কালে আমাদের (মুসলিমদের) সমাজের এতটা অবক্ষয় হতো না। ইকবালের বিশ্বজগৎ ও মানব সৃষ্টি রহস্য যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে পার্থিব জগতকে নিয়ে হয়তো আমরা এত্টা ব্যস্ত হতাম না। ইকবালের চিন্তা-দর্শন থেকে আমাদের তথা বিশ্বজগতের সকল ধর্মের মানুষের শিক্ষা নেওয়া উচিত। তাঁর চিন্তা-দর্শন আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন হলে, হয়তো আমরা পার্থিব নানা বিপর্জয় থেকে মুক্তি পাবো এবং ইহকাল ও পরকালে নাজাতের পথ খুঁজে পাবো ।

তথ্য নির্দেশ

১ আল কুরআন, সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ৫৪।

২ আহম্মদ মোহাম্মদী ও আহমদ মির আল্লায়ি, *এরফানে মৌলভী* (তেহরানঃ চাপখানে ছেপাহার, ৩য় সংস্করণ, ২৫৩৬ রাজতন্ত্র বছর), পৃ. ২৮।

৩ আল্লামা ইকবাল, *বালে জিবরিল* (পাকিস্তানঃ ইকবাল একাডেমি, লাহোর, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৪৪।

৪ তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, *ইকবাল কাব্যে মুসলিম মানষ ও মানবতা* (ঢাকাঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি- ২০১৩), পৃ. ১২০।

৫ আল্লামা ইকবাল, *বালে জিবরিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৬ ড, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ইকবাল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১ম প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ৮৬।

৭ আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৭।

৮ আল কুরআন, সূরা আর-রাহ্মান, আয়াত : ২৯।

৯ মাওলানা মহিউদ্দীন খান (অনূদিত), কোরআনুল করীম (বাংলায় অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), (ঢাকাঃ বাদশাহ ফাহাদের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত), পৃ. ১৩১৮।

১০ খাজা গোলামুস সাঈয়েদাইন, সৈয়দ আব্দুল মান্নান (অনূদিত), *ইকবালের শিক্ষাদর্শন*, (ঢাকাঃ মাহফুজ পাবলিকেশন্স, ১৯৫৮), পৃ. ১০৫।

১১ আহমদ সুরুশ (সম্পাদিত), *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরি (পয়ামে মাশরিক অংশ)*, (ইরানঃ কেতাব খানেয়ে সানায়ি, ৭ম সংস্করণ, ১৩৭৪ হি. শা.), পৃ. ২৬০।

১২ তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, *ইকবাল কাব্যে মুসলিম মানষ ও মানবতা* (ঢাকাঃ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি- ২০১৩), পৃ. ১২১।

১৩ ইকবাল, *পয়ামে মাশরিক* (লাহোরঃ কাশমিরি বাজার, শেখ গোলাম আলী এন্ড সন্স, তা. বি.), পৃ. ১৩২।

১৪ খাজা গোলামুস সাঈয়েদাইন, সৈয়দ আব্দুল মান্নান (অনূদিত), *ইকবালের শিক্ষাদর্শন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭।

১৫ আল-কুরআন, সূরা আল হিজর, আয়াতঃ ২৮-২৯।

১৬মাওলানা মহিউদ্দীন খান (অনূদিত), কোরআনুল করীম (বাংলায় অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), (ঢাকাঃ বাদশাহ ফাহাদের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত), পৃ. ৭২৮।

১৭ ড. মো. রেযা শাফি কাদকানি (সম্পাদিত), *মানতেকুত তায়ের* (তেহরানঃ এনতেশারাতে সোখান, ১৩৮৩ হি. শা.), পৃ. ২৩৩।

১৮ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ৫২২।

১৯ আল কুরআন, সূরা আত্‌তিন, আয়াত : ৪-৫।

২০ মোহাম্মদ এসতে'লামী (সম্পাদিত), *মাসনাভিয়ে মাওলানা জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ বালখি*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (তেহরানঃ এনতেশারাতে যাওয়ার, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৭২ হি. শা.) , পৃ. ৫২।

২১ *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরি* (পয়ামে মাশরিক অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫।

২২ খাজা গোলামুস সাঈয়েদাইন, সৈয়দ আব্দুল মান্নান (অনূদিত), *ইকবালের শিক্ষাদর্শন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯।

২৩ *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরি* (পয়ামে মাশরিক অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১।

২৪ তদেব, (জাভিদনামা অংশ), পৃ. ৩৭৭।

২৫ *কুল্লিয়াতে আশয়ারে ফারসিয়ে মাওলানা ইকবাল লাহোরি* (রমুযে বিখুদী অংশ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

২৬মীর রেজাউর রহমান, *আল্লামা ইকবাল প্রতিভা* (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ২০১০), পৃ. ৬৬।

২৭ ড. মুহাম্মদ ইকবাল, *কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু)*, *বালে জিব্রিল* অংশ, (আলীগরঃ এডুকেশনাল বুক হাউজ, শততম সংস্করণ, ২০০১), পৃ. ৩৯৮।

২৮মীর রেজাউর রহমান, *আল্লামা ইকবাল* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

২৯ তদেব, পৃ. ৭০।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির কাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেম

ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ*

Abstract: Khaza Moinuddin Chisti was a Persian Muslim poet, preacher, ascetic, religious scholar, philosopher, and mystic who eventually ended up settling in the Indian subcontinent in the early 13th-century. He was born in 536 A.H./1141 CE, in Sajistan, Khorasan or Isfahan in Persia. He was died in 1230 CE in India. He also known as Gharib Nawaz, is the most famous Sufi saint of the Chishti Order of South Asia. He was a direct descendent of the Prophet Muhammad. His father was Hussaini and Mother was Hassani. He was one of the most outstanding figures in the annals of Islamic mysticism and founder of the Chistiyya order in India. He visited nearly all the great centers of Muslim culture, and acquainted himself with almost every important trend in Muslim religious life in the middle Ages. Today, hundreds of thousands of people, Muslims, Hindus and others, from the Indian sub-continent assemble to his tomb on the occasion of his death anniversary in Ajmer. Besides preaching, he also contributed to Persian literature. The Diwan of Khaza Moinuddin Chisti is one of his best works in Persian literature. The Diwan is a beacon on the way to spirituality.

ভূমিকা

ফারসি সাহিত্যের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো-প্রেম-ভালোবাসা ও অধ্যাত্মবাদ। মুসলিম বিশ্বে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষতায় ফারসি সাহিত্য বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আধ্যাত্মিক সাধকগণ অদেখা ও অজানার অবগুণ্ঠন উন্মোচনের প্রয়াসে আল্লাহর সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। আর এ সম্পর্কের অন্যতম মিলন সেতু হলো প্রেম, যা মানব জীবনের এক শাশ্বত প্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ। প্রেমের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির যে সূচনা হয়েছিল, আজো সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির বৈচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় পরম সত্তাই প্রেম-প্রকাশের প্রতীক। প্রেম এমন এক শক্তি যার প্রভাবে মানুষ জয় করেছে ভয়কে এবং তুচ্ছ করেছে মৃত্যুকে। মোটকথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থবহ ও আনন্দময় করার জন্য প্রেমের বিকল্প নেই। ফারসি সাহিত্যের যে সকল কবিগণ তাদের কাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেমের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি। ফারসি সাহিত্যে তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যা কী সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর অসংখ্য রচনাবলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির সংক্ষিপ্ত জীবনপরিক্রমা

কবির পূর্ণনাম খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি। উপনাম গরীবে নেওয়াজ। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে জীবনীকারকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মো. মোজাম্মেল হক সফিনাতুল আউলিয়া ও আইনে আকবরি গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি ৫৩৭ হিজরি কামারি/১১৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] এ. কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী সিয়ারুল আকতাব ও খাজিনাতুল আসফিয়া গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি ৫৩৭ হিজরি সনের ১৪ রজব সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।[২] আজো খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির মাযার আজমিরে ১৪ রজব তাঁর জন্ম তারিখ হিসেবে পালন করা হয়। তাঁর জন্মতারিখের ন্যায় তাঁর জন্মস্থান নিয়েও জীবনীকারকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী বলেন, তিনি সঞ্জরের অন্তর্গত সিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।[৪]মো. মোজাম্মেল হক বলেন, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা সিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] তাঁর পিতার নাম সৈয়দ গিয়াসুদ্দিন হাসান চিশতি যিনি ইমাম হুসাইন (রা.) এর বংশধর ছিলেন। অপরদিকে তাঁর মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল ওয়ারা মাহেনুর যিনি ইমাম হাসান (রা.) এর বংশধর ছিলেন। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির পিতা একজন উঁচু মাপের আলেম ও আরেফ ছিলেন। তিনি শৈশবকাল থেকেই স্বীয় পিতার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শুরু করেন এবং অল্প বয়সেই শরিয়ত ও মারেফতের জ্ঞানার্জন করেন। তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে পবিত্র কুরআনের

---

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হাফেজ হন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে পিতা-মাতাকে হারিয়ে এতিম হয়ে পড়েন।[৬] তিনি ৫৫৩ হিজরি কামারি/১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিনজার ত্যাগ করে সমরকন্দ ও বুখারায় চলে যান। সেখানে তিনি ছয় বছর অবস্থানকালে মৌলানা হিসামুদ্দিন ও মৌলানা শারফুদ্দিন এর নিকট ইসলামের সমকালীন শিক্ষার্জন করেন। অতঃপর তিনি বাগদাদে গমন করেন এবং ৫৬০ হিজরি কামারি/১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানির সহচর্য লাভ করেন। এ সময়ে তিনি আব্দুল কাদের জিলানির নিকট হতে রুহানি ফয়েজ লাভ করেন। তারপর তিনি বাগদাদের উপকণ্ঠে নাজমুদ্দিন কোবরার সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁর নিকটেও তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন এবং রুহানী ফয়েজ লাভ করেন। তারপর তিনি শায়খ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দির মুর্শিদ শায়খ জিয়াউদ্দিনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর নিকটেও তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর তিনি খাজা আওহাদউদ্দিন কেরমানির সাথে সাক্ষাত করেন। তারপর তিনি খাজা ইউসুফ হামেদানির নিকট গমন করেন এবং তাঁর নিকটেও বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন এবং রুহানি ফয়েজ লাভ করেন। এরপর তিনি আবু সাঈদ তাবরিজির সাহচর্য লাভ করেন। তারপর তিনি শায়খ মাহমুদ ইস্ফাহানির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইস্ফাহানে গমন করেন এবং সেখানেও কিছুদিন অবস্থান করেন। এভাবে তিনি মারেফত তত্ত্বে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন।[৭] অতঃপর তিনি খোরাশানের নিশাপুরের খাজা উসমান হারুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট পনেরো বছর অতিবাহিত করেন। এ দীর্ঘসময়ে তিনি খাজা উসমান হারুনির নিকট হতে শরিয়ত, তরিকত, মারেফত ও হাকিকতের গভীর জ্ঞানার্জন করেন। তিনি ৫৮০ হিজরি কামারি/১১৮৪ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ সমাপনান্তে হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে প্রথমে তিনি সমরকন্দে উপনীত হন এবং এখানে খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ইস্ফাহান, বাল্‌খ, হিরাত, গজনি, পাঞ্জাব ও লাহোর হয়ে ৫৮১ হিজরি কামারি/১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে উপনীত হন। দিল্লীতে তিনি কিছু সময় অতিবাহিত করে খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে এখানকার খলিফা নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি আজমির অভিমুখে রওয়ানা করেন। তিনি আজমিরে উপনীত হয়ে হিন্দুদের নানাবিধ বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করে ধর্মের বাণী প্রচার করতে থাকেন। এভাবে ধর্মের বাণী প্রচারের ফলে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সূফি সাধকগণ এখানে উপনীত হয়ে ইসলামের শিক্ষা ধারণ করে বিভিন্ন এলাকায় ধর্মের বাণী প্রচার করার জন্য ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। তিনি আনুমানিক ৯৭ বছর বয়সে ৬ রজব ৬৩৩ হিজরি কামারি/১২৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ ভারতের রাজস্থান প্রদেশের আজমিরে মৃত্যুবরণ করেন।[৮] এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মাযার আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ও সর্বসাধারণের জন্য দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এখানে ভীড় জমায়।

ফারসি সাহিত্যে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির অবদান

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি ছিলেন মূলত ধর্ম প্রচারক, আধ্যাত্মিক সাধক ও ফারসি কবি। তবে ফারসি সাহিত্যে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির বিচরণ খুবই স্বল্প পরিসরে। তবে কেউ কেউ বলেন, তাঁর কোন রচনাকর্মই ছিলো না। যদিও তাদের এ বক্তব্য গবেষণায় অসত্য বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ তাঁর অনেকগুলো ফারসি সাহিত্যের অনেক পাণ্ডুলিপি আজো বিদ্যমান। তবে তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সংখ্যা কী পরিমাণ সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর যে সব রচনাবলির উল্লেখ পাওয়া যায় নিম্নে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

দিভানে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি: এ গ্রন্থটি ফারসি সাহিত্যে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনাকর্ম। এটি আধ্যাত্মিকতার পথে একটি আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এতে ১১৮টি গযল, ২টি কাসিদা ও ৫টি রুবাই রয়েছে। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির গযলে আধ্যাত্মিকতার গোপনভেদ মনোমুগ্ধকর আলংকারিক ভাবধারায় প্রকাশ পেয়েছে। এগুলোতে আত্মিক ঔজ্জ্বল্য অর্জন ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের মহান শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে আধ্যাত্মিকতা ও প্রেমের কবি হিসাবে খ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন ও কবি হাফিজ শিরাজি খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির আলংকারিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে কাব্যচর্চা করেছেন। ভারতের হায়দারাবাদের আসেফিয়া লাইব্রেরিতে, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে ও উদয়পুরের নবাব মর্দান আলীর খানের সরকার মাওয়ার লাইব্রেরিতে এর হাতে লেখা পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির এ *দিভানটি* সর্বপ্রথম কুতুবুদ্দিন আহমেদ কর্তৃক লক্ষ্ণৌর নামি প্রেস হতে ১৩০৯ হিজরি কামারি/১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এ ছাপার ৭টি কপি সংরক্ষিত রয়েছে। ১৩২৭ হিজরি কামারি/১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভারতের কানপুরের মাজিদিয়া প্রেস হতে ছাপা হয়। ১৩৫৩ হিজরি কামারি/১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার ভারতের কানপুরের রাজ্জাকি প্রেস হতে ছাপা হয়।[৯]

মকতুবাতে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি: এটি মূলত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির একটি পত্র সংকলন। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি তাঁর খলিফা খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকিকে বিভিন্ন সময়ে উপদেশমূলক যে সাতটি পত্র লিখেছিলেন এটি সে

সকল পত্রাবলির সংকলন যা সন্নিবেশিত করে গ্রন্থে রূপদান করা হয়েছে। প্রথম পত্রে প্রদত্ত উপদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- হে কুতুবুদ্দিন, যদি তাসাউফের মহাজ্ঞানে জ্ঞানী হতে চাও তবে বাহ্যিক সুখ-সম্পদের আশা পরিত্যাগ কর এবং মহাসম্পদশালী চিরশান্তি ও আরামদাতা পরম সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা লাভ করার উদ্দেশ্যে একাগ্র চিত্তে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করো। ২য় পত্রে প্রদত্ত উপদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো, সে দিবারাত্র আল্লাহর এবাদত-বন্দেগিতে ব্যস্ত থেকে সৎ বান্দাদের খাতায় নিজের নাম সন্নিবেশিত করে নেয় এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা পায়। তৃতীয় পত্রে প্রদত্ত উপদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- হে কুতুবুদ্দিন, মনে রেখো, যে ব্যক্তি ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছে সে মারেফত দলভূক্ত হয়েছে এবং সে খোদাতত্ত্ব হাসিল করেছে। চতুর্থ পত্রে প্রদত্ত উপদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- হে কুতুবুদ্দিন, কামাল আনোয়ারে পরিপূর্ণ চক্ষু দ্বারা লক্ষ্য করলে প্রতিটি ধূলি-কণাতেও অনাদি অনন্ত, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রত্যক্ষ নিদর্শন হৃদয়াঙ্গম করতে পারবে। পঞ্চম পত্রে প্রদত্ত উপদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- হে কুতুবুদ্দিন, এলেম (জ্ঞান) একটি বিন্দু যা অর্জন করা সহজ, কিন্তু তার প্রতি আমল করা বড় কঠিন। এ পত্রে খাজা বলখির জন্য হাতেমের আটটি ফয়দা বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ পত্রে প্রদত্ত উপদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- হে কুতুবুদ্দিন, মনে রেখো, কালেমা শাহাদাত, নামাজ, রোজা ইত্যাদির বাহ্যিক অবয়ব আছে এবং এগুলোর বিশেষ হকিকতও আছে। এ হকিকত বাদ দিয়ে জাহেরি অবয়ব নিয়ে লাখো আমল করাও বৃথা। সপ্তম পত্রে প্রদত্ত উপদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- হে কুতুবুদ্দিন, ফকির (আধ্যাত্মিক পথের পথিক) ঐ ব্যক্তি যে প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তারা কোন কিছুর প্রতি খেয়াল রাখে না; এমন কি নিজের চেহারার খেয়াল থাকলে অন্য মকসুদ এসে পড়ে। মানবের এ চেহারা যাবতীয় মাখলুকাতের আয়নাস্বরূপ।[১০] এটি ১৩১০ হিজরি কামারি/১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মুরাদাবাদ হতে প্রথম ছাপা হয়।

আনিসুল আরওয়াহ: এ গ্রন্থটি মুলত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির মুরশিদ নিশাপুরের খাজা উসমান হারুনীর ফারসি ভাষার বিভিন্ন বক্তব্য ও বাণী বিশেষ। মুলত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির স্বীয় মুরশিদ খাজা উসমান হারুনীর আটাশটি মজলিসের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে আটাশটি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত করে এ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ গ্রন্থের দুইটি কপি আজো পাকিস্তানের লাহোরের গাঞ্জ বখ্‌শ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

আসরারে হাকিকি: এটি মূলত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির একটি ফারসি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ বিশেষ। যা তিনি তাঁর খলিফা খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকির জন্য লিখেছিলেন। এতে তিনি ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাওহিদতত্ত্ব বা কালেমা তাইয়্যেবার হকিকতের বর্ণনায় তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে অধ্যাত্মবাদের তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। নামাজের হকিকতের অংশে তিনি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- হুজুরি কাল্‌ব (হৃদয়) ব্যতিত নামাজ সিদ্ধ হয় না। রোজার হকিকতের অংশে তিনি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- দিদারে এলাহি দ্বারা রোজা রাখো এবং দিদারে এলাহি দ্বারা ইফতার করো। যাকাতের হকিকতের অংশে তিনি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- শরিয়ত মোতাবেক দুইশো দিনারের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিনার যাকাত প্রদান করা ফরজ। হজ্জের হকিকতের অংশে তিনি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- মানুষের হৃদয় খানায়ে ক্বাবা এবং মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আসন। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এর ১টি কপি সংরক্ষিত রয়েছে। জিয়াউল আলম মো. ইউসূফ খাঁ এর বাংলা অনূবাদ করে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন।[১১]

গাঞ্জে আসরার: খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির ফারসি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটিতে অধ্যাত্মবাদের তৃতীয় স্তর মারেফতের সুগভীর তত্ত্বের আলোচনা স্থান লাভ করেছে। এছাড়া এতে ইসলামি শরিয়তের বিধানুযায়ী প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পবিত্রতা অর্জন, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ইবাদত এবং অধ্যাত্মবাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের দুইটি কপি আজো পাকিস্তানের লাহোরের গাঞ্জ বখ্‌শ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

রেসালায়ে মুঈনুদ্দিন: খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির ফারসি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটিতে জিকির (আল্লাহর স্মরণ), রিয়াজত (আত্মনিয়ন্ত্রণ) ও চিল্লায় অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের হাতে লেখা একটি কপি পাকিস্তানের লাহোরের গাঞ্জ বখ্‌শ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

আদাবে দামযাদান: এ গ্রন্থের হাতে লেখা একটি কপি ইরানের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

কালেমাতে মুঈনুদ্দিন: এটি খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক গ্রন্থ। এতে ওয়াহদাতুল ওযুদ (সর্ব্বখোদাবাদ), নফি (লা ইলাহা) ওয়া এসবাত (ইল্লাল্লাহ), মাকামে নাসুত (দেহভান্ডে ডুব দেওয়া/দখল

করা) এবং লাহুত ওয়া মালাকুত (কান ও নাকের নিয়ন্ত্রণ) সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে। এ গ্রন্থের একটি কপি পাকিস্তানের লাহোরের গাঞ্জ বখ্‌শ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

রেসালায়ে তাসাওফে মানযুম: এটিও খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক গ্রন্থ। এতে এলমে তাসাওফের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের একটি কপি ভারতের হায়দারাবাদের আসেফিয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।[১২]

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির ফারসি সাহিত্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি মূলত একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তবে তিনি যে একজন বড় মাপের ফারসি সাহিত্যের আধ্যাত্মিক প্রেমের কবিও ছিলেন এ কথাটা হয়ত আজো অনেকের জানার বাইরে রয়ে গেছে। ফারসি সাহিত্যে তার উল্লেখযোগ্য অবদান হলো- *দিভানে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি*। এতে গযল, কাসিদা ও রুবাই এর সমাহার ঘটেছে। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির গযল সমূহে মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের বিশ্লেষণ অতি মনোরমভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক প্রেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপানের নাম ফানা ফিল্লাহ। আধ্যাত্মিক পথে কয়েকটি স্তর অতিক্রম আধ্যাত্মিক সাধককে এ স্তরে উপনীত হতে হয়। এ স্তরে সাধক ধ্যান ও তন্ময়তার মাধ্যমে আত্ম-চেতনাকে মুছে ফেলে আল্লাহর জাতের (Self) অসীম চেতনায় উন্নীত হন এবং তিনি আল্লাহর প্রেমে সমাহিত হন। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির গজলে এ বিয়য়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আধ্যাত্মিক প্রেমের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপানের নাম বাকা বিল্লাহ। ফানা ফিল্লাহ অবস্থায় সাধক যখন স্বীয় অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে তারপরই সে বাকা বিল্লাহ স্তরে উপনীত হয়। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির গজলে এ বিয়য়েও বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। নিজের অস্তিত্বকে 'লা-ইলাহার আগুনে বিনাশ করে দিলেই ইল্লাল্লাহর নুর উদ্ভাসিত হবে। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি তাঁর কাব্যে অতি সুন্দর ও আলঙ্কারিকভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তত্ত্বের প্রকাশ করেছেন। মহিমান্বিত আল্লাহর প্রেমের স্বাদ পেতে হলে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' তথা সরল-সোজা পথে চলার বিকল্প নেই। তাই জীবনকে কলুষমুক্ত না করে, রিপুর ধ্বংস সাধন না করে ও কু-প্রবৃত্তিকে হত্যা না করে এ পথে উড়তে গেলে ডানা ও পালক সবই পুড়ে যেতে পারে। এ সাবধান বাণী কবি খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি তাঁর কাব্যে উচ্চারণ করেছেন।[১৩] মানুষ তার চর্ম চোখে আল্লাহকে দেখতে পায় না। মুসা (আঃ) এর সম্প্রদায়ের সত্তরজন নেতৃস্থানীয় মানুষ আল্লাহকে দেখার দাবি করলে তারা বজ্রাঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়। কবি খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির কাব্যে হৃদয়ের সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার যবনিকা সরিয়ে হৃদয়ের আয়নায় আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মুসলিম দর্শনে মিরাজতত্ত্ব (রজনীযোগে ভ্রমণ/উর্ধ্ব ভ্রমণ) এক গভীর অন্তর্ব্যাপী বিষয় এবং একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। মিরাজের ঘটনাটি ইসলামকে মহিমান্বিত করেছে। রাসূলকে (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে। উন্মোচিত হয়েছে মহান ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক, যা অন্য কোন নবি-রাসূলের সাথে এরূপ কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি। কবি খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির কাব্যে মিরাজের আলোচনা স্থান পেয়েছে। কবি খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির কাব্যে 'নিজেকে জানা তত্ত্ব' (Know thyself) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে 'নিজেকে জানা তত্ত্ব' বিষয়ে বলা হয়েছে 'যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভূকে চিনতে পেরেছে'। নিজেকে চিনতে হলে মানুষ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ দুইটি উপাদান দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দৃশ্যমান জড় পদার্থ এবং অভ্যন্তরীণ অদৃশ্যমান পদার্থ অর্থাৎ আত্মা (রুহ) যা মানুষের মূল উপাদান সম্বন্ধে জানা অপরিহার্য। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছাড়াও খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির কাব্যে 'আহদে-আলাস্তু তথা রুহের জগতের পবিত্র অঙ্গীকার বিষয়ে আলোচনা, নুরের নেকাব তথা নুরতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা, পার্থিব প্রেম ও ঐশী প্রেমের মধ্যে পার্থক্য, ওয়াহদাতুল ওযুদ বা সর্বখোদাবাদ, আল্লাহ ভরসা, তাকদির বা ভাগ্য, মুসা (আঃ) ও খিজির (আঃ) এর ঘটনা, আন্দালিব, হুমা ও হুদহুদ পাখির বিবরণ, জান্নাত-জাহান্নাম, ইল্লিন ও সিজ্জিন, হিলা তালাকের বিবরণ, সুলতান মাহমুদের গোলাম আয়াজের বিবরণ, লজ্জানবত ও বিনয়াবত ও আনুগত্যশীল আকাশের নববধু খ্যাত ফেরেস্তাগণের বিবরণ, পিরে মোগান তথা শুঁড়িখানার তত্ত্বাবধায়কের বিবরণ, নাসরে ওয়াক্বে তথা কর্কট রাশিতে অবস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রের বিবরণ, সর্বোপরি আধ্যাত্মিক প্রেমের বিশদ আলোচনা স্থান লাভ করেছে।

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির কাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেম

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি তাঁর রচনায় প্রেমতত্ত্ব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারনা করেছেন। তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেমদর্শন, পাশ্চাত্য ভাববাদি দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের আলোচনা স্থান পেয়েছে। স্রষ্টাই পরম প্রেম ও বিশ্ব সৃষ্টি প্রেমনীতির বহিঃপ্রকাশ। প্রেমই পরম বস্তু, পরম ধন ও সাধকের পরম কাম্য। প্রেম মূলত দু'ভাগে বিভক্ত। তা

হলো: প্রাকৃতিক প্রেম ও আধ্যাত্মিক তথা আল্লাহ প্রেম। আল্লাহ প্রেম তথা আল্লাহকে ভালোবাসার বিবরণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.[১৪]

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে তিনিও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল দয়ালু।'আল্লাহ তাআলা অন্যত্র এরশাদ করেন:

يٰأَيُّهَا الَّذينَ امَنوا مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِى اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكٰفِرينَ يُجٰهِدونَ فى سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَخافونَ لَومَةَ لائِمٍ، ذٰلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ، وَاللَّهُ وٰسِعٌ عَليمٌ.[১৫]

'হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের মধ্য থেকে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করন। আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, মহাজ্ঞানী।'

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ.[১৬]

'আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর।'

আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادًا يُحِبّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذينَ ءامَنوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَو يَرَى الَّذينَ ظَلَموا إِذ يَرَونَ العَذابَ أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَميعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَديدُ العَذابِ.[১৭]

'আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। আর কতইনা উত্তম হতো যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিন।'

আল্লাহ প্রেমের অপর নাম হলো তাঁর প্রেরিত বিধি-বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) অবাধ্য না হওয়া। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে অনেক বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ يُدخِلهُ نارًا خٰلِدًا فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهينٌ.[১৮]

'যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।'

নবি আকরাম (স.) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ

إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.[১৯]

> ‘আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউই পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক ভালোবাসার প্রিয় পাত্রে পরিণত না হই।’

আল্লাহ প্রেমময়, তিনি আমাদের প্রেমাস্পদ। প্রেমই একমাত্র ধর্ম। আল্লাহর প্রেম লাভই মানব জীবনের পরম পাওয়া। আল্লাহর প্রেমে বলীয়ান হওয়াই মানব জীবনের মহামূল্য লক্ষ্য। আল্লাহ নির্মম কিংবা কিম্ভূতকিমাকার কোন সত্তা নন, কেবল মানুষকে শাস্তি প্রদান করাই তাঁর কর্ম নয়। আল্লাহ পরম দয়ালু। তিনি সমস্ত প্রেম ও সমস্ত জ্ঞানের আঁধার। তিনি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলের সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।[২০] খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

عشق مانند همایست که از اوج شرف　　سایهٔ دولت او بر دو جهان تافته است
تو درون دل و بوی ز تو خود می شنوم　　نکهت عطر تو بر غالیهدان تافته است.[২১]

> ‘প্রেম হুমা পাখির মত সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী
> প্রেমের রাজত্বের ছায়া উভয় জাহানের উপর পড়েছে।
> হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিজ থেকেই তার খুশবু পাই
> তোমার অন্তরের সুগন্ধ খুশবুদানিকে সুরভিত করেছে।’

ইসলামি বিশ্বাসের মৌলিক তিনটি বিষয় হলো তাওহিদ তথা একত্ববাদ, রেসালাত ও আখেরাত। এর মধ্যে একত্ববাদই হলো প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রতিটি নবি ও রাসূলগণের ধর্ম প্রচারের মূলমন্ত্র ছিলো এ একত্ববাদ। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

طبل عشقست که در کون و مکان می کوبند　　پنبه از گوش برون کن بشنو کین چه صداست
شد معین با تو بخلوت گه وحدت محرم　　تا که از هستی و از نیستی و خویش جداست.[২২]

> ‘প্রেমের তবলা জগত ও জীবনের কাছে বাজানো হচ্ছে
> কান থেকে তুলা সরাও এবং শোন এটা কিসের আওয়াজ।
> একত্ববাদের নিরালায় মুঈন তোমার সাথে উপবিষ্ট হয়েছে
> যাতে করে অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব ও নিজ থেকে পৃথক হয়ে যায়।’

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আরো বলেন-

مگر آن ساقی وحدت نقاب از رخ بر افگنده　　که جام و باده یکسان گشت بجر و قطره در هم شد.[২৩]

> ‘একাত্ববাদের সাকি চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে ফেলেছে
> পেয়ালা ও শরাব একাকার হয়ে গেছে, একাকার হয়ে গেছে সমুদ্র ও বারিবিন্দু।’

মানবীয় প্রেম ও আধ্যাত্মিক তথা আল্লাহ প্রেমের মধ্যে একটা ব্যবধান রয়েছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে মানবীয় তথা পার্থিব প্রেম অপ্রয়োজনীয় নয়; তবে বিপজ্জনক। কারণ এ ক্ষেত্রে রিপুর প্রবণতা প্রবল থাকে। যদি না তা বিশেষ পন্থায় আধ্যাত্মিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

مستم امروز از آن باده که در جام　　تا ابد چاشنی عشق تو در کام دلست

دلست

تشنگی در دل از آن نیست که یابد تسکین   که همه جوی بهشت ست که یک جام دلست.[২৪]

'আমার হৃদয় পেয়ালার শরাবে আজ মত্ত
অনন্তকাল পর্যন্ত তোমার প্রেমের স্বাদ হৃদয়ের আশা-আকাঙ্খায় পুঞ্জীভূত।
প্রশান্তি পাবার জন্য হৃদয় তৃষ্ণার্ত
বেহেশতের ঝরণাধারার সবটুকু হৃদয়ের এক পেয়ালা মাত্র।'

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আরো বলেন-

کسی که عاشق و معشوق خویشتن همه اوست   حریف خلوت و ساقی انجمن همه اوست

اگر بدیدهٔ تحقیق بنگری دانی   که ناظر دل و منظور جان و تن همه اوست. [২৫]

'যে নিজেই নিজের আশেক ও মাশুক সে-ই সবকিছু
সে নির্জনে নিজেই নিজের সহচর, সাকি ও মজলিস সবই সে।
যদি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর তবে জানতে পারবে
হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক, দেহ ও প্রাণের লক্ষ্য, সে-ই সবকিছু।'

আল্লাহর উপর ভরসা করা একটা মানসিক অবস্থা। আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর উপর ভরসা বিষয়ে অনেক বিবরণ এসেছে। আল্লাহ বলেন,

فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظًّا غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلينَ.[২৬]

'আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।'

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

در ره عشق توام درد تو همراه بس ست   مونس خلوت دل آه سحرگاه بس ست

ره مخوفست و شب مظلم دشمن به کمین   رهبرم نور توکّلت علی اللّه بس ست. [২৭]

'আমি তোমার প্রেমের পথে আছি, তোমার ব্যথা আমার সাথি এটাই যথেষ্ট
হৃদয় যখন বন্ধু শূন্য তখন শেষ রাতের একটা আহ্ শব্দই যথেষ্ট।
রাস্তা শঙ্কাকুল, রাত্রি অন্ধকার, শত্রু লুকায়িত
আল্লাহ ভরসা এর আলো আমার পথ-প্রদর্শক এটাই যথেষ্ট।'

প্রেম–ভালবাসা এমন এক অগ্নি যা সবকিছুকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়। প্রেম কখনও জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিচালিত হয় না। প্রেম বিবেক ও দর্শনের বিপরীত একটি অন্ধ গুণ। প্রেমে আসক্ত ব্যক্তি নগদ যা পায় তাই গ্রহণ করে, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনরূপ চিন্তা ভাবনা করতে পারেনা। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

آتشی افروخت عشق و جسم و جان من بسوخت
گفتم آهی برکشتم کام و زبان من بسوخت

آتش دوزخ ندارد تابش سوز فراق
آه ازین آتش که پیدا و نهان من بسوخت. [২৮]

‘প্রেম এমন আগুন জ্বালিয়েছে যা আমার দেহ ও প্রাণকে পুড়িয়ে ফেলেছে
ভাবলাম, আহ্ করে চীৎকার দেবো, তখনি আশা ও ভাষা পুড়ে গেছে।
বিরাহানলের তাপ ও জ্বালা দোজখের আগুনেও নেই
হায় ! এ আগুন আমার ভেতরটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।’

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আরো বলেন-

آتشی آمد پدید و جسم و جان یکسر بسوخت
دل درون سینه ام چون عود در مجمر بسوخت

سوخت جسم و جانم ای محرم خدا را باز پرس
کین چه آتس بود کز وی جمله بحر و بر بسوخت. [২৯]

‘এমন আগুন জলেছে যা আমার দেহ ও প্রাণকে একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছে
আমার বুকে যেন চন্দন কাঠের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।
আমার দেহ ও প্রাণ পুড়ে গেছে, সে সাথি আল্লাহকে আবার জিজ্ঞাসা কর,
এ কোন ধরণের আগুন যা জল-স্থলের সব কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছে।’

আল্লাহ একমাত্র পরম সত্তা। সব কিছুই আল্লাহর অস্তিত্বেই অস্তিত্ববান। বিশ্বজগৎ আল্লাহর নাম ও গুণের প্রকাশ। আল্লাহ অনির্দিষ্ট আদি থেকে অনাদি ভবিষ্যৎ অবধি বিচিত্র প্রকাশ্য সৃষ্টি ও অসীম গুপ্ত রহস্যরূপে বিদ্যমান। সত্তাগত দিক হতে তিনি একক কিন্তু নাম ও গুণাবলির দিক বিবেচনায় তিনি বহুমাতৃক। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

مرا ز عشق تو دردیست در دل مجروح
که گرچه شرح دهم هم نمی شود مشروح

فتوح عالم غیبی همی کنند نثار
گهی که درگه میخانه می شود مفتوح. [৩০]

‘আমার ক্ষত হৃদয়ে তোমার প্রেমের ব্যথা
যতই ব্যাখ্যা করি, সবই যেন ব্যাখ্যার বাইরে রয়ে যায়।
অদৃশ্য জগতের সকল সফলতা করে উৎসর্গ
কখনো শরাবখানার দরগাহ হয় অবমুক্ত।’

পরকালে বিচারের দিন যখন মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে তখন তারা আদম (আ.), নূহ (আ.) ও মুসাসহ (আ.) সকল নবি-রাসূলগণের নিকট উপস্থিত হয়ে শাফায়াতের অনুরোধ করবেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করবেন। এ সময় তারা সকলেই মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর নিকটে উপস্থিত হবে । যখন তারা মুহাম্মাদ (সা.) এর নিকটে উপস্থিত হবে সে সময়ে তারা দেখতে পাবে তিনি আল্লাহর কাছে সিজদারত অবস্থায় কান্নাকাটি করছেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি মাথা উঠাবেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন। এদিকে ইঙ্গিত করে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আরো বলেন-

امروز خون عاشق در عشق گر به در شد — فردا ز دوست خواهد تاوان ما محمّد.[৩১]

'আজ যদি প্রেমিকের প্রেমের রক্ত নিষ্ফল হয়ে যায়,

আগামিকাল বন্ধুর কাছে চাইলে আমাদের শাফায়াতকারী মুহাম্মদ (সা.)।'

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আরো বলেন-

گر اعتدال هوای محبّتش خواهی — هوای خویشتن از سر به درکنی چه شود

بگو به عقل که تا چند شش جهت گردی — جهات را همه زیر و زبر کنی چه شود.[৩২]

'যদি প্রিয়তমার ভালোবাসায় গৌরবান্বিত হতে চাও,

তোমার কামনা-বাসনা ত্যাগ করো, তবে কী হবে ?

তোমার বিবেককে বলো, আর কত ছয়দিকে ঘুরে বেড়াবে ?

দিকগুলোকে যদি উঠাও ও নামাও, তবে কী হবে ?'

মানুষের কর্ম, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয় বন্ধুত্বের কল্যাণে। ঈমান ও আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বন্ধুত্ব সর্বোত্তম। হাদিসে কুদসিতে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন- যারা আমার প্রেমে পরস্পর ভালোবাসে, আমার জন্য সমবেত হয়, আমার জন্য পরস্পর খোঁজ-খবর নেয় ও পারস্পারিক যোগাযোগ বহাল রাখে, আমার ভালোবাসা তাদেরই প্রাপ্য। নবি করিম (সা.) বন্ধুত্ব সম্পর্কে বলেন-একাকী নিঃসঙ্গতার চেয়ে ভালো বন্ধু উত্তম আর নিঃসঙ্গতা মন্দ বন্ধুর চেয়ে উত্তম। উত্তম বন্ধুর সহচর্য শান্তিময় আর উত্তম বন্ধুর বিরহ যেন জাহান্নাম তুল্য। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

اگر با یار خود باشی ترا دوزخ بـهشت آمد — و گر بی یار خود مانی ترا جنّت جهنّم شد.[৩৩]

'যদি বন্ধুর সাথে থাকো তবে দোজখ হবে বেহেশত

আর বন্ধুহীন অবস্থায় তোমার বেহেশত হবে দোজখ।'

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য ব্যতিত দুনিয়া যেমন উপভোগ্য হবে না অনুরূপ তাঁর দর্শন লাভ ব্যতিরেকে জান্নাতও আনন্দময় হবে না। বান্দার প্রতি ভলোবাসার অন্যতম উপকারিতা হলো বান্দার আল্লাহর দর্শন লাভ করা। কিয়ামতের দিন জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্মুখে স্বীয় নূরসহ প্রকাশিত হবেন। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

چشم بگشای که دیدار خدا جلوه نمود — دیده شو یکسر و بر بند در گفت و شنود

عکس رخسارهٔ ساقی بنمود از رخ جام — هوش آرام ز مستان می عشق ربود

ساقی عشق مرا روز ازل باده چشاند — تا ابد هر نفسم مستی دیگر بفزود.[৩৪]

'চোখ খোল, দেখো, আল্লাহর সাক্ষাতের পথ প্রকাশিত হয়েছে

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকো, কান ও মুখ বন্ধ কর।

পেয়ালায় সাকির চেহারার প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত হয়েছে

প্রেম প্রেমিকের হুশ ও আরাম ছিনিয়ে নিয়েছে।
প্রেমের সাকি আমাকে আদি দিবসে শরাবের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে,
অনন্তকালব্যাপি প্রতি নিঃশ্বাসে আরো মত্ততা বাড়িয়ে দিয়েছে।’

প্রেম চিরন্তন এক শক্তি। সমগ্র সৃষ্টির শুরুটাই প্রেম, প্রেম এবং প্রেম। সাধনার মাধ্যমে আত্মপ্রেমের এ শক্তি হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হলে কোন সাধনাই ব্যর্থ হবে না। বরং আত্মপ্রেমের এ শক্তি হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে আল্লাহকে চিনতে পারবে ও আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করা যাবে। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

واللّٰه که در رگهای جان چو شهد و شیر آرام مدام   لیلی جون تیر امتحان بر سینهٔ مجنون زند
عشق از ورای لامکان رد خیمه اندر باغ جان   از خلوت خاصی چنان کی تخت خود بیرون زند
مفلس چو یابد گوهری پوشد زهر بد اختری   مسکین معین در هر دری زان لعل دیگر گون زند.[৩৫]

‘আল্লাহর কসম! প্রেমিক প্রাণের শিরায় অনবরত দুধ ও মধু দেয়
লাইলি যেমন পরীক্ষার তীর ছুঁড়ে মারে মজনুর বুকে।
প্রেম লা-মাকানের পিছনে প্রাণের বাগানে তাঁবু খাটিয়েছে
খাসমহল থেকে কে বাইরে পালঙ্ক খাটায়।
নিঃস্ব যখন মোতি পায় তখন সে তা অপাত্রে পরিয়ে দেয়
মিসকিন মুঈন সে মোতির ঔজ্জ্বল্য আরো বাড়িয়ে দেয়।’

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আরো বলেন-

جنبش رشتهٔ عشق از طرف تست ازلی   میلت اندر دل عشاق چرا می جنبد
کشش تست که کوه دلم از جای ببرد   دل نه کاهیست که از باد هوا می جنبد.[৩৬]

‘এটা প্রেমের সুতার নড়াচড়া যা আদি থেকেই তুমি নাড়াও
তোমার ইচ্ছা কেন প্রেমিকের হৃদয়ে নড়াচড়া করে ?
তোমার আকর্ষণ যন্ত্রণার পাহাড়কে জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলেছে
হৃদয় কোন খড়কুটো নয় যে, বাতাসে নড়াচড়া করবে।’

প্রেম-ভালোবাসা মৌলিক মানবীয় গুণাবলির একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। মানবীয় গুণাবলির বিকাশে ও উত্তম মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের মূলে রয়েছে বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। যা একজন প্রকৃত বন্ধুর কাছ থেকেই আশা করা যায়। খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির ভাষায়-

مرا در دل بغیر از دوست چیزی در نمی گنجد   بخلوت خانهٔ سلطان کسی دیگر نمی گنجد
درون قصر دل دارم یکی شاهی که گر گاهی   ز دل بیرون زند خمیه ببحر و بر نمی گنجد
بصدر مسند هر دل خیالش کی زند تکیه   که مهد کبریای او بهر منظر نمی گنجد.[৩৭]

'আমার হৃদয় বন্ধু ছাড়া অন্য কিছুই ধারণ করে না
বাদশাহর অন্দরমহল যাকে তাকে গ্রহণ করে না ।
হৃদয়-প্রাসাদে একজনই বাদশাহ থাকেন
যদি তিনি হৃদয়ের তাঁবু খাটাতে চান, তবে জল-স্থল তা ধারণ করতে পারে না।
প্রত্যেক হৃদয়ের সিংহাসনে তাঁর স্মরণ জাগ্রত থাক
তাঁর গৌরবান্বিত দোলনা কোন দৃশ্যই ধারণ করতে পারে না।'

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) বলেছেন- إذا أحَبَّ اللّه ُ عَبدا ألـهَمَهُ حُسنَ العِبادَةِ অর্থাৎ আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তার হৃদয়ে সুন্দরভাবে ইবাদত করার মানসিকতা ও প্রচেষ্টা দান করেন। তখন বান্দা ইবাদতকে খুবই উপভোগ্য মনে করে। তখন বান্দা পার্থিব জগতের কোন কিছুতেই অনুরূপ স্বাদ অনুভব করেন না। বান্দার জন্য ইবাদত করাটা উৎসাহ ও উদ্দীপনাময় হয়ে উঠে। বান্দা তার সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ ও চাওয়া-পাওয়ায় সে একমাত্র আল্লাহরই শরণাপন্ন হয়। সে নিজেকে সৌভাগ্যবান হিসেবে আলোকিত ভূবনে আবিষ্কার করে। সে নিজেকে সকল প্রকার দুঃখ-বেদনা হতে মুক্ত, পরিপূর্ণ স্বচ্ছ, নির্মল ও আন্তরিক হিসেবে দেখতে পারে। এ শ্রেণির লোকেরাই আল্লাহর দলভূক্ত ও এবং পরিত্রাণপ্রাপ্ত।[৩৮] এ সম্বন্ধে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

رموز عشق اگر خواهی ز لوح دل توان خواندن   که حرفی از روایاتش بصد دفتر نمی گنجد

ز بحر عشق یک قطره ظهور سرّ منصورست   بظرف همّت عاشق ازین کمتر نمی گنجد

بآن جامی که من خوردم نهان کی ماند اسرارم   شراب عشق در جوشست و در ساغر نمی گنجد.[৩৯]

'যদি প্রেমের রহস্য পড়তে চাও, তা শুধু হৃদয়-ফলকে পড়া যায়
তাঁর বর্ণনার একটি বর্ণ শত খাতাও তা ধারণ করতে পারে না।
প্রেমের সমূদ্র থেকে মাত্র এক ফোটা মনসুরের রহস্যের প্রকাশ
প্রেমের ক্ষমতার পাত্র এর চাইতে আর কম ধারণ করতে না।'

সূফি সম্রাট মাওলানা জালাল উদ্দিন রূমি বলেছেন- যদি তুমি চাঁদের প্রত্যাশা করো, তবে রাত থেকে লুকিয়োনা। যদি তুমি গোলাপ প্রত্যাশা করো, তবে তার কাঁটার আঘাত থেকে পালিয়োনা আর যদি তুমি প্রেমের প্রত্যাশা করো, তবে আপন সত্তা থেকে হারিয়োনা। যদিও প্রেম আসলেই কোথাও মিলিত হয় না বরং তা সারাজীবন সবকিছুতেই বিরাজমান।[৪০] এ সম্বন্ধে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি বলেন-

مگر صبا ز سر کوی دوست می آید   که از زمین و زمان بوی دوست می آید

چه رشکهاست که از یاد می برم هر شب   که روی او ز چه بر روی دوست می آید

ز کوی دوست چو عاشق کشیده دارد پای   کمند شوق هم از موی دوست می آید.[৪১]

'ভোরের যে হাওয়া বন্ধুর আবাসভূমি থেকে আসে

তাতে পৃথিবী ও মহাকাল থেকে বন্ধুর ঘ্রাণ আসে।
তার স্মরণে প্রতিরাতে অজস্র অশ্রু বিসর্জন, এসব কী
বন্ধুর চেহারা তার চেহারার উপর কিভাবে প্রতিফলিত হয়।
বন্ধুর আবাস থেকে যখন প্রেমিকের পা টেনে ধরা হয়
আগ্রহের রশিও বন্ধুর চুল থেকে তৈরি হয়।'

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি আরো বলেন-

زد پیک عشق حلقه سحر بر در دلم آورده مژده ای که شهنشاه می رسد

در شاه راه سینه در افتاد غلغله گفتند شاه عشق ازین راه می رسد.[৪২]

'প্রেমের বার্তাবাহক ভোরে নাড়িয়েছে আমার হৃদয়ের দরজার কড়া
এনেছে সুসংবাদ, শাহানশাহ আসছে।
বক্ষের রাজপথে শোরগোল শুরু হয়েছে
তারা বলল, প্রেমের বাদশাহ এ পথেই আসছে।'

উপসংহার

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যেকে বিশ্ব সাহিত্য পরিমণ্ডলে গৌরবময় আসনে সমাসীন করার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি । তবে ইসলামের এ মহান সাধক যে, একজন বড় মাপের কবি; অনেকের তা জানা ছিলো না। তিনি আধ্যাত্মিক প্রেমের উৎকর্ষ সাধনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর কাব্যে আল্লাহর নামতত্ত্ব, তাওহিদ, রাসুলের (স.) প্রশংসা, নৈতিকতা, প্রেম-ভালবাসা, শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সাথে আধ্যাত্মিকতার অবতারণা করা হয়েছে। তাঁর কবিতার ছত্রে-ছত্রে আল কুরআন ও হাদিসের মর্মবাণীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিক প্রেমের শাখা-প্রশাখা বিশেষ করে ফানা ফিল্লাহ ও বাক্বা বিল্লাহ বৈচিত্র্যময় অনুভূতিতে বিধৃত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর কাব্যে সকল চাওয়া-পাওয়ার পর্দা সরিয়ে হৃদয়ের আয়নায় আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শন, আল্লাহকে পেতে হলে প্রেমের রাস্তায় তাকওয়া তথা আল্লাহভীতিকে প্রবাহিতকরণ, মুসার বৃক্ষের বিবরণ, অনবদ্য লাইলি-মজনুর চিরন্তন প্রেম কাহিনী, নবি আকরাম (সা.) এর আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের ঐতিহাসিক মিরাজের বর্ণনা, দেহ ও আত্মার বিবরণ, রুহের জগতে আল্লাহকে রব তথা পালনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, অবসরে কঠোর সাধনায় ব্রতী হওয়া, নূরতত্ত্বের ধর্মীয় দিক বিশ্লেষণ ও ওয়াহদাতুল ওজুদসহ সুফিবাদী চিন্তা-দর্শনের বিষয়ের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১ Muhammad Muzammel Haq, *Some Aspects of the Principal Sufi Orders in India* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh,1985.) p. 31.

২ এ. কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, *হযরত খাজা মুঈন উদ্দিন চিশতি* (ঢাকা: মিল্লাত লাইব্রেরী, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৭।

৩ সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক* (ঢাকা: ইমলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৫।

৪ খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী, *দলিলুর আরেফিন* (ঢাকা: বরহাগে চিশতিয়া, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৮।

৫ *Some Aspects of the Principal Sufi Orders in India*. p. 31.

৬ Shaykh Al Mufid, *Kitab Al- Irshad* (Tehran: Ansarian Publication,1985.) p. 289.

৭ An Encyclopadia of Persian Literature. Vol-4, (Tehran: 2001), Pp. 2401-2402.
৮ *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক*, পৃ. ৯।
৯ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (র), *দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন* (জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান কর্তৃক অনু., সম্পা. ও টীকাভাষ্য) (ঢাকা: গতিয়া প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫২১-৫২২।
১০ তদেব, পৃ. ৪৫৫-৪৬৪।
১১ তদেব, পৃ. ৮।
১২ তদেব, পৃ. ৫২২।
১৩ তদেব, পৃ. ৪৩।
১৪ *আল কুরআনুল কারিম*, ৩ নং সূরা আলে এমরান, আয়াত: ৩১।
১৫ *আল কুরআনুল কারীম*, ৫ নং সূরা আল মায়েদা, আয়াত: ৫৪।
১৬ *আল কুরআনুল কারীম*, ৬১ নং সূরা আস-সফ, আয়াত: ৪।
১৭ *আল কুরআনুল কারীম*, ২ নং সূরা আল-বাক্বারাহ্, আয়াত: ১৬৫।
১৮ *আল কুরআনুল কারিম*, ৪ নং সূরা আলে আন-নিসা, আয়াত: ১৪।
১৯ আল মাকতাবাতুশ শামেলা, *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ১৪, পৃষ্ঠা. ২৪।
২০ ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৫৪-৫৫।
২১ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি, *দিভানে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি* (কানপুর: মাজিদিয়া প্রেস, ১৩২৭ হি. কা./১৯০৯ খ্রি.), পৃ. ৯-১০।
২২ তদেব, পৃ. ১০।
২৩ তদেব, পৃ. ২৩।
২৪ তদেব, পৃ. ১১।
২৫ তদবে, পৃ. ১৩।
২৬ *আল কুরআনুল কারিম*, ৩ নং সূরা আলে এমরান, আয়াত: ১৫৯।
২৭ *দিভানে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি*, পৃ. ১৫।
২৮ তদেব, পৃ. ১১-১২।
২৯ তদেব, পৃ. ১২।
৩০ তদেব, পৃ. ১৫।
৩১ তদেব, পৃ. ২১।
৩২ তদেব, পৃ. ২২।
৩৩ তদেব, পৃ. ২২।
৩৪ তদেব, পৃ. ২৩।
৩৫ তদেব, পৃ. ২৫।
৩৬ তদেব, পৃ. ২৪।
৩৭ তদেব, পৃ. ২৫।
৩৮ https://iqna.ir/bd/news/2603108/
৩৯ *দিভানে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি*, পৃ. ২৫-২৬।
৪০ https://bangla.bdnews24.com/kidz/article1540793.bdnews

৪১ *দিভানে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি*, পৃ. ২৬।
৪২ তদেব, পৃ. ২৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

আধুনিক ফারসি কাব্যের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য

ড. তাহমিনা বেগম*

Abstract: The modern Persian poetry is the reflection of the life of contemporary Iranian people. A new trend of thematic and poetic diction has been developed in the poetry. The modern poetry deals with the socio-cultural, political, and moral values as well. Patriotism also plays a vital role spreading modern literature in Iran. Moral values, the principles and ethics as narrated in poetry assist people in living rightous life. The thoughts of people of all walks of life such as deprived, distressed and poor people have become elements of poetry. The contribution of both men and women is sorely needed to develop a society. The significant role of women in the society is also depicted in the poetry. Social diversity, thematic variety, and new poetic diction are elements of modern Persian verses as well. The article attempts to discuss the theme and characteristics of modern Persian poetry.

বর্তমান বিশ্বে যেসব ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায় তার অধিকাংশ ভাষার উৎপত্তি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে। ভাষাবিদরা মনে করেন, সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক, আর্মানীয়, প্রাচীন স্লাভিক, প্রাচীন গ্রিক, লাতিন, প্রাচীন জার্মানিক এবং প্রাচীন কেতলিক এ ভাষাসমূহ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। ইরানি ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকেই সৃষ্ট। ইরানের ফারসি ভাষার ইতিহাস বহু পুরানো। এ ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিচর্চা সাহিত্যকে নতুন দিগন্তের দিকে ধাবিত করে। ফারসি সাহিত্যের একটি বলয় দখল করে আছে কবিতা। এ কবিতা পুরাতন এবং আধুনিক দু'ভাগে বিভক্ত। পুরাতন কবিতায় কবিরা ঐ সময়ের রাজা-বাদশাহদের কাহিনি, বীরত্বগাঁথার কল্পকথা, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক বিষয়াবলি সম্বলিত হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি ও কল্পনাশক্তির ছবি এঁকেছেন গভীরভাবে। এসবের মাঝে আবেগ থাকলেও বাস্তবতা ও জীবনধর্মী বিষয়াদি তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক কবিতায় প্রাচীন ও সমকালীন বিষয়ের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়- যা সাহিত্যজগতে এক নতুন মাত্রা হিসেবে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে। ফলে এতে যুক্ত হয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে বিশ্বসাহিত্যের প্রভাব ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। ফলে আধুনিক ফারসি কাব্যের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য নান্দনিক হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকে আধুনিক কবিতার সূচনা হলেও ঐতিহাসিকগণ এ সময়ের কবিতাকে পূর্ণ কবিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তাই সে সময়ে জেগে ওঠা আধুনিক ফারসি কবিতা পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে বিশ শতকের শুরুতে। ১৯০৬ সালে ইরানের সাংবিধানিক বিপ্লবের প্রাক্কালে পুরাতন ধারা ভেঙ্গে আঙ্গিকগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক কবিতা বিষয় ও বৈশিষ্ট্যে নিজস্বতায় আবদ্ধ হয়। সাংবিধানিক আন্দোলনের সময় থেকে রেজা শাহ পাহলভি কর্তৃক ইরানের শাসনক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত আধুনিক ফারসি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

মানুষের জীবন একটি সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক সত্তা যা অসংখ্য বিভাগ, দিক এবং অগণিত শাখা-প্রশাখার সমন্বিত রূপ। অপরিমেয় কার্যকারণ মানবজীবনে প্রতিনিয়ত গতিশীল। সাহিত্য এমনই একটি বিষয়। হৃদয় নির্গত ভাষান্তরকেই সাহিত্য বলা হয়ে থাকে। সাহিত্য একইসাথে গদ্য ও পদ্যে তার অবস্থানকে সমুন্নত করে চলেছে। মানবজীবনের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কবিতা মূলত এমন একটি শিল্প যার দ্বারা কবির অনুভূতি ও উপলব্ধি সহজভাবে নানা আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। জীবনের মূল্যমান নির্ধারণ ও বিনির্মাণে এর ভূমিকা অসামান্য। সাহিত্যের প্রাণ বলা হয় কবিতাকে। মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ ও চেতনাকে উজ্জীবিত, উচ্ছ্বাসিত ও উদ্ভাসিত করে তোলে কবিতা। আধুনিক কবিদের রচনায় মানুষের কথা প্রাণের আকুতি হয়ে ফুটে উঠে। আধুনিক কবিতা মানেই বাস্তব কোনো ঘটনার প্রতিচ্ছবি বা কল্পনামিশ্রিত রচনা।

---

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আধুনিক ফারসি কবিতায়মানুষের জীবনের কথা ঝংকৃত হতে থাকে। এ ধারার কবিতা বিকশিত হয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। গণমুখী কাব্য মানুষের নাগালে পৌঁছাতে সমকালীন পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক কবি ও কাব্যকে মানুষের হৃদয়ের গভীরে নিয়ে আসতে নিয়ামকে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় পত্র-পত্রিকা। আধুনিক ফারসি কবিতায় মানুষের জীবনকে তুলে ধরতে অসামান্য ভূমিকা রাখে যেসব পত্রিকা এগুলোর মধ্যে *রোযনামেয়ে দৌলতে আলিয়ে ইরান*, *রোযনামেয়ে মেল্লাতি*, *রোযনামেয়ে এলমি*, *ইরান*, *মেরআতুস সাফা*, *মেশকাতুল হাজার*, *এলমি*, *শারফ*, *শারাফাত*, *আখতার*, *কানুন*, *হাবলুল মাতিন* এর নাম স্মরণযোগ্য। এছাড়া আরও কিছু পত্রিকার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যার মধ্যে রয়েছে *সুরে ইস্রাফিল*, *দানেশকাদে*, *আরমোগান*, *আযাদিস্তান*। এসব পত্রিকা জুড়েই ছিল মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবহুল জীবনের চিত্র। স্বদেশপ্রেম, মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনগাথার প্রকৃত স্বরূপ অংকিত হয় *মোসাভাত*, *নাসিমে শুমাল*, *নাসিমে সাবা* ও অন্যান্য পত্রিকায়। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা অবলম্বন করেই আধুনিক ফারসি কাব্যের বিকাশ ঘটে।

আধুনিক ধারার কবিতা এমন যাতে ছন্দের মিল ও যতির রীতি অনুসৃত হয় না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবিতা ঝংকারপূর্ণ তবে এতে ছন্দের পুনরাবৃত্তি ও ধারাবাহিকতা নেই। বাস্তববাদী সাহিত্যের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিষয়ে কবিতা একটি মহার্ঘ শিল্পের দাবিদার। আর এই দাবি পূরণার্থে আধুনিক কবিতা মানুষের মনের লুকানো ভাবনাকে তুলে আনে। মানবজীবন সহজ নয়, আবার জটিলও নয়। জীবন জীবনের মতই। আমরাই একে সহজ করি, আমরাই একে জটিল করি। তাই জীবনের এই বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার সংযোগও হয় নিবিড়। জীবনের এই বাস্তবতাকে কবি তার শিল্পীসত্তা দিয়ে কলমের ছোঁয়ায় তৈরি করেন কবিতা। যার সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে সহজেই অনুমেয়।

ফারসি ভাষায় যেসব কবি-সাহিত্যিক মানুষের জীবনবোধ নিয়ে কথা বলেছেন, গনমানুষের পাশে থেকেছেন এবং আধুনিক কবিতার বিষয় ও বৈশিষ্ট্যকে সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে আদিবুল মামালিক ফারাহানি, সাইয়েদ আশরাফ উদ্দিন গিলানি, ইরাজ মির্জা, আলী আকবর দেহখোদা, মালিকুশ শোআরা বাহার, ফোরুগে ফাররুখযাদ, সোহরাব সেপেহরি, তাহেরা সাফফারযাদে, মিরযাদে এশকি, আরেফ কাজভিনি, আহমেদ শামলু, নিমা ইউশিজ, পারভিন এতেসামি, শাহরিয়ার, সিমিন বাহবাহানি, ফারিদুন মাশিরি, হোশাঙ্গে এবতেহাজ, ইসমাইল শাহরুদি, পারভেজ নাতেল খানলারি, রাহি মুয়াইয়েরি, সাইয়েদ কারিম আমিরি ফিরোজকুহি, মেহেরদাদ আভেস্তা, মোহাম্মদ রেজা শাফিয়ি কাদকানি, মোহাম্মদ আলি সেপানলু, রাদি অযারখশি, মনুচেহের অতাশি, নুসরাত রাহমনি প্রমুখ।

সামাজিক সমস্যা আধুনিক কবিতার অন্যতম একটি বিষয় ও বৈশিষ্ট্য। সামাজিক সমস্যা নির্দিষ্ট কোনো কারণবশত দেখা দেয় না। এটি এমন এক পরিস্থিতি যা মানুষের জীবনযাত্রাকে সাবলীল করার ক্ষেত্রে বাঁধা দেয়। সাংবিধানিক বিপ্লব পরবর্তী সময়েও ইরানে সামাজিক সমস্যার চিত্র দেখা যায়- যা আধুনিক কবি-সাহিত্যিকগণ তাদের কবিতায় প্রকাশ করেছেন। কাজার বংশের শাসকদের মধ্যে নাসির উদ্দিন শাহের শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক অরাজকতার দরুন ইরান চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়; ফলে এখানে এক গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এসব পরিস্থিতিতেও সাংবিধানিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে ইরানের প্রথম সারির একজন কবি আদিবুল মামালিক ফারাহানি তার বক্তব্য তুলে ধরেন। কবির ভাষায়-

ز اوّل بنای مجلس آزادی جهان

شرمنده ترز مجلس ما پارلمان نبود

ایران بروزگار تجدد چه داشت، گر

مفتی و شیخ و مفت خور و روضه خوان نبود[২]

‘সর্বপ্রথম মজলিসের ভিত্তিই পৃথিবীর স্বাধীনতা
আমাদের মজলিসের চেয়ে লজ্জিত কোনো পার্লামেন্ট ছিল না।
সংস্কার যুগে ইরানের কিইবা বৈশিষ্ট্য ছিল

মুফতি, শেখ ও পরজীবী আর রওজা ভিন্ন কিছু নয়।'

আধুনিক ফারসি কবিতার জনক নিমার সমসাময়িককালের একজন কবি আমিরি ফিরোজকুহি। যিনি পাশ্চাত্যবিষয়ক জ্ঞান ধারণ করে এ নিয়ে সামাজিক সচেতনার পক্ষে কলম ধরেছেন। কবির ভাষায়-

سفیر مهر و رسول محبت ز عرش
از آن قبل همه کس را به عشق راهبرند
خبر ز عالم افلاک می دهند تو را
همین گروه که از حال خویش بی خبرند
ز گوشمال فلک، هرچه پیچ و تاب خورند
به صد ترانه ز تار وجود نغمه گرند
ز هر افق که بر آیند، نجم یک فلک اند
زهر صدف که در آیند، در یک گهرند
ز هر کرانه که خیزند، سرو یک چمن اند
به هر کجا که برویند، شاخ یک شجرند[৩]

'করুণার বার্তাবহ আরশ হতে ভালোবাসার বাণীবাহক
এশকের পথে সবার তরে পথনির্দেশক
তোমাকে আকাশের বাণী পৌঁছে দেন
এ জাতীয় মানুষ নিজের অবস্থা সম্পর্কে রয়েছেন অজ্ঞ
কালের আবর্তে যতই ঘূর্ণিপাক আসুক
শতকণ্ঠে অস্তিত্বের গান বেজে ওঠে
যে দিগন্তেই উদিত হোক একই আকাশের তারা
যে ঝিনুক থেকেই বের হোক উৎসমূলে একই রত্ন
যে প্রান্ত থেকেই উদ্গত হোক না কেন একই বাগানের দেবদারু
যেখানেই বপন করা হোক মূলত একই বৃক্ষের শাখা।'

সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে নারী। সৃষ্টির শুরু থেকেই নারীপুরুষ সম্পর্ক সমাজকে পরিপূর্ণ করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব উৎসের মূলেই একজন নারীর অবস্থান। আমাদের সমাজব্যবস্থায় একজন নারী, পুরুষের শক্তির উৎস, ইচ্ছা ও কর্মের প্রেরণা হবার পরও নির্যাতিত, নিপীড়িত এবং অধিকারবঞ্চিত। এ অবস্থার মধ্যেথেকে তারা আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই করে চলেছে। আধুনিক কবিসাহিত্যিকগণ নারীদের অধিকার ও মর্যাদা, সম্মান, সন্তানের প্রতি মায়েদের কর্তব্যের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এ সময়কার কবিরা একজন নারী যে কত বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল তার বর্ণনা করেছেন নানাভাবে। পুরুষ সমাজ নারী সমাজের ওপর যে আধিপত্য এবং নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে আসছে আধুনিক কবিদের মূলসুর হলো মূলত তাই। এইরূপ একজন সমাজসচেতন ব্যক্তি হলেন ইরাজ মির্জা (১৮৭৪-১৯২৫ খ্রি.)। যার লেখনীতে একজন নারী পর্দা উন্মোচন করে পাশ্চাত্য জ্ঞানধারণ করে নিজেদের সুসংগঠিত করেছেন। নারীরঅধিকার এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক লিখা কবিকে *শায়েরে মাদার* বা মায়ের উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তার *মাদার* কবিতার কিছু অংশ ছিল এমন:

گویند مرا چو زاد مادر   پستان به دهان گرفتن آموخت
شبها بر گاهواره من   بیدار نشست و خفتن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبانم   الفاظ نهاد و گفتن آموخت
لبخند نهاد بر لب من   بر گنچه گل شکفتن آموخت
پس هستی من زهستی اوست   تا هستم و هست دارمش دوست[৪]

'যখন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলাম
তখনই তিনি আমায় দুধপান করানো শেখান।
রাতগুলো দোলনার শিয়রে আমার
নিদ্রাহীন জেগে বসে আমায় ঘুমানো শেখান।
এক বর্ণ দুই বর্ণ করে আমার মুখে
শব্দ তুলে দেন কথা বলা শেখান।
আমার হাসির ঝলক তুলেছেন
যেমন কাননে ফুলের কলি ফোটে ওঠে।
সুতরাং আমার অস্তিত্ব তার অস্তিত্ব থেকেই সৃষ্ট
যতদিন আমি আছি আর তিনি আছেন তাকেই ভালোবেসে যাব।'

সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর অন্যতম ধনী-দরিদ্র বৈষম্য। এ থেকেই সৃষ্টি হয় দুঃখ-কষ্ট, সজ্ঞাত ও সহিসংতার। এর কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ, দিন মজুর থেকে শুরু করে এতিম শিশুদের মৌলিক অধিকারবঞ্চিত হবার দৃশ্য। সমাজের ধনী ব্যক্তিদের জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলির আলোকে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্য কবিরা তাদের লেখায় এ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। পুরাতন ফারসি কবিতায় এ সমস্যাগুলো সেভাবে উপস্থাপিত না হলেও আধুনিক ফারসি কবিতায় এ জাতীয় বিষয়াবলি খুঁজে পাওয়া যায়। এ ধারার কবিদের মধ্যে নিমা ইউশিজের নাম সর্বাগ্রে তুলে ধরতে হয়। পুরাতন প্রথাকে ভেঙ্গে তদস্থলে নতুন আঙ্গিকে কবিতায় প্রাণসঞ্চারকারী কবি ছিলেন নিমা ইউশিজ (১৮৯৭-১৯৫৯ খ্রি.)। তাই এ কবিকে আধুনিক ফারসি কবিতার জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি সামাজিক জুলুম, নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচারকে কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচনা করেছেন। কবি বলেন-

هان، ای شب شوم وحشت انگیز   تا چند زنی به جانم آتش
یا چشم مرا زجای برکن   یا پرده زروی خود فروکش
یا باز گذار تا بمیرم   کز دیدن روزگار سیرم
دیریست که در زمانهٔ دون   از دیده همیشه اشکبارم
عمری به کدورت و الم رفت   تاباقی عمر چون سپارم![৫]

'হায়! হে অশুভ ভয়ঙ্কর রজনী
কতকাল জ্বালাবে অগ্নি হৃদয়ে মোর।
নয়তো আমার দৃষ্টি প্রকৃত অবস্থা থেকে রইবে দূরে
অথবা স্বীয় মুখাবয়ব থেকে উত্থিত হবে নেকাব।
সব উন্মুক্ত করে দাও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব
পৃথিবীর প্রতি নেই কোনোমায়া-মোহ।
হীনকালে যেন আধ্যাত্মিক আস্তানা
সর্বদা বিসর্জিত হয় অশ্রুধারা
জীবন পীড়িত দুঃখ-কষ্টের বেদনায়
হায়! বাকি জীবন কিভাবে অনিশ্চয়তায় কাটাব!'

ইরানে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিলাসিতার কারণে সৃষ্ট সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ব্যথিত হন কবি তাহেরা সাফফার যাদেহ (১৯৩৬-২০০৮খ্রি.)। একজন শক্তিমান নারী কবি হয়ে দরিদ্র ও অনাহারী মানুষের কষ্টকে ধারণ করেছেন এবং হৃদয় দিয়ে লিখেছেন কিভাবে ক্ষুধায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে মানুষ। আধুনিক কবিতার এ বৈশিষ্ট্যকে কবি গদ্যাকৃতিতে তুলে ধরেন এভাবে-

> به تشخیص سپوران شبی که او از گرسنگی مرد با نان فقط دو خیابان فاصله داشت صبح روز بعد در سرمای بستر پیاده رو نان و ران و سینه مرغ نیم خورده در گوشه ی خیابان نزدیک مغازه واکسی هوگر تلنبار شده بود در انتظار سگان یا سپور محله او می بایست آنجا کمی از خود پذیرایی می کرد تنها دو خیابان آنطرف تر بود (مردمی هستند که از مسیر هوا راههای پر ماجرایی را هر روز برای امضاء قرار دادهی طی می کنند) دو خیابان که دور نبود اگر بچه ها عصایش را ندزدیده بودند اگر او بیش از یک پا می داشت[৬]

‘রাতের ডিনার টেবিল হতে মাত্র দু’কদম দূরে এক টুকরো রুটিসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো। পরদিন সকালে ফুটপাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাতে ধরা আধ-খাওয়া জমাট রুটি, মুরগীর রান এবং পাঁজর নিয়ে হুগোর জুতো পালিশের দোকানের সামনে মহিলাটি পড়ে থেকে অপেক্ষা করছিলো কুকুর অথবা ধাঙ্গড়ের জন্যে, তার উচিত ছিলো নিজেকেই সাহায্য করা কেননা সে মাত্র দু’কদম দূরে ছিলো। মাত্র দু’হাতের দূরত্ব তার জন্যে খুব বেশি দূর ছিলো না যদি সুগঠিত বাচ্চারা তার হাতের লাঠিটা কেড়ে না নিতো আবার যদি তার একটির বেশি পা হতো।’[৭]

আধুনিক ইরানে স্বদেশের প্রতিনিধিত্বকারীদের অন্যতম এক ব্যক্তির নাম আল্লামা আলী আকবর দেহখোদা (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রি.)। তিনি ছিলেন গণমানুষের কবি। স্বদেশপ্রেম কবিমনকে অত্যাচারিতের বিরুদ্ধে কঠোর হতে উদ্বুদ্ধ করে ভীষণভাবে। মোহাম্মদ আলী শাহের সময়ের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দৃশ্য তার কবিতাকে নতুন মাত্রা এনে দেয়। শাণিত বিষয়বস্তু, অতি সাধারণ, নিপীড়িত, অবহেলিত, নির্যাতিত ও খেটে খাওয়া বঞ্চিত মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতা নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় তার অনুভূতি তুলে ধরেন। আর এভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে একজন কবি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। স্বদেশপ্রেম নিয়ে কবির অনুভব ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে নিম্নের কবিতায়-

ای مردم آزاده ، کجایید کجایید ؟
آزادگی ا فسرد ، بیایید بیایید !
در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید
مقصود از آزاده شمایید شمایید ![৮]

‘হে স্বাধীনচেতা মানুষ, তোমরা কোথায়, কোথায়?
স্বাধীনতা বিপন্ন আজ, আস ছুটে আস!
কাহিনী আর ইতিহাসে তোমরা পড়ছ স্বাধীনতার যে পাঠ
সে স্বাধীনতার লক্ষ্য তোমরাই! তোমরাই!’

স্বদেশের প্রতি দেহখোদার মমত্ববোধই কবিকে সৃষ্টিশীল করে তোলে। এমনই একটি কবিতা *শেকওয়ায়ে পিরে যাল*, যেখানে অসহায় এক বৃদ্ধের অভিযোগ ব্যক্ত হয়েছে। বৃদ্ধের শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন বসতবাড়ি যা জালেমদের অত্যাচারের স্বীকার। যার মূল্য জালেমদের কাছে অতিনগণ্য অথচ সেটাই এক বৃদ্ধার বেঁচে থাকার অবলম্বন। কবি বলেন-

هنوزم بگردد از این هول، حال
چو یاد آیدم حال آن پیر زال
که می رفت و می گفت سیر از جهان

ربوده زکف ظالمش خان و مان
به چشم تو این خانه سنگ است و خشت
مرا قصر فردوس و باغ بهشت
چه ارزد به پیش تو یک مشت سیم ؟
مرا خویش و پیوند و یار و ندیم[৯]

'এই ভয়ংকর অবস্থা এখনো আমায় খুঁজে বেড়ায়
যখনই স্মরণ হয় সেই বার্ধক্যের কাল।
যে পথ চলছিল আর বলছিল পৃথিবীর তৃপ্ত মানুষদের-
অত্যাচারীর নির্মমতা তার বসতবাড়ি কেড়ে নিয়েছে।
তোমার চোখে এই বাড়িটি পাথর আর পোড়া ইট
এটি আমার কাছে ফেরদৌসের প্রাসাদ আর বেহেশতের বাগান
কিইবা মূল্য তোমার কাছে?সামান্য কানাকড়ি মাত্র
একান্ত আপন, হৃদ্যতা, বন্ধু ও প্রাণের সঙ্গী আমার।'

স্বদেশপ্রেম উজ্জীবিত ইরানের অপর এক কবির নাম আরেফ কাজভিনি (১৮৮২-১৯৩৩খ্রি.)। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসায় সিক্ত কবি সংবিধানিক আন্দোলনের সময় স্বাধীনতাকামীদের সংগ্রামে যোগ দেন এবং গীতিকাব্য রচনার মধ্যদিয়ে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। এ ভূমিকার জন্য তাকে নানাভাবে লাঞ্চিততও হতে হয়। আরেফ কাজভিনি শুধুমাত্র একজন কবি নন; একধারে একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং গীতিকবি। আরেফের দেশাত্মবোধক গীতগুলো ছিল সাবলীল, অন্তরঙ্গ এবং গজল ও অন্যান্য কবিতার তুলনায় সহজতর। আর এ কারণেই সংবিধান আন্দোলন যুগে এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে সাধারণ মানুষের মনে এগুলো উচ্ছ্বাসের জন্ম দেয়। সাংবিধানিক আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আরও ঘনিষ্ঠতর ও নিকটতর করে তুলতেই কবি বলেন-

لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست
چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست
ز حد گذشت تعدی، کسی نمی پرسد
حدود خانه بی خانمان ما ز کجاست
چه شد که مجلس شورا نمی کند معلوم
که خانه خانه غیر است یا که خانه ماست[১০]

'পৃথিবীর শরীরে মৃত্যুর বসনই সৌন্দর্যময়
এই সামান্য আলখেল্লা আমাদের দেহে পরে কিইবা লাভ?
কতকাল কেটে গেলো কেউ কখনো জানতে চায়নি
আমাদের বসতভিটাহীন মানুষের বাড়ির সংখ্যা কোথায়?
জাতীয় সংসদ অবগত না হওয়ায় কী আসে যায়
এ ঘর আমাদেরইনাকি অন্য কারো ঘর।'

দেশমাতৃকার প্রতি নিবেদিত ইরানের প্রথিতযশা কবি মালিকুশ শোআরা বাহার (১৮৮৬-১৯৫১ খ্রি.)। স্বদেশ ও এর মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ কবিতায় ফুটে ওঠে নিবিড়ভাবে। তার দৃষ্টিতে, যে সমাজব্যবস্থায় জনতার বৃহত্তম অংশই মানবেতর জীবন যাপন করে আর মুষ্টিমেয় মানুষ উদরপুর্তিতে লিপ্ত; সে সমাজব্যবস্থাকে সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা বলা যায় না। সামরিক শাসকেরা জনগণের সেবক, খাদেম, হিতৈষী বলে পরিচয় দেয় বটে; কিন্তু কার্যত তারা শোষকের ভূমিকায়

অবতীর্ণ। মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। মানুষের অধিকার মানুষকেই আদায় করে নিতে হবে। সামাজিক অন্ধকার থেকে আলোর মশালে পৌঁছানোর দায়িত্ব মানুষকেই পালন করতে হবে। এভাবেই মনোভাব তিনি তার হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন *হুব্বুল ওয়াতান* (স্বদেশপ্রেম) কবিতায়-

دوستار خلق شو تا مردمت گیرند دوست هرکه راه مهر پیماید خدایش رهبر است

دل ز خشم و آز خالی کن که فرّ ایزدی ره نیاید اندر آن دل کاین دو دیوش همبراست

خدمت دیگر کسان از هفته باشد تا به سال خدمت گوینده باقی تا به روز محشر است.[১১]

'সৃষ্টিজগতের বন্ধু হও, মানুষও তোমাকে বন্ধু করে নিবে
যে মানুষ কল্যাণের পথ খোঁজে, খোদা তাকে সঠিক পথ দেখান।
ক্রোধ ও হিংসা থেকে মুক্ত করো হৃদয়কে কেননা আল্লাহর মহিমা
সঠিক পথের সন্ধান দেয় না যাদের অন্তর এ দুটি মন্দে পূর্ণ।
অপরের কল্যাণ কামনা সপ্তাহ থেকে বছরে স্থায়ী হবে
কবির খেদমত হাশরের দিন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।'

নিমায়ী কাব্যরীতিতে খ্যাতিমান এক ব্যক্তিত্ব আহমাদ শামলু (১৯২৫-২০০০ খ্রি.)। যিনি সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক বিষয়াবলির পাশাপাশি একজন শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ফরাসি কবিদের অনেক গ্রন্থ ফারসি ভাষায় অনুবাদ করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। পরবর্তীসময়ে তার অনেক কবিতাও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে দেখা যায়। এছাড়াও আধুনিক কবি শাহরিয়ারও নিমায়ী ধারার একজন শক্তিমান কবি। স্বদেশ, সমাজ, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে তিনি লিখেছেন। তার রচনার ভাষা ছিল খুবই সাবলীল, মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী। আধুনিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি মেধাকে শাণিত রেখেছেন ক্লাসিক কবি সাদি, রুমি, হাফিজ ও আমির খসরুর ন্যায় গজল রচনাতেও। আধুনিককালে শাহরিয়ারই অদ্বিতীয় কবি যিনি গজল রচনায় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন নিজস্বতায়-

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟ بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا ؟

نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر می خواستی، حالا چرا؟

عمر مارا مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان توام فردا چرا؟[১২]

'হে প্রিয়! তোমার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ, তুমি এসেছো কিন্তু এখন কেন?
হে বিশ্বস্ত, এখন তো আমি নিশ্চল, এ অসময়ে কেন এসেছো?
উপশমনীয় ঔষধ তুমি, সোহরাবের মৃত্যুর পর এসেছো
পাষাণ হৃদয় সবই দ্রুত চেয়েছো, কিন্তু এখন কেন?
আমাদের জীবন আজ বিপন্ন, আগামীকাল তো কিছুই বাকী নেই
তোমার মেহমান আজ আমি, কাল কেন?'

আধুনিকতার এ সময়ে যারা সুরের ঝংকারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন তাদের অন্যতম হলেন কবি হোশাঙ্গ এবতেহাজ। যিনি জীবনের কন্টকাকীর্ণ পথ চলায় প্রেমের সুরকেই সৌভাগ্যের প্রতীকী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিমার কাব্যশৈলীর অনুসারী হয়েও বিষয়বস্তুগতভাবে তার নিজস্ব চিন্তাশিল্প কবিতায় এক দ্যোতনার সৃষ্টি করে। তাই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রেমের সুরঝংকার তুলেছেন তার *তারানে* কবিতায়,

تا تو با منی زمانه با منست

بخت و کام جاودانه بامنست

تو بهار دلکشی و من چو باغ

شور و شوق صد جوانه با منست
یاد دلنشینت ای امید جان
هر کجا روم، روانه با منست
ناز نوشخند صبح اگر تراست
شور گریه شبانه با منست[১৩]

'যদি তুমি আমার সঙ্গী হও তাহলে সৌভাগ্য আমার সাথে
কল্যাণ ও চিরন্তন সবই আমার
তুমি হৃদয়গ্রাহী বসন্ত, আমি পুষ্পকানন
উৎসাহ-উদ্দীপনা শত আনন্দ সবই আমার
হে হৃদয়ের প্রত্যাশা, তোমার স্মরণে
যেখানেই যাই, সবই আমার
তুমি থাকলে প্রভাত আনন্দময়
রাতের ক্রন্দনময় ব্যকুলতা শুধুই আমার।'

পাজমান বাখতিয়ারি (১৯০০-১৯৭৭ খ্রি.) এমন একজন আধুনিক কবি যিনি একাধারে তার রচনায় কাসিদা, তারকিববান্দ, চারপারে ও গজল বিষয়ক কবিতা রচনা করে খ্যাত হয়েছেন। তিনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি যৌবনে প্রেমের গভীরতা এঁকেছেন অত্যন্ত সুনিপূণভাবে। তার কাব্যে রোমান্টিকতার ছাপ পুরোপুরি বিদ্যমান। তিনি বলেন-

در کنج دلم عشق خانه ندارم　　　کس جای در این کلبه ویرانه ندارم[14]

'হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রেমের নেই কোনো জন্মভূমি
কারও এখানে নেই কোনো কুটির, নেই কোনো বিরাণভূমি।'

সাংবিধানিক বিপ্লব সমাপ্তের মধ্য দিয়ে কাজার রাজত্ব পাহলভি রাজত্বে পরিবর্তিত হওয়ার পর ফারসি কাব্যশৈলীর ক্ষেত্রে দু'টি চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল। প্রথমত প্রচলিত কাঠামোগুলোর সঙ্গে নব্য চিন্তাধারার বিন্যাস যাকে সাংবিধানিক যুগের অব্যাহত ধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেখানে মালিকুশ শোআরা বাহার, পারভিন এতেসামি, আদিব নিশাপুরি, আদিবুল মামালিক ফারাহানি এবং হামিদি শিরাজির ন্যায় কবিগণও এ ধারায় কাব্যচর্চা করেছেন। দ্বিতীয়ত নিমা ইউশিজের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ফারসি কাব্যশৈলীতে আধুনিক ধারার সূত্রপাত ঘটে। এ কাব্যশৈলীতে ভাষা, সাহিত্য ও চিন্তাদর্শন এ তিনটি পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে কাব্যসাহিত্যে অতীতের তুলনায় ভিন্ন একটি ধারা তৈরি হয়। এ সময়ে কবিসাহিত্যিকগণের রচনায় সামাজিক বিভিন্ন বিষয়াবলির পাশাপাশি নৈতিকতাসম্পৃক্ত বক্তব্যমালা প্রাধান্য লাভ করে। বিভিন্ন উপমা দ্বারা মানুষের উদ্দেশ্যে নৈতিক শিক্ষামূলক বিষয়ের অবতারণা আধুনিক কাব্যমানকে করেছে উন্নত ও সমৃদ্ধ।

আধুনিক কালের কবি-সাহিত্যিকদের রচনাতে সমাজের প্রচলিত ঘটনাবলি বর্ণনার পাশাপাশি নৈতিক বিষয়াদি যেমন ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমা প্রদর্শন, উদারতা, কল্যাণ কামনা, অল্পে তুষ্টি, খোদাভীতি ও পরকালীন জবাবদিহিতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ধৈর্য ধারণ, বিনয় ও নম্রতা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, বদান্যতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

কবিতায় মৃত্যু, মৃত্যুভাবনা ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের আলোচনা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। এটাই চিরন্তন সত্য যে অতীতে আমরা মৃত ছিলাম, এখন জীবিত আছি, চিরাচরিত নিয়মে আমরা মারা যাব এবং পরে আবার জীবিত হব। তারপর প্রত্যেকেই তাদের কর্মের ভালমন্দ দেখতে পাবে। কবি পাজমান বাখতিয়ারি ক্ষণস্থায়ী জীবন ও তার প্রাপ্তি সম্পর্কে বলেন-

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد　　　کس جای درین خانه ویرانه ندارد

دل را به کف هر که نهم باز پس آرد   کس تاب نگهداری دیوانه ندارد
در بزم جهان جز دل حسرتکش مانیست   آن شمع که می سوزد و پروانه ندارد[১৫]

‘আমার হৃদয় রাজ্যে কারও ভালবাসা নেই
এ গ্রহে কারও জন্য বিরাণ ভূমি নেই
এ হৃদয় যার প্রতিই অনুরক্ত হোক না কেন পুনরায় তা ফিরে আসে
কারও পাগলের প্রতি খোঁজখবর নেওয়ার কোনো চিন্তা নেই
পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্রে হিংসাত্মক হৃদয় ছাড়া আমাদের যেন কিছু অবশিষ্ট নেই
ঐ দীপ্তিমান প্রদীপের কোনো প্রজাপতি নেই।’

আধুনিক যুগের কবিরা ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভাদীপ্ত। তাদের কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্য এতদুভয়ের সার্থক সমাহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আধুনিক কবিরা ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়। তাদের লেখনীতে সেই সময়ের চলমান ঘটনাপ্রবাহ মানুষকে উজ্জিবীত করেছে। মানুষ তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়েছে। ফলে খুব সহজেই পূর্বের বিষয়বস্তু নতুনমাত্রায় আধুনিক হয়ে উঠেছে। কবিরা তাদের কলম চালনায় নিজেকে স্বাধীনভাবে তুলে ধরেছেন বিষয় ও বৈশিষ্ট্যে। এভাবেই আধুনিক কবিসাহিত্যিকদের লেখনীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি মূল বিষয়ে পরিণত হয়। জীবনমুখী কবিতার এ ধারা ফারসি সাহিত্যাঙ্গনে এক নব দিগন্ত উন্মোচন করে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ সাংবিধানিক বিপ্লব:নাসির উদ্দিন শাহের শাসনামলে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর ইরানের ওপর অর্থনৈতিক আধিপত্য বৃদ্ধি পেলে জনগণ তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯০৬ সালের ১৯ জুলাই ইরানের জনগণ ব্রিটিশ দূতাবাসের চত্বরে ধর্মঘট শুরু করে এবং প্রধানমন্ত্রী আইনুদ্দৌলার পদত্যাগ দাবি করে। একই সঙ্গে আলেম সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধ ও মজলিশ (আইন পরিষদ) গঠনের দাবিও সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে শাহ ২৯ জুলাই আইনুদ্দৌলাকে পদচ্যুত করেন এবং এর এক সপ্তাহ পর ৫ আগস্ট একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। ইরানের ইতিহাসে এটি সাংবিধানিক বিপ্লব নামে খ্যাত। (সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, ২য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ১৯-২০)

২ ড. মানজার ইমাম, *আদাবিয়াতে জাদিদে ইরান* (বিহার: কিতাবিস্তান, ১৯৯৬), পৃ. ৭৯।

৩ শাকির সবুর, *সমকালীন ইরানের কবি ও কবিতা* (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০২০), পৃ. ৭১-৭২।

৪ ড. মোহাম্মদ জাফর ইয়াহাকি, *চুন সাবুয়ে তেশনে* (তেহরান: জামি প্রেস, ১৯৯৫), পৃ. ৪৬।

৫ ইয়াহইয়া অরাইয়ানপুর, *আয নিমা তা রোযেগারে মা*, ৩য় খণ্ড (তেহরান: এন্তেশারাতে যাওয়ার, ২০০৩.), পৃ. ৫৮৬।

৬ আনিসুর রহমান স্বপন, *তাহেরেহ্ সফরজাদেহ্ : স্বনির্বাচিত কবিতা* (ঢাকা: বুক ভিউ, ১৯৯১), পৃ. ২৩।

৭ তদেব, পৃ. ২২।

৮ ড. ইসমাঈল হাকিমি, *আদাবিয়াতে মোআসেরে ইরান* (তেহরান: এন্তেশারাতে আসাতির, ১৯৯৬), পৃ. ৪৮।

৯ ওয়ালিউল্লাহ দোরুদিয়ান, *দেহখোদায়ে শায়ের* (তেহরান: এন্তেশারাতে আমির কবির, ২০০৫), পৃ. ৮০।

১০ *চুন সাবুয়ে তেশনে*, পৃ. ৬৫।

১১ মালিকুশ শোআরা বাহার, *সেতায়েশগারে মেইহান ওয়া অজাদি*, হাসান আহমাদ গিভি (সম্পা.) (তেহরান: নাশরে ক্বেতরে, ১৯৯৯), পৃ. ১০৫-৬।

১২ *আদাবিয়াতে জাদিদে ইরান*, পৃ. ১০৫।

১৩ *আদাবিয়াতে মোআসেরে ইরান*, পৃ. ১৫৫-৬।

১৪ মোহাম্মদ হোকুকি, *আদাবিয়াতে এমরোযে ইরান* (তেহরান: নাশরে ক্বেতরে, ১৯৯৮), পৃ. ৫১৭।

১৫ গোরুহে ফারহাঙ্গ ওয়া আদাব পাজ্বাঙ্গ, *শেরি কে জেন্দেগি আস্ত* (তেহরান: শেরকাতে এন্তেশারাতে পাজ্বাঙ্গ, ১৯৯৭), পৃ. ১৬৫।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বরান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপঃ একটি পর্যালোচনা

ড. বেবী বিশ্বাস*

Abstract: The most important medium of expressing the thought of human being is language. Only language can enable one's express his/her thinking to others. Vocabulary helps language in this respect. So for this reason, one can express theirselves more eloquently in that language which is enriched in its vocabulary. Declension has a great role in enriching vocabulary of Sanskrit language. There are also two kinds of inflection in Sanskrit grammar— nominal inflection and root inflection. Nominal inflection has first to seventh classes. Moreover every nominal inflection has also three kinds of number— Singular, Dual and Plural. After all there are twenty one symbols in this nominal inflection. Masculine, Feminine and Neuter are the three genders in Sanskrit. When the twenty one numbers of nominal inflection connect with the nominal bases or the nominal stem, it transforms the word from which we get the knowledge of cases and numbers. Masculine base inflection in vowels which is connected with the twenty one nominal inflections controlled by the multiple system of Sanskrit grammar brings about transformation in words which I have endeavoured to discuss in this article.

বাগ্‌যন্ত্রের সহায্যে যে সব অর্থবোধক ধ্বনি সৃষ্টি করে মনের ভাব প্রকাশ করা হয় তাকে ভাষা বলে। ভাষাদেহের কোষ হলো শব্দ। জীবদেহ যেমন অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত ভাষাও তেমনি অসংখ্য শব্দের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কতগুলো অর্থবোধক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে জনমনে বিষয়বস্তুর জ্ঞান জন্মালে সেই ধ্বনিকে বলে শব্দ। শব্দ প্রধানত দুই প্রকার— মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ। শব্দের মূলকে বলে প্রকৃতি। প্রকৃতি দুই প্রকার— ধাতু ও প্রাতিপদিক। ভূ বা প্রভৃতি যে সব প্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়া বোঝায় তাকে ধাতু বলে।[১] যা ধাতুও নয়, প্রত্যয়ও নয় বা প্রত্যয়ান্তও নয়, অথচ যার অর্থ আছে, এমন শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। অর্থাৎ বস্তুবাচক, বস্তুর বিশেষণবাচক শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। আবার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত এবং সমাসনিষ্পন্ন শব্দগুলিও প্রাতিপদিক।[২] সুপ্ (সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি) এবং তিঙ্ (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি) যুক্ত প্রাতিপদিক ও ধাতুকে পদ বলে।[৩] সংস্কৃত ভাষায় এই পদ দুই প্রকার— সুবন্ত ও তিঙন্ত। সুপ্ যুক্ত প্রাতিপদিককে সুবন্ত (সুপ্+অন্ত) পদ এবং তিঙ্ যুক্ত ধাতুকে তিঙন্ত (তিঙ্+অন্ত) পদ বলে। প্রাতিপদিক বা নামশব্দের উত্তর যা যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে তাকে বিভক্তি বলে। অথবা যার দ্বারা কর্তৃকর্ম প্রভৃতির অর্থ পৃথক করা হয় তাকে বিভক্তি বলে।[৪] বিভক্তি হতে সংখ্যা, কারক ও সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মায়— সংখ্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ। বিভক্তি দুই প্রকার— সুপ্ বা শব্দবিভক্তি ও তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তি। যেসকল বিভক্তি নাম-প্রকৃতি বা প্রাতিপদিকের সাথে যুক্ত হয়ে নামপদ বা সুবন্ত পদ গঠন করে সেগুলোকে শব্দবিভক্তি বলে। শব্দবিভক্তি সাত প্রকার। যথা— প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী । প্রত্যেকটি শব্দবিভক্তির তিনটি বচন থাকে, যেমন— একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। সুতরাং সব মিলিয়ে শব্দবিভক্তির একুশটি চিহ্ন (৭✕৩=২১) পাওয়া যায়। প্রথমার একবচনের ‘সু’ থেকে আরম্ভ করে সপ্তমীর বহুবচনের ‘সুপ্’-এর ‘প্’ পর্যন্ত হচ্ছে সুপ্ প্রত্যাহার[৫]। কর্তৃবাচ্যে[৬] কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী এবং অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। এছাড়া সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয় এবং সম্বোধনে প্রথমা হয়। সংস্কৃতে লিঙ্গ তিনটি। যথা— পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ(ক্লীবলিঙ্গ)।

সুপ্ বা শব্দবিভক্তির আকৃতি

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সু (ঃ)	ঔ	জস্ (অঃ)

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয়া	অম্	ঔট্ (ঔ)	শস্ (অঃ)
তৃতীয়া	টা (আ)	ভ্যাম্	ভিস্ (ভিঃ)
চতুর্থী	ঙে (এ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
পঞ্চমী	ঙসি (অঃ)	ভ্যাম্	ভ্যস্ (ভ্যঃ)
ষষ্ঠী	ঙস্ (অঃ)	ওস্ (ওঃ)	আম্
সপ্তমী	ঙি (ই)	ওস্ (ওঃ)	সুপ্ (সু)

শব্দরূপ: নামপ্রকৃতি বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে শব্দ বিভক্তি যোগ করে নামপদ বা সুবন্তপদের গঠন, তার পদ্ধতি ও গঠিত রূপের বর্ণনাকে শব্দরূপ বলে। শব্দরূপকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে— অজন্ত (স্বরান্ত) এবং হলন্ত (ব্যঞ্জনান্ত)। যার শেষে অচ্[৭] প্রত্যাহারের কোনো-না-কোনো বর্ণ থাকে তাকে অজন্ত (অচ্+অন্ত) এবং যার অন্তে হল্[৮] প্রত্যাহারের কোনো-না-কোনো বর্ণ থাকে তাকে হলন্ত (হল্+অন্ত) বলে। এগুলো আবার পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, নপুংসকলিঙ্গ (ক্লীবলিঙ্গ) ভেদে তিন প্রকার। এছাড়াও সর্বনাম শব্দ এবং সংখ্যাবাচক শব্দের কিছু ভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। অজন্ত পুংলিঙ্গ শব্দরূপের কিছু পরিচয় তুলে ধরা হবে আলোচ্য প্রবন্ধে। 'সু' প্রভৃতি বিভক্তি প্রাতিপদিকের উত্তর যোগ হয়ে যথাস্থিত অবস্থায় আমাদের কাছে আসে না। বিবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপটি সাধিত হয়। তা না হলে 'নর' শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হতো নর+সু= 'নরসু'। সাধিত রূপ 'নরঃ'। উল্লিখিত মূল বিভক্তিগুলির পরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সাধারণত যা থাকে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

অকারান্ত পুংলিঙ্গ, আকারান্ত পুংলিঙ্গ, ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ ইত্যাদি অজন্ত (স্বরান্ত) শব্দরূপের নিয়মগুলি ক্রমান্বয়ে দেখানো হলো—

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দরূপের নিয়মগুলো নিম্নরূপ—

১. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের 'সু' বিভক্তির উ-কারের লোপ হয় এবং সন্ধির নিয়মে স্ স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়।[৯] যেমন— নর+সু> নরস্> নরর্ (রু)> নরঃ। তদ্রূপ— রামঃ; অধ্যাপকঃ ইত্যাদি।

২. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে 'ঔ' বিভক্তি যুক্ত হয়।[১০] যেমন— নর+ঔ> নরৌ। তদ্রূপ— রামৌ; অধ্যাপকৌ ইত্যাদি।

৩. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে 'ঔট্' (ট্ লোপ পায় ঔ থাকে) বিভক্তি যুক্ত হয়।[১১] যেমন— নর+ঔট্ (ঔ)> নরৌ । তদ্রূপ— রামৌ; অধ্যাপকৌ ইত্যাদি।

৪. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুবচনের 'জস্' বিভক্তির জ্ লোপ পেয়ে 'অস্' হয়[১২] এবং পূর্বসবর্ণ ও দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়।[১৩] সন্ধির নিয়মে স্ স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়।[১৪] যেমন— নর+জস্> নর+অস্> নরাস্> নরার্ (রু)> নরাঃ।

৫. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে 'অম্' বিভক্তির পূর্বরূপ একাদেশ হয়[১৫], সন্ধির নিয়ম অনুসারে দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়নি। যেমন— নর+অম্> নরম্। তদ্রূপ— রামম্; অধ্যাপকম্ ইত্যাদি।

৬. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের 'শস্' বিভক্তির শ্-কারের লোপ পেয়ে 'অস্' হয় এবং অন্ত অ-কারের পূর্বসবর্ণ ও দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়।[১৬] 'অস্' বিভক্তির স্-কার স্থানে ণত্ববিধি অনুসারে ণ্ হয়[১৭] কিন্তু পদান্তে ন-কার হওয়ায় ণ্ না হয়ে ন্ হয়েছে।[১৮] যেমন— নর+শস্> নর+অস্> নরা অস্> নরান্। তদ্রূপ— রামান্; অধ্যাপকান্ ইত্যাদি।

৭. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়ার একবচনের 'টা' বিভক্তির স্থানে ইন আদেশ হয়[১৯] এবং সন্ধির নিয়মে গুণ হয়ে ই-কার স্থানে এ-কার হয়[২০] এবং ণত্ব-বিধানের নিয়মে ন্ স্থানে ণ্ হয়।[২১] যেমন— নর+টা> নর+ইন> নরেন> নরেণ। তদ্রূপ— রামেণ; অধ্যাপকেণ ইত্যাদি।

৮. তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমীর দ্বিবচনের 'ভ্যাম্' বিভক্তির আদিতে ভ-কার হলে অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়;[২২] তবে বহুবচনে একার হয়।[২৩] কিন্তু তৃতীয়ার বহুবচনে 'ভিস্' বিভক্তি স্থানে ঐস্ আদেশ হয়[২৪]এবং সন্ধির নিয়মে

স্ স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়।[২৫] তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমীর দ্বিবচনের রূপ একই এবং চতুর্থী ও পঞ্চমীর বহুবচনের রূপ একই। যেমন— তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমীর দ্বিবচনের রূপ— নর+ভ্যাম্> নরা+ভ্যাম্= নরাভ্যাম্। তদ্রূপ— রামাভ্যাম্; অধ্যাপকাভ্যাম্ ইত্যাদি।

তৃতীয়ার বহুবচনের রূপ— নর+ভিস্> নর ঐস্> নরৈস্> নরৈর্ (রু)> নরৈঃ। তদ্রূপ— রামৈঃ; অধ্যাপকৈঃ ইত্যাদি।

চতুর্থী ও পঞ্চমীর বহুবচনের রূপ— নর+ভ্যস্> নরে+ভ্যস্> নরেভ্যস্> নরেভ্যর্ (রু)> নরেভ্যঃ। তদ্রূপ— রামেভ্যঃ; অধ্যাপকেভ্যঃ ইত্যাদি।

৯. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের চতুর্থীর একবচনের 'ঙে' বিভক্তির স্থানে য আদেশ হয়[২৬], য প্রত্যয়ের পূর্ববর্তী হ্রস্ব অ-কার দীর্ঘ আকারে পরিণত হয়।[২৭]যেমন— নর+ঙে> নর+য> নরা য> নরায়। তদ্রূপ— রামায়; অধ্যাপকায় ইত্যাদি।

১০. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পঞ্চমীর একবচনের 'ঙসি' বিভক্তির স্থানে আৎ আদেশ হয়[২৮] এবং সন্ধির নিয়মে দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়।[২৯] যেমন— নর+ঙসি> নর+আৎ> নরা আৎ> নরাৎ। তদ্রূপ— রামাৎ; অধ্যাপকাৎ ইত্যাদি।

১১. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের' ঙস্' বিভক্তির স্থানে স্য আদেশ হয়।[৩০] যেমন— নর+ঙস্> নর+স্য> নরস্য। তদ্রূপ— রামস্য; অধ্যাপকস্য ইত্যাদি।

১২. ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দ্বিবচনে অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অ-কার স্থানে এ-কার আদেশ হয়[৩১] এবং সন্ধির নিয়মে এ স্থানে অয়্ হয়[৩২] এবং স্ স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়।[৩৩] যেমন— নর+ওস্> নরে+ওস্> নরয়্+ওস্> নরয়োস্> নরয়োর্ (রু)> নরয়োঃ। তদ্রূপ— রাময়োঃ; অধ্যাপকয়োঃ ইত্যাদি।

১৩. ষষ্ঠীর বহুবচনে অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পর এবং 'আম্' বিভক্তির পূর্বে নকার আসে[৩৪] এবং অঙ্গের দীর্ঘ আকার হয়।[৩৫] যেমন— নর+আম্> নর ন আম্> নরা ন আম্> নরানাম্> নরাণাম্ (ণত্ব-বিধানের নিয়মানুসারে ন্ স্থানে ণ্ হয়)।[৩৬] । তদ্রূপ— রামাণাম্; অধ্যাপকানাম্ ইত্যাদি।

১৪. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর একবচনের 'ঙি' বিভক্তির ঙ-কারের লোপ পেয়ে ই-কার থাকে[৩৭] এবং সন্ধির নিয়মে ই-কার স্থানে এ-কার হয়।[৩৮] যেমন— নর+ঙি> নর+ই> নরি> নরে। তদ্রূপ— রামে; অধ্যাপকে ইত্যাদি।

১৫. অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনের 'সুপ্' বিভক্তির প্-কারের লোপ হয়।[৩৯] অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অন্ত্য অ-কার স্থানে এ-কার হয়।[৪০] ষত্ব-বিধানের নিয়মানুসারে স্ স্থানে ষ্ হয়।[৪১] যেমন— নর+সুপ্> নর সু> নরেসু> নরেষু। তদ্রূপ— রামেষু; অধ্যাপকেষু ইত্যাদি।

১৬. সম্বোধনের একবচনকে সম্বুদ্ধি বলে।[৪২] অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সম্বুদ্ধিতে 'সু' বিভক্তির উ-কারের লোপ পেয়ে স্-কার থাকে[৪৩] এবং পরবর্তীতে স্-কারেরও লোপ হয়।[৪৪] যেমন— নর+সু> নর স্> নর। তদ্রূপ— রাম ; অধ্যাপক ইত্যাদি।

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'নর' শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নরঃ	নরৌ	নরাঃ
দ্বিতীয়া	নরম্	নরৌ	নরান্
তৃতীয়া	নরেণ	নরাভ্যাম্	নরৈঃ
চতুর্থী	নরায়	নরাভ্যাম	নরেভ্যঃ
পঞ্চমী	নরাৎ	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
ষষ্ঠী	নরস্য	নরয়োঃ	নরাণাম্
সপ্তমী	নরে	নরয়োঃ	নরেষু
সম্বোধন	নর	নরৌ	নরা

সর্বনাম ভিন্ন অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ যথা— অধ্যাপক, অনল, অমাত্য, অধর, মানুষ, গজ, অশ্ব, হর, দেব, অসুর, দৈত্য, স্বর্গ, বৃক্ষ, গ্রাম, নৃপ, দেশ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, বালক, জনক, শিষ্য, পুত্র, কাল, সূর্য, রথ, বিড়াল, বসন্ত,

গ্রীষ্ম ইত্যাদি শব্দের রূপ নর শব্দের মতো হবে। মিত্র শব্দ পুংলিঙ্গে সূর্য বোঝায় তখন 'নর' শব্দের মতো হবে। ক্লীবলিঙ্গে বন্ধু বোঝায়, তখন 'ফল' শব্দের মতো রূপ হবে।

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ হতে আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পৃথক নিয়মগুলো নিম্নে দেখানো হলো—

১৭. স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকলে আ-কারান্ত প্রাতিপদিকের আ-কার লুপ্ত হয়; কিন্তু অন্ত্য আ-কারটি ধাতু ভিন্ন হলে লুপ্ত হয় না।[৪৫] আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের 'শস্' বিভক্তির শ্-কারের লোপ পেয়ে অস্ হয়।[৪৬] 'অস্' বিভক্তির স্-কার স্থানে ণত্ব-বিধি অনুসারে ণ্ হলেও[৪৭] পদান্ত ন-কার হওয়ায় ণত্ব হয়নি অর্থাৎ ণ্ না হয়ে ন্ হয়েছে।[৪৮] অনুবন্ধলোপে 'ঙে' বিভক্তির ঙ্-কারের লোপ হয়ে এ, 'ঙসি' বিভক্তির ঙ্ ও ই-কারের লোপ হয়ে স্, 'ঙস্' বিভক্তির ঙ-কারের লোপ হয়ে স্, 'ঙি' বিভক্তির ঙ্-কারের লোপ হয়ে ই-কার থাকে।[৪৯] সন্ধির নিয়মে স্ স্থানে বিসর্গ(ঃ) হয়।[৫০] যেমন—
আ-কারান্ত 'হাহা' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ— হাহা+শস্ > হাহা+অস্> হাহা+অণ্> হাহান্।
আ-কারান্ত 'হাহা' শব্দের চতুর্থীর একবচনের রূপ— হাহা+ঙে> হাহা+এ> হাহৈ ।
আ-কারান্ত 'হাহা' শব্দের পঞ্চমীর একবচনের রূপ— হাহা+ঙসি> হাহা+স্> হাহাঃ ।
আ-কারান্ত 'হাহা' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ— হাহা+ঙস্> হাহা+স্> হাহাঃ।
আ-কারান্ত 'হাহা' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের রূপ— হাহা+ঙি> হাহা+ই> হাহে।
'হাহা' শব্দের অন্য সকল বিভক্তির রূপ 'গোপা' শব্দের মতো।
আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের বাকী নিয়মগুলো অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের মতো।

আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'গোপা' শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গোপাঃ	গোপৌ	গোপাঃ
দ্বিতীয়া	গোপাম	গোপৌ	গোপঃ
তৃতীয়া	গোপা	গোপাভ্যাম্	গোপাভিঃ
চতুর্থী	গোপে	গোপাভ্যাম্	গোপাভ্যঃ
পঞ্চমী	গোপঃ	গোপাভ্যাম্	গোপাভ্যঃ
ষষ্ঠী	গোপঃ	গোপোঃ	গোপাম্
সপ্তমী	গোপি	গোপোঃ	গোপাসু
সম্বোধন	গোপাঃ	গোপৌ	গোপাঃ

বিশ্বপা, ধূমপা, বলদা, সোমপা, শোঙ্খধ্মা, পুন্যদা, মধুপা প্রভৃতি শব্দের রূপ গোপা শব্দের মতো ।

ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দরূপের নিয়মগুলো নিম্নরূপ—

১৮. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ, অ-কারান্ত পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের রূপের মতো। যেমন— ই-কারান্ত— মুনি+সু> মুনি+স্> মুনিস্[৫১]> মুনিঃ[৫২]। উ-কারান্ত— সাধু+সু> সাধু+স্ > সাধু+সাধুস্[৫৩]> সাধুঃ[৫৪] ।

১৯. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকায় পূর্বসবর্ণ ও দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়।[৫৫] অনুবন্ধলোপে ঔকার লোপ পেয়েছে। যেমন— মুনি+ঔ> মুনী; সাধু+ঔ> সাধূ।

২০. দ্বিতীয়ার একবচনে অম্ প্রত্যয় পরে থাকায় পূর্বরূপ একাদেশ হয় দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়না।[৫৬] যেমন— মুনি+অম্> মুনিম্; সাধু+অম্> সাধুম্।

২১. প্রথমার বহুবচনে 'জস্' বিভক্তির জ্ লোপ পেয়ে অস্ হয়।[৫৭] সন্ধির নিয়মে ই-কার স্থানে এ; উ-কার স্থানে ও[৫৮] এবং এ স্থানে অয়; ও স্থানে অব্ হয়।[৫৯] যেমন— মুনি+জস্> মুনি+অস্> মুনে+অস্> মুনয়্+অস্> মুনয়স্[৬০]> মুনয়র্ (রু)[৬১]> মুনয়ঃ[৬২]। সাধু+জস্> সাধু+অস্> সাধো+অস্ > সাধবস্> সাধবর্ (রু) [৬৩]> সাধবঃ[৬৪] ।

২২. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুবচন ও সম্বোধনের বহুবচনের রূপ একই। যেমন— মুনয়ঃ; সাধবঃ।

২৩. দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'শস্' বিভক্তির শ্-কারের লোপ হয়ে 'অস্' হয়[৬৫] এবং ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পূর্বসবর্ণ ও দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়।[৬৬] 'অস্' বিভক্তির স্-কার স্থানে ণত্ববিধি অনুসারে ণ্ হলেও[৬৭] পদান্ত ন-কার হওয়ায় ণত্ব হয়নি অর্থাৎ ণ্ না হয়ে ন্ হয়েছে।[৬৮] যেমন— মুনি+ শস্> মুনি+অস্> মুনী অস্> মুনীস্> মুনীন্। সাধু+শস্> সাধু+অস্> সাধূ অস্> সাধূস্> সাধূন্।

২৪. তৃতীয়ার একবচনে 'টা' বিভক্তির স্থানে না আদেশ হয়।[৬৯] যেমন— মুনি+টা> মুনি+না> মুনিনা; সাধু+টা> সাধু+না> সাধুনা।

২৫. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমীর দ্বিবচনে 'ভ্যাম্' বিভক্তি যুক্ত হয়। তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমীর দ্বিবচনের রূপ একই এবং চতুর্থী ও পঞ্চমীর বহুবচনের রূপ একই। যেমন— ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমীর দ্বিবচনের রূপ— মুনি+ভ্যাম্> মুনিভ্যাম্। উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমীর দ্বিবচনের রূপ— সাধু+ভ্যাম্> সাধুভ্যাম্ ।

২৬. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে 'ভিস্' বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সন্ধির নিয়মে স্ স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়।[৭০] যেমন— মুনি+ভিস্> মুনিভিস্> মুনিভির্ (রু)> মুনিভিঃ। সাধু+ভিস্> সাধুভিস্> সাধুভির্ (রু)> সাধুভিঃ।

২৭. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের চতুর্থী ও পঞ্চমীর বহুবচনে 'ভ্যস্' বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সন্ধির নিয়মে স্ স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়।[৭১] যেমন— মুনি+ভ্যস্> মুনিভ্যস্> মুনিভ্যর্ (রু)> মুনিভ্যঃ। সাধু + ভ্যস্ > সাধুভ্যস্ > সাধুভ্যর্ (রু) > সাধুভ্যঃ।

২৮. চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সম্বোধনের একবচনের 'ঙিৎ' (ঙে, ঙসি, ঙস্) প্রত্যয় পরে থাকায় ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অঙ্গের ই-কারের গুণ একার ও উ-কারের গুণ ওকার হয়[৭২] এবং এ স্থানে অয়; ও স্থানে অব্ হয়[৭৩]। আর ঙে বিভক্তির ঙ্-কারের লোপ হয়ে এ হয়।[৭৪] যেমন— মুনি+ঙে> মুনে+ঙে> মুনয়্+এ> মুনয়ে। সাধু+ঙে> সাধো+ঙে> সাধব্+এ> সাধবে।

২৯. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর 'ঙসি' বিভক্তির ঙ-কার ও ই-কারের লোপে স্-কার থাকে এবং 'ঙস্' বিভক্তির ঙ-কারের লোপে স্-কার থাকে এবং 'ঙসি' ও 'ঙস্' প্রত্যয়ের অ-কার পরে থাকায় পূর্বরূপ একাদেশ হয়েছে অর্থাৎ এ-কার এবং ও-কার মাত্রই অবশিষ্ট রয়েছে।[৭৫] সন্ধির নিয়মে স্ স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়েছে।[৭৬] যেমন—

মুনি+ঙসি> মুনে+স্> মুনেস্> মুনের্ (রু)> মুনেঃ। সাধু+ঙসি> সাধো+স্> সাধোস্> সাধোঃ । মুনি+ঙস্> মুনে+স্> মুনেস্> মুনের্ (রু)> মুনেঃ। সাধু+ঙস্> সাধো+স্> সাধোস্> সাধোঃ ।

৩০. সপ্তমীর একবচনে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অঙ্গের ই-কার ও উ-কার স্থানে অ-কার আদেশ হয়[৭৭] এবং 'ঙি' প্রত্যয়ের স্থানে ঔ-কার আদেশ হয়।[৭৮] যেমন— মুনি+ঙি> মুন+ঔ> মুনৌ; সাধু+ঙি> সাধ+ঔ> সাধৌ।

৩১. সম্বুদ্ধির (=সম্বোধনের একবচনে) ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অঙ্গের ই-কারের গুণ এ-কার ও উ-কারের গুণ ও-কার হয়।[৭৯] আর সম্বুদ্ধির হল্ প্রত্যয় অর্থাৎ 'সু' বিভক্তির লোপ হয়।[৮০] যেমন— মুনি+সু> মুনে+সু> মুনে; সাধু+সু> সাধো+সু>সাধো।

৩২. ষষ্ঠীর বহুবচনে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের 'আম্' বিভক্তির পূর্বে ন-কার আসে[৮১] এবং নাম্ পরে থাকায় স্বরান্ত অঙ্গের দীর্ঘাদেশ হয়।[৮২] যেমন— মুনি+আম্> মুনি ন আম্> মুনী ন আম্> মুনীনাম্। সাধু+আম্> সাধু ন আম্> সাধূ ন আম্> সাধূনাম্ ।

৩৩. ষষ্ঠীর ও সপ্তমীর দ্বিবচনে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ই-কার স্থানে য ও উ-কার স্থানে ব হয়[৮৩]এবং স্-কার স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়।[৮৪] যেমন— মুনি+ওস্> মুন্য+ওস্> মুন্যোস্> মুন্যোঃ; সাধু+ওস্> সাধ্ব ওস্> সাধ্বোস্> সাধ্বোঃ।

৩৪. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনে 'সুপ্' বিভক্তির প্-কারের লোপে সু থাকে[৮৫] এবং ষত্ব-বিধানানুসারে স্ স্থানে ষ্ হয়।[৮৬] যেমন— মুনি+সুপ্> মুনি+সু> মুনিসু> মুনিষু; সাধু+সুপ্> সাধু+সু> সাধুসু> সাধুষু।

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'মুনি' শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ
দ্বিতীয়া	মুনিম্	মুনী	মুনীন্
তৃতীয়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ
চতুর্থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
পঞ্চমী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনিণাম্
সপ্তমী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু
সম্বোধন	মুনে	মুনী	মুনয়ঃ

'পতি' ও 'সখি' ভিন্ন যাবতীয় পুংলিঙ্গ ই–কারান্ত শব্দ 'মুনি' শব্দের মতো। যথা— হরি, কবি, গিরি, বিধি, নিধি, ঋষি, রবি, অগ্নি, অতিথি, অলি, অসি, ইত্যাদি।

৩৫. অন্য কোনো শব্দের সাথে সমাস হলে পতি শব্দের রূপ মুনি শব্দের মতো।[৮৭] অতএব নৃপতি, ভূপতি, মহীপতি প্রভৃতি শব্দের রূপ মুনি শব্দের মতো।

৩৬. 'আ' (টা), 'এ' (ঙে) প্রভৃতি স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকলে পতি শব্দের অন্ত্য ই-কারের স্থানে সন্ধির নিয়মে য-কার আদেশ হয়।[৮৮] তারপর ঙ-কারলোপী উক্ত বিভক্তির অ-কার স্থানে উ-কার আদেশ হয়।[৮৯] যেমন—পতি+টা> পত্য+আ> পত্যা। পতি+ঙে> পত্য+এ> পত্যে; পতি+ঙসি> পত্য+অস্> পত্য+অর্ (রু)[৯০]> পত্য+অঃ[৯১]> পত্য+উঃ> পত্যুঃ; পতি+ঙস্> পত্য+অস্> পত্য+অর্ (রু)[৯২]> পত্য+অঃ[৯৩]> পত্য+উঃ> পত্যুঃ।

৩৭. ই-কারান্ত পতি শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'ঙি' বিভক্তির ই-কার স্থানে ঔ-কার আদেশ হয়[৯৪] এবং পতি শব্দের ই-কার স্থানে য-কার আদেশ হয়।[৯৫] যেমন— পতি+ঙি> পত্য+ই> পত্য+ঔ>পত্যৌ।

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'পতি(স্বামী/প্রভু)' শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পতিঃ	পতী	পতয়ঃ
দ্বিতীয়া	পতিম্	পতী	পতীন্
তৃতীয়া	পত্যা	পতিভ্যাম্	পতিভিঃ
চতুর্থী	পত্যে	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
পঞ্চমী	পত্যুঃ	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	পত্যুঃ	পত্যোঃ	পতীনাম্
সপ্তমী	পত্যৌ	পত্যোঃ	পতিষু
সম্বোধন	পতে	পতী	পতয়ঃ

সখি শব্দের রূপ তৃতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত পতি শব্দের মতো।

৩৮. 'সু' বিভক্তিতে সখি শব্দের ই-কার স্থানে অনঙ্ অর্থাৎ অন্ আদেশ হয়। তারপর প্রথম পাঁচটি বিভক্তি (সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্) সর্বনামস্থানসংজ্ঞক হওয়ায় সম্বুদ্ধি ভিন্ন সর্বনামস্থান বিভক্তি পরে থাকায় ন-কারান্ত সখন্ শব্দের উপধার দীর্ঘ আদেশ হয়।[৯৬] তারপর স-কার এবং ন-কার লুপ্ত হয়ে 'সখা' পদ সিদ্ধ হয়। যেমন— সখি+সু> সখন্+স্> সখান্+স্> সখা।

৩৯. সখি শব্দের অঙ্গ ই-কারের পর সম্বুদ্ধি ভিন্ন সর্বনামস্থান (=সুট্) প্রত্যয়ের ণলোপীর মতো কার্য হয়[৯৭] বলে স্বরবর্ণ অঙ্গ ই-কারের বৃদ্ধি ঐ-কার হওয়ায়[৯৮] পরে সন্ধির নিয়মে ঐ-কার স্থানে আয় হয়েছে।[৯৯] কিন্তু সম্বুদ্ধিতে বৃদ্ধি না হওয়ায় গুণ হয়েছে এবং পরে 'সু' বিভক্তির লোপ হয়েছে। যেমন–
সখি+ঔ> সখায়্+ঔ> সখায়ৌ; সখি+ঔট্> সখায়্+ঔ> সখায়ৌ।
সখি শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনের রূপ— সখি+অম্> সখায়্+অম্> সখায়ম্।
সখি শব্দের সম্বোধনের একবচনের রূপ— সখি+সু> সখে।

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'সখি(বন্ধু)' শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সখা	সখায়ৌ	সখায়ঃ
দ্বিতীয়া	সখায়ম্	সখায়ৌ	সখীন্
তৃতীয়া	সখ্যা	সখিভ্যাম্	সখিভিঃ
চতুর্থী	সখ্যে	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
পঞ্চমী	সখ্যুঃ	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
ষষ্ঠী	সখ্যুঃ	সখ্যোঃ	সখীনাম্
সপ্তমী	সখ্যৌ	সখ্যোঃ	সখিষু
সম্বোধন	সখে	সখায়ৌ	সখয়ঃ

'সখি' শব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে সমাস হলে 'সখ' হয়। তখন প্রিয়সখ, রাজসখ প্রভৃতি শব্দের রূপ 'নর' শব্দের মতো হয়।

উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'সাধু' শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সাধুঃ	সাধূ	সাধবঃ
দ্বিতীয়া	সাধুম্	সাধূ	সাধূন্
তৃতীয়া	সাধুনা	সাধুভ্যাম্	সাধুভিঃ
চতুর্থী	সাধবে	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
পঞ্চমী	সাধোঃ	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	সাধোঃ	সাধ্বোঃ	সাধূনাম্
সপ্তমী	সাধৌ	সাধ্বোঃ	সাধুষু
সম্বোধন	সাধো	সাধূ	সাধবঃ

গুরু, তরু, বন্ধু, রিপু, ঋতু, পশু, প্রভু প্রভৃতি উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সাধু শব্দের মতো।

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ হতে ঈ-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পৃথক নিয়মগুলো নিচে দেখানো হলো–

৪০. ঈ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ, অ-কারান্ত পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের রূপের মতো। যেমন— ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ— সুধী+সু> সুধী+স্> সুধীস্> সুধীর্ (রু)> সুধীঃ। ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ—স্বভূ+সু+ঔ> স্বভূ+স্> স্বভূস্> স্বভূর্ (রু)> স্বভূঃ।

৪১. অজাদি (স্বরাদি) প্রত্যয় পরে থাকলে ঈ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অঙ্গস্থ স্বরের স্থানে ইয়ঙ্ ও উবঙ্ আদেশ হয়।[১০০] সম্বুদ্ধিতে হ্রস্বাদেশ[১০১] ও সুলোপ হয়নি।[১০২] যেমন— ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের রূপ— সুধী+ঔ> সুধিয়ঙ্+ঔ> সুধিয়+ঔ> সুধিয়ৌ। উকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের রূপ— স্বভূ+ঔ> স্বভুবঙ্+ঔ> স্বভুব+ঔ> স্বভুবৌ। ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ— সুধী+জস্> সুধিয়ঙ্+অস্> সুধিয়+অস্> সুধিয়র্ (রু)> সুধিয়ঃ । উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ— স্বভূ+জস্> স্বভুবঙ্+অস্> স্বভুব+অস্> স্বভুবর্ (রু)> স্বভুবঃ। ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনের রূপ— সুধী+অম্> সুধিয়ঙ্+অম্> সুধিয়+অম্> সুধিয়ম্। উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনের

রূপ— স্বভূ+অম্> স্বভুবঙ্+অম্> স্বভুব+অম্> স্বভুবম্। ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ— সুধী+টা> সুধিয়ঙ্+আ> সুধিয়+আ> সুধিয়া। ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ— স্বভূ+টা> স্বভুবঙ্+আ> স্বভুব+আ> স্বভুবা। ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের চতুর্থীর একবচনের রূপ— সুধী+ঙে> সুধিয়ঙ্+এ> সুধিয়+এ> সুধিয়ে। ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের চতুর্থীর একবচনের রূপ— স্বভূ+ঙে> স্বভুবঙ্+এ> স্বভুব+এ> স্বভুবে। ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পঞ্চমীর একবচনের রূপ— সুধী+ঙসি> সুধিয়ঙ্+স্> সুধিয়+স্> সুধিয়স্> সুধিয়র্ (রু)> সুধিয়ঃ।

ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পঞ্চমীর একবচনের রূপ— স্বভূ+ঙসি> স্বভুবঙ্+স্> স্বভুব+স্> স্বভুবস্> স্বভুবঃ। ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দ্বিবচনের রূপ— সুধী+ওস্> সুধিয়ঙ্+ওস্> সুধিয়+ওস্> সুধিয়োস্> সুধিয়োর্ (রু)> সুধিয়োঃ। ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দ্বিবচনের রূপ— স্বভূ+ওস্> স্বভুবঙ্+ওস্> স্বভুব+ওস্> স্বভুবোস্> স্বভুবোর্ (রু)> স্বভুবোঃ। ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ— সুধী+আম্> সুধিয়ঙ্+আম্> সুধিয়+আম্> সুধিয়াম্। ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ— স্বভূ+আম্> স্বভুবঙ্+আম্> স্বভুব+আম্> স্বভুবাম্। ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনের রূপ— সুধী+সুপ্> সুধী+সু> সুধীসু> সুধীষু। ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর বহুবচনের রূপ— স্বভূ+সুপ্> স্বভূ+সু> স্বভূসু> স্বভূষু। ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনের একবচনের রূপ— সুধী+সু> সুধী+স্[১০৩]> সুধীস্> সুধীর্ (রু)[১০৪]> সুধীঃ[১০৫]। ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনের একবচনের রূপ— স্বভূ+সু> স্বভূ+স্[১০৬]> স্বভূস্> স্বভূর্ (রু)[১০৭]> স্বভূঃ[১০৮]।

ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'সুধী(জ্ঞানী লোক)' শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সুধীঃ	সুধীয়ৌ	সুধিয়ঃ
দ্বিতীয়া	সুধিয়ম্	সুধীয়ৌ	সুধিয়ঃ
তৃতীয়া	সুধিয়া	সুধিভ্যাম্	সুধিভিঃ
চতুর্থী	সুধিয়ে	সুধিভ্যাম্	সুধিভ্যঃ
পঞ্চমী	সুধিয়ঃ	সুধিভ্যাম্	সুধিভ্যঃ
ষষ্ঠী	সুধিয়ঃ	সুধিয়োঃ	সুধিয়াম্
সপ্তমী	সুধিয়ি	সুধিয়োঃ	সুধীষু
সম্বোধন	সুধীঃ	সুধীয়ৌ	সুধিয়ঃ

সেনানী, অগ্রণী, গ্রামণী প্রভৃতি কতগুলো শব্দ ভিন্ন ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সুধী শব্দের মতো। যথা— সুশ্রী, হতশ্রী ইত্যাদি।

ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'স্বভূ (স্বদেশ/ ভূমি) শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	স্বভূঃ	স্বভুবৌ	স্বভুবঃ
দ্বিতীয়া	স্বভুবম্	স্বভুবৌ	স্বভুবঃ
তৃতীয়া	স্বভুবা	স্বভূভ্যাম্	স্বভূভিঃ
চতুর্থী	স্বভুবে	স্বভূভ্যাম্	স্বভূভ্যঃ
পঞ্চমী	স্বভুবঃ	স্বভূভ্যাম্	স্বভূভ্যঃ
ষষ্ঠী	স্বভুবঃ	স্বভুবোঃ	স্বভুবাম্
সপ্তমী	স্বভুবি	স্বভুবোঃ	স্বভূষু
সম্বোধন	স্বভূঃ	স্বভুবৌ	স্বভুবঃ

প্রতিভূ, অধিভূ প্রভৃতি ঊ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ স্বভূ শব্দের মতো।

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ হতে ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ব্যতিক্রম নিয়মগুলো নিম্নে দেখানো হলো—

৪২. ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সর্বনাম স্থান অর্থাৎ সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্ বিভক্তিতে অন্ত্য ঋ-কারের বৃদ্ধি[১০৯] আর্ হয় এবং সু বিভক্তির লোপ হয়। যেমন— ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ— দাতৃ+সু> দাতার্+সু> দাতা। ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার দ্বিবচনের রূপ— দাতৃ+ঔ> দাতার্+ঔ> দাতারৌ। ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার বহুবচনের রূপ— দাতৃ+জস্> দাতার্+অস্> দাতারস্> দাতারর্ (রু)> দাতারঃ। ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনের রূপ— দাতৃ+অম্> দাতার্+অম্> দাতারম্। ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের রূপ— দাতৃ+ঔট্> দাতার্+ঔ> দাতারৌ ।

ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'দাতৃ'(দাতা) শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দাতা	দাতারৌ	দাতারঃ
দ্বিতীয়া	দাতারম্	দাতারৌ	দাতৄন্
তৃতীয়া	দাত্রা	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভিঃ
চতুর্থী	দাত্রে	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	দাতুঃ	দাতৃভ্যাম্	দাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	দাতুঃ	দাত্রোঃ	দাতৃণাম্
সপ্তমী	দাতরি	দাত্রোঃ	দাতৃষু
সম্বোধন	দাতঃ	দাতারৌ	দাতারঃ

সবিতৃ, হোতৃ, কর্তৃ, বিধাতৃ প্রভৃতি ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ 'দাতৃ শব্দের মতো হবে।

ঋ-কারান্ত পুংলিঙ্গ 'ভ্রাতৃ'(ভ্রাতা/ভাই) শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ভ্রাতা	ভ্রাতারৌ	ভ্রাতারঃ
দ্বিতীয়া	ভ্রাতারম্	ভ্রাতারৌ	ভ্রাতৄন্
তৃতীয়া	ভ্রাত্রা	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভিঃ
চতুর্থী	ভ্রাত্রে	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী	ভ্রাতুঃ	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী	ভ্রাতুঃ	ভ্রাত্রোঃ	ভ্রাতৃণাম্
সপ্তমী	ভ্রাতরি	ভ্রাত্রোঃ	ভ্রাতৃষু
সম্বোধন	ভ্রাতঃ	ভ্রাতারৌ	ভ্রাতারঃ

৪৩. পিতৃ, মাতৃ, ননান্দৃ, নৃ, সব্যেষ্টৃ (সারথী), ভাতৃ, যাতৃ (ভ্রাতৃবধূ), জামাতৃ, দুহিতৃ, দেবৃ (দেবর)— এই দশটি শব্দের প্রথমার সকল বিভক্তিতে এবং দ্বিতীয়ার একবচন ও দ্বিবচনে অন্ত্য ঋ-কারের স্থানে গুণ অর্ হয়। মাতৃ, ননান্দৃ, যাতৃ ও দুহিতৃ— এই চারটি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। এরা দুহিতৃ শব্দের রূপের মতো হবে। পিতৃ, নৃ, সব্যেষ্টৃ (সারথী), ভাতৃ, জামাতৃ ও দেবৃ (দেবর)— এই ছয়টি শব্দ পুংলিঙ্গ। এরা ভ্রাতৃ শব্দের রূপের মতো হবে। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার বহুবচনে পার্থক্য আছে। অন্য সব ক্ষেত্রে একই।

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ হতে ও-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ব্যতিক্রম নিয়মগুলো নিম্নে দেখানো হলো—

৪৪. সর্বনামস্থান বিভক্তি (অর্থাৎ সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্) পরে থাকলে গো শব্দের ও-কারের বৃদ্ধি হয়ে ঔ-কার হয়।[১১০] সন্ধির নিয়মে ঔ-কার স্থানে আব্ হয়।[১১১] যেমন— গো+সু> গৌ+স্[১১২]> গৌস্> গৌর্ (রু)[১১৩]> গৌঃ[১১৪]।

৪৫. তবে 'অম্' ও 'শস্' বিভক্তি পরে থাকলে ওকার এবং অকার এই উভয় স্থানে আকার এই একটিমাত্র আদেশ হয়।[১১৫] যেমন— গো+অম্> গা+অম্> গাম্। গো+শস্> গা+অস্> গাস্> গার্ (রু)[১১৬]> গাঃ[১১৭]।

ও-কারান্ত পুংলিঙ্গ গো (ষাঁড়) শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ
দ্বিতীয়া	গাম্	গাবৌ	গাঃ
তৃতীয়া	গবা	গোভ্যাম্	গোভিঃ
চতুর্থী	গবে	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
পঞ্চমী	গোঃ	গোভ্যাম্	গোভ্যঃ
ষষ্ঠী	গোঃ	গবোঃ	গবাম্
সপ্তমী	গবি	গবোঃ	গোষু
সম্বোধন	গৌঃ	গাবৌ	গাবঃ

ও-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ গো (ষাঁড়) শব্দের মতো ।

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ হতে ঐকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ব্যতিক্রম নিয়মগুলো নিম্নে দেখানো হলো—

৪৬. ব্যঞ্জনাদি বিভক্তি পরে থাকলে রৈ শব্দের অন্ত ঐ-কার স্থানে আকার আদেশ হয়।[১১৮] যেমন—

ঐ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ— রৈ+ সু> রা+স্> রাস্> রার্ (রু)> রাঃ।

ঐ-কারান্ত পুংলিঙ্গ রৈ (ঐশ্বর্য) শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাঃ	রায়ৌ	রায়ঃ
দ্বিতীয়া	রায়ম্	রায়ৌ	রায়ঃ
তৃতীয়া	রায়া	রাভ্যাম্	রাভিঃ
চতুর্থী	রায়ে	রাভ্যাম	রাভ্যঃ
পঞ্চমী	রায়ঃ	রাভ্যাম	রাভ্যঃ
ষষ্ঠী	রায়ঃ	রায়োঃ	রায়াম্
সপ্তমী	রায়ি	রায়োঃ	রাসু
সম্বোধন	রাঃ	রায়ৌ	রায়ঃ

ঐ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ রৈ শব্দের মতো।

ঔ-কারান্ত পুংলিঙ্গ গ্লৌ (চাঁদ) শব্দের রূপ

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গ্লৌঃ	গ্লাবৌ	গ্লাবঃ
দ্বিতীয়া	গ্লাবম্	গ্লাবৌ	গ্লাবঃ
তৃতীয়া	গ্লাবা	গ্লৌভ্যাম্	গ্লৌভিঃ
চতুর্থী	গ্লাবে	গোভ্যাম্	গ্লৌভ্যঃ
পঞ্চমী	গ্লাবঃ	গ্লৌভ্যাম্	গ্লৌভ্যঃ
ষষ্ঠী	গ্লাবঃ	গ্লাবোঃ	গ্লাবাম্
সপ্তমী	গ্লাবি	গ্লাবোঃ	গ্লৌষু
সম্বোধন	গ্লৌঃ	গ্লাবৌ	গ্লাবঃ

ঔ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ গ্লৌ (চাঁদ) শব্দের মতো।

সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণের ওপর অধিক নির্ভরশীল। ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মনীতির ওপর এ ভাষা প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত ভাষার পরিধিও অত্যন্ত ব্যাপক। যে কোনো ভাষাকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর করতে হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্দরূপের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। সংস্কৃত সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি ২১টি শব্দ বিভক্তি বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের

বিভিন্নরূপ গঠন করে। যেমন— নর+সু= নরঃ (একজন মানুষ)। আপত দৃষ্টিতে এখানে আমরা সু-বিভক্তির কোনো চিহ্ন পাই না। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সু-বিভক্তির উ-কার লোপ পেয়ে 'স্' থাকে। পরে সন্ধির নিয়মে 'স্' স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়েছে। নর+ঔ= নরৌ (দুইজন মানুষ)। এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' (৬/১/১০২) সূত্রে প্রাপ্ত পূর্বসবর্ণদীর্ঘ 'নাদিচি' (৬/১/১০৪) সূত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে 'বৃদ্ধিরেচি' (৬/১/৮৮) সূত্রে বৃদ্ধিরেকাদেশে নরৌ হয়েছে। আবার নর+জস্= নরাঃ (মানুষগুলো)। এখানে 'জস্' বিভক্তির জ্ লোপ পেয়ে অস্ হয়েছে এবং পূর্বসবর্ণ ও দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়েছে; সন্ধির নিয়মে স্ স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়েছে। এভাবে 'সুপ্' বিভক্তি সংস্কৃত ব্যাকরণের বহুবিধ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বিভক্তিযুক্ত শব্দের রূপান্তর ঘটায় এবং সংখ্যা ও কারকের জ্ঞান জন্মায়। সংস্কৃতে স্বরান্ত, ব্যঞ্জনান্ত, বতুপ্, মতুপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত অসংখ্য শব্দ রয়েছে। ২১টি 'সুপ্' বিভক্তি যোগে এসব শব্দের বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ হয়ে থাকে। আবার শব্দরূপের জ্ঞান ছাড়া সংস্কৃতে বাক্য গঠনও অসম্ভব। শব্দরূপের স্বরান্ত অ-কারান্ত, আ-কারান্ত, ই-কারান্ত, ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত, ঋ-কারান্ত, এ-কারান্ত, ঐ-কারান্ত, ও-কারান্ত প্রভৃতি শব্দের শব্দরূপের নিয়মগুলো যথাযথ জানতে পারলে বিভিন্ন শব্দের বচন, লিঙ্গ, বিভক্তি, সংখ্যা ও কারকের জ্ঞান জন্মে। শব্দরূপের জ্ঞান ছাড়া বেদার্থ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, কোশ প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. "ভূবাদয়ো ধাতবঃ"(১/৩/১)।
২. "অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্"(১/২/৪৫); "কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ"(১/২/৪৬)।
৩. 'সুপ্তিঙন্তং পদম্'(১/৪/১৪)।
৪. 'বিভজ্যন্তে পৃথক্ ক্রিয়ন্তে কর্তৃকর্মাদয়ো যয়া সা বিভক্তিঃ'।
৫. 'প্রত্যাহ্রিয়ন্তে সংক্ষিপ্য গৃহ্যন্তে বর্ণা অনেন ইতি প্রত্যাহারঃ'— যার দ্বারা সংক্ষেপে অনেক বর্ণের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকে প্রত্যাহার বলে। যেমন, 'অণ্' একটি প্রত্যাহার। অণ্ বলতে আমরা অ ই উ-কে বুঝি। প্রত্যাহারের অন্তবর্ণটি ইৎ (লোপ) হয়। এখানে ণ্ ইৎ যায়।
৬. বাক্যের যে রীতিতে তিঙন্ত ক্রিয়ার প্রয়োগে সাক্ষাৎভাবে কর্তার কথাই প্রধানভাবে বলা হয়, তা কর্তৃবাচ্য। যেমন— শিশুঃ চন্দ্রং পশ্যতি।
৭. অ থেকে ঔ পর্যন্ত সমস্ত স্বরবর্ণকে অচ্ বলে।
৮. ক থেকে হ পর্যন্ত সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে হল্ বলে।
৯. অনুবন্ধলোপে সু বিভক্তির উকার ইৎ যায়; 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬) অর্থাৎ পদান্তে সকার স্থানে র্ (রু) হয়; 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫) অর্থাৎ খর্ প্রত্যাহারের অন্তর্গত স্ পরে থাকায় রু (র্) স্থানে বিসর্গ (ঃ) হয়।
১০. 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' (৬/১/১০২) সূত্রে প্রাপ্ত পূর্বসবর্ণদীর্ঘ 'নাদিচি' (৬/১/১০৪) সূত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে 'বৃদ্ধিরেচি' (১/১/১) সূত্রে বৃদ্ধিরেকাদেশ হয়েছে।
১১. *প্রাগুক্ত*।
১২. 'চুটূ' (১/৩/৭) ; অনুবন্ধলোপে জস্ বিভক্তির জ্ লোপ হয়ে অস্ হয়েছে।
১৩. 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' (৬/১/১০২);
১৪. 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬) ; 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫)।
১৫. 'অমি পূর্বঃ' (৬/১/১০৭)। একাদেশ বলতে পূর্ব এবং পর এই দুটি বর্ণ মিলে একরূপ হওয়াকে বুঝায়।
১৬. 'লশক্বতদ্ধিতে'(১/৩/৮) সূত্রানুসারে শস্ বিভক্তির শ-কারের লোপ হয়েছে। কিন্তু 'ন বিভক্তৌ তুস্মাঃ' () এই সূত্রানুসারে স্-কারের লোপ হয়নি, 'প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ' (৬/১/১০২) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘরূপ একাদেশ হয়েছে।
১৭. 'তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসি' (৬/১/১০৩)।
১৮. 'পদান্তস্য' (৮/৪/৩৭)।
১৯. 'টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ' (৭/১/১২)।
২০. 'আদ্গুণঃ' (৬/১/৮৭)।— অ, এ এবং ও গুণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ— ই ঈ স্থানে এ; উ ঊ স্থানে ও; ঋ ৠ স্থানে অর্ এবং ৯ স্থানে অল্ হওয়াকে গুণ বলে। যেমন— দেব+ইন্দ্রঃ= দেবেন্দ্রঃ।
২১. 'অট্কুপবাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি' (৮/৪/২)।
২২. 'সুপি চ' (৭/৩/১০২)।
২৩. 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' (৭/৩/১০৩)।
২৪. 'অতো ভিস ঐস্' (৭/১/৯)।
২৫. 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬); 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫) এবং অনুবন্ধলোপে রু-এর উ-কার লোপ পেয়েছে।

২৬. ‘টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ’ (৭/১/১২)।
২৭. ‘সুপি চ’ (৭/৩/১০২)।
২৮. ‘টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ’ (৭/১/১২)। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যে রূপ পরিবর্তন তাকে আদেশ বলে। যেমন— স্থা+ তি= তিষ্ঠতি। এখানে স্থা ধাতু স্থানে তিষ্ঠ আদেশ হয়েছে।
২৯. ‘অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।’ (৬/১/১০১)।
৩০. ‘টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ’ (৭/১/১২)।
৩১. ‘ওসি চ’ (৭/৩/১০৪)।
৩২. ‘এচোঽয়বায়াবঃ।’ (৬/১/৭৮)।
৩৩. ‘সসজুষোরুঃ’ (৮/২/৬৬); ‘খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ’ (৮/৩/১৫) এবং অনুবন্ধলোপে রু-এর উ-কার লোপ পেয়েছে।
৩৪. ‘হ্রস্বনদ্যাপো নুট্’ (৭/১/৫৪)।
৩৫. ‘নামি’ (৬/৪/৩)।
৩৬. ‘অট্কুপবাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি’ (৮/৪/২)।
৩৭. ‘লশক্বতদ্ধিতে’ (১/৩/৮)।
৩৮. ‘আদ্গুণঃ’ (৬/১/৮৭)।
৩৯. অনুবন্ধলোপে প্-কারের লোপ হয়েছে।
৪০. ‘বহুবচনে ঝল্যেৎ’ (৭/৩/১০৩)।
৪১. ‘আদেশপ্রত্যয়য়োঃ’ (৮/৩/৫৯)।
৪২. ‘একবচনং সম্বুদ্ধিঃ’ (২/৩/৪৯)।
৪৩. অনুবন্ধলোপে উ-কারের লোপ হয়েছে।
৪৪. ‘এঙ্হ্রস্বাৎ সম্বুদ্ধেঃ’ (৬/১/৬৯)।
৪৫. ‘আতো ধাতোঃ’ (৬/৪/১৪০)।
৪৬. ‘লশক্বতদ্ধিতে’ (১/৩/৮) সূত্রানুসারে শস্ বিভক্তির শ্-কারের লোপ হয়েছে।
৪৭. ‘তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসি’ (৬/১/১০৩)।
৪৮. ‘পদান্তস্য’ (৮/৪/৩৭)।
৪৯. ‘ঙসিঙসোশ্চ’ (৬/১/১১০)। অনুবন্ধলোপে ঙে বিভক্তির ঙ্-কারের লোপ হয়ে এ, ঙসি বিভক্তির ঙ্ ও ই-কারের লোপ হয়ে স্, ঙস্ বিভক্তির ঙ-কারের লোপ হয়ে স্, ঙি বিভক্তির ঙ্-কারের লোপ হয়ে ইকার থাকে; ‘আদ্গুণঃ’ (৬/১/৮৭)।
৫০. ‘সসজুষোরুঃ’ (৮/২/৬৬) ; ‘খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ’ (৮/৩/১৫) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে।
৫১. *প্রাগুক্ত*।
৫২. *প্রাগুক্ত*।
৫৩. *প্রাগুক্ত*।
৫৪. *প্রাগুক্ত*।
৫৫. ‘প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ’ (৬/১/১০২)। অনুবন্ধলোপে ঔ-কারের লোপ হয়েছে।
৫৬. ‘অমি পূর্বঃ’ (৬/১/১০৭)।
৫৭. ‘জসি চ’ (৭/৩/১০৯)।
৫৮. ‘ঘের্ঙিতি’ (৭/৩/১১১); ‘হ্রস্বস্য গুণঃ’ (৭/৩/১০৮)।
৫৯. ‘এচোঽয়বায়াবঃ।’ (৬/১/৭৮)।
৬০. ‘সসজুষোরুঃ’ (৮/২/৬৬) ; ‘খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ’ (৮/৩/১৫) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে।
৬১. *প্রাগুক্ত*।
৬২. *প্রাগুক্ত*।
৬৩. *প্রাগুক্ত*।
৬৪. *প্রাগুক্ত*।
৬৫. ‘লশক্বতদ্ধিতে’ (১/৩/৮)।
৬৬. ‘প্রথময়োঃ পূর্বসবর্ণঃ’ (৬/১/১০২)।
৬৭. ‘তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসি’ (৬/১/১০৩)।
৬৮. ‘পদান্তস্য’ (৮/৪/৩৭)।
৬৯. ‘টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ’ (৭/১/১২)।
৭০. ‘সসজুষোরুঃ’ (৮/২/৬৬) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে এবং ‘খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ’ (৮/৩/১৫)।
৭১. *প্রাগুক্ত*।
৭২. ‘ঘের্ঙিতি’ (৭/৩/১১১); ‘হ্রস্বস্য গুণঃ’ (৭/৩/১০৮)।

৭৩. 'এচোঽয়বায়াবঃ।' (৬/১/৭৮)।
৭৪. অনুবন্ধলোপে ঙ্-কারের লোপ হয়ে এ হয়েছে ।
৭৫. 'ঙসিঙসোশ্চ' (৬/১/১১০)।
৭৬. 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে এবং 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫)।
৭৭. 'ঙসিঙসোশ্চ' (৬/১/১১০)।
৭৮. 'অচ্চ ঘেঃ' (৭/৩/১১৯)।
৭৯. 'ঘের্ঙিতি' (৭/৩/১১১); 'হ্রস্বস্য গুণঃ' (৭/৩/১০৮)।
৮০. অনুবন্ধলোপে 'এঙহ্রস্বাৎসম্বুদ্ধেঃ' (৬/১/৬৯)।
৮১. 'হ্রস্বদ্যাপো নুট্' (৭/১/৫৪)।
৮২. 'নামি' (৬/৪/৩)।
৮৩. 'ইকোযণচি' (৬/১/৭৭)।
৮৪. 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে এবং 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫)।
৮৫. অনুবন্ধলোপে প্-কারের লোপ পেয়েছে।
৮৬. 'আদেশপ্রত্যয়য়োঃ' (৮/৩/৫৯)।
৮৭. 'পতিঃ সমাস এব' (১/৪/৮)।
৮৮. 'ইকোযণচি' (৬/১/৭৭)।
৮৯. 'খ্যাত্যাৎপরস্য' (৬/১/১১২); 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে এবং 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫)।
৯০. *প্রাগুক্ত*।
৯১. *প্রাগুক্ত*।
৯২. *প্রাগুক্ত*।
৯৩. *প্রাগুক্ত*।
৯৪. 'ঔৎ' (৭/৩/১১৮)।
৯৫. 'ইকো যণচি' (৬/১/৭৭)।
৯৬. 'সুডনপুংসকস্য', 'সর্বনামস্থানে চাসম্বুদ্ধৌ' (১/১/ ৪৩, ৬/৪/৮)।
৯৭. 'সখ্যুরসম্বুদ্ধৌ' (৭/১/ ৯২)।
৯৮. 'অচোঞ্ণিতি' (৭/২/১১৫)।
৯৯. 'এচোঽয়বায়াবঃ।' (৬/১/৭৮)।
১০০. 'অচি শ্নুধাতুভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ' (৬/৪ /৭৭)।
১০১. 'অস্বার্থনদ্যোর্হ্রস্বঃ' (৭/৩/১০৭)।
১০২. 'হল্ঙ্যাদি' (৬/১/৬৮)।
১০৩. অনুবন্ধলোপে উ-কারের লোপ হয়েছে।
১০৪. 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে এবং 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫)।
১০৫. *প্রাগুক্ত*।
১০৬. অনুবন্ধলোপে উ-কারের লোপ হয়েছে।
১০৭. 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে এবং 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫)।
১০৮. *প্রাগুক্ত*।
১০৯. 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' (১/১/১)।— আ, ঐ এবং ঔ-কার বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ— অ স্থানে আ; ই, ঈ এবং এ-কার স্থানে ঐ; উ, ঊ এবং ও-কার স্থানে ঔ; ঋ, ৠ স্থানে আর্ এবং ৯ স্থানে আল্ হওয়াকে বৃদ্ধি বলে। যেমন— শরীর+ঠক্= শারীরিক, বিধি+অন্= বৈধ।
১১০. 'গোতো ণিৎ', 'অচোঞ্ণিতি' (৭/১/৯০, ৭/২/১১৫)।
১১১. 'এচোঽয়বায়াবঃ।' (৬/১/৭৮)।
১১২. অনুবন্ধলোপে উ-কারের লোপ হয়েছে।
১১৩. 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে এবং 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫)।
১১৪. *প্রাগুক্ত*।
১১৫. 'ঔতোঽম্শসোঃ' (৬/১/৯৩)।
১১৬. 'সসজুষোরুঃ' (৮/২/৬৬) এবং অনুবন্ধলোপে রু এর উকার লোপ পেয়েছে এবং 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' (৮/৩/১৫)।
১১৭. *প্রাগুক্ত*।
১১৮. 'রায়ো হলি'(৭/২/৮৫)।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

বেদে দেবভাবনা

ড. জুয়েলী বিশ্বাস*

Abstract: The Hindu religion believes in gods. Not only Hindu religion, most of the ancient religions believe in the existance of gods. The gods of the Hindu religion are enormous. They can be divided mostly in three groups- i) The Vedic gods ii) The Puranic gods and iii) The Loukik gods. The subject-matter of this article is the Vedic gods. The Vedic saints believed in one God. Yet they praised many natural gods. They felt that one God exists in different forms in nature. So they praised the natural objects and their force. Most of the Vedic gods are symbolic; they are the symbols of natural objects and their force.

বেদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান– পারমার্থিক জ্ঞান। বেদ শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে। বিদ্ ধাতুর একাধিক অর্থ। বিদ্– জানা (to know), বেত্তি, বেদ, বেদিতুম্। বিদ্– থাকা (to be), বিদ্যতে। বিদ্– অর্জন করা (to gain, to acquire), বিন্দতি, বিন্দতে। বেদে বিদ্ ধাতুটি জানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিদ্যতে অনেন ইতি বেদঃ'– যার দ্বারা পারমার্থিক জ্ঞান জানা যায় বা লাভ করা যায় তাকে বেদ বলে। জ্ঞান দুই প্রকার– ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও পারমার্থিক জ্ঞান। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। এর মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ হয় তাকে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বলে। এ ছাড়া মানুষ সাধনার দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করে তাকে পারমার্থিক জ্ঞান বলে। বেদজ্ঞান পারমার্থিক জ্ঞান। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি উপায় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ থেকে লাভ করা যায় বলে বেদকে বেদ বলা হয়–

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা ॥[১]

প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের মতে, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ থেকে আমরা লাভ করতে পারি তাই বেদ। বস্তুত বেদ আর্য ঋষিদের সাধনালব্ধ পারমার্থিক জ্ঞান।

বেদ বলতে সাধারণত আমরা ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ব বেদকে বুঝি। কিন্তু বেদের পরিধি আরও ব্যাপক। বেদের চারটি স্তর– সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বেদের সংহিতা ভাগেই আমরা বৈদিক দেবতার স্তব-স্তুতি পাই। সংহিতা ভাগকে আবার মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো– ঋক্সংহিতা, সাম-সংহিতা, যজুঃ-সংহিতা এবং অথর্ব-সংহিতা। ঋক্সংহিতা বা ঋগ্বেদই সর্বপ্রাচীন এবং এই বেদেই আমরা বৈদিক দেবদেবীর স্তুতি দেখতে পাই। ঋগ্বেদের মন্ত্রসংখ্যা ১০,৪৭২। এসব ঋক্ বা মন্ত্রের মাধ্যমে বৈদিক ঋষিরা দেবদেবীর স্তুতি করেছেন। এক একজন দেবতার জন্য যতগুলো মন্ত্র উক্ত হয়েছে তার সমষ্টিকে সূক্ত বলা হয়।[২]

সাম অর্থ গান। যজ্ঞানুষ্ঠানে সুর সংযোজন করে যেসব মন্ত্র গাওয়া হতো তার সংকলনই সামবেদ। যজুঃ শব্দের অর্থ মন্ত্র। যে-সব মন্ত্র যজ্ঞের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতিদানের সময় প্রযুক্ত হতো সে সব মন্ত্রের সংকলনই যজুঃ সংহিতা বা যজুর্বেদ। অথর্ববেদ পরবর্তীকালের রচনা। মাঙ্গলিক ক্রিয়া, চিকিৎসাবিদ্যা, শত্রুবধের উপায় ইত্যাদি অথর্ববেদের আলোচ্য বিষয়। বেদ বলতে প্রথমে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদকে বুঝাতো। এজন্য বেদকে ত্রয়ী বলা হতো।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেদের শ্রেণিভেদ করা হয়েছে। প্রাচীন মতে, বেদের দুটি ভাগ– মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" (আপস্তম্ব)। বেদের মন্ত্রভাগ পদ্যে রচিত এবং ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। বেদের যে

* প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।

অংশে মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন যজ্ঞে তাদের বিনিয়োগ বা ব্যবহারের কথা আলোচিত হয়েছে, তাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। ব্রাহ্মণ শব্দটি এসেছে 'ব্রহ্মন্' শব্দ থেকে। 'ব্রহ্মন্' শব্দের এক অর্থ মন্ত্র। এই অর্থে যে গ্রন্থে 'ব্রহ্মন্' বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং যজ্ঞে কীভাবে সেগুলোকে বিনিয়োগ করতে হবে তার আলোচনা আছে, তাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরণ্যক ও উপনিষদ নামক দুই শ্রেণির গ্রন্থও বেদের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগে দেবতাদের স্তুতি ও যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আরণ্যক ও উপনিষদে জ্ঞানের দ্বারা শ্রেয়োলাভের কথা বলা হয়েছে। তাই মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগকে বেদের কর্মকাণ্ড বলা হয় এবং আরণ্যক ও উপনিষদকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। যাগযজ্ঞরূপ কর্মানুষ্ঠানকে পরিহার করে জ্ঞানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানার সূচনা হয় আরণ্যকে। অরণ্যে গুরুর নিকট বসে যে বিদ্যা অধীত হতো তাকে আরণ্যক বলে। যাগযজ্ঞরূপ কর্মের মাধ্যমে স্বর্গপ্রাপ্তিই ছিল তখনকার ধর্মসাধনা। পরবর্তীতে ঋষিরা উপলব্ধি করলেন যাগযজ্ঞরূপ কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গলাভ হয় বটে, কিন্তু কর্মফল ক্ষয় হয়ে গেলে তাকে আবার জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ফিরে আসতে হয়। জ্ঞানের মাধ্যমে পরম সত্তাকে জানতে পারলে আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ফিরে আসতে হয় না। জীবাত্মা তখন পরমাত্মার সাথে লীন হয়ে যায়। তাই ঋষিরা জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করলেন। আরণ্যক সেই জ্ঞানমার্গে প্রবেশের সোপানস্বরূপ। আরণ্যকে যে অধ্যাত্মবিদ্যার সূচনা, উপনিষদে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে। তাই উপনিষদকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। উল্লেখ্য, ঋগ্বেদ বৈদিক দেবতাদের স্তব-স্তুতিতে পরিপূর্ণ; কিন্তু উপনিষদে একেশ্বরবাদ ঘোষিত। উপনিষদের ঋষিরা এমন কথাও বলেছেন যে, যারা অবিদ্যার অর্থাৎ যাগযজ্ঞরূপ কর্মের চর্চা করে তারা অদর্শনাত্মক অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে। আর যারা বিদ্যাতে অর্থাৎ দেবতার উপাসনায় রত থাকে তারা তা থেকেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে–

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে'বিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥[৩]

বৈদিক দেবতার সংজ্ঞা ও শ্রেণিভেদ

বেদ এবং বৈদিক দেবতা পরিপূরক। বেদে, বিশেষ করে ঋগ্বেদে বিভিন্ন দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। 'দেব' শব্দটি দিব্ ধাতু থেকে এসেছে। দিব্ ধাতুর অর্থ দীপ্যমান হওয়া (To shine)।[৪] দিব্+অচ্= দেব। দেব শব্দের সঙ্গে তল্ প্রত্যয়যোগে দেবতা শব্দটি গঠিত। দেব+তল্= দেবতা। সুতরাং দেব এবং দেবতা শব্দ দুটি সমানার্থক। নিরুক্তকার যাস্ক দেব শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "দেবো দানাৎ বা দীপনাৎ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি।"[৫] অর্থাৎ যিনি দান করেন অথবা যিনি দীপ্তরূপে প্রকাশিত হন বা অপরকে দীপ্যমান করেন এবং স্বর্গে থাকেন তিনি দেবতা। সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে ঋগ্বেদের প্রকৃত দেবতা নির্বাচনে ততটা সহায়ক হয় না। দান করা দেবতাদের ততটা বৈশিষ্ট্য নয় যতটা দীপ্তি ও দ্যোতনা। শেষের গুণটি দেবতাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করে না, তা গৌণ বিশেষণ। যাঁরা দ্যুলোকে বা স্বর্গে বাস করেন কেবল তাঁদের দেবতা বললে ঋগ্বেদে বর্ণিত অধিকাংশ দেবতাই বাদ পড়ে যান। দেবতারা দান করেন এর অর্থ দেবতারা মানুষের অভীষ্ট পূরণ করেন। অগ্নি, বায়ু, সূর্য, আকাশ, মেঘ জলরূপ দেবতারা জীবজগতকে রক্ষা করার জন্য অনেক কিছুই দান করেন। তাই তাঁরা দেবতা। অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার মানুষ দেবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব থেকে জানা যায়, লাতিনে deus, কেলটিকে devos, লিথুনিয়ন divas প্রত্যেকেরই এক অর্থ। বৈদিক দ্যৌস্পিতা গ্রিক ও রোমীয় Zeus pater এবং Deispeter বা Jupiter রূপে পরিচিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক অশ্বিদ্বয়কে গ্রিসীয় Dioscuri-র সঙ্গে তুলনা করেন। বৈদিক দেবতা পর্জন্য (মেঘ) লিথুনিয়ান ভাষায় Perkunos (Thunderer বা বজ্রধর)। ইরানীয়দের প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়ের নাম জরথুস্ত্র। তাদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় উল্লিখিত দেবতাদের মধ্যে মিথ্র (Mithra) এবং অহুর মজ্‌দা (Ahura Mazda) অন্যতম। বৈদিক দেবতা মিত্র এবং বরুণ থেকে এঁরা অভিন্ন। সুতরাং কেবল ভারতীয় ঋষিরা নয়, প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশের মানুষও প্রকৃতির ভয়াবহতা এবং সৌন্দর্যে আকুল ও মুগ্ধ হয়ে তাকে দেবতারূপে স্তুতি করেছেন।

বৈদিক ঋষিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করেছেন। একারণে অনেকে হিন্দুধর্মকে জড়োপসক বলে থাকেন। কিন্তু ধরণাটি সঠিক নয়। বৈদিক ঋষিরা প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। প্রকৃতির লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ। প্রকৃতির বিচিত্র লীলা আর্য ঋষিদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। প্রকৃতির মহাশক্তিকে তাঁরা দৈবী মহিমায় ভূষিত করেছেন। তাই পাশ্চাত্য মনীষী Maurice Winternitz বলেন,

"... the most prominet figures of mythology have proceeded from personification of the most striking natural phenomena."[৬]

আকাশের বিশালতা, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার ঔজ্জ্বল্য, সমুদ্রের গর্জন, প্রচণ্ড বেগে বাতাসের ধেয়ে-চলা, অগ্নির দাহিকাশক্তি, স্নিগ্ধ নির্মল প্রকৃতির শোভা দেখে ঋষিদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এসব সৃষ্টি কার? তাঁরা উপলব্ধি করেছেন নিশ্চয়ই আছেন একজন। যাঁর সত্তায় সব কিছুই সত্তাবান। তিনি মহান, বিরাট পুরুষ। তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর শক্তি জড় অজড় সবকিছুতেই বিদ্যমান। তাই কবি বলেছেন,

আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপী লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।[৭]

সৃষ্টির বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করলে আমাদের অভিভূত হতে হয়। স্রষ্টার সৃষ্টির কোন একটি উপাদানের অভাবে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। সূর্যের আলো না থাকলে আমরা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। আবার বাতাসে অক্সিজেন না থাকলে প্রাণিকুল বাঁচে না। অক্সিজেন আমরা পাই গাছ থেকে। আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে প্রাণিরক্ষা। এভাবেই চলছে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া। বৈদিক ঋষিরা এটা অনুভব করে প্রকৃতির সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তাই তাঁরা প্রাকৃতিক শক্তিতে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করে তাকে দেবতাজ্ঞানে স্তুতি করেছেন। বৈদিক ঋষিরা এটাও অনুভব করেছিলেন যে, প্রাকৃতিক বস্তু এবং তার শক্তি সেই পরমসত্তারই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। এ সম্পর্কে ড. রামেশ্বর শ বলেন,

"... ঋগ্বেদের দেবদেবীরা শুধুমাত্র প্রকৃতিরই কল্পিত রূপ নন, ঋষিদের সত্যিকার ধ্যানদৃষ্টিলব্ধ উপলব্ধি। এই উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্যে ঋষি-কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতিকে যেমন কোনো ক্ষেত্রে দেবদেবীরূপে উর্ধায়িত করা হয়েছে, তেমনি আন্তরিক দৈবী উপলব্ধিকেও প্রকৃতির চিত্রকল্পে নামিয়ে আনা হয়েছে। বস্তুত বস্তুজগৎ ও অমৃতলোককে প্রকৃতি ও দেবতাকে ঋষিরা পৃথক তো ভাবেনই নি বরং এই দুই কোটির মধ্যে আপন কবি-চেতনাকে সেতুরূপে স্থাপন করেছেন। এ হল জীবন সম্পর্কে তাঁদের পূর্ণায়ত দৃষ্টির পরিচায়ক।"[৮]

বৈদিক ঋষিরা বহু দেবতার স্তুতি করলেও এক পরমসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁদের কণ্ঠে শুনতে পাই–

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।[৯]

সেই সদ্‌বস্তু এক, বিপ্রগণ তাঁকে বহু বলে থাকেন; যথা, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) প্রভৃতি।

"একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"[১০]

দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে বিশ্বকর্মার মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুতবিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমি জনয়ন্ দেব একঃ ॥[১১]

–সেই এক দেবতা, সর্বব্যাপী তাঁর চক্ষু, বিশ্বময় তাঁর মুখ, সর্বময় তাঁর হাত ও পা – তিনি বাহু দ্বারা স্বর্গকে সম্যকরূপে স্থাপন করেছেন, পদদ্বারা স্বর্গ মর্ত্য সৃষ্টি করে এক অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করছেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্য একটি সূক্ত দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। সূক্তটি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ কর্তৃক রচিত। তিনি অন্যান্য ঋষিদের মতো পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে উপলব্ধি করে ঘোষণা করলেন,

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥
অহং সোমমাহনসংবিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্ ॥[১২]

[আমিই একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি। আমি দ্বাদশ আদিত্য ও সমস্ত দেবতা (অথবা বিশ্বসংজ্ঞক দেবগণরূপে) বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয় দেবকে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার নামক দেবকে ধারণ করি। শত্রুদের সংহারকর্তা।

নিরুক্তকার যাস্ক স্থানভেদে বৈদিক দেবতাদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা,
১) ভূলোকের দেবতা
২) অন্তরীক্ষলোকের দেবতা এবং
৩) দ্যুলোকের দেবতা।

নিরুক্তমতে মুখ্য দেবতা তিনজন– অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য। অগ্নি ভূলোকের দেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষলোকের দেবতা এবং সূর্য দ্যুলোকের দেবতা।

"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্র বা অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ।"[১৩]

অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও বিশেষণ নিয়ে দেবতাদের বিভিন্ন নাম হয়েছে। অগ্নিদেবতার বিভিন্ন কার্য ও বিশেষণ নিয়ে বৈশ্বানর, জাতবেদ্য, নারাশংস, সুসমিদ্ধ, তনূনপাৎ প্রভৃতি নাম হয়েছে। বায়ু বা ইন্দ্রদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কার্য নিয়ে মাতরিশ্বা, রুদ্র, অপাং-নপাৎ, মরুদ্গণ প্রভৃতি নাম হয়েছে। সেরূপ সূর্যদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কার্য থেকে আদিত্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, পুষা, ভগ, ঊষা, অশ্বিযুগল, সবিতা দ্যৌস্পিতা প্রভৃতি নাম হয়েছে। তবে যাজ্ঞিক-সম্প্রদায় নামে একদল ঋষির মতে দেবতাদের নাম যত তাঁদের সংখ্যাও তত।

একত্ববাদী আত্মবিদ্ ঋষিদের মতে এক মহান আত্মাই তাঁর অপরিমিত ঐশ্বর্যবলে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করেন। অগ্নি, সূর্য, মরুৎ, সরস্বতী, ঊষা প্রভৃতি দেবদেবী মূলত একই ঈশ্বর বা পরমাত্মার বিভিন্ন সত্তামাত্র। ঋগ্বেদে দেবতাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি দেখা যায়। কোথাও বলা হয়েছে ত্রিলোকের তিনজন মাত্র দেবতা।[১৪] কোথাও বলা হয়েছে, প্রতিটি লোকে ১১ জন করে মোট দেবতার সংখ্যা ৩৩।[১৫] আবার কোথাও এমন কথা বলা হয়েছে যে, দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯।[১৬] এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, বেদে দেবতাদের এরূপ সংখ্যাবৈপরিত্যের কারণ কী? বিভিন্ন বৈদিক দেবতাদের স্বরূপ এবং ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ দেবদেবী প্রকৃতি থেকে কল্পিত হয়েছেন। পরিবর্তনশীল প্রকৃতিদেবীর বিচিত্র লীলা-ঐশ্বর্য ও রূপে মুগ্ধ হয়ে আর্য ঋষিদের কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। ঊষার অরুণচ্ছটায় তাঁদের চিত্ত রঞ্জিত হতো। তার রূপ দেখে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাঁরা তার স্তব করেছেন। উদীয়মান সূর্যের সাথে ঊষাদেবীর নানারূপ কবিত্বময় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। অসীম আকাশের তারকাখচিত ঘননীল তাঁদের কবিদৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তাঁরা অনবদ্য ভাষায় দ্যৌস্পিতার (আকাশের) উদ্দেশ্যে স্তবগীত উচ্চারণ করেছিলেন। এভাবে অশ্বিদ্বয়, পর্জন্য, সবিতা, বরুণ, রুদ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি বহু বৈদিক দেবতার উদ্ভব হয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপ ও শক্তি থেকে। আর্য ঋষিরা তাঁদের কল্পনা আর কবিত্বশক্তিবলে প্রকৃতিকে এমনই দৈবীসাজে সজ্জিত করেছেন যে অনেক সময় সেই কল্পনার আবরণ ভেদ করা সাধারণ বিচার-বুদ্ধির অসাধ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেবতাদের মৌলিক প্রাকৃত রূপের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা লক্ষ্য করে তাঁদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন–

১) অতি স্বচ্ছ (Transparent)
২) অর্ধ স্বচ্ছ (Translucent) এবং
৩) অস্বচ্ছ (Opaque)

অতি স্বচ্ছ দেবতাদের মধ্যে আছে অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র, সূর্য/মিত্র, পৃথিবী, সবিতা, ঊষা, রাত্রি, সরস্বতী (নদী) জল/অপ, পর্জন্য বা মেঘ, সোমলতা প্রভৃতি। অর্ধ স্বচ্ছ দেবতাদের মধ্যে আছে ঋভুগণ, ব্রহ্মণস্পতি, সিনীবালী, ঋত, কুরঙ্গদান, অশ্বিদ্বয়, দানস্তুতি প্রভৃতি। এ ছাড়া বৈদিক দেবতার আরেকটি শ্রেণি আছে যারা কোনো প্রাকৃতিক বস্তু থেকে উদ্ভূত নয়। তাঁরা যাজ্ঞিক ঋষিদের দার্শনিক চিন্তা-চেতনা থেকে উদ্ভূত। এঁদের অনির্দিষ্ট দেবতা (Abstract Deities) বলা হয়েছে। যেমন, উলূখল, মুষল, যূপ, অরণ্যানী, প্রস্তর প্রভৃতি। যজ্ঞীয় দ্রব্য এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি মানবজীবনের অন্তর্জগতের ভাবসমূহ। ঋষিগণ এঁদেরও দেবতাজ্ঞানে স্তব করেছেন।

ঋগ্বেদের সূক্তসংখ্যা ১০২৮। প্রতিটি সূক্তেরই এক বা একাধিক দেবতা আছেন। ১০২৮টি সূক্তকে ১০টি মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ১৯১, দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ৪৩, তৃতীয় মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ৬২, চতুর্থ মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ৫৮, পঞ্চম মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ৮৭, ষষ্ঠ মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ৭৫, সপ্তম মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ১০৪, অষ্টম মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ১০৩, নবম মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ১১৪ এবং দশম মণ্ডলের সূক্তসংখ্যা ১৯১ । মণ্ডল ও সূক্তের ক্রম অনুসারে ঋগ্বেদের দেবতাদের একটি তালিকা দেয়া হলো–

অগ্নি, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র, ঋতু, বরুণ, ব্রহ্মণস্পতি, মরুৎ/মরুৎগণ, ঋভু/ঋভুগণ, সবিতা, পূষা, রুদ্র, ঊষা, সূর্য, বিশ্বদেবগণ, সোম, দানদেবতা, মিত্রাবরুণ, আপ্রী।[১৭] (অগ্নি– জলশোষক সবিতা। জলের পৌত্র। জল থেকে শস্য বৃক্ষাদি জন্মায় এবং তা থেকে অগ্নি উৎপাদন হয়। এজন্য অগ্নিকে জলের পৌত্র বলা হয়েছে।) বিষ্ণু, দ্যাবাপৃথিবী, অশ্বদেবতা, পিতুদেবতা (অন্ন), ব্রহ্মণস্পতি/বৃহস্পতি, জল, তৃণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবতা, সরস্বতী, রাকা (সূর্য রশ্মি অথবা পৌর্ণমাসী চন্দ্র), সিনীবালী (দেবপত্নী), অপাং নপাৎ (বিদ্যুৎ), মধু, মাধব, ত্বষ্টা, শুক্র, শুচি, নভঃ/নভস্য, বৈশ্বানর অগ্নি, পর্বত, বাগদেবতা, মিত্র, সোমকরাজা, অদিতি, বামদেব, ঋত, শ্যেন পক্ষী, দধিক্রা, রাজর্ষি, সীতা, ক্ষত্রপতি, শুন, গো, ঘৃত, সোমরস, পৃথিবী, পৃষ্ণি, বর্ম, ধেনু, সারথি, রশ্মি, বসিষ্ঠ/বসিষ্ঠপুত্রগণ, বিশ্বদেব, অপ, নদী, আদিত্য, বাস্তোষ্পতি, পর্জন্য, মণ্ডূক, গ্রীবা, কুরঙ্গদান, দানস্তুতি, পবমান, পবমানসোম, যম ও যমী, হবিধান নামক শকটদ্বয়, পিতৃলোক ও যম, সরণ্য, মৃত্যুধাতা, ত্বষ্টা, অগ্নিসংস্কার, গাভী, অক্ষ ও দ্যুতকার, বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র, মৃত সুবন্দুর মনপ্রাণ প্রভৃতি, নিধতি, অসুনীতি, রাজা অসমতি, পক্ষাস্বস্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, প্রস্তর, বিশ্বকর্ম, পুরূরবা ও উর্বশী, ইন্দ্রের ঘটকদ্বয়, ওষধি, পণিগণ, সরমা, প্রজাপতি, বনদেবতা, পরমাত্মা, রাত্রি, যম ও যমী, দ্যৌস্পিতা (স্বর্গ), সপত্নীপীড়ন, অরণ্যানী, শ্রদ্ধা, মৃত ব্যক্তির অবস্থা (১০/১৫৫), বিশ্বদেবা, গর্ভরক্ষণ দেবতা (১০/১৬২), যক্ষা রোগের নাশদেবতা (১০/১৬৩), দুঃস্বপ্ননাশ দেবতা (১০/১৬৪) শত্রুবিনাশ দেবতা (১০/১৬৬), রাজস্তুতি (১০/১৭৩), সোম প্রস্তুত করার উপযোগী প্রস্তর (১০/১৭৫), মায়া দেবতা (১০/১৭৭), তার্ক্ষপক্ষী দেবতা (১০/১৭৮), যজমান দেবতা (১০/১৮৩), জাতবেদ্য অগ্নি (১০/১৮৮), সৃষ্টি দেবতা (১০/১৯০)।

যে সব ঋষি বেদমন্ত্র বা সূক্ত রচনা করে দেবতাদের স্তুতি করেছেন তাঁরা হলেন–

বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা, কন্বের পুত্র মেধাতিথি, অজিগর্তের পুত্র শুনঃশেপ, অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ, কণ্ব, কন্বের পুত্র প্রস্কন্ব, অঙ্গিরার পুত্র সব্য, গোতম ঋষির পুত্র নোধা, শক্তির পুত্র পরাশর, গৌতম, অঙ্গিরার পুত্র কুৎস, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কক্ষীবান্, কশীবান্, লোমশা (নারী ঋষি), দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ, উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা, অগস্ত্য, গৃৎসমদ, সোমাহুতি, বিশ্বামিত্র, ঋষভ, উৎকীল, কত, গাথী, দেবশ্রবা, প্রজাপতি, জমদগ্নি, বামদেব, বসুশ্রুত, পুরুমীল্হ, অজমীল্হ, ইষ, গয়, সুতম্ভর, পুরু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বসুয়ু, বিশ্বসাম্য, দ্যুম্ন, অত্তি, বিশ্ববারা (নারী ঋষি), সম্বরণ, প্রভুবসু, অত্রি, অবৎসার, প্রতিভানু, স্বস্তি, শ্যাবাশ্ব, যজতি, উরুচক্রি, বাহুবৃক্ত, অত্রিয়, পৌর, অবস্যু, ভৌম, সত্যশ্রবা, ভরদ্বাজ, শুনহোত্র, নর, শংযু, গর্গ, বৃহস্পতির পুত্র শংসু, ভরদ্বাজের পুত্র ঋজিশ্বা, বশিষ্ঠ, মেধ্যাতিথি, দেবাতিথি, বৎস, প্রগাথ, পর্বত, নারদ, গোসূক্তি, সোভরি, বিবস্বানের পুত্র মনু, প্রিয়মেধ, নীপাতিথি, শ্যাবাশ্ব, নাভাক, ভগ, প্রগাথ, কুসীদী, উশনা, হিরণ্যস্তূপ, অসিত/দেবল, ভৃগু, নিধুব, বৈখানস, ভার্গব, বিমদ, কবষ, লুশ, ঘোষা, কৃষ্ণ, নারায়ণ, অরুণ, অঙ্গ, ভৃগুপুত্র কবি, জীরতা, ত্রিত, যম, বিমদ, অষ্টক, কেতু, জরিতা, ইন্দ্রাণী, ভিক্ষু, পৃথু, শবর, ত্বষ্টা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, এসব ঋষির নামের সাথে কোনো পদবী নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় বৈদিকযুগে কারুর কোনো পদবী ছিল না। পৌরাণিক যুগেও আমরা কোনো পদবী দেখতে পাই না। পদবী এসেছে অনেক পরবর্তীকালে।

সমাজ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল সমাজের মানুষের চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। ঋগ্বৈদিক যুগের ঋষিরা এক মহান সত্তার অভিব্যক্তি হিসেবে প্রাকৃতিক বস্তু ও তার শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে স্তুতি করলেও পরবর্তী ঋষিরা, বিশেষ করে পুরাণকারেরা তাঁকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে অসংখ্য দেবদেবীর কাহিনী রচনা করেছেন। ঋগ্বেদের অতি স্বচ্ছ, অর্ধ স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ মিলে প্রায় এক শত চল্লিশেরও অধিক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নিরুক্তকার যাস্ক স্থানভেদে তিনজনমাত্র দেবতার কথা বলেছেন। অন্যান্য দেবতারা এই তিন দেবতারই বিভিন্ন রূপভেদ। তাই এখানে ঋগ্বেদের প্রধান তিন দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

ঋগ্বেদে ১০২৮টি সূক্তের মধ্যে ইন্দ্র এবং অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তসংখ্যা সর্বাধিক। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এককভাবে রচিত সূক্তসংখ্যা ২০৪টি এবং অগ্নির উদ্দেশ্যে এককভাবে রচিত সূক্তসংখ্যা ১৭৪টি। এছাড়া উভয় দেবতা অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গেও স্তুত হয়েছেন। কিন্তু প্রধান তিন দেবতার মধ্যে সূর্য দেবতার সূক্তসংখ্যা অত্যন্ত কম। সূর্য স্বর্গের দেবতা এবং সৃষ্টির মূলাধার। ঋগ্বেদে এককভাবে চারটিমাত্র সূক্তে সূর্য দেবতার স্তুতি এবং পাঁচটি সূক্তের কয়েকটি ঋকে তাঁর উল্লেখ আছে।[১৮] এর কারণ বোধগম্য নয়।

অগ্নি

অগ্নিকে পৃথিবীস্থানীয় দেবতা বলা হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এর প্রয়োজনীয়তা এবং দাহিকাশক্তির ভয়াবহতা দেখে ঋষিরা এর স্তুতি করেছেন। আর্য ঋষিরা যাগযজ্ঞের মাধ্যমে ধর্মসাধনা করতেন। যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাতে আহুতি দিতেন। বৈদিক ঋষিদের মতে অগ্নি হব্যবাহ। অগ্নি দেবতাদের মুখরূপে যজ্ঞে প্রদত্ত হবি সকল দেবতার কাছে পৌঁছে দেন। ঋগ্বেদে ১৭৪টি সূক্তে অগ্নি দেবতাকে এককভাবে স্তুতি করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে এসে অগ্নিদেবতার প্রভাব খর্ব হয়েছে। বর্তমান হিন্দুসমাজে অগ্নিকে অন্যান্য দেবতাদের মতো মূর্তি গড়ে পূজা করা হয় না। তবে পূজা-পার্বণ ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত আকারে যে যজ্ঞ করা হয় এবং সেই যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া হয় তা বৈদিক অগ্নি দেবতারই সংক্ষিপ্ত যজ্ঞ-সংস্করণ। অগ্নিসূক্তের প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে–

অগ্নিমীলে (অগ্নিমীড়ে) পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্নধাতমম্।[১৯]

অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান। অগ্নি দেবতাদের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী। আমি অগ্নির স্তুতি করি।] বেদে এই অগ্নি বিভিন্ন নামে ও রূপে স্তুত। যেমন, জাতবেদ্য, বৈশ্বানর , আপ্রী ইত্যাদি। জলমধ্যস্থিত অগ্নিকে আমরা বড়বাগ্নি বলি, দাবানল সংঘটিত অগ্নিকে দাবাগ্নি বলি। সেরূপ বৈদিক ঋষিরাও বিভিন্ন বস্তুতে স্থিত অগ্নির বিভিন্ন নামকরণ করেছেন।

প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অগ্নি-উপাসনা প্রচলিত ছিল। এখনও আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্নি দেবতা এখন ব্রহ্মার রূপ পরিগ্রহ করেছেন। ভারতীয় দেবতানিচয় স্বরূপত সূর্যাগ্নি বা তেজোময়ী শক্তি হওয়ায় ব্রহ্মা সূর্যাগ্নির রূপ গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মা বাস্তুদেবতাও বটে। তাই সাধারণ মানুষ অগ্নির হাত থেকে বাস্তুগৃহ রক্ষা করার জন্য ব্রহ্মাপূজা করে থাকেন। স্বরূপত লক্ষ্য করলে স্রষ্টার এই সৃষ্টির মাঝে সর্বত্রই অগ্নি বিদ্যমান। পাথরে পাথরে ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, পৃথিবীর গর্ভে অগ্নি আছে, প্রতিটি নক্ষত্র এক একটি অগ্নিপিণ্ড। অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা চিন্তা করলে আমরা অভিভূত হই। সুতরাং বৈদিক ঋষিরা স্রষ্টার শক্তিরূপে অগ্নির স্তুতি করবেন এতে আর বিচিত্র কী!

ইন্দ্র

অগ্নির পরেই যিনি সর্বাধিক প্রভাবশালী দেবতা তিনি হলেন ইন্দ্র। বেদে দুই শতাধিক সূক্তে ইন্দ্র দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। যাস্কের মতে ইন্দ্র অন্তরীক্ষলোকের দেবতা। অন্তরীক্ষ বলতে ভূলোক এবং দ্যুলোকের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ আকাশকে বুঝায়। সূর্য দ্যুলোকের বা স্বর্গের দেবতা, অগ্নি ভূলোকের বা পৃথিবীস্থানীয় দেবতা আর ইন্দ্র মধ্যবর্তী স্থানের অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোকের দেবতা। অগ্নিদেবতার যেমন অবস্থা, কার্য ও গুণভেদে বিভিন্ন নাম তেমনি ইন্দ্রেরও কার্য ও রূপভেদে বিভিন্ন নাম। যেমন, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ, অপাং নপাৎ (বিদ্যুৎ), পর্জন্য (মেঘ)। এরা অন্তরীক্ষলোকের দেবতা। সুতরাং এঁরা যে ইন্দ্র দেবতারই বিভিন্নরূপভেদ তা বোঝা যায়। নিরুক্তকার যাস্ক ইন্দ্র শব্দের তিনটি অর্থ করেছেন। প্রথম অর্থ, যিনি ইরা অর্থাৎ অন্নের হেতুভূত, মেঘকে বিদীর্ণ করেন– ইরাং দৃণাতি। দ্বিতীয় অর্থ: যিনি ইরা বা অন্ন দান করেন– ইরাং দদাতি। তৃতীয় অর্থ: যিনি অন্ন উৎপাদনের জন্য কর্ষণের সময় মৃত্তিকা বিদীর্ণ করেন– ইরাং দারয়তে।[২০] ঋগ্বেদের অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত ১/২/৪ ঋকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "ইন্দ্ ধাতুর অর্থ বর্ষণ। ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ। প্রাচীন আর্যরা আকাশকে দ্যু, বরুণ প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন।"[২১] ঋগ্বেদে ইন্দ্র দেবতার

বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইন্দ্র মেঘের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন। তিনি বিশ্বভুবন নির্মাণ করেছেন।[২২] ইন্দ্র ঊষাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জল প্রেরণ করেন, সপ্ত নদীকে প্রবাহিত করেন। তিনি নিজের তেজে অন্তরীক্ষ পূর্ণ করেন (ঋগ্বেদ, ১/৫১/২)। ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা (ঋগ্বেদ, ১.৫২.১৫)। ইন্দ্র বজ্রতুল্য বাহুবিশিষ্ট, বজ্র তার অস্ত্র (ঋগ্বেদ, ২.১৩.১৩)। ইন্দ্র দেবতার জন্ম সম্পর্কে বেদে বলা হয়েছে, তিনি মাতৃগর্ভের পার্শ্বদেশ ভেদ করে বের হয়েছিলেন (ঋগ্বেদ, ৩.৪৮, ৪.১৮)। এই মাতৃগর্ভ সম্ভবত আকাশ। জন্মমাত্রই তিনি আকাশকে উজ্জ্বল করেন (ঋগ্বেদ, ৩.৪৪.৪)। জন্মাবধি তিনি যোদ্ধা, শত্রু দমনকারী (৩.৫১.৮; ১০.১১৩.৪)। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে আবার বলা হয়েছে, পুরুষের মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নির জন্ম (ঋগ্বেদ, ১০.৯০.১৩)। ইন্দ্র পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, পর্বতসমূহকে স্থির করেছেন, দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছেন; মেঘের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেছেন, সূর্য ও ঊষাকে সৃষ্টি করেছেন, সপ্ত নদীকে প্রবাহিত করেছেন (ঋগ্বেদ, ১.৫১.২; ২.১২/২-৪)। ইন্দ্র সোমপায়ী। তিনি তার পিতা দ্যৌঃ বা ত্বষ্টার হত্যাকারী ইত্যাদি। বেদে ইন্দ্র দেবতার জন্মের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা কবিকল্পনার উচ্ছ্বাসমাত্র। বিভিন্ন ঋকে ইন্দ্র দেবতার অদ্ভূত রকমের বর্ণনা আছে। এ ধরনের বর্ণনা বৈদিক এবং পৌরাণিক সব দেবতার বেলায়ই দেখা যায়।

পৌরাণিক যুগে এসে ইন্দ্র হয়ে গেছেন স্বর্গের রাজা। তিনি দেবরাজ।

সূর্য

ঋগ্বেদের তিন প্রধান দেবতার মধ্যে সূর্য অন্যতম। গুণ, কর্ম ও অবস্থাভেদে সূর্যই আদিত্য, সবিতা, বরুণ, বিষ্ণু, ঊষা, অর্জমা, মাতরিশ্বা, ভগ, মিত্র, ত্বষ্টা প্রভৃতি নামে অভিহিত। সবিতা ও মিত্র দেবতা সূর্য দেবতারই রূপভেদ বা ভিন্ন নাম। ঋগ্বেদের ৩/৬২/১০ ঋকে বলা হয়েছে–

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি। এ ঋকটির ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য সবিতা শব্দের অর্থ করেছেন পরমেশ্বর এবং সূর্য।[২৩] মিত্র ও আদিত্যও সূর্য দেবতার ভিন্ন রূপ। অগ্রহায়ণ মাসের সূর্যের নাম মিত্র।[২৪] সূর্য বা মিত্রের আরেক নাম আদিত্য। ঋগ্বেদের ৩/৫৯ সূক্তে মিত্রকে আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে স্তুতি করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিত্র ও বরুণ দেবতা যুক্তভাবে স্তুত হয়েছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, মিত্রাবরুণ দিবা ও রাত্রি– "অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণো।"[২৫] আদিত্য সূর্যের প্রতিরূপ হলেও ঋকসংহিতায় ছয়জন আদিত্য দেবতার উল্লেখ দেখা যায়। এঁরা হলেন, মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ।[২৬] বিষ্ণুদেবতাও সূর্য দেবতার আরেক রূপ।

ঋগ্বেদে সূর্যকে তেজ বা প্রাণশক্তিস্বরূপ সমস্ত বিশ্ব চরাচরের আত্মারূপে স্তুতি করা হয়েছে–

চিত্রং দেবানামুদদনীকং চক্ষুসি ত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী চান্তরীক্ষং সূর্য আত্মা জগস্তস্থুশ্চ ॥ (ঋগ্বেদ, ১/১১৫/১)

অর্থাৎ বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ অগ্নি উদিত হয়েছে। দ্যাবা পৃথিবীও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পূর্ণ করেছেন। সূর্য জঙ্গম-স্থাবর সকলের আত্মাস্বরূপ। কৃষ্ণযজুর্বেদেও বলা হয়েছে,

"অসৌ বা আদিত্যঃ প্রাণঃ প্রামেবৈনানুৎ সৃজতি" (কৃষ্ণযজুর্বেদ, ৫/৫/২/৫)। অর্থাৎ আদিত্যই বিশ্বের প্রাণস্বরূপ, আদিত্য থেকেই প্রাণের সৃষ্টি।

সূর্যের আলো যদি পৃথিবীতে না আসত তাহলে জীবসৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না। তাই তাঁরা সূর্যকে স্থাবর জঙ্গমের আত্মা বলেছেন। কিন্তু একথাও ঠিক যে, সূর্যের আলো চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহেও পতিত হয়। সেখানে কিন্তু কোনো জীবের অস্তিত্ব নেই। বস্তুত আমরা যারা এই বিশ্ব জগতের এক মহান স্রষ্টাকে বিশ্বাস করি তারা বিশ্ব স্রষ্টার লীলাকে অস্বীকার করতে পারি না। বৈদিক ঋষিরাও তা করতেন। বাংলা সাহিত্যের কবিরাও বৈদিক ঋষিদের মতোই সূর্যবন্দনা করেছেন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন–

বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন
বিশ্বের জীবন তুমি

সর্বদেবময় সর্ববেদাশ্রয়
আকাশ পাতাল তুমি।
একচক্র রথে আকাশের পথে
উদয় গিরি হতে।
যাহ অস্ত গিরি একদিনে ফিরি
কে পারে শক্তি কহিতে।[২৭]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সূর্যকে সর্বপ্রাণের স্রষ্টা ও প্রাণ শক্তিরূপে অন্তরে বরণ করে বলেছেন–

হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দীপ্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ।
তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছে যে ভরে
কেইবা সে জানে।[২৮]

"বৈদিক ঋষিদের সূর্যস্তুতি কেবল জড় অগ্নিপিণ্ডের স্তুতি নয়। বৈদিক ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে তেজঃশক্তিরূপী সূর্যাগ্নি সকল প্রাণের উৎস, প্রাণময়, সর্বেশ্বরব্রহ্ম– সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা। তাই তাঁরা আদিত্যের অত্যুজ্জ্বল তেজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন এক হিরণ্ময় পুরুষ, যিনি সূর্যের অন্তরস্থ পুরুষ যিনি সর্বচেতনার উৎস।"[২৯]

ভারতীয় ঋষিরা নানাভাবে, নানা প্রকারে সূর্য এবং তার আলোকরশ্মিকে বর্ণনা করেছেন, উপমান দ্বারা অভিরঞ্জিত করেছেন এবং কখনও দেবতা কখনও বা স্রষ্টার আসনে বসিয়েছেন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছেন। গ্রিকদের হেলিও, লাটিনদের সোল, টিউটনদের টার (Tyr), ইরানীদের খরসেদ প্রভৃতি সূর্য দেবতারই নামান্তর।[৩০]

ভারতীয় হিন্দুদের বিভিন্নপূজা-পার্বণ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মন্ত্রে সূর্যদেবতার প্রচুর স্তুতি দেখা যায়। ভারতের উপাসক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সৌর সম্প্রদায় অন্যতম।

বিষ্ণু

পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে এবং বর্তমান হিন্দুসমাজে বিষ্ণুর স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু বৈদিক যুগে বিষ্ণু নামক দেবতার স্থান ততটা উচ্চে ছিল না– যদিও সূর্যেরই আরেক নাম বিষ্ণু। ঋগ্বেদে চারটিমাত্র সূক্তে (১/১৫৪, ১৫৬; ১/২২/১৭; ৭/১০০; ১০/১৮৪) বিষ্ণুদেবতার একক স্তুতি লক্ষ্য করা যায় এবং কয়েকটি সূক্তে (১/২২/১৭; ১/১৫৫; ৬/৬৯;৭/৯৯) ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে বিষ্ণুর স্তুতি করা হয়েছে।

বেদের বিভিন্ন অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার স্বীকার করেছেন যে, বিষ্ণু সূর্য দেবতারই নামান্তর। গুণ, কর্ম ও অবস্থাভেদে অগ্নি ও ইন্দ্রের যেমন বিভিন্ন নাম সূর্যেরও তাই। যোগেশচন্দ্র রায় বলেন,

"যেমন অন্যান্য আদিত্য সূর্যের শক্তি, বিষ্ণুও তেমন সূর্যের এক শক্তি। বিষ্ণু সূর্যের গতিশক্তি। এই শক্তি ত্রিবিক্রমে প্রচলিত হইয়াছে। ত্রিবিক্রম শব্দের অর্থ ত্রিপদক্ষেপ।"[৩১]

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর *হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ* গ্রন্থে লিখেছেন–

"যাস্কাচার্যের নিরুক্ত ব্যাখ্যায় ড. অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, 'পুষাবস্থা অতিক্রম করিয়া আদিত্য বিষ্ণু হন। বিষ্ণু শব্দ প্রবেশনার্থক 'বিশ্' ধাতু হইতে অথবা বি পূর্বক ব্যাপ্তার্থক 'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন: (১) বিষ্ণু তীব্র রশ্মিসমূহের দ্বারা সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হন।"[৩২]

ঋগ্বেদের বিখ্যাত অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন,

"বিষ্ণুশব্দের অর্থ সূর্য, সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। সূর্যরূপ বিষ্ণুর 'ময়ূখ' অর্থ কিরণ।"[৩৩]

ঋগ্বেদের বিষ্ণু যে সূর্য দেবতারইনামান্তর সে সম্পর্কে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সব পণ্ডিতও একমত । ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (১/২২/১৭) বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ নিয়ে পণ্ডিত মহলে অনেক ব্যাখ্যা দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারে নিরুক্তকার যাস্কের ব্যাখ্যার সূত্র ধরে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন–

"অতএব স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাবলে অস্তগমন, এ তিনটি বিষ্ণুর পদ-বিক্ষেপ বলে বর্ণিত হয়েছে। এ উপমা হতে পারে কত যে পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি হয়েছে।"[৩৪]

বর্তমান ভারতীয় হিন্দু সমাজের একটি বিরাট অংশ বাসুদেব কৃষ্ণের পূজা করে থাকেন। ইনি ভগবদ্ গীতার এবং ভাগবতের কেন্দ্রীয়পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। বর্তমানে *গীতা* হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। *গীতায়* যে দর্শন বর্ণিত হয়েছে, বলা হয়, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অবতারপুরুষ এবং বিশ্ব নিয়ন্তা। কিন্তু বেদে বৈদিক দেবতা হিসেবে কোনো সূক্ত বা স্তুতি দেখা যায় না। বৈদিক সাহিত্যে যে বিরাটপুরুষ, পরমাত্মা বা ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের কোনো প্রসঙ্গ আসেনি। তবে ঋগ্বেদে কৃষ্ণ নামে একজন ঋষির নাম আছে (ঋগ্বেদ ৮/৮৫; ১০/৪২–৪৪)। দুটি ঋকে ঋষি কৃষ্ণ অশ্বিদ্বয়কে সোমযাগে আহ্বান করে বলেছেন–

> অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনা হবতে বাজিনীবসূ। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।
> শৃনুতং জরিতুহর্বং কৃষ্ণস্য স্তবতো নরাঃ। মধ্বঃ সোস্য পীতয়ে।[৩৫]

[অর্থ: হে অন্নযুক্ত ধনবান অশ্বিদ্বয়! মদকর সোমপানার্থ এই কৃষ্ণ ঋষি তোমার আহ্বান করছে।]

পৌরাণিক যুগে হিন্দুসমাজে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার প্রভাব সুস্পষ্ট। এই তিনজন দেবতাকে কেন্দ্র করে সমাজে তিনটি উপাসক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এরা হলেন বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। যাঁরা বিষ্ণুর উপাসক তাঁরা বৈষ্ণব, যাঁরা শিবের উপাসক তাঁরা শৈব এবং যাঁরা শক্তির উপাসক তাঁরা শাক্তরূপে পরিচিত। বৈষ্ণবেরা বেদের বিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একীভূত করে তাতে বেদত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু বৈদিক বিষ্ণু সূর্যদেবতারই নামান্তর। একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

বৈদিক দেবতা সাকার না নিরাকার

বৈদিক দেবতারা সাকার না নিরাকার এ নিয়ে মতভেদ আছে। বৈদিক যুগেই এ সম্পর্কে মতভেদ গড়ে উঠেছিল। নিরুক্তকার যাস্ক তাঁর গ্রন্থের দৈবতকাণ্ডে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি পূর্বাচার্যদের দুই প্রকার বিরোধী পরস্পর বিরোধী মত আলোচনা করে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। যাস্ক সাকার অর্থে পুরুষবিধ এবং নিরাকার অর্থে অপুরুষবিধ শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। পুরুষবিধ অর্থ পুরুষের মতো শরীরধারী এবং কর্মকুশল। অপুরুষবিধ অর্থ এর বিপরীত। যাঁরা দেবতাদের সাকারাত্ব স্বীকার করেছেন তাঁদের যুক্তি নিম্নরূপ–

(১) বৈদিক মন্ত্রে দেবতাদের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের 'বজ্রপাণি', সবিতার 'হিরণ্যহস্ত', আদিত্যের 'উজ্জ্বল মুখ', মিত্রদেবতার 'চক্ষু', বিষ্ণুর 'পদদেশ' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায় তাঁরা পুরুষের ন্যায় শরীরধারী। বেদে দেবতাদের অশ্ব, রথ, বজ্র, গৃহ, পত্নী, দুর্গ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইন্দ্র ও সূর্যের অশ্ব, ইন্দ্রদেবতার বজ্রপ্রয়োগ, ত্বষ্টাদেবতার বজ্র-নির্মাণ প্রভৃতির কথা আছে। অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্রের পত্নী যথাক্রমে অগ্নায়ী, ইন্দ্রাণী ও রুদ্রাণী। দেবতারা শরীরধারী না হলে এসব কথা অর্থহীন।

(২) ইন্দ্র সোম পান করেন, যুদ্ধ করেন, বৃত্রকে বধ করেন, অশ্বচালনা করেন; অগ্নি যজ্ঞের হবি ভক্ষণ করেন; মরুৎগণ বংশীবাদন করেন, রুদ্র ভীষণ গর্জন করেন, বিষ্ণু বিশাল চক্ষু দ্বারা সমগ্র জগৎ প্রত্যক্ষ করেন। মন্ত্রের এসব উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায়, দেবতারা পুরুষবিধ এবং শরীরধারী।

(৩) ঋগ্বেদে কতকগুলো সংবাদ-সূক্ত আছে, যেখানে দেবতারা সরাসরি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেছেন। যেমন, যম-যমী সংবাদ, সরমা-পণি সংবাদ, উর্বশী-পুরূরবা সংবাদ প্রভৃতি। দেবতাদের শরীর ও চৈতন্য না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ও বিবাহাদি সম্ভব নয়।

যাঁরা দেবতাদের নিরাকারত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের যুক্তি নিম্নরূপ–

(১) অগ্নি, সূর্য, পৃথিবী, বায়ু, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা যাঁদের আমরা নিত্য দেখছি তাঁরা পুরুষবৎ শরীরধারী নয়।

(২) ঋষিরা অগ্নি, সূর্য, বায়ু বা ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুতে চেতন-শরীর আরোপ করেছেন বলেই তাঁরা পুরুষবিধ নয়। আর্য ঋষিরা অচেতন প্রাকৃতিক বস্তু ও তার শক্তিকে চেতনবৎ কর্মাদি আরোপ করে তাঁদের স্তুতি করেছেন। বেদের অধিকাংশ দেবতাই প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতিরূপ। প্রাকৃতিক বস্তুতে মানবীয় গুণাবলী আরোপ করা কবিদের ধর্ম।

(৩) দেবতাজ্ঞানে স্তুতি করা হয়েছে বলেই যে অচেতন পদার্থ, যেমন, অক্ষ (পাশা), ওষধি, প্রস্তর, উলূখল, মুষল, তৃণ প্রভৃতি চেতনশরীরী দেবতা হবে এমন যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

দর্শনের যুগে আমরা দেখতে পাই জৈমিনীর পূর্বমীমাংসা দর্শনে দেবতাদের সাকারত্ব স্বীকার করা হয়নি। উক্ত দর্শন মতে মন্ত্রের অতিরিক্ত দেবতাদের কোনো পৃথক সত্তা নেই। (প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় ..) বেদব্যাস অবশ্য দেবতাদের পুরুষবৎ শরীর ধারণ ও কার্যাদি স্বীকার করেছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বেদব্যাসের মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, পর্জন্য এমন কি উলূখল, অক্ষ, মুষল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু কীভাবে শরীরধারী দেবতা হয় সে কথা তাঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। নিরুক্তকার যাস্ক অবশ্য দুটি মতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, দেবতা মন্ত্রময়ী।

যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মে যখন কোনো বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয় তখন সেই মন্ত্ররূপে দেবতার আবির্ভাব ঘটে। তাছাড়া দেবতার পৃথক কোনো সত্তা, বিগ্রহ বা রূপ নেই।[৩৬](যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয়, পৃ. ১০৯)

কেউ কেউ 'আজানদেব' ও 'কর্মদেব' নামে দেবতাদের আরও দুটি ভাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে যে সকল দেবদেবীদের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ, দেবত্বলাভ করার জন্য যাঁদের কোনো পুণ্য কর্মাদি বা তপস্যা করতে হয় না তাঁরা আজানদেব। অর্থাৎ তাঁরা জন্মরহিত স্বতঃসিদ্ধঃ দেবতা। আর যাঁরা পূর্বে মানুষ ছিলেন, পুণ্যকর্ম বা তপস্যার বলে দেবত্ব লাভ করেছেন তাঁদের 'কর্মদেবতা' সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, সোম, মরুৎ, বিষ্ণু, ঊষা, বাক্ প্রভৃতি দেবদেবী 'আজানদেবতা'; এঁদের দেবত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ঋভু নামক দেবগণ এবং অশ্বিদেবতাযুগল কর্মদেবতা। কারণ তাঁরা প্রথমে দেবতা ছিলেন না; পুণ্যকর্মের দ্বারা তাঁরা দেবত্ব লাভ করেছেন।[৩৭]

বৈদিক দেবতা বহু। বর্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র তিন প্রধান দেবতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মূলত অন্যান্য দেবতা এই তিন দেবতারই রূপভেদ। স্বল্প পরিসরে সকল দেবতার বর্ণনা দেওয়াও সম্ভবপর নয়। দেবতাদের সম্পর্কে বৈদিক ঋষিদের একটি ধারণা এখানে তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

তথ্য নির্দেশ

১ ড.শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩), পৃ, ৪
২ সু+উক্ত= সূক্ত। সুচারুরূপে উক্ত মন্ত্রসমষ্টি। কতকগুলো মন্ত্র নিয়ে এক একটি সূক্ত।
৩ ঈশোপনিষদ, মন্ত্র নং ১
৪ ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১/১/১, ১/৫৩/৫। রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ম খণ্ড (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৩)।
৫ যাস্ক, নিরুক্ত, ৭/১৫।
৬ Winternitz, A History of Indian Literature, 1972, p.75
৭ রজনীকান্ত সেন, কান্তগীতিমাল্য (কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭২)
৮ ড. রামেশ্বর শ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য: সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৫) পৃ. ৫২।
৯ ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৪৬ রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ম খণ্ড (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৩)।
১০ ঋগ্বেদ, ১০/১১৪/৫
১১ তদেব, ১০/৮১/৩

১২ ঋগ্বেদ, ১০/১২৫//১-২। শাক্তবাদীরা শাক্তধর্মের প্রাচীনত্ব এই সূক্তটিতে খুঁজে পান। বৈদিক যুগেও যে শক্তি পূজার প্রচলন ছিল তার প্রমাণ হিসেবে তাঁরা এই সূক্তটি উল্লেখ করে থাকেন। বাক্ ছিলেন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা এবং সাধক। তিনি সাধনাবলে অন্যান্য ঋষির মতোই নিজের মধ্যে সেই পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে 'সো'হম্' (স+অহম্– আমিই সেই) উক্তির মতোই উক্ত কথাটি বলেছিলেন। পরবর্তীকালে বাক্ দেবীকেই পরমাত্মার আসনে বসিয়ে শক্তিপূজা বা মাতৃপূজাকে বৈদিক ধর্মসাধনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৩ যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয় (কলিকাতাঃ ফার্মা কেএলএম প্রা.লি. ১৯৯৩), পৃ. ১০০

১৪ ঋগ্বেদ, প্রাগুক্ত, ১০/১৫৮/১

১৫ ঋগ্বেদ, তদেব, ১/৩৪/১১, ১/৪৫/২, ১/১৩৯/১১, ৩/৬/৯, ৮/২৮/১

১৬ ঋগ্বেদ, তদেব, ৩/৯/৯, ১০/৫২/৬।

১৭ আপ্রী অগ্নির আরেক নাম। এঁকে জলশোষক সবিতাও জলের পৌত্র বলা হয়েছে। জল থেকে শস্য বৃক্ষাদি জন্মায় এবং তা থেকে অগ্নি উৎপাদন হয়। এজন্য অগ্নিকে জলের পৌত্র বলা হয়েছে।অগ্নি– জলশোষক সবিতা।

১৮ ঋগ্বেদ, প্রাগুক্ত, ১/৫০, ১০/৩৭, ১০/৫৮, ১০/১৭০, ১০/১৮৯; ১/১১৫,১/২৪, ৪/৫৮, ৪/৪০, ৭/৬৩

১৯ ঋগ্বেদ, তদেব, ১/১/১,

২০ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী, প্রথম পর্ব (কলিকাতাঃ ফার্মা কেএল এম প্রা. লি. ১৯৯২) পৃ. ১৭৮

২১ তদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

২২ ঋগ্বেদ, তদেব, ২/১২/২-৪,

২৩ ঋগ্বেদ, তদেব, ৩/৬২/১০ ঋকের টীকা।

২৪ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

২৫ তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২/৪/১০/১।

২৬ ঋগ্বেদ, ২/২৭/১

২৭ ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, বসুমতী সংস্করণ।

২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূরবী– সাবিত্রী কবিতা ।

২৯ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, প্রথম পর্ব, পৃ. ১১৪।

৩০ রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ২২নং সূক্তের টীকা, পৃ. ১০৩

৩১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল (কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ১৩৬১) পৃ. ৯৪

৩২ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রগুক্ত, ২০৬।

৩৩ রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদ-সংহিতা, গ্রাগুক্ত, ৭/৯৯/৩-৪ ঋক্এর ব্যাখ্যা, পৃ. ১৯৫

৩৪ তদেব, (১/২২/১৭) সূক্তের টীকা, পৃ. ১০৩

৩৫ ঋগ্বেদ ৮/৮৫,৩-৪

৩৬ যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয় (কলিকাতাঃফার্মা কেএলএম প্রা.লি. ১৯৯৩), পৃ. ১০৯

৩৭ তদেব, পৃ. ১১১

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

শ্রীমদ্ভগবদগীতার ‘কর্মযোগ’ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ড. জয়শ্রী দাষ*

Abstract: The Srimad Bhagavad Gita is a part of epic Mahabharat. It is considered to be the primary Holy Scripture for Hinduism. The Gita is the set in a narrative framework of a dialogue between Pandava prince Arjuna and his guide and charioteer Krishna, an avatar of Lord Vishnu. Karma Yoga is a fundamental chapter of the Gita. At the start of the Dharma Yuddha between Pandavas and Kauravas, Arjun is filled with moral dilemma and despair about the violence and death the war will cause in the battle against his own kin. In the scripture, Krishna counsels Arjuna to fulfill his Kshatriya (warrior) duty to uphold the Dharma through selfless action. Arjuna, after listening to Krishna's spiritual teachings in Sankhya Yoga, gets more confounded and returns to the predicament he faces. Then Krishna states that Arjuna has an obligation to understand and perform his duty because everything is connected by the law of cause and effect. Every man or woman is bound by activity. Those who act selfishly create the karmic cause and are thereby bound to the effect which may be good or bad. But those who act selflessly for the right cause and strive to do their dharmic duty remain free from the action bond. In this article, I have tried to discuss about the Karma Yoga of the Srimad Bhagavad Gita.

জগতের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যেমন বেদ,উপনিষদ,কোরআন,বাইবেল স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত কিন্তু গীতা স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ নয় এটা মহাভারতের অংশ। গীতাকে বলা হয়েছে, বেদগাভীর দুগ্ধ।''সর্ব্বোপনিষদো গাবো দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।''বেদানুগ শাস্ত্রের মধ্যে গীতার স্থান সর্ব্বোপরী। সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক ব্যক্তির গীতাগ্রন্থ নিত্যপাঠ্য। উপনিষদে যে শিক্ষা রহস্যে আবৃত গীতায় তা আবরণহীন উন্মুক্ত। উপনিষদের কথাগুলি গভীর রহস্যে পরিপূর্ণ কিন্তু গীতার উপদেশ দরদ মাখানো । ভক্তের আকুল আবেদনের কাছে হার মেনে ভগবান সাড়া দিয়েছেন। ভগবান ভক্তের দেহে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন,

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।

যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ৷৷[১]

অর্থাৎ হে মহাবাহো, তুমি আমার বাক্য শ্রবণে প্রীতি লাভ করেছ, আমি তোমার হিতার্থ পুনরায় উৎকৃষ্ট কথা বলছি, তুমি তা শ্রবণ কর।

এই প্রাণ-নিঙড়ানো স্নেহধারা, গীতায় ফল্গুধারার মত সাতশত শ্লোকের অন্তস্থলে প্রবাহিত হয়েছে। গীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আর শ্রোতা পাণ্ডুপুত্র অর্জুন। কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে অর্জুন কর্তব্য নির্ণয়ে দ্বিধাগ্রস্থ। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মনের এই অবস্থার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছুই হতে পারে না। যুদ্ধে মনোবলই আসল। হাত,পা ভাঙ্গলে দোষ নাই কিন্তু মন ভাঙ্গলেই বিপদ। প্রাণ হারালেও বিপদ নাই,লক্ষ্য হারালেই মহাবিপদ। অর্জুন লক্ষ্য হারিয়েছেন তাই মহাবিপদের সম্মুখীন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জুনের রথের সারথি নয়,সমগ্র মানব মাত্রেরই জীবন রথের সারথি। গীতার শুরুতে সারথিরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বিষাদ দূর করেছেন। এরপর তাঁকে বিষাদ হতে মোক্ষে উর্ত্তীণ করেছেন। ডাক্তার যেমন রোগীকে জিজ্ঞাসা করে- ঔষধ ঠিকমত খেয়েছ কিনা? রোগ সেরেছে কিনা? গীতার শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সব মনোযোগ সহকারে শুনেছ তো? তোমার অজ্ঞতা জনিত মোহ দূর হয়েছে তো? রোগী কেমন অনুভব করছে, সেইটায় বড় কথা।

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তাই অর্জুন বলেছেন,

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রাসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥[২]

অর্থাৎ হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আমার কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান লাভ হলো,আমি স্থির হয়েছি,আমার আর সংশয় নাই,আমি তোমার উপদেশ মত কার্য করব।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ। যোগ শব্দের অর্থ যুক্ত করা। যখন দুটি স্বজাতীয় তত্ত্বের মিল হয়ে যায়,তখন তার নাম হয় ''যোগ''। আয়ুর্বেদে দুটি ঔষধ পরস্পর মিলে যাওয়াকে ''যোগ'' বলা হয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই ''যোগ'' বলা হয়েছে। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দের বিচিত্র অর্থ আছে। যুজ্ ধাতুর থেকে সৃষ্ট'যোগ'শব্দ যার অর্থ হচ্ছে সমরূপ পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ; যেমন-'সমত্ব যোগ উচ্যতে'। আবার চিত্তের স্থিরতা অর্থাৎ সমাধিতে স্থিতিই যোগ।'যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া'। সামর্থ্য বা প্রভাব অর্থেও যোগ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন-'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'।[৩]

আবার বলা হয়েছে,

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥[৪]

অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় দুঃখসংযোগের বিয়োগ হয়,এই দুঃখবিয়োগই যোগশব্দবাচ্য। এইযোগ নির্বেদশূন্যচিত্তে অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্তব্য।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥[৫]

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়,যোগস্থ হয়ে,ফলাসক্তি বর্জন করে,সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করে তুমি কর্ম কর। এরূপ সমত্ব-বুদ্ধিকেই যোগ বলে।

সঠিকভাবে বলা যায়, গীতায় চিত্তবৃত্তি থেকে সর্বথা সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ পূর্বক স্বাভাবিকভাবে সম-স্বরূপে স্থিতিলাভ করাকেই 'যোগ'বলা হয়েছে।

কর্ম শব্দটি সংস্কৃত কৃ ধাতু থেকে এসেছে। কৃ ধাতুর অর্থ করা; যা কিছু করা হয় তাই কর্ম। এই শব্দটির আবার পারিভাষিক অর্থ 'কর্মফল'। দার্শনিকভাবে ব্যবহার করা হলে কখনো কখনো এর অর্থ দাঁড়ায়-সেই সব ফল, আমাদের পূর্বকর্ম যেগুলোর কারণ। কিন্তু কর্মযোগে আমাদের 'কর্ম' শব্দটি শুধু 'কাজ' অর্থেই ব্যবহার করতে হবে।[৬] কর্ম বন্ধনের কারণ নয়,ফলাসক্তিই বন্ধনের কারণ। ফলসন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস,আসক্তি ত্যাগেই মুক্তি। যিনি রাগদ্বেষত্যাগী তিনি কর্মানুষ্ঠান করেও সন্ন্যাসী । কর্মত্যাগ ব্যতীত সন্ন্যাস কেবল দুঃখেরই কারণ। ফলাফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বক নিষ্কামভাবে বিশ্বকর্ম সম্পাদন করাই কর্মযোগ।[৭] নিঃস্বার্থ কর্মদ্বারা মানব-প্রকৃতির চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ করাই কর্মযোগ। সুতরাং প্রত্যেক স্বার্থপূর্ণ কার্যই আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে বাধা স্বরূপ;আর প্রত্যেক নিঃস্বার্থ কর্মই আমাদের সেই লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।তাই যা স্বার্থ শূন্য,তাই নীতিসঙ্গত;আর যা স্বার্থপর,তা নীতিবিরুদ্ধ।[৮]

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে বললেন। দ্বিবিধা নিষ্ঠা কিভাবে সমন্বয় করা সম্ভব তা বুঝতে অর্জুনের কষ্ট হলো। অর্জুনের সংশয় উপস্থিত হলো এবং শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন,

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥[৯]

অর্থাৎ হে জনার্দন,যদি তোমার মতে কর্ম হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব,আমাকে হিংসাত্মক কর্মে কেন নিযুক্ত করছো? বিমিশ্রবাক্যদ্বারা কেন আমার মনকে মোহিত করছো? যা দ্বারা আমি শ্রেয় লাভ করতে পারি, সেই একটি পথ আমাকে নিশ্চিত করে বল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন তার কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছে না। সে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে চাচ্ছে। কিন্তু তার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। অর্জুন ক্ষত্রিয়। আর ক্ষত্রিয় হিসেবে তার প্রধান কর্তব্য হলো প্রজাদের রক্ষা করা এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করা।

অর্জুনের এই সংশয় দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ৷৷

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ৷৷[১০]

অর্থাৎ হে অনঘ, ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, এটা পূর্বে বলেছি। সাংখ্যগণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং কর্মীগণের জন্য কর্মযোগ। কর্মচেষ্টা না করলেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্যলাভ করতে পারে না, আর কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

আচার্য শঙ্কর ও তাঁর মতাবলম্বিগণ বলেন যে,"কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুইটি বিভিন্ন সাধনা নহে। তা একই সাধনার দুইটি স্তর। প্রথমে নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করতে হয় এটাই কর্মযোগ। কর্মযোগদ্বারা চিত্ত নির্মল হলে জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে। তখন কর্ম পরিত্যাগপূর্বক গুরুর নিকট 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য শ্রবণান্তর মনন ও নিধিধ্যাসন করলে মুক্তিলাভ করা যায়। এই মতে কর্মদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। কারণ,কর্ম জ্ঞানের বিরোধী। জ্ঞান ও কর্ম একত্র হয় না, কাজেই জ্ঞানীর কোন কর্ম নাই। নিষ্কাম কর্মদ্বারা জ্ঞানলাভের যোগ্যতা জন্মে বটে, কিন্তু জ্ঞানলাভ করতে হলে কর্মত্যাগ করতেই হবে। যতক্ষণ কর্ম আছে ততক্ষণ জ্ঞানলাভ হবে না। আবার জ্ঞান ব্যাতীত মুক্তি নাই, সুতরাং মুক্তির জন্য কর্মত্যাগ আবশ্যক। কর্ম বন্ধনের কারণ মুক্তির কারণ নয়।"[১১]

সন্ন্যাসবাদীগণ বলেন, "কর্মত্যাগ করে জ্ঞানমার্গে বিচরণ করলেই নৈষ্কর্ম্য বা মোক্ষ লাভ হয়। শ্রীগীতায় বলা হয়েছে,তা হয় না। সন্ন্যাস মার্গে মোক্ষলাভ হয় ঠিক,তা হয় জ্ঞানের ফলে কর্মত্যাগের ফলে নয়। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়,অহংকার ও কামনাই বন্ধনের কারণ। কামনাত্যাগেও জ্ঞানের প্রয়োজন এবং সেই হেতুই নিষ্কাম কর্ম মোক্ষের জন্য চাই,অহঙ্কার ও ফলাসক্তি ত্যাগ,কর্মত্যাগ প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ দেহধারী জীব একেবারে কর্মত্যাগ করতেই পারে না।"[১২]

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান মোক্ষলাভের দুইটি মার্গের কথা বলেছেন। একটি জ্ঞানমার্গ বা সন্ন্যাসমার্গ অপরটি কর্মযোগ-মার্গ।কর্মযোগ মার্গের ভিত্তি হচ্ছে সম্যক জ্ঞান এবং এই সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ সম্ভব। কর্ম যদি করতেই হয় এমনভাবে করতে হবে যেন তা বন্ধনের কারণ না হয়ে মোক্ষের কারণ হয় এটাই কর্মযোগ।[১৩] আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ,আমরা কোন কাজ গ্রহণ করে তাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি। হয়তো তা নিষ্ফল হল,তবুও আমরা তা পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি, কর্ম আমাদের আঘাত দিচ্ছে,কর্মের প্রতি আরও বেশি আসক্ত আমাদের শুধু দুঃখই দিচ্ছে,তবুও আমরা ওই কর্ম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারি না। মাছি মধুপান করতে এসেছিল, কিন্তু তার পাগুলো মধুপাত্রে আটকে গেল। সে আর বেরোতে পারল না। বরাবরই আমাদের এ রকম দুরবস্থা হচ্ছে। আমাদের সমস্ত জীবন এমন একটা রহস্যে জড়ানো। অতএব আমরা যদি বিষয়ে জড়িত হয়ে না পড়ি ,তাহলে সর্ববিধ সফলতা ও বিফলতা ,সুখ ও দুঃখ সত্ত্বেও আমাদের জীবন অনবরত আনন্দোজ্জ্বল হতে পারে।[১৪]
শ্রীভগবান বলেছেন,

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ৷৷
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ৷৷[১৫]

অর্থাৎ কিন্তু যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সংযত করে অনাসক্ত হয়ে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়ত কর্ম কর, কর্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম না করলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হতে পারে না।

আমাদের জ্ঞানের দ্বারা মনকে সংযত করে নিষ্কামভাবে কর্ম করতে হবে। তাহলে সেই কর্ম আমাদের বন্ধনের কারণ হবে না। বরং তা জ্ঞানযজ্ঞে পরিণত হবে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।[১৬]

অর্থাৎ যজ্ঞার্থ যে কর্ম তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম মনুষ্যের বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়, তুমি সেই উদ্দেশ্যে অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর।

যে কর্ম যজ্ঞের সঙ্গে করা হয় তাকে যজ্ঞার্থ কর্ম বলে।এই কর্ম ত্যাগমূলক,কিন্তু এই ত্যাগমূলক কর্মদ্বারাই মানবগণের রক্ষা ও বৃদ্ধি হয়ে থাকে,এটা দ্বারাই মানবগণের ইষ্টলাভ হয়।এই কর্মে যে ইষ্টলাভ হয় তা যজ্ঞের ফলস্বরূপ,সুতরাং ততখানি শুদ্ধ ও পবিত্র।[১৭] দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূত অগ্নিতে আহুতি দানকেই বৈদিক যজ্ঞ বলে। স্মৃতি,দেবতার উদ্দেশ্যে কথাটিকে ব্যাপক করে ঋষির উদ্দেশ্যে,পিতৃগণের উদ্দেশ্যে,মানুষের উদ্দেশ্যে,পশুপাখির উদ্দেশ্যে যথাযথ শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণকে যজ্ঞ বলেছেন। শুধুমাত্র অগ্নিতে ঘৃত দিলেই যজ্ঞ হয় না। ব্রহ্মরূপ মহাগ্নিতে আত্মরূপ হবির উৎসর্গীকরণই প্রকৃত যজ্ঞ। যে কর্মে ক্ষুদ্র আমিত্বটা আহুতিরূপে সমর্পিত হয়ে গিয়েছে তাই যজ্ঞ। কর্মযোগীর কর্ম মাত্রই যজ্ঞ। অথবা কর্মকে যজ্ঞময় করে প্রতিষ্ঠা করে কর্মী কর্মযোগী হয়ে থাকেন।[১৮] শুধু যজ্ঞ এবং সামাজিক কতর্ব্য নয়,সকল কর্মই যজ্ঞার্থে করা যেতে পারে। প্রত্যেক কর্মই ছোট অথবা বড় স্বার্থের জন্য করা যেতে পারে অথবা ঈশ্বরার্থে করা যেতে পারে। প্রকৃতির সকল বস্তু এবং সকল কর্মই ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বর হতেই তার উৎপত্তি,তাঁর দ্বারাই এটা রক্ষিত হয়, এবং তাঁর দিকেই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু যতদিন আমরা অহংভাবের অধীন,ততদিন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারি না, ততদিন আমরা অহংভাবের বশে স্বার্থের জন্য কর্ম করি, যজ্ঞার্থে নয়। অহংকারই সকল বন্ধনের গ্রন্থি।[১৯]

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বো স্তিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ।
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥[২০]

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞের সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন, তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বর্ধিত হও; এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদ হোক। এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্ধনা কর,সেই দেবগণও তোমাদেরকে সংবর্ধিত করুক। এরূপে পরস্পরের সংবর্ধনা দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করবে। যেহেতু দেবগণ যজ্ঞাদিদ্বারা সংবর্ধিত হয়ে তোমাদেরকে অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন, সুতরাং তাঁদের প্রদত্ত অন্নপানাদি যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁদের প্রদান না করে যে ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর। যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন,তাঁরা সর্বপাপ হতে মুক্ত হন। যে পাপাত্মারা কেবল আপন উদর পূরণার্থ অন্ন পাক করে , তারা পাপরাশিই ভোজন করে।

শ্রীভগবান আরো বলেছেন,

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসমম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্টিতম ॥

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥[২১]

অর্থাৎ প্রাণিসকল অন্ন হতে উৎপন্ন হয়, মেঘ হতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ হতে মেঘ জন্মে কর্ম হতে যজ্ঞের উৎপত্তি,কর্ম বেদ হতে উৎপন্ন এবং বেদ পরব্রহ্ম হতে সমুদ্ভূত, সেহেতু সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম সদাযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইরূপে প্রবর্তিত জগচ্চক্রের যে অনুবর্তন না করে, সে ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ও পাপজীবন; হে পার্থ, সে বৃথা জীবন ধারণ করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝানোর পর কর্ম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মান্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনাহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥[২২]

অর্থাৎ যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, যিনি কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁর নিজের কোন প্রকার কর্তব্য নাই। যিনি আত্মারাম তাঁর কর্মানুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নেই, কর্ম হতে বিরত থাকারও কোন প্রয়োজন নেই। সর্বভূতের মধ্যে কার আশ্রয় তার প্রয়োজন নাই।

এখানে দুইটি বিরোধী আদর্শ দেখা যাচ্ছে। একটি বৈদিক, অপরটি বৈদান্তিক। একদিকে কর্মের আদর্শ,যজ্ঞের দ্বারা এবং মনুষ্য ও দেবগণের পরস্পরের উপর নির্ভরতা দ্বারা ইহকালে ভোগসুখ ও পরকালে পরমার্থ লাভ,অন্যদিকে মুক্ত পুরুষের কঠোরতর জীবনের আদর্শ। তিনি আত্মসত্তায় স্বাধীন, কর্ম ও ভোগের সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই,নরলোক বা দেবলোক নিয়ে তিনি ব্যস্ত নয়। শুধু পরমাত্মার শান্তির মধ্যে তিনি বাস করেন, ব্রহ্মের স্থির আনন্দে তিনি আনন্দলাভ করেন।[২৩]

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥[২৪]

অতএব তুমি আসক্তিশূন্য হয়ে সর্বদা কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর, কারণ অনাসক্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করলে পুরুষ পরমপদ প্রাপ্ত হন। জনকাদি মহাত্মারা কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছেন। লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেও তোমার কর্ম করা কর্তব্য।

মুক্তপুরুষের কর্মানুষ্ঠান বা কর্মত্যাগ কোনটারই প্রয়োজন নাই তাই মুক্তপুরুষের কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠান ভাল কারণ মুক্তপুরুষের কর্মদ্বারাই লোকসংগ্রহ হয়, লোকসকল সন্মার্গে প্রতিষ্টিত থাকে। মুক্তপুরুষই শ্রেয় পুরুষ; কাজেই তিনি যদি কর্মত্যাগ করেন তবে তাঁর দৃষ্টান্ত অজ্ঞ লোকেরাও কর্ম ত্যাগ করতে পারে।[২৫] স্বর্গ,মর্ত্য এবং পাতাল এই ত্রিলোকের মর্যাদাকে স্থায়ী রাখার জন্য যে কর্ম করা হয় তাকে 'লোকসংগ্রহ' বলে।[২৬] জনকাদি রাজর্ষিগণের এই লোক-সংগ্রহ ছিল জীবনের একটি প্রধান কাজ। ঋষি হয়েও তত্ত্বদ্রষ্টা মহাজ্ঞানী হয়েও তাঁরা কর্ম করতেন এবং এই কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। লোক-সংঘট্ট কমিয়ে লোক-সংগ্রহ সাধনায় ছিল তঁদের লক্ষ্য। এরা কোন দলের লোক নন বাহ্যতঃ গন্ডীর মধ্যে থাকলেও জ্ঞানী গন্ডীর বহু উর্ধ্বে বিরাজিত। রসিক কবি চন্ডীদাস যে 'মানুষ'কে সবার উপরে বলেছিলেন, এরা হচ্ছে সেই মানুষ। অমানুষকে মানুষ করাই হলো এদের সব কর্মের মূল। এই কাজই লোক-সংগ্রহ।[২৭]

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥[২৮]

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন,অপর সাধারণেও তাই করেন। তিনি যা প্রামাণ্য বলে বা কর্তব্য বলে গ্রহণ করেন,সাধারণ লোকে তারই অনুবর্তন করে। হে পার্থ, ত্রিলোক মধ্যে আমার করণীয় কিছু নাই,অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই,তথাপি আমি কর্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত আছি।

পরমেশ্বর ভগবান আত্মতৃপ্ত এবং আপ্তকাম। তথাপি তিনি কর্ম করেন। সর্বাপেক্ষা আত্মতৃপ্ত এবং আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানই যদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে আত্মতৃপ্ত মুক্ত মানুষের কর্মত্যাগের কোনও হেতুই থাকতে পারে না। তারপর মুক্ত পুরুষগণ ভাগবত জীবন লাভ করেছেন। সুতরাং ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁদের পক্ষেও কর্ম করাই উত্তম।[২৯]

শ্রীভগবান বলেছেন,

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥[৩০]

অর্থাৎ হে পার্থ যদি অনলস হয়ে কর্মানুষ্ঠান না করি, তবে মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্তী হবে। যদি আমি কর্ম না করি তা হলেও এই লোকসকল উৎসন্ন হয়ে যাবে। আমি বর্ণ-সঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু হবো এবং ধর্মলোপহেতু প্রজাগণের বিনাশের কারণ হবো।

মানুষের সমস্ত আচরণই লোকমর্যাদা অনুযায়ী হওয়া উচিত। এতে যে যাই ভাবুক না কেন ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা না ভেবে বিশ্ব হিতের জন্য কর্তব্য কর্ম করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজ কল্যাণের কথা চিন্তা না করে শুধু অপরের কল্যাণের ভাব মনে রেখে নিজ কর্তব্য পালন করে, তার দ্বারা স্বতঃই মানুষের কল্যাণ হয়। যেমন বরফের কাছে গেলে ঠান্ডা লাগে,আগুনের কাছে গেলে গরম লাগে, তেমনি ঐসব ব্যক্তির কাছে গেলে বা তাদের কথা চিন্তা করলেও কল্যাণ হয়। এইসব ব্যক্তি যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকেন, তাহলে তাঁর গৃহ থেকে যারা অন্ন-জল নিয়ে ব্যবহার করে তাদেরও ভাল হয় এবং এরূপ ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসী হন তাহলে তিনি যে গৃহ থেকে অন্ন-জলাদি গ্রহণ করেন, যেই ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়ে থাকে। তিনি জীবিত থাকাকালে তাঁর আচরণ,বাক্য,ভাব ব্যক্তিদের উপর যে প্রভাব ফেলে, তাঁর মৃত্যুর পরও তা তেমনি প্রভাব ফেলে। যে স্থানে মহাপুরুষ বসবাস করেন,অজানিত ভাবে কোন ব্যক্তি যদি তথায় যায় তবে সে-ও সেই স্থানে শান্তি অনুভব করে।[৩১]

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥[৩২]

অর্থাৎ হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্মে আসক্তিবিশিষ্ট হয়ে যেরূপ কর্ম করে থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত চিত্তে লোকরক্ষার্থে সেইরূপ কর্ম করবেন। জ্ঞানীরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞানগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। নিজেরা অবগত হয়ে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করে তাদের কর্মে নিযুক্ত রাখবেন।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি কর্মত্যাগ করে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করেন তাহলে সাধারণ মানুষও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুসরণ করে কর্মত্যাগ করবেন এবং তারা কর্মত্যাগকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করবেন। কিন্তু গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলেছেন যে, কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করা শ্রেয়ঃ। সুতরাং জ্ঞানীগণ অনাসক্তভাবে কর্মানুষ্ঠান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন এবং সাধারণ মানুষের অনুকরণীয় হবেন। অতুল চন্দ্র সেন বলেছেন,"উপদেশ দ্বারাই অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ ঘটে থাকে তা নয়। জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত দর্শনেও তার মতিভ্রম জন্মাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের উপর উপদেশের প্রভাব অপেক্ষা দৃষ্টান্তের প্রভাব অনেক বেশী। সুতরাং জ্ঞানী যদি কর্মত্যাগ করেন তবে তাঁর দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীও কর্মত্যাগ করবে। কারণ সে মনে করবে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যখন কর্মত্যাগ করেছেন তখন কর্ম দূষণীয় এবং কর্মত্যাগই মোক্ষলাভের পথ। এ প্রকারে কর্ম ত্যাগ করে সে জ্ঞান ও কর্মের উভয় পথ হতেই ভ্রষ্ট হবে। সুতরাং জ্ঞানী

কর্মত্যাগ করবেন না, তিনি ভগবানের সাথে যুক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে সর্ববিধ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করবেন; পরন্তু জ্ঞানীর নিষ্কাম ভাগবত কর্ম দেখে তারাও ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনে শিক্ষালাভ করবে।"[৩৩] কর্মযোগে বলা হয়েছে,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥[৩৪]

অর্থাৎ প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সর্বতোভাবে কর্মসকল সম্পন্ন হয়। যে অহঙ্কারে মুগ্ধচিত্ত সে মনে করে আমিই কর্তা। কিন্তু হে মহাবাহো, যিনি সত্ত্বরজস্তমগুণ ও মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির বিভাগ ও তাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম-বিভাগতত্ত্ব জেনেছেন, তিনি ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত আছে তা জেনে কর্মে আসক্ত হন না,কর্তৃত্বাভিমান করেন না।

গুণ বলতে সত্ত্ব,রজঃ ও তম এই ত্রিগুণকে বোঝায়। গীতায় ত্রিগুণ কথাটি একাধিকবার এসেছে। শ্রীমদ্ভগবতগীতায় গুণত্রয় সম্পর্কে বলা হয়েছে,

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥[৩৫]

অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি বটে, কিন্তু আমি তার সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাকে অকর্তা ও বিকাররহিত বলেই জেনো।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥[৩৬]

অর্থাৎ এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা (সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা) সমস্ত জগৎ মোহিত হয়ে রয়েছে, এ-সকলের অতীত অক্ষয় আনন্দস্বরূপ আমাকে স্বরূপতঃ জানতে পারে না ।

কর্মযোগে বলা হয়েছে,

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥[৩৭]

অর্থাৎ যারা প্রকৃতির গুণে মোহিত তারা দেহেন্দ্রিয়াদি কর্মে আসক্তিযুক্ত হয়; সেই সকল অল্পবুদ্ধি মন্দমতিদিগকে জ্ঞানীগণ কর্ম হতে বিচালিত করবেন না। কর্তা ঈশ্বর,তাঁর উদ্দেশ্যে ভৃত্যবৎ কর্ম করছি, এরূপ বিবেক-বুদ্ধি সহকারে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে কামনাশূন্য ও মমতাশূন্য হয়ে শোকত্যাগপূর্বক তুমি যুদ্ধ কর।

সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। পুরুষ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীল। প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে সত্ত্ব, রজঃ ও তম। এই তিন গুণ দ্বারাই প্রকৃতি কর্ম করে থাকে। এই তিন গুণ সাম্য অবস্থায় থাকলে প্রকৃতি কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। কিন্তু যখন একটি গুণের অন্য গুণ অপেক্ষা আধিক্য দেখা যায় তখন গুণত্রয় প্রাধান্য বিস্তার করে। এই সৃষ্টি প্রকৃতির গুণসমুহেরই পরিণাম বা বিকার।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥[৩৮]

অর্থাৎ যে মানবগণ শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হয়ে আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে, তারাও কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়। যারা অসূয়াপরবশ হয়ে আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে সর্বজ্ঞান-বিমূঢ় ও বিনষ্ট বলে জেনো।

নিষ্কাম কর্মযোগদ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। আত্মজ্ঞান লাভ করে নিরাশী নির্মম হয়ে সমস্ত কর্ম পরমেশ্বর ভগবানকে সমর্পণপূর্বক লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করতে হবে।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥[৩৯]

অর্থাৎ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম করে থাকেন। প্রাণীগণ প্রকৃতির অনুসরণ করে; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে কি করবে। সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। ঐ রাগদ্বেষের বশীভূত হয়ো না; তা জীবের শত্রু।

প্রকৃতিদ্বারাই মানব জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি নিয়েই মানব প্রকৃতি গঠিত হয়। মানব প্রকৃতিকে বশে রাখতে হলে সবার আগে ইন্দ্রিয় সংযম প্রয়োজন। মন ও বুদ্ধি যাতে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। শ্রীভগবান বলেছেন,

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥[৪০]

অর্থাৎ স্বধর্মো কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্ট হলেও তা উত্তমরূপে অনুষ্টিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা বিপজ্জনক।

মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মকেই স্বধর্ম বলে। সমাজে সকল ব্যক্তির একটা নিদিষ্ট কর্ম আছে। যার যে কর্ম সেই কর্ম ঐ ব্যক্তি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করলে জীবন ছন্দোময় হয়ে ওঠে। অন্যথায় তা বিশৃঙ্খলতার রূপ নেয়। তাই অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥[৪১]

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, লোকে কারদ্বারা প্রযুক্ত হয়ে অনিচ্ছাসত্তেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপাচরণ করে।

এর উত্তরে ভগবান বলেছেন,

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥
ধুমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরুপেণ কৌন্তেয় দুষ্পরেণানলেন চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥
তস্মাৎ তৃমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভারতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রু মহাবাহো কামরুপং দুরাসদম্ ॥[৪২]

অর্থাৎ ইহা কাম, ইহায় ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন, ইহা দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র। ইহাকে সংসারে শত্রু বলে জানবে। যেমন ধূমদ্বারা বহ্নি আবৃত থাকে,মলদ্বারা দর্পণ আবৃত হয়,জরায়ুদ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত। হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীগণের নিত্যশত্রু এই দুষ্পূরণীয় অগ্নিতুল্য কামদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি-এরা কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্থান বলে কথিত হয়। কাম এদেরকে অবলম্বন করে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে

জীবকে মুগ্ধ করে। হে ভারতশ্রেষ্ঠ, সেই হেতু তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করে জ্ঞানবিজ্ঞান-বিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট কর। ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। হে মহাবাহো,এইরূপে বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে,আত্মাকে আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং দুর্ণিবার শত্রু কামকে বিনাশ কর।

রূপরসাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ কাম। কাম প্রতিহত হলে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। আমাদের কামের আশ্রয়স্থল ইন্দ্রিয়কে বশে রাখতে হবে। যেমন ধূলিময় দর্পণে আমরা নিজেকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাই না ঠিক তেমনি কামনা বাসনার কারণে আমাদের আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হতে পারে না। জীব যখন আত্মাকে জানতে পারে তখন আর প্রকৃতির বশীভূত থাকে না। তখন 'আমি' 'আমি' মোহ থাকে না। 'কাঁচা আমি' জ্ঞানের দ্বারা 'পাকা আমি'তে পরিণত হয়। একেই বলে আত্মার দ্বারা আত্মাকে স্থির করা বা নিজেই নিজেকে স্থির করা। ভক্তিমার্গে বলা হয়েছে যে,আত্মজ্ঞান পরমাত্মারূপ শ্রীভগবান হতেই আসে। তাতে চিত্ত স্থির করতে পারলেই,অনন্যভক্তিচিত্তে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করলেই,প্রকৃতির বন্ধন দূর হয়,কামনা, বাসনা,রাগ, দ্বেষ লোপ পায়। সুতরাং চিত্তকে আত্মসংস্থ করে কামনাকে জয় করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, মানব জীবনে কর্ম অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকেই কোন না কোন কর্মে নিযুক্ত। কর্ম থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি না। আমরা যখন সকামভাবে কর্ম করি তখন তা বন্ধনের কারণ হয় কিন্তু যখন আমরা লোক-সংগ্রহার্থে ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষের কল্যাণার্থে কামনা ত্যাগ করে কর্ম করি তখন তা যজ্ঞের সমতুল্য হয় এবং এরুপ কর্ম আমাদের বন্ধনের কারণ না হয়ে যজ্ঞে পরিণত হয়। পরে এই যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞে সার্থকতা লাভ করে। নিষ্কামভাবে স্বার্থচিন্তা ব্যতিরেকে ঈশ্বরে নিজেকে সমর্পণ করলে মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্তি পেতে পারে এবং আত্মতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব দিব্যজ্ঞান অর্জন করতে পারে। তাই আমাদের কর্মফলের চিন্তা না করে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করে যেতে হবে।

তথ্যনির্দেশঃ

১ শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ,শ্রীগীতা,প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী;কলকাতা-৭৩,জানুয়ারী-২০০৫,১০/১,পৃ.৩৩৯।
২ তদেব,১৮/৭৩,পৃ.৫৪৪।
৩ স্বামী রামসুখদাস,গীতা দর্পণ,(গীতা প্রেস,গোরখপুর-২৭৩০০৫),২০১১,পৃ.১১৫।
৪ প্রাগুক্ত,শ্রীগীতা,৬/২৩,পৃ.২১২।
৫ তদেব,২/৪৮,পৃ.৬০।
৬ বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র,(অখন্ড বাংলা সংস্করণ),নবপত্র প্রকাশক,কলকাতা-৭৩,১ বৈশাখ ১৩৯১,পৃ.১০৮।
৭ প্রাগুক্ত,শ্রীগীতা,পৃ.১৭৯।
৮ প্রাগুক্ত,বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র,পৃ.৩৯।
৯ প্রাগুক্ত, শ্রীগীতা,৩/১-২,পৃ.৮৪।
১০ তদেব,৩/৩-৪,পৃ.৮৫-৮৬।
১১ অতুল চন্দ্র সেন,শ্রীমদ্ভগবদগীতা,হরফ প্রকাশনী;কলকাতা-০৭,১৯৩৬,পৃ.১২৪।
১২ প্রাগুক্ত,শ্রীগীতা,পৃ.৮৬।
১৩ তদেব,পৃ.৮৭।
১৪ প্রাগুক্ত,বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র,পৃ.১৪২।
১৫ প্রাগুক্ত,শ্রীগীতা,৩/৭-৮,পৃ.৮৮।
১৬ তদেব,৩/৯,পৃ.৯০।
১৭ প্রাগুক্ত,শ্রীমদ্ভগবদগীতা,পৃ.১৪২।
১৮ ড.শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী,গীতাধ্যান,(শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট:কলকাতা-৫৯),১৯৯৩,পৃ.১১২।
১৯ শ্রী অনিলবরণ রায় অনুবাদিত গীতানিবন্ধ,(শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট:পণ্ডিচেরী),১৯৯৪,পৃ.৯৭।
২০ প্রাগুক্ত,শ্রীগীতা,৩/১০-১৩,পৃ.৯৩-৯৫।
২১ তদেব,৩/১৪-১৬,পৃ.৯৬।

২২ তদেব, ৩/১৭-১৮,পৃ.১০১-১০২।
২৩ প্রাগুক্ত, গীতা নিবন্ধ,পৃ.১০০।
২৪ প্রাগুক্ত, শ্রীগীতা,৩/১৯-২০,পৃ.১০২,১০৫।
২৫ প্রাগুক্ত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা,পৃ.১৪৪।
২৬ প্রাগুক্ত,গীতা নিবন্ধ,পৃ.১৩৬।
২৭ প্রাগুক্ত, গীতা ধ্যান,পৃ. ১১৪।
২৮ প্রাগুক্ত,শ্রীগীতা,৩/২১-২২,পৃ.১০৫-১০৬।
২৯ প্রাগুক্ত,শ্রীমদ্ভগবদগীতা,১৪৭।
৩০ প্রাগুক্ত,শ্রীগীতা,৩/২৩-২৪,পৃ.১০৬-১০৭।
৩১ প্রাগুক্ত, গীতা দর্পণ,পৃ.১৩৭।
৩২ প্রাগুক্ত,শ্রীগীতা,৩/২৫-২৬,পৃ.১০৮,১১০।
৩৩ প্রাগুক্ত,শ্রীমদ্ভগবদগীতা,পৃ.১৫১।
৩৪ প্রাগুক্ত,শ্রীগীতা,৩/২৭-২৮,পৃ.১১১,১১৪।
৩৫ তদেব,৪/১৩,পৃ.১৪৪।
৩৬ তদেব,৭/১৩,পৃ.২৭৩।
৩৭ তদেব,৩/২৯-৩০,পৃ.১১৫-১১৬।
৩৮ তদেব,৩/৩১-৩২,পৃ.১১৭।
৩৯ তদেব,৩/৩৩-৩৪,পৃ.১১৮-১১৯।
৪০ তদেব,৩/৩৫,পৃ.১১৯।
৪১ তদেব,৩/৩৬,পৃ.১২৪।
৪২ তদেব,৩/৩৭-৪৩,পৃ.১২৪,১২৬,১২৭,১২৮।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

কালিদাসের রচনায় প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি

ড. মোছা. এলিনা আখতার পলি*

Abstract: Kalidasa was a classical Sanskrit poet, widely regarded as the greatest poet and dramatist in the Sanskrit languages in India. He was the courtpoet of the emperor Vikramaditya. His works were most likely authored within the 4th-5th century CE. The seven works identified as genuine written by Kalidasa that are the dramas Abhijanashakuntala, Vikramorvashi and Malavikagnimitra; the epic poem Raghuvamsha, Kumarsamvava and the lyrics Meghaduta and Ritusamhara. Poetry has an important role and function in society, just as poet do. The society reflected in Kalidasa's work is that of a courtly aristocracy sure of its dignity and power. The fusion which epitomizes the renaissance of the Gupta period, did not however, survive its fragile social base with the disorders following the collapse of the Gupta empire. Kalidasa became a memory of perfection that neither Sanskrit nor the Indian aristocracy would know again.

জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মানুষকে নানারকম প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হয়, ফলে সৃষ্টি হয় সমাজের। জীবনের নিরাপত্তার জন্য সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং প্রয়োজনের জন্য একে অন্যের সহযোগিতা মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে মানুষ নিরাপত্তার আশ্রয় খুঁজে পায়। মানবসমাজ প্রাকৃতিক ভাবে বৈচিত্র্যময় ও বৈসাদৃশ্যে পূর্ণ। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি বিষয় সমন্বয়ে মানব সমাজ শ্রেণী বিভক্ত। তাই সমাজ প্রত্যয়টি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত। নাটকের বিষয়বস্তু যে সময়কে ঘিরে আবর্তিত হয় নাটক বা সাহিত্যেও সে সময়ের জীবনধারা প্রতিবিম্বিত হয়। সমাজব্যবস্থা, সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান সবকিছু ফুটে ওঠে কবির কাব্যসমূহে।

মহাকবি কালিদাস ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের একজন রত্ন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগের প্রতিনিধি ছিলেন কবি কালিদাস। সমাজের অভিজাত শ্রেণীর সান্নিধ্যে, বিলাস-বৈভবের মধ্যে থেকে তিনি কখনো সাধারণ নিরন্ন, দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর কাব্যপাঠ করলে মনে হয় তিনি এক সম্ভ্রান্ত যুগের চিত্র এঁকেছেন।

সে সময় সমাজে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা ছিলেন রাজ্যের প্রধান। রাজা ছিলেন নির্লোভ, ধর্মপ্রাণ এবং যোগ্য শাসক। তার যোগ্যতার জন্যই রাজ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অমাত্যদের সহায়তায় রাজ্য পরিচালনা করতেন। প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল তাঁর হস্তে। তিনি নগর রক্ষার কাজে নগররক্ষী নিযুক্ত করতেন। যাতে সকলে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে। নগররক্ষীগণ দিনরাত সর্বসময় তাদের দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত থাকতেন।

রাজা অর্থ সংগ্রহ করতেন জনগণের কাছ থেকে কর সংগ্রহের মাধ্যমে। জনগণের উৎপাদিত পণ্যের ষষ্ঠ অংশের এক অংশ রাজাকে কর প্রদান করা হত। কর আরোপের ক্ষেত্রে কোনো জোর আরোপের উল্লেখ দেখা যায় না কোথাও, তাই ধারণা করা হয় নির্ধারিত অংশ যা জনগণ কররূপে প্রদান করে তা তাদের সাধ্যের মধ্যেই ছিল।

অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকতেন। ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রচলন সেকালে ছিল এবং তা শুধু আন্তর্দেশীয় নয় বিভিন্ন দেশের সাথেও বিভিন্ন দেশের পণ্যের ক্রয়বিক্রয় হত। বণিকগণ একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করতে যেত। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পরিব্রাজিকার উক্তিতে বণিকশ্রেণীর কথা পাওয়া যায়। *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* ষষ্ঠ অঙ্কে নৌব্যবসায়ী ধনমিত্রের বর্ণনা

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

থেকে সেকালের নৌবাণিজ্যের ও একটা ধারণা পাওয়া যায়। *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* প্রথম অঙ্কে চীন দেশীয় পতাকার উল্লেখ করা হয়েছে-

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥" [১]

(বাতাসের প্রতিকূলে নিয়ে যাওয়া পতাকার চীনদেশের তৈরি কাপড়ের মত আমার দেহ সামনের দিকে চললেও চঞ্চল মন কিন্তু পেছনে ছুটে চলেছে।)

রঘুবংশ মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গে রাজা অজ'র পারস্য দেশীয় অশ্বের উল্লেখ প্রমাণ করে যে, সে সময় বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসার পথ বেশ সুগম ছিল-

"দীর্ঘেষ্বমী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু
নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ বনায়ুদেশ্যাঃ।
বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি
লেহ্যানি সৈন্ধবশিলাশকলানি বাহাঃ ॥"[২]

(হে কমললোচন! সুদীর্ঘ পটমণ্ডপে নিয়ন্ত্রিত ঐ পারস্যদেশীয় অশ্বগুলি নিদ্রা ত্যাগ করে সম্মুখে রাখা অবলেহনযোগ্য সৈন্ধব শিলাখণ্ড সকল মুখের বাষ্প দ্বারা মলিন করছে।)

সে সময়টা অনেক কিছুর মতো চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও যথেষ্ট এগিয়ে ছিল। অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসার আশ্রয় নেয়ার কথা পাওয়া যায় কালিদাসের কাব্য সমূহে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় লোকপ্রসিদ্ধ ধর্ম আচার এবং বাস্তব বুদ্ধি বিবেচনার সুচিন্তিত প্রয়োগ ছিল প্রতিক্ষেত্রে। গাছ গাছড়ার ব্যবহার রয়েছে বিভিন্ন চিকিৎসায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসায় ঔষধের ব্যাবহার নেই কিন্তু লৌকিক ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বিদূষককে সাপে কামড়েছে শুনে তাকে সুস্থ করার জন্য পরিব্রাজিকার উক্তিতে দষ্ট অংশটি ছেদন, দাহ বা রক্তমোচন এ তিন উপায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। *রঘুবংশ* মহাকাব্যের প্রথম সর্গে সর্পদষ্ট অঙ্গুলি কর্তন করার কথা বলা হয়েছে। আবার জলকুম্ভ নামক বিশেষ পদ্ধতির ও উল্লেখ আছে যা দিয়ে সে যুগে সর্পদংশনের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে বিষমুক্ত করা হত।[৩]

"ছেদো দংশস্য দাহো বা ক্ষতের্বা রক্তমোক্ষণম্।
এতানি দষ্টমাত্রাণামায়ুষ্যাঃ প্রতিপত্তয়ঃ ॥"[৪]
"দ্বেষ্যো'হপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্তস্য যথৌষধম্।
ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়ো'হপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা ॥"[৫]

(দষ্ট অংশের ছেদন অথবা দাহ অথবা রক্তমোচন- দংশন মাত্রেই প্রাণ বাঁচানোর এই উপায়গুলোই আছে। শত্রুও শিষ্ট হলে পীড়িত ব্যক্তির নিকট ঔষধের মতো তার নিকট সমাদৃত হত এবং প্রিয়ব্যক্তিও দুষ্ট হলে সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর মতো তিনি তাকে পরিত্যাগ করতেন।)

প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার কথা পাওয়া যায় *অভিজ্ঞানশকুন্তলমের* তৃতীয় অঙ্কে, সেখানে শকুন্তলার জ্বর দেখা দিলে তাঁর শরীর ঠান্ডা করার জন্য উশীরানুলেপন, পাথরের মেঝের বিছানা, পদ্মপাতা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া দেওয়া ইত্যাদির প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে। আবার *রঘুবংশ* মহাকাব্যের শেষদিকে রাজা অগ্নিবর্ণ অসংযমী জীবন যাপন করে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের নিষেধ অমান্য করে অকালে মৃত্যুবরণ করলে রাজ-প্রাসাদের উপবনে গোপনে আগুন জ্বেলে মন্ত্রীগণ তাঁর মৃতদেহ সৎকার করেন-

"তং গৃহোপবন এব সঙ্গতা পশ্চিমক্রতুবিদা পুরোধসা।
রোগশান্তিমপদিশ্য মন্ত্রিণঃ সংভৃতে শিখিনি গূঢ়মাদধুঃ ॥"[৬]

{মন্ত্রিগণ (রাজার মৃত্যুসংবাদ গোপন রেখে) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে কুশল পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে (প্রজাদের) রোগ শান্তির কথা বলে প্রাসাদের মধ্যবর্তী উপবনে প্রজ্জলিত অগ্নিতে তাঁকে গোপনে দাহ করলেন।}

আবার, *রঘুবংশে* রাম-লক্ষ্মণ রাক্ষস বিরাধকে বধ করে তাঁর মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখেন যাতে তাঁর অপবিত্র গন্ধ বনভূমি দূষিত না হয়।৭ *রঘুবংশের* তৃতীয় অঙ্কে শিশুচিকিৎসকের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় সে সময়টাতে তারা চিকিৎসাক্ষেত্রে কতটা এগিয়ে ছিল।

"কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিত ভিষগভিরাপ্তৈরথ গর্ভভর্মণি।
পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্মুখীং প্রিয়াং দদর্শ কালে দিবমব্ভ্রিতামিব ॥"[৮]

(বিশ্বস্ত শিশু চিকিৎসা নিপুণ চিকিৎসকগণদের দিয়ে গর্ভপোষণব্যাপার সম্পাদিত হলে, রাজা সন্তুষ্ট হৃদয়ে বর্ষণোন্মুখ মেঘযুক্ত আকাশের মতো মহিষীকে আসন্নপ্রসবা বুঝতে পারলেন।)

দূরদূরান্তে চলাচল ও ভার বহনের জন্য উট, অশ্ব এবং রথের ব্যবহার ছিল (রঘু. ৫/৩২)। এছাড়া কাব্যের কোনো কোনো স্থানে নৌকার প্রচলন ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে

"বিলুপ্তমন্তঃপুরসুন্দরীণাং যদঞ্জনং নৌ-লুলিতাভিরদ্ভিঃ।
তদ্বধ্ন তীভির্মদরাগশোভাং বিলোচনেষু প্রতিমুক্তমাসাম্ ॥"[৯]

{নৌকাতরঙ্গিত জলে পুরসুন্দরীদের চোখের কাজল ধুয়ে গিয়েছিল, (জলকেলির পরে) তাদের চোখে মদরাগশোভার মধ্য দিয়ে যেন তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।}

আবার *রঘুবংশম্* মহাকাব্যের প্রথম সর্গে রাজা দিলীপ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ব্রতানুষ্ঠান করার জন্য রথে করে আশ্রমে যাচ্ছেন এরূপ বর্ণনা রয়েছে (রঘু. ১/৩৬,১/৩৯)। রাজর্ষিদের বিভিন্ন নামে রথ থাকত এবং তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ চিহ্নযুক্ত পতাকাশোভিত থাকতো। *বিক্রমোর্বশীয়তে* রাজার সোমদত্ত নামক রথের উল্লেখ রয়েছে-

"এসো উচ্চলিদহরিণকেদণো তস্স রাএসিণো সোমদত্তো রহো দীসদি।"[১০]

তবে কালিদাসের কাব্যের বিভিন্ন স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে বিমানযানের কথা বলা হয়েছে। যেমন *অভিজ্ঞানশকুন্তলমের* সপ্তম সর্গে রাজা দুষ্মন্তের দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে পালন করে স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আকাশপথের চমৎকার বর্ণনা আছে–

"অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতজ্কর্নিষ্পতভি
র্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরানাং
পিশুনয়তি রথস্তে সীকরক্লিন্ন নেমিঃ॥"[১১]

(মেঘের জলকণায় রথের চাকার ধারগুলি ভিজে আছে; চাকার শলাকার ফাঁক দিয়ে চাতক পাখিরা বেরিয়ে আসছে এবং বিদ্যুতের প্রভায় রথের ঘোড়াগুলি ঝলসে উঠছে এই সবই আমরা যে জলভরা মেঘের ওপর দিয়ে যাচ্ছি তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।)

অভিজ্ঞানশকুন্তলের সপ্তম অঙ্কের ৮নং শ্লোকেও আকাশপথের বর্ণনা আছে। *রঘুবংশের* সপ্তম সর্গে ৫১ নং শ্লোক এবং দশম সর্গের ৪৬ নং শ্লোকে, পঞ্চদশ সর্গের ১০০ নং শ্লোকে বিমান যানের উল্লেখ আছে। *রঘুবংশের* ১৩ সর্গের ১৯ এবং ৬৮ নং শ্লোকে রাম বিমান যোগে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন তার বর্ণনা রয়েছে।১২ *বিক্রমোর্বশীয়ম্* নাটকের ৪র্থ অঙ্কের ৪৪ নং শ্লোকে বিদ্যুল্লেখার পতাকায় শোভিত ইন্দ্রধনুর দ্বারা বিচিত্র শোভামণ্ডিত নবমেঘের বিমানে করে স্ত্রী উর্বশীকে নিয়ে রাজা পুরুরবা নিজ বাসভূমিতে যান। এ সকল বর্ণনা থেকে যে বিমান যানের প্রচলন ছিল সে বিষয়ে ভাবার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

মেয়েরা সবসময় সাজতে ভালোবাসে। কালিদাসের সময়েও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভেদে এই সাজসজ্জার ভিন্নতা দেখা যায়। তাই অভিসারিকা উর্বশী নীলাম্বরী শাড়ী আর ব্রতোপবাসিনী ঔশীনরীর পরনে শুভ্র বসন এবং *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকে পরিব্রাজিকার পরনে গেরুয়া বস্ত্র, *কুমারসম্ভবে* পার্বতীর বিয়ের সময় তাকে শাড়ি পরিয়ে বিয়ের জন্য তৈরি করতে দেখা যায় । আশ্রমবাসীরা বল্কল আর সাধারণ মানুষের বস্ত্র পরিধান করতেন। রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার অভিজাত ব্যক্তি বা রাজপরিবারে ছিল। *মালবিকাগ্নিমিত্রে* বিবাহের সময় রেশমী কাপড় পরানো হয়েছিল নায়িকাকে আবার *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার বিদায়বেলায় ক্ষৌমবস্ত্র পরানো হয়েছিল।

তৎকালে নৃত্যাভিনয় পরিবেশনের পূর্বেও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে *মালবিকাগ্নিমিত্রের* প্রথম অঙ্কে। সেখানে প্রতিযোগিতার বিচারক পরিব্রাজিকা আচার্যদেরকে তাদের যে শিষ্যা নৃত্য পরিবেশন করবে পরিব্রাজিকা তাকে প্রসাধন ক্রিয়া সম্পন্ন করে সভাগৃহে উপস্থাপন করতে বলেন-

"সর্বাঙ্গসৌষ্ঠবাভিব্যক্তয়ে বিরলনেপথ্যয়োঃ পাত্রয়োঃ প্রবেশো'হস্তু।"[১৩]

(সমস্ত অঙ্গের সুন্দর ভঙ্গি প্রকাশের জন্য সামান্য প্রসাধন করে শিষ্যা দুজনকে আনবেন।)

অলঙ্কারে রুচি ছিল নারী পুরুষ উভয়েরই। স্বর্ণের অলঙ্কারের পাশাপাশি নারীরা মুক্তা এবং ফুল ও পাতার তৈরি আভরণও ব্যবহার করত। পুরুষগণ হাতে বলয়, কানে কুন্তল এবং কণ্ঠে হারলতা এবং বাহুতে অঙ্গদ সহ বিভিন্ন অলঙ্কার ধারণ করতো। *অভিজ্ঞানশকুন্তলমের* প্রথম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত আশ্রমে প্রবেশের পূর্বে তাঁর ধারণকৃত সমুদয় অলঙ্কার খুলে রাখেন। এছাড়া নাটকটির তৃতীয় অঙ্কে তাঁর দুষ্যন্তের মনিখচিত স্বর্ণবলয় ও *রঘুবংশে* (১৬/৭৩) কুশের বাহুর দিব্যবলয়ের উল্লেখ আছে। সাজসজ্জার দিক দিয়ে মেয়েরাই ছিল অগ্রগণ্য। স্নানসিক্ত ভেজাচুল ধুপের দ্বারা সুবাসিত করা হত (*রঘু*, ১৬/৫০) এবং এভাবেই চুলের আর্দ্রতা দূর করা হত (*কুমারসম্ভব*, ৭/৩৮) শৌখিন অভিজাত মেয়েরা মণিময়, মুক্তাখচিত কর্ণভূষণ (*রঘু*,১৬/৬৭) মুক্তার আভরণ (*কুমারসম্ভব*, ১/৪২) কলহংস চিহ্নিত পট্ট বস্ত্র (*কুমারসম্ভব*, ১৭/১৫,) কর্ণে স্বর্ণালঙ্কার (*কুমারসম্ভব*, ৬/৯) পায়ে আলতা (*মেঘদূতম্*, পূর্ব–৩৩) নূপুর (ঋতু.১/৫, *মালবিকাগ্নিমিত্র* দ্বিতীয় অঙ্ক) চোখে কাজল দেয়া হত (*ঋতুসংহার*, ৩/৫)।১৪ সৌন্দর্য বাড়াতে ললনাগণ কপালে তিলকভূষণ ব্যবহার করতো (*রঘু*. ৯/৪১)। সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে সে সময় একধরণের চূর্ণ পাওয়া যেত, যা দ্বারা সেযুগে বস্ত্র সুবাসিত করা হত-

"মুরলামারুতোদ্ধূতমগমৎ কৈতকং রজঃ।
তদযোধবারবাণানামযত্নপটবাসতাম্॥"[১৫]

(মুরলাতীর প্রবাহিত বায়ুভরে কেতকীপুষ্পরেণু বিকীর্ণ হয়ে রঘুসৈন্যের গাত্রস্থিত কঞ্চুকে সংলগ্ন হওয়ায়, তাদের অযত্নে পাওয়া পটবাসের কার্য সম্পন্ন করল।)

বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারের প্রচলন ছিল, রত্নখচিতমেখলা (*ঋতু*.৪/৩), করযুগলে বলয়, অঙ্গদ (*ঋতু*.৪/৩), চরণদ্বয় লাক্ষারসের লালিমায় রক্তিম করা হত। সূক্ষ্ম বসন (*ঋতু*.৪/৩), অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্যের প্রলেপ (*ঋতু*.৪/১৭), স্নানের সময় বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি দ্রব্য (*ঋতু*.১/৪), ফুলের অলঙ্কার (*ঋতু*.৫/৮,২/২৪,৬/৫) ব্যবহার করা হত। রমণীদের প্রসাধনের অঙ্গ হিসেবে মুখমণ্ডলে চন্দনের রেখাচিত্র অঙ্কনের রীতি ছিল। একে পত্রাবলি, পত্রভঙ্গ বা অলকাতিলকও বলা হয়।[১৬] সজ্জা গ্রহণের পর প্রসাধিত মুখপদ্ম তারা দর্পণে অবলোকন করে (*ঋতু*. ৪/১৩, *মেঘদূত*,পূর্ব. ৫৯)। উজ্জয়িনীর অট্টালিকায় বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায় দৃষ্টিযুক্ত সুন্দরী ললনারা ধূপ জ্বেলে তার কেশ সংস্কার করে আর সে ধোঁয়া অট্টালিকার জানালা দিয়ে নির্গত হয়ে মেঘের সাথে মিলে যায় (*মেঘদূত*.পূর্ব.৩৩)। সেই সুন্দরীদের আলতা রাঙানো পায়ের চিহ্নে চিহ্নিত থাকে সে গৃহাভ্যন্তর।

দামী অলঙ্কারের পাশাপাশি ফুলের অলঙ্কারও বাদ ছিলনা। মুখমণ্ডলের শুভ্রতা বাড়াতে ফুলের রেণু ব্যবহার করা হত। খোঁপায় ফুল, চুলের বেণীতে ছোট ছোট ফুল গুজে দেয়া হত। পার্বতীর কণ্ঠে বকুলমালার চন্দ্রহার ছিল বিয়ের সজ্জায় তাঁর কুসুমখচিত কুঞ্চিত কেশ দুর্বাযুক্ত হরিৎ বর্ণের মধুক ফুলের মালায় বেঁধে দেয়া হলো মুখের দীপ্তি আরো বাড়িয়ে তুলতে ব্যবহার করা হল পুষ্পের রেণু।[১৭] *মালবিকাগ্নিমিত্রের* তৃতীয় অঙ্কে অশোক বৃক্ষের দোহদ পূরণের সময় পায়ে আলতা পরিয়ে, নূপুর বেঁধে দেয়ার পর বকুলাবলিকা নায়িকা মালবিকাকে অশোক বৃক্ষের পল্লব ধারণ করতে বলে-

"এসো'হশোকশাখাবলম্বী পল্লবগুচ্ছকঃ। অবতংসয়ৈনম্।"[১৮]

(অশোক-শাখায় ঝুলছে পল্লবগুচ্ছ, একে কানে পরে নাও।)

কালিদাসের কাব্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলার প্রচলন ছিল। সেযুগে ছেলেমেয়ে উভয়েই খেলাধুলা করত। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত যারা তাদের খেলার উপকরণ ছিল পকৃতিনির্ভর। শকুন্তলার পুত্রের সিংহশাবকের সাথে, উর্বশীর পুত্রের একটি ময়ূরের সাথে সখ্যতার বিষয়ের উল্লেখ

আছে। তপোবন বালাদের খেলাধুলার মধ্যে ছিল গাছে জল দেওয়া, গাছের সাথে লতার বিয়ে দেওয়া এবং হরিণ সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী পোষা। বিয়ের পর পুরূরবা-উর্বশী বেড়াতে গিয়ে মন্দাকিনীর বেলাভূমিতে গন্ধর্বকন্যা উদয়বতীকে দেখা যায় সে বালি দিয়ে পাহাড় গড়ার খেলায় মেতে ছিল। মেঘদূত গীতিকাব্যের উত্তরমেঘে সুন্দরীললনাদের বর্ণনার সময় বালির মাঝে দামি মণি লুকিয়ে রেখে তা খুঁজে বের করতে হবে, এরূপ খেলার বর্ণনা রয়েছে। কন্দুক বা বলখেলা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে বেশ পছন্দের খেলা ছিল বলে মনে হয়। *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে কুমারী বসুলক্ষ্মী কন্দুক নিয়ে খেলার বিবরণ পাওয়া যায়।

"মন্দাকিনী-সৈকত-বেদিকাভিঃ সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুমধ্যগতা সখীনাং ক্রীড়ারসং নির্বিশতীব বাল্যে ॥"[১৯]

(বাল্যে ক্রীড়ারস আস্বাদন করার জন্যই যেন তিনি কখনও মন্দাকিনীর তীরে বালুকার বেদী নির্মাণ করে কখনও কন্দুক নিয়ে আবার কখনও বা পুতুলের ছেলেমেয়ে নিয়ে খেলা করতেন।)

বিভিন্ন ধরণের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে বসন্তোৎসব বেশ আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যেই সম্পন্ন হতো, সে বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় বেশ কয়েকটি কাব্যে।[২০]

খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের কদর ছিল বেশি (*রঘু.* ২/ ৬৫-৬৬)। তার মধ্যে ঘৃত (*রঘু.* ১/৪৫), বিভিন্ন রকমের ফলমূল (*রঘু.*১/৪৯, ৮৮), খৈ. (*রঘু.* ২/১০) প্রধান ছিল। আম (*রঘু.*,৪/৯), সুপারী (*রঘু.*৪/৪৪), নারিকেল এর উল্লেখ পাওয়া যায় রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে-

"তাম্বুলিনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ।
নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ॥[২১]

(তার যোদ্ধারা সেখানে পানভূমি রচনা করে তাম্বুলপত্রপুটে নারিকেলজলমদ্যচ্ছলে শত্রুর শুভ্র যশ পান করল।)

ঋতুসংহার থেকে জানা যায় খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে শীতকালে শালিধানের চাল থেকে তৈরি খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গুড়জাত মিষ্টি খাবারের প্রাচুর্য ছিল,

"প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ প্রবলসুরতকেলির্জাতকন্দর্পঃ।
প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ শিশিরসময় এষ শ্রেয়সে বোহস্তু নিত্যম্ ॥"[২২]

(এখন গুড়জাত মিষ্টদ্রব্যের প্রাচুর্য, সুস্বাদু শালিধান ও আখে এই ঋতু রমণীয়। রতিক্রিয়া এখন প্রবল। কামদেব এখন গর্বিত। যাদেও প্রিয়জন বিচ্ছিন্ন সেই রমণীদের কাছে এই ঋতু মনোবেদনার কারণ। এই শীতকাল তোমাদের কল্যাণময় হয়ে উঠুক।)

কালিদাসসাহিত্যে বিবাহ, মেয়ের শশুর-বাড়িতে পাঠানো, শ্রাদ্ধ, সন্তান জন্ম ও লালনপালন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের নিখুঁত বর্ণনা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। *কুমারসম্ভবে* বিবাহবর্ণনায় দেখা যায় শিবের সাথে পার্বতীর বিয়ে স্থির করতে দেবর্ষিরা পার্বতীর পিত্রালয় ওষধিপ্রস্থে যাচ্ছেন। এখানে ঋষিপত্নি অরুন্ধতীরও ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ কারণ এ জাতীয় কাজে গৃহিনিদের কথাই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়

"আর্য্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি।
প্রায়েণৈবংবিধে কার্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা ॥[২৩]

(সেই বিবাহ ব্যাপারে মাননীয়া অরুন্ধতী দেবীও সাহায্য করতে পারেন; এই জাতীয় কাজে গৃহিণীদের ►নপুণ্য সকলেই জানেন।)

বিয়ের প্রস্তাব করা হল। সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিতা স্বাধীন হলেও তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন কারণ মেয়ের বিয়েতে কন্যার মায়ের সম্মতি প্রদান প্রয়োজন।[২৪]

পতিব্রতা রমণীরা কখনো পতির ইচ্ছার বিরোধিতা করেন না তাই মা কন্যার স্নেহে অশ্রুজলে সিক্ত হয়েও বিবাহে সম্মত হলেন । ঋষিগণের সম্মতিতে তিনদিন পর শুক্লপক্ষের জামিত্র গুণযুক্ত তিথিতে বিবাহ স্থির করা হয় (*কুমারসম্ভব*,৭/১)। ঘরে ঘরে গিন্নিদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সন্তানক গাছের ফুলে ঢাকা সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের পতাকাসজ্জিত

রাজপথে সুবর্ণতোরণ নির্মাণ করে তার উজ্জ্বলতায় স্বর্গের দীপ্তির ন্যায় মনে হতে লাগল। মৈত্র মুহুর্তে (সূর্যোদয় মুহূর্ত থেকে১ তৃতীয় মুহূর্তে; মুহূর্ত =৪৮ মিনিট) উত্তরকগুলী নক্ষত্র চন্দ্রের সাথে যুক্ত হলে কুলরমণীরা কন্যা সাজাতে বসলেন। শ্বেতসর্ষপ যুক্ত নবীন দূর্বাঙ্কুরে তাঁর সিঁথি সাজিয়ে, নাভিদেশ আবৃত্ত করে কৌশেয় বস্ত্র পরিয়ে, লোধ্রফুলের (লাল বা সাদা রঙের ফুল, এর রেণু সাদা) শ্বেত পরাগে উমার দেহের নিম্বতেল মুছে কানেয় (গন্ধদ্রব্য বিশেষ কালো চন্দন) নামক গন্ধদ্রব্যে অঙ্গরাগ সম্পন্ন হলে পার্বতীকে শাড়ি পরিয়ে চারস্তম্ভযুক্ত স্নানগৃহে নেওয়া হল।[২৫]

সেখানে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়ে শুভসূচনার পর তাকে স্বর্ণঘটের জল দিয়ে স্নান করিয়ে উমাকে একটি মণ্ডপের প্রসাধন বেদীতে পূর্বমুখী করে বসালেন তখন তাকে দেখে মনে হতে থাকল যেন মেঘবর্ষণের পর প্রফুল্ল কাশফুলে সজ্জিতা পৃথিবীর ন্যায়। পুরললনাগণ তারপর তাকে নিয়ে বসালেন চন্দ্রাতপ সজ্জিত মণ্ডপের মধ্যবর্তী প্রসাধন বেদীর উপরে। পূর্বমুখী করে বসিয়ে ধুপের ধোঁয়ায় তার কুঞ্চিত কেশের আদ্রতা দূর করে দুর্বাযুক্ত বন্ধুকফুলের মালা জড়িয়ে, কপোলে লোধ্রপরাগের লেপনে ছিল শ্বেতবর্ণ সেখানে যুক্ত হলো কর্ণে অর্পিত শ্যামল যবাঙ্কুর। নির্মল ঠোঁটে মধুর প্রলেপ, পায়ে আলতারঞ্জিত, চোখে কাজল এবং ক্ষৌমবস্ত্র পরানো শেষ হলে মা এসে হরিতাল ও লালরঙের মনঃশিলা দিয়ে কপালে বিবাহকালোচিত তিলক পরালেন, হাতে উর্ণাময় মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিলেন (*কুমারসম্ভব*,৭/২৫), মেয়েকে দিয়ে গৃহদেবতার প্রণাম ও সতীসাধ্বীদের পাদবন্দনা করালেন (*কুমারসম্ভব*, ৭/২৭) তারপর সম্প্রদান সভায় চন্দ্রশেখরের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে কৈলাশ পর্বতেও বিবাহোৎসবের সমারোহ। অনুরূপ সজ্জা ও অলঙ্কার সকল মঙ্গলদ্রব্য ও প্রসাধন শঙ্করের সামনে রাখলে তিনি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক একবার স্পর্শ করলেন (*কুমারসম্ভব*, ৭/৩১)। তাঁর নরকপাল, হস্তিচর্ম, তৃতীয় নয়ন ফণাধরসাপ সবই থাকল। তিনি কোনরূপ সজ্জা গ্রহণের প্রয়োজন মনে করলেন না, নিজের প্রভাবে বিবাহকালোচিত অলঙ্কার ও বেশভূষার সৃষ্টি করলেন তিনি। বৃষপৃষ্ঠে ব্যাঘ্রচর্ম আবৃত করে বরবেশে মহেশ্বর যাত্রা করলেন-

"স গোপতিং নন্দিভুজাবলম্বি শার্দ্দূলচর্মান্তিরিতোরূপৃষ্ঠম্।
তদ্ভক্তিসংক্ষিপ্তবৃহৎ প্রমাণমারুহ্য কৈলাশমিব প্রতস্থে ॥"[২৬]

(নন্দীর বাহু আশ্রয় করে মহেশ্বর বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন-বৃষপৃষ্ঠ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। মহেশ্বরের প্রতি ভক্তি হেতু বৃষ তার বিশাল দেহ সঙ্কুচিত করল, মনে হলো কৈলাসনাথ তার প্রিয় কৈলাশপর্বতে আরোহন করলেন। এরপর মহেশ্বর যাত্রা করলেন।)

বর হিমালয়ে পৌছালে পুরসুন্দরীগণ নিজেদের যাবতীয় কাজ অসমাপ্ত রেখে মহাদেবকে বর রূপে দেখার জন্য ভিড় করলেন প্রতিটি গৃহের জানালায়।২৭

"তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকূতুহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥"[২৮]

(গবাক্ষগুলি ভরে গেল পুরসুন্দরীদের মুখের সারিতে সেই মুখগুলি মদের গন্ধে মধুর। মনে হল জানালাগুলি পদ্মের শ্রেণীতে অলঙ্কৃত হয়েছে, তাদের চঞ্চল নয়নগুলি যেন ভ্রমরের সারি।)

রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভার পর রঘুর পুত্র অজের সাথে বিবাহ উৎসবের বর্ণনায়ও কালিদাস অনুরূপ খুঁটিনাটি উল্লেখ করেছেন। পতাকা ও তোরণসজ্জিত রাজপথ, বর-কনের সজ্জা, উৎসুক রমণীদের ভীড় (*রঘুবংশ*, ৭/২০) নব দম্পতির অগ্নিপ্রদক্ষিণ, শমী পল্লব ও জ্ব এর ধোঁয়া বধুর মুখে লাগানো (*রঘুবংশ*,৭/২৬), বরবধু আসনে বসলে কন্যাকর্তা ভোজরাজ তাঁর আত্মীয়বর্গ ও কুলরমণীগণের জলে ভেজা আতপ চাল ছড়িয়ে আশীর্বচন (*রঘুবংশ*,৭/২৮) কবির বর্ণনায় কোনো কিছুই যেন বাদ পড়েনি। *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকে মালবিকার বিবাহ ও সাজসজ্জা তা পুনরায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

কালিদাসের কাব্যে প্রতিফলিত সমাজচিত্র ধর্মপ্রাণ ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার-পরিচয় বহন করে। সমাজের প্রায় সকলেই ছিল ধর্মপ্রাণ। *বিক্রমোর্বশীয়ে* রাজা পুরূরবা ছিলেন সূর্যের উপাসক। রাজমহিষীও বিভিন্ন পূজার্চনা করতেন। মহারানী ঔশীনরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রিয়প্রসাদন নামক ব্রত এবং চন্দ্রের পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা-রাণী বিশেষ দিনে গঙ্গা-যমুনার মিলনস্থলে স্নান করতেন। *রঘুবংশ* মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে রাণী সুদক্ষিণার পুত্রলাভার্থে ব্রতানুষ্ঠান

ও উপবাস পালনের বিষয় বলা হয়েছে (*রঘুবংশ*, ২/১৯) *বিক্রমোর্বশীয়ে* তৃতীয় অঙ্ক থেকে জানা যায় অন্তঃপুরের নারীরা ছিলেন শ্রদ্ধাচারসম্পন্না। সন্ধ্যায় তারা মঙ্গলদ্বীপ জ্বেলে পূজাপ্রাঙ্গন আলোকিত করতেন।

সমাজে ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকদের মাঝে পূজা অর্চনার প্রচলন ছিল। উজ্জয়িনীতে গন্ধবতী নদীর তীরে চণ্ডিকাপতি মহেশ্বরের মন্দির এবং মহাকাল মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি, ঢাকের গর্জন, দেবদাসীদের নৃত্য প্রমাণ করে যে সে সময় বেশ ঘটা করেই পূজা পালন করা হত। সন্ধ্যা হলেই মন্দিরে মন্দিরে, গৃহে গৃহে পূজা অর্চনায় নারীপুরুষ সবাই নিরত থাকতেন। *মেঘদূতের* মহাকালমন্দিরের পূজার আনুষ্ঠানিকতা যেন চিরায়ত সনাতন গ্রাম বাংলার চিত্রই মনে করিয়ে দেয়। *ঋতুসংহারেও* দেখি সেরূপ চিত্র, সন্ধ্যার পর গৃহাভ্যান্তরে বৃদ্ধাগণ উজ্জ্বল আলোকে ধূপের ধোঁয়ায় পুষ্পশোভিত অর্ঘ্য নিয়ে পূজা অর্চ্চনায় ব্যস্ত থাকেন-

"উৎকীর্ণা ইব বাসযষ্ঠিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণো
ধূপৈর্জালবিনিঃসৃতৈর্বলভয়ঃ সন্দিগ্ধপারাবতাঃ।
আচারপ্রযতঃ সপুষ্পবলিষু স্থানেষু চার্চিষ্মতীঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপিকা বিভজতে শুদ্ধান্তবৃদ্ধো জনঃ॥"[২৯]

(রাতের নিদ্রায় অলস ময়ূরগুলি যেন বাসযষ্ঠির উপর উৎকীর্ণ হয়ে আছে, জানালা থেকে নিঃসৃত ধুপে কার্ণিশগুলি কপোতের ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, আচারনিষ্ঠ অন্তঃপুরের বৃদ্ধারা কুসুমশোভিত পূজার্হ স্থানগুলিতে উজ্জ্বল শিখাসমন্বিত সন্ধ্যার মঙ্গলদ্বীপ সাজিয়ে রেখেছেন।)

পূজাপার্বণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির প্রচলন ছিল। *অভিজ্ঞানশকুন্তলে* তপস্বীদের যাগযজ্ঞাদি, পশুবলি আবার *মালবিকগ্নিমিত্রে* এবং *রঘুবংশে* অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ রয়েছ।

পড়াশুনার জন্য গুরুর আশ্রমে থাকার প্রথা ছিল। সেখানে অবস্থান করে ছাত্রেরা বিভিন্ন শাস্ত্রবিদ্যার পাশাপাশি শস্ত্রবিদ্যাও শিক্ষালাভ করতো। বর্ণাশ্রম অনুসারে তাদের জাতকর্মাদি সংস্কার অনুষ্ঠিত হত। *বিক্রমোর্বশীয়ম্* নাটকে কুমার আয়ুর বাল্যশিক্ষা এবং ক্ষাত্রজনোচিত সংস্কার সম্পন্ন করা হয় মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে। আশ্রমে মুনি, ঋষি এবং সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন হোম করতেন এবং হোমাগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করতেন। *রঘুবংশ* মহাকাব্যে রাজকুমার রঘুর চূড়াকরণ সম্পন্ন করে তাকে বর্ণমালা শিক্ষার মাধ্যমে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়-

"স বৃত্তচূলশ্চলকাকপক্ষকৈরমাত্যপুত্রৈঃ সবয়োভিরন্বিতঃ।
লিপের্যথাবদ্ গ্রহণেন বাঙ্ময়ং নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ॥"[৩০]

(রাজকুমার রঘুর চূড়াকরণ সম্পন্ন হলে, তিনি চঞ্চল শিখাধারী সমবয়স্ক অমাত্যপুত্রগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে নদীমুখ দিয়ে সাগরে প্রবেশের মতো বর্ণমালা শিক্ষার মাধ্যমে শব্দশাস্ত্ররূপ সমুদ্রে প্রবেশ করেছিলেন।)

বর্ণমালার পর তাকে সুপণ্ডিত আচার্যের সান্নিধ্যে বেদাদিবিদ্যা শিক্ষা দেয়া হয় এরপর তাকে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।[৩১]

এমনকি তার শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে তার পিতা দিলীপ তাকে অস্ত্রবিদ্যাও শিক্ষা দান করেছিলেন (*রঘুবংশ*, ৩/২৯-৩০)। শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুকে দক্ষিণা দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। *রঘুবংশ* মহাকাব্যে মহারাজ রঘুর নিকট গুরুদক্ষিণা হিসেবে চতুর্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে বলা হয়েছিল

"নির্বন্ধসঞ্জাতরুষার্থকার্শ্যমচিন্তয়িত্বা গুরুণাহমুক্তঃ।
বিত্তস্য বিদ্যাপরিসংখ্যয়া মে কোটিশ্চতস্রো দশ চাহরেতি ॥"[৩২]

{তারপর আমি তাকে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ জানালে তিনি রুষ্ট হয়ে আমার দারিদ্র্য বিবেচনা না করেই বললেন-(তুমি যেমন আমার নিকট চতুর্দ্দশ বিদ্যা শিক্ষা করেছ, সেই বিদ্যার সংখ্যানুসারে) চতুর্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আমায় দাও।}

গৃহাভ্যন্তরে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানেও কালিদাস বেশ আন্তরিক এবং নিখুঁত ছিলেন। মারীচের আশ্রমে শকুন্তলার শিশুপুত্র সর্বদমন (*অ.শ.*৭) ঋষি চ্যবনের আশ্রমে পালিত উর্বশীর পুত্র আয়ু (বিক্রম.৫) মহারাজ দিলীপ ও সুদক্ষিণার পুত্র রঘু (*রঘু.*৩) সকলের শৈশব কালের বিষয়ে কালিদাস চমৎকার বর্ণনা প্রদান করেছেন। সন্তানসম্ভবা সুদক্ষিণার

ফ্যাকাশে শরীর, মাটির গন্ধমাখা মুখের বিবরণ (*রঘু.*৩/৩), তিনি যা চাইছেন তা সম্পাদনের সর্বাত্মক চেষ্টা (*রঘু.*৩/৫-৬), পুংসবনক্রিয়া চিকিৎসকদ্বারা গর্ভপুষ্টির ব্যবস্থা (*রঘু*, ৩/১২), বশিষ্ঠ মুনির হাতে নবজাতকের জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কারক্রিয়া (*রঘু.*৩/১৮), মঙ্গলবাদ্য, বারাঙ্গনাদের নৃত্য (*রঘু.*৩/১৯), ধাত্রীর কাছে শিশুর কথা বলতে শেখা, আঙ্গুল ধরে এক পা, দুপা করে হাটতে শেখা(*রঘু.*৩/২৫), চূড়াকরণ, শিক্ষারম্ভ কেশদান কিছুই যেন বাদ পড়েনি কবির বর্ণনা থেকে।[৩৩]

এছাড়া *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর সময় বাস্তব মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন কালিদাস।

পুরুষদের বহুবিবাহ সমাজে অনুমোদিত ছিল। কেবলমাত্র সমাজের অভিজাতদের মধ্যে নয়, সর্বস্তরে এই বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুরুষরা পুনরায় এক বা একাধিক বিবাহ করতে পারতেন।

কালিদাস সাহিত্যে দেখা যায় নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও স্ত্রীচরিত্রগুলো নিজগৃহে আপনজনদের জন্য যেন কল্যাণের আধার হয়ে ছিলেন। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঋষি মারিচের আশ্রমে সন্তান প্রসব করে সাধ্যমত তার পালন করেছিলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের মা রাজবাড়িতে নির্দিষ্ট তিথিতে পুত্রের কল্যাণে 'পুত্রপিণ্ডপালন' ব্রত ও উপবাস করেন। পুরূরবার প্রণয় চাপল্যে কষ্ট পেলেও তৃতীয় অঙ্কে রাণী তাঁর জন্য ব্রত অনুষ্ঠান করেন এবং গন্ধদ্রব্য ও ফুল উপহার পাঠান। *মালবিকাগ্নিমিত্রের* পঞ্চম অঙ্কে রাণী ধারিণী তাঁর পুত্রের কল্যাণে প্রতিদিন অষ্টাদশ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন।

বার্ধ্যক্যে সন্ন্যাসজীবন যাপন করার সময় রঘুর মৃত্যু হলে পুত্র অজ সন্ন্যাসীদের সাহায্যে তাঁর অগ্নিসংস্কাররশূন্য অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করেন (*রঘুবংশ*, ৮/২৫)। পিতৃভক্ত পুত্র পিতৃপিণ্ডের ব্যবস্থা করেন (*রঘুবংশ*,৮/২৬)। ইন্দুমতীর অকালমৃত্যুতে তাকে অন্তিম সজ্জায় সাজিয়ে অগুরুচন্দনের আগুনে দাহ করা হয় (*রঘুবংশ*,৮/৭১) দশদিন পর শ্রাদ্ধ (*রঘুবংশ*,৮/৭৩) এবং পিণ্ডজল দান করে অজ পত্নীতর্পণ করেন। অজকে আত্মসংবরণ করতে হয় কারণ প্রিয়জনের অশ্রুপাতে আত্মা কষ্ট পায় (*রঘুবংশ*,৮/৮৬)।[৩৪] এছাড়া শকুন্তলার প্রতিকূল দৈব উপশমের জন্য কণ্বমুনির সোমতীর্থে যাত্রার কথা আমরা *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* প্রথম অঙ্কে পেয়েছি।

রাজারা যে শুধু সুদক্ষ শাসক ছিলেন তা নয় তারা শিল্পকলায় ও বেশ অনুরাগী ছিলেন। তাই প্রসাদাভ্যান্তরে শিল্পচর্চার যাবতীয় ব্যবস্থা মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখা যায়। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত এবং নৃত্যাভিনয়েও পুরুষ নারী দুয়েরই জ্ঞান ছিল।

মেঘদূতে (উত্তর ২৫)দেখা যায় যক্ষের প্রিয়া যক্ষের বিরহে করুণ সংগীত গাইছে, শকুন্তলার পঞ্চম অঙ্কে হংসপদিকার করুণ সংগীত, শিব-পার্বতীর বিয়েতে দেবী সরস্বতীর সংগীত পরিবেশন এবং অপ্সরাদের অভিনয়, *রঘুবংশে* নবম সর্গে (৩৩), ও অষ্টম সর্গে (৬৭) নৃত্যাভিনয়ের উল্লেখ, বিক্রমোর্বশীয়ে স্বর্গসভায় নাট্যাভিনয়ে লক্ষ্মীর ভূমিকায় উর্বশীর অভিনয় *মালাবিকাগ্নিমিত্রে* নায়িকার আচার্যের নিকট নৃত্যাভিনয় শিক্ষা এবং তার উপযুক্ত প্রয়োগ *বিক্রমোর্বশীয়ে* উর্বশী লতায় পরিণত ১৪ হলে পুরূরবার অনুসন্ধানের সময় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার একত্রিশটি গানের সন্নিবেশ তার সাক্ষ্য প্রদান করে। রঘুবংশে রাজপুত্র রঘু'র জন্মের পর সঙ্গীতবাদ্যের অয়োজন করা হয়েছিল-

"সুখশ্রবা মঙ্গলতুর্য্যনিস্বনাঃ প্রমোদনৃত্যৈঃ সহ বারযোষিতাম্।
ন কেবলং সদ্মনি মাগধীপতেঃ পথিব্যজম্ভন্ত দিবৌকসামপি॥"[৩৫]

(কেবল সুদক্ষিণাপতি দিলীপের ভবনেই যে শ্রুতিমধুর মঙ্গলবাদ্য ও তার সঙ্গে সঙ্গে বারাঙ্গনাদের আনন্দনৃত্য হয়েছিল এমন নয়, এ সমস্ত অনুষ্ঠান স্বর্গপথেও প্রকাশ পেয়েছিল।)

বিক্রমোর্বশীয়ের চতুর্থ অঙ্কে প্রবেশক অংশে চিত্রলেখার কণ্ঠে দ্বিপদিকা নামক তাল লয়-সমন্বিত গানের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় সে সময় নারীরা সঙ্গীতচর্চায় কতটা পারদর্শিনী ছিলেন। এক ধরনের মৃদঙ্গধ্বনি শুনে ময়ূরেরা আহ্লাদিত হয় বলে এ ধ্বনির নাম ছিল "ময়ূরী"। এ ধ্বনির প্রশংসায় *মালবিকাগ্নিমিত্রে* বলা হয়েছে-

"জীমূতস্তনিতবিশঙ্কিভির্ময়ূরৈরুদ্গ্রীবৈরণুরসিতস্য পুস্পরস্য।
নিহ্রাদিন্যুপহিতমধ্যমস্বরোত্থা মায়ূরী মদয়তি মার্জনা মনাংসি ॥"[৩৬]

নৃত্যাভিনয়ের প্রশংসায় সেখানে বলা হয়েছে-

"দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ শান্তং ক্রতুং চাক্ষুষং
রুদ্রেণেমুমাকৃতব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা।
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্ ॥"[৩৭]

{মুনি-ঋষিরা বলেন এ হল দেবতাদের চোখে দেখার মতো এক শান্ত যজ্ঞ। মহাদেবের নিজের শরীরের মধ্যে পার্বতীর দেহ ধারণ করে তার দুটি বিভাগ (স্পষ্ট) করে দিয়েছেন, এতে তিন গুণ থেকে জন্ম নেয় যে লৌকিক ক্রিয়াকলাপ তাকে নানান রসে পুষ্ট দেখা যায়, মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন তবুও নৃত্যাভিনয় অনেক রকমে সকলকেই অনন্য আনন্দ যোগায়।}

বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল তার মধ্যে মৃদঙ্গ, ঢোল, বাঁশি (রঘু. ২/১২), বীণা (রঘু. ৪/৭৩) প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

চিত্রবিদ্যার কথাও কালিদাস তাঁর কাব্যে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের আঁকা শকুন্তলার একটি চমৎকার চিত্রের বর্ণনা রয়েছে যা বিদূষক ও সানুমতির প্রশংসায় নায়কের চিত্রাঙ্কণের নিপুণতা প্রকাশ করে

"তর্কয়ামি যা এষা শিথিলবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশহস্তেন উদ্ভিন্নস্বেদবিন্দুনা
বদনেন, বিশেষতঃ অপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাম্ অবসেকস্নিগ্ধতরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য
পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা সা তত্রভবতী শকুন্তলা, ইতরে সখ্যৌ ইতি।"

(যাঁর শিথিল কবরী থেকে ফুল ঝরে পড়ছে, যার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, বাহু দুটি পড়েছে এলিয়ে, জলসেচের পর সিক্ত ও সতেজ পল্লবযুক্ত আমগাছের পাশে যাকে পরিশ্রান্তভাবে আঁকা হয়েছে ইনিই পূজনীয়া শকুন্তলা।)

চতুর্থ অঙ্কে অনসূয়া প্রিয়ংবদার চিত্র দেখে সজ্জা ও অলঙ্কার বিষয়ক জ্ঞানার্জন যা কিনা শকুন্তলার বিদায় বেলায় তাকে প্রস্তুত করার জন্য কাজে লাগে। *মালবিকাগ্নিমিত্রের* প্রথম অঙ্কের গুরুজীর আঁকা সদ্য প্রস্তুত চিত্র থেকে নায়ক অগ্নিমিত্র নায়িকা মালিবিকাকে প্রথম দর্শন করেন। *মালবিকগ্নিমিত্রের* পঞ্চম অঙ্কে সমুদ্রগৃহেও রাজার চিত্রের উল্লেখ আছে। *কুমারসম্ভবে* (৫/৫৮ সর্গে) পার্বতী মহাদেবের স্বহস্তে অঙ্কে চিত্রে অনুযোগ করছেন এ থেকে তৎকালে চিত্রাঙ্কন যে এক বিশেষ জায়গা দখল করে রেখেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[৩৮]

সুরাপান সেযুগে বেশ প্রচলিত ছিল। সুরাপানের জন্য সরাইখানা ছিল, সেখানে গিয়ে সকলে অনায়াসেই সুরা পান করতে পারত। *কুমারসম্ভবম্* মহাকাব্যে এবং *রঘুবংশম্* মহাকাব্যে এবং *মেঘদূতম্* গীতিকাব্যে (উত্তরমেঘ-১৩,৩৪) বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে সুরাপানের স্থানগুলির বর্ণনা রয়েছে। *কুমারসম্ভবম্* মহাকাব্যে বলা হয়েছে-

"যত্রৌষধি প্রকাশেন নক্তং দর্শিত-সঞ্চরাঃ।
অনভিজ্ঞাস্তমিস্রাণাং দুর্দিনেম্বভিসারিকাঃ॥"[৩৯]

(এখানে রাত্রিতে স্ফটিক নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে সুরাপানের স্থানগুলিতে তারকার উজ্জ্বল আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে ঝলমল করতে থাকে-সেই প্রতিবিম্বগুলি যেন তারকার উপহার বলে মনে হতে থাকে।)

শুধু পুরুষরা নয় নারীরাও সে যুগে সুরা পান করত। *কুমারসম্ভবম্* মহাকাব্যের সপ্তম এবং অষ্টম সর্গে, *ঋতুসংহারম্* এবং *মেঘদূতম্* গীতিকাব্যে অভিজাত মেয়েদের সুরাপানের কথা বল হয়েছে।

"তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগ▸র্ভর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকূতুহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥"[৪০]

(গবাক্ষগুলি ভরে গেলে পুরসুন্দরীদের মুখের সারিতে- সেই মুখগুলি মদের গন্ধে মধুর! মনে হলো জানালাগুলি পদ্মের শ্রেণীতে অলঙ্কৃত হয়েছে, তাদের চঞ্চল নয়নগুলি যেন ভ্রমরের সারি।)

"পার্বতী তদুপযোগসম্ভবাং বিক্রিয়ামপি সতাং মনোহরম্।
অপ্রতর্ক্যবিধিযোগনির্মিতামাম্রতেব সহকাতরং যযৌ॥"[৪১]

(অলজ্ঘ্য বিধির বিধানে কোনরূপ তর্ক চলে না -এই নিয়মে আম্রতরুর সঙ্গে যেমন রসাললতিকা মিলিত হয়-উমা সেরূপ শঙ্করের সথে মিলিত হলেন। সুরাপানজনিত মত্ততা তখন উমাকে অধিকার করেছে কিন্তু সেই বিকৃতি শঙ্করের হৃদয়গ্রাহী।)

রঘুবংশের নবম সর্গে নারীদের মদ্যপানের উল্লেখ রয়েছে

"ললিতাবিভ্রমবন্ধবিচক্ষণং সুরভিগন্ধপরাজিতকেশরম্ ।
পতিষু নির্বিবিশুর্মধুমঙ্গনাঃ স্মরসখংরসখণ্ডণবর্জ্জিতম্ ॥"[৪২]

(রমণীগণ নিজ নিজ প্রিয়তমের সহিত সম্মিলিত হয়ে নানাবিধ মনোহর বিভ্রম রচনায় চতুর বকুল কুসুম হতেও সুগন্ধিতর স্মরোদ্দিপক সুরা অনুরাগের সহিত সেবন করতে লাগল।)

মেঘদূত গীতিকাব্যে নারীদের মদ্যপান বিষয়ে যক্ষ বলেছেন-

"রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্ ।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চল-কুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি॥"[৪৩]

(তার চূর্ণ কুন্তল এসে পড়েছে নয়নের কোণে, সেই নয়নে আবার কাজল নেই! মদিরা ছেড়েছে তাই সেই নয়নে কোন ভ্রূভঙ্গি নেই। তুমি কাছে গেলে তার চোখের উপরের অংশ স্পন্দিত হতে থাকবে তোমার মনে হবে যেন জলের নিচে মৎস্যের বিক্ষোভে বিকশিত পদ্মের পাপড়িগুলি কাঁপছে।)

শক্তিশালী রাজাদের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের জন্য সে সময় উত্তরভারতে রাজনৈতিক অখণ্ডতা সাধিত হয়েছিল; দক্ষিণভারতের রাজ্যের সাথেও তাদের মিত্রতা ছিল। তখন জনগণের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ দেশের লোকজন বেশ সৎ স্বভাবের ছিলেন। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন (Fa Hien) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় অর্থাৎ কালিদাসের আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষে যে সুখ ও শান্তি দেখেছেন তার বর্ণনা করেছেন। বলেছেন-

> "The people are numerous and happy. They have not to register their households, or attend to any magistrates and their rules. The king governs without decapitation or other corporal punishments. People of various sects set up houses of charity where rooms, couches, beds, food, and drink are supplied to travellers."[44]

রাজসভাকবি কালিদাস ভারতের নগরকেন্দ্রিক সমৃদ্ধি ও বিলাসিতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর কাব্যে বিদিশা, উজ্জয়িনী, অলকা, অযোধ্যার সৌন্দর্য, সমৃদ্ধির চিত্র ফুটে উঠেছে। মেঘদূত কাব্যে উজ্জয়িনীর বর্ণনায় এসেছে বৃহৎ সব অট্টালিকার কথা। এসেছে সম্পদ ও সৌন্দর্য পরিপূর্ণ বিশালা নগরীর কথা। কবির দৃষ্টিতে এ যেন স্বর্গের একটা খণ্ডিত অংশ। সেসময় নগরগুলিতে আধুনিকনগরের মতো ব্যস্ততা ছিলনা। গৃহের চিলেকোঠায় অনেক যত্নে পালিত হত কবুতর (মে.পৃ.৩৯)। আর ময়ূর ছিল তাদের পোষা প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। নদীতে স্নানরতা তরুণীদের উল্লেখ পাওয়া যায় (মে.পৃ. ৩৪)। সন্ধ্যায় মহাকাল মন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্যের বর্ননা রয়েছে (মে.পৃ.৩৬)। সেখানে ছিল প্রকৃতির শান্তি, মাধুর্য ও সরলতা।[৪৫]

"তেষাং দিক্ষু প্রথিত-বিদিশা-লক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিত-সুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥"[৪৬]

(সর্বত্র বিখ্যাত বিদিশা নামক দশার্ণ দেশের রাজধানীতে গিয়ে সদ্যই তুমি কামুকত্বের সম্পূর্ণ ফল পাবে। যেহেতু বেত্রবতীর ভ্রূভঙ্গসমন্বিত মুখের ন্যায় চঞ্চল তরঙ্গযুক্ত জল তটপ্রান্তে গর্জন করতে করতে পান করবে।)

"জালোদ্গীর্ণৈরূপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যাভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।

হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথা
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেসু॥" ৪৭

(সেখানে জানালার রন্ধ্রপথে উদ্‌গীর্ণ কেশ-সংস্থার ধূপে বর্ধিতদেহ হয়ে, বন্ধুর প্রতি স্নেহহেতু ভবনশিখিদের দ্বারা নৃত্যরূপ উপহার পেয়ে এবং কুসুমদ্বারা সুরভিত সুন্দরী বধূদের পাদরাগে অঙ্কিত হর্ম্যে বিশালা নগরীর সৌন্দর্যশ্রী দেখতে দেখতে তুমি পথের শ্রম দূর করবে।)

কালিদাস যে গুপ্ত যুগের সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার চিত্র দেখেছেন তারই পরোক্ষ চিত্র এঁকেছেন তার কাব্যে। মেঘদূতে তিনি বিশালা নগরীকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তা একখণ্ড স্বর্গসমতুল্য। স্বর্গবাসী মনুষ্যগণ পুণ্যফলের কিয়দংশ ভোগ করার জন্য তারা এ নগরীতে আসেন।

স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং।
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥"৪৮

(ঐ নগরী যেন স্বর্গের এক কান্তিযুক্ত খণ্ডের মত এবং ভোগে পুণ্যফল ক্ষয় পেয়ে অল্প হয়ে গেলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ স্বর্গবাসী মানুষদের অবশিষ্ট পুণ্যের বলে আনীত বটে।)

মালবিকাগ্নিমিত্রে রাজাদের অবকাস যাপনের জন্য সমুদ্রগৃহের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিক্রমোর্বশীয়তে দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি প্রাসাদে প্রমোদোদ্যানের ব্যবস্থা ছিল-

"এতেন প্রমদবচনচোদিতেনেব প্রত্যুদ্গাতো ভবানাগন্তুকো দক্ষিণোমারুতেন।"৪৯

এই প্রমোদোদ্যানের দক্ষিণা বাতাস যেন আপনাকে আগন্তুকের মত স্বাগত জানাচ্ছে।

প্রচণ্ড গরমে কিছুটা স্বস্তির আশায় স্নান সেরে নিতে সকলেরই ইচ্ছা করে আর সে সময় নগরজীবনে মনিখচিত স্নানাগারের ব্যবস্থা ছিল আর সেখানে ছিল ফোয়ারা

"নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ কৃচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্ ।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচৌ প্রিয়ে যান্তি জনস্য সেব্যতাম্ ॥"৫০

(প্রিয়ে! গ্রীষ্মে লোকের উপভোগ্য হয় রাত্রিকাল যার অন্ধকারের পুঞ্জ চন্দ্রের প্রভাবে দূরীভূত, কখনও জলযন্ত্রযুক্ত বিচিত্র ধারাগৃহ নানাপ্রকার মণি আর চন্দনের আর্দ্রতা।)

প্রচণ্ড গরমে কিছুটা স্বস্তি পেতে ধনাঢ্য পরিবারগুলোতে বিলাসিনী গণিকা তাদের প্রেমিকের হাতে সুরাপাত্র তুলে দেন আর সে সময় তন্ত্রীর লয় সহযোগে সঙ্গীত আস্বাদন করে-

"সুবাসিতং হর্ম্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথে'হনুভবন্তি কামিনঃ॥"৫১

(গ্রীষ্মের রাত্রিতে রসিক পুরুষেরা সুবাসিত সুরম্য হর্ম্যতল, দ্রুত শ্বাসপ্রবাহে প্রকম্পিত প্রিয়ার অধরসুধা, সুরা এবং তন্ত্রীর লয় সহযোগে সঙ্গীত আস্বাদন করে।)

ঋতুসংহার কাব্য থেকে জানা যায় শীতকালে রমণীরা তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করে পান নিয়ে ধূপে সুবাসিত কক্ষে প্রবেশ করে

"গৃহীততাম্বুলবিলেপনস্রজঃ সুখাসবামোদিতবক্রপঙ্কজাঃ।
প্রকামকালাগুরুধূপবাসিতং বিশন্তি শয্যাগৃহমুৎসুকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥"৫২

(যাদের মুখপদ্ম সুখপ্রদ সুরাপানে আমোদিত সেই রমণীরা পান, চন্দন ও ফুলের মালা নিয়ে আবেগভরে পর্যাপ্ত অগুরুচন্দনের ধূপে সুবাসিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করে।)

কালিদাস সমৃদ্ধ যুগের সুখ স্বচ্ছন্দ স্বল্প কথায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন তার কাব্যসমূহে। সে প্রসঙ্গে এসেছে উমা ও শঙ্করের ভোগসুখের কিছু চিত্র। শিব পার্বতীর বিবাহোত্তর মিলনদৃশ্যের বর্ণনায় এসেছে

"নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়া শঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ।
তদ্দুকূলমথ চাভবৎ স্বয়ংদুরমুচ্ছ্বসিতনীবিবন্ধনম্ ॥"৫৩

(নাভিদেশে নিহিত শঙ্করের কর উমা কম্পিত দেহে রোধ করতে যান, কিন্তু সেই দুকূলের নীবিবন্ধন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আপনিই মুক্ত হয়ে যায়।)

"শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা সংনিরুধ্য নয়নে হৃতাংশুকা।
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে মোঘযত্নবিধুরা রহস্যভূৎ ॥"৫৪

(নির্জনে শঙ্কর যখন উমার পরিধেয় বসন হরণ করতেন, তখন তিনি দুই হাতে তাঁর দু'নয়ন চেপে ধরতেন। কিন্তু শিবের ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন চেয়ে থাকতো বলে উমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হত তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়তেন।)

কালিদাস যে সমৃদ্ধির যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাতে এরূপ চিত্র উপস্থাপিত করা স্বাভাবিক। অনেকে *কুমারসম্ভবের* এ দৃশ্যগুলি অশালীন মনে করেন কিন্তু মহাকবি কালিদাস ভোগকে পরিহার করে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার কল্পনা করতে পারেননি। বিশেষত গুপ্ত যুগের সমৃদ্ধির শীর্ষে অবস্থান করে কালিদাস ভোগবর্জিত সন্ন্যাসের পক্ষপাতি ছিলেন না।৫৫

কিছু কুসংস্কার সেযুগে প্রচলিত ছিল যেমন, অশোক তরুতে পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে বিলম্ব হলে সুন্দরী মেয়েদের বামচরণের আঘাতে তাতে পুষ্প বিকশিত হয়। পদাঘাতাৎ অশোকে বিকশতি বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ'৫৬ অশোকতরুর সাধ সুন্দরীর বামচরণের আঘাত আর বকুলের সাধ রমণীয় মুখের মদিরা। 'দোহদ' অর্থ গর্ভিনীর সাধ। কিন্তু যে তরু পুষ্পবিকাশে উন্মুখ তারও সাধের প্রয়োজন হয়। সুন্দরী যুবতীর পদাঘাত পেয়ে তবে পুষ্পিত হবে এমন বাসনা (দোহদ) যেন অশোকতরু করেছে। *মেঘদূতম্* (উত্তরমেঘ-১৭), *মালবিকাগ্নিমিত্র* (তৃতীয় অঙ্ক), *কুমারসম্ভব* (তৃতীয় অঙ্ক, ২৬),ও *রঘুবংশ* মহাকাব্যে (৮/৬২) দোহদক্রিয়া সম্পাদনের উল্লেখ আছে। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে ২৬নং শ্লোকে উল্লেখ রয়েছে যে অশোকতরু স্কন্ধ থেকে শুরু করে পল্লবসহ প্রস্ফুটিত হল সুন্দরীদের নূপুর মুখর পাদাঘাতের জন্য অপেক্ষা করলোনা।

সন্তান জন্ম, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ওপর শুভ অশুভ ক্ষণ নির্ণয় করা হতো। *কুমারসম্ভবম্* মহাকাব্যে হিমালয় কন্যা উমার বিবাহ জামিত্রগুণান্বিত সময় নির্ধারণ করা হয় । *রঘুবংশম্* মহাকাব্যে রাজা দিলীপের পুত্র রঘুর জন্ম হয়েছিল এরকম শুভ সময়ে-

"গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।
অসূত পুত্রং সময়ে শচীসমা ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্ ॥"৫৭

(যেরূপ প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র এই ত্রিসাধনাশক্তি অক্ষয়সম্পদ প্রসব করে, শচীমাতার মতো রাজমহিষীও সেরূপ যথাকালে পুত্র প্রসব করলেন, জন্মকালে পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থানে ও সূর্য থেকে সুদূরে উদিত থাকায় ঐ পুত্রের ভাবী সৌভাগ্যসম্পদ সূচিত হয়েছিল।)

উজ্জয়িনী নগরীর নাগরিক জীবন। সেখানে মেয়েরা ধূপ জ্বেলে কেশসংস্কার করে (*মেঘদূত*, পূর্বমেঘ,৩৩)। সে ধূপের ধোঁয়া বহুতল ভবনগুলির জানালা দিয়ে নির্গত হয়ে মেঘের দেহের পুষ্টি সাধন করে। চোখে কাজল, পায়ে আলতা পরে তাদের উজ্জ্বল জীবন। সন্ধ্যায় মহাকালমন্দিরে আরতি (*মেঘদূত*, পূর্বমেঘ, ৬৫), দেবদাসীদেব নৃত্য (*মেঘদূত*, ৩৬), নদীতে মেয়েদের স্নান, জলক্রীড়া, রাতের সূচীভেদ্য অন্ধকারে রাজপথে তাদের অভিসার যাত্রা (*মেঘদূত*, পূর্বমেঘ, ৩৮), নীচে পাহাড়ের গুহায় গন্ধমালা, প্রসাধনসামগ্রী প্রভৃতির সুগন্ধ, যেখানে পণ্যরমণীদের সাথে নাগরদের উদ্দাম যৌবন উপভোগ ছিল অবাধ ও নিঃসঙ্কোচ (মেঘদূত,পূর্বমেঘ,২৬)। অন্যদিকে কল্পবৃক্ষ হতে পাওয়া বসন-ভূষণ, পায়ের আলতা, নয়নরঞ্জনী, ফুলের সজ্জা প্রভৃতি আরণ্যক জীবনের সহজ সরল বর্ণনাও রয়েছে সেখানে। বসতবাড়ির প্রবেশপথে মন্দারতরু, দীঘি বাঁধানো ঘাট, তার পাড়ে কৃত্রিম পাহাড়, কলাগাছ, মাধবীকুঞ্জ, অশোক ও বকুলগাছ, পোষা পাখি। যক্ষের অনুপস্থিতিতে লাল গিরিমাটি দিয়ে ছবি এঁকে, গান গেয়ে, বীণাযন্ত্রে সুর তুলে অলস, নির্বিকারভাবে দিন কাটে যক্ষবধূর। এ চিত্র যেন একটি সম্পন্ন, পরিপূর্ণ স্বচ্ছল গার্হস্থ্যের চিত্র।৫৮

মেঘদূত কাব্যে মেঘের যাত্রাপথে সরল গ্রাম্যজীবনও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। আম, জামের বাগান, পূর্ব মেঘ ১৬ (সদ্য কর্ষিত ভূমিতে মাটির সুবাস) পূর্ব মেঘ ২১ (আধফোটা কদম্বফুলে ভর্তি গাছ , গ্রামের বাড়িতে বাসা বেঁধে) পূর্ব মেঘ ১৬ (বর্ষার মেঘ দেখে উল্লখিত কৃষকবধূর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত, নদীতীরে যুথিকার বনে পুষ্প চয়ন) পূর্ব মেঘ ২৪ (থাকা পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত দশার্ণ গ্রাম করতে আসা মেয়েদের রোদে পোড়া, ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত গালে লেগে থাকা কর্নের ফুলের পাপড়িযুক্ত সরল , যেন চিরায়ত গ্রাম বাংলার কথা মনে করিয়ে দেয়।) পূর্ব মেঘ ৩১ (চাহনি, গল্পে মশগুল বৃদ্ধের দল মেঘদূত কাব্যে অবন্তীর গ্রামে বৃদ্ধদের মজলিশে উদয়নের গল্প আর *রঘুবংশ* মহাকাব্যে রাজা রঘুর রাজ্যে আখের জমিতে ছায়ায় বসে শালিধান পাহারা দেবার সময় গ্রাম্য মেয়েদের রাজকাহিনী নির্ভর চিরায়ত লোকজীবনের আশ্চর্য ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। *মেঘদূতে* যেমন পাওয়া যায়)রঘু. ৪/২০ (গান মেঘের পথ ধরে মধ্য ও উত্তর ভারতের ছবি আর *রঘুবংশে* রঘুর দিগ্বিজয়যাত্রার পথ ধরে দেখা মেলে, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে তালীবন, সমুদ্র উপকূল) রঘু, ৪/২২ (নদীতীরে উল্লসিত ষাঁড়ের উদ্দামতা, ধান চাষ, কপিশা) রঘু.৪/৩৬(সুঙ্গ দেশ, বহুধাবিভক্ত গঙ্গাস্রোতে বঙ্গদেশের নৌযুদ্ধ) রঘু. ৪/৩৪(,) রঘু.৪/৪২(নদী, উৎকল, কলিঙ্গ, বালির উপর বসে পান পাতায় জন্যদের নারকেলজাত মদ্যপান কাবেরী ও অম্রপর্নী নদী, পান্ড্যদেশ কেরলরমণী, পারসীক, যবনদের মদ্যপানে রক্তাভ মুখ এভাবে কালিদাস সাহিত্যে উত্তর) রঘু. ৪/৬৯(গোষ্ঠীর দুর্দান্ত মানুষ) রঘু.৪/৬৮(হুন) রঘু.৪/৬১ (পূর্ব ভারতের বৈচিত্রময় পরিক্রমা সমাধা হয়।[৫৯]

সুসজ্জিত গৃহপ্রাঙ্গন, সুরম্য অট্টালিকা, তোরণসজ্জিত প্রশস্ত রাজপথ, ফোয়ারাযুক্ত এবং মণিখচিত স্নানাগার রাজাদের প্রমোদউদ্যান, সমুদ্রগৃহ, চিত্রযুক্ত গৃহদ্বারে সেসময়ের উন্নত স্থাপত্যকলা এবং মন্দিরে আরতি, নদীতে মেয়েদের স্নান, তাদের নিখুঁত প্রসাধনকলা, জলক্রীড়া, সমুদ্রতীরে কন্দুক ও বালি নিয়ে খেল রাতে সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথে অভিসারিকাদের অভিসারযাত্রা, ভোরের রাজপথে ছড়িয়ে পড়া সেই অভিসারিকাদের ছিন্ন মুক্তার হার, পুরুষদের পাশাপাশি অভিজাত মেয়েদের মদ্যপান, তন্ত্রীর লয় সমন্বিত সুমধুর সঙ্গিতধ্বনি, প্রভৃতি বর্ণনা প্রমাণ করে সে যুগে সচ্ছল সম্ভ্রান্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তথ্যনির্দেশ ঃ

১ কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, ১/৩১, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পা. (কলিকাতাঃ সংস্কার পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৮), পৃ.১১৬।
২ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৫/৭৩, অশোক কুমার ঘোষ সম্পা. (কলিকাতাঃ সদেশ, ১৪২০), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।
৩ নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, *কালিদাসের মালবি*কা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ.৮৬।
৪ কালিদাস, *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*, ৪/৪, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ১১ (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন), পৃ. ২৮৭।
৫ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. ১/২৮, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩।
৬ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ১৯/৫৪, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬।
৭ "তং বিনিস্পিষ্য কাকুৎস্থৌ পুরা দূষয়তি স্থলীম্ । গন্ধেনাশুচিনা চেতি বসুধায়াং নিচখনতুঃ ॥" কালিদাস, রঘুবংশম্, ১২/৩০, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৪।
৮ *তদেব*, ৩/১২, পৃ.১২০।
৯ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. ১৬/৫৯, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩৪।
১০ কালিদাস, *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, সতিনাথ আচার্য ও দেবকুমার দাস সম্পা. (কলিকাতাঃ সংস্কারকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯), পৃ. ৫।
১১ কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, ৭/৭, সত্যনারায়ন চক্রবর্তী সম্পা. পৃ. ৫০৯।
১২ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ১৯/৫৪, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬।
১৩ কালিদাস, *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার- ১১ (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১), পৃ. ২৬৭।
১৪ কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, মল্লিনাথ সুরি সম্পা. (কলকাতাঃ সংস্কারকৃতযন্ত্র, ১৯১৯), পৃ. ২০০।
১৫ কালিদাস, *রঘুবংশম্*,৪/৫৫, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা .পৃ. ১৭৪।
১৬ কালিদাস, *ঋতুসংহারম্*, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার -১১, (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১), পৃ.৩৩৪।
১৭ "তং মাতরো দেবমনুব্রজন্ত্যঃ স্ববাহনক্ষোভ-চলাবতংসাঃ। মু৮খঃ প্রভামণ্ডলরেণুগেরঃ পদ্মাকরং চক্রুরিবান্তরীক্ষম্ ।" কালিদাস, কুমারসম্ভবম্ ,৭/৩৮, *সংস্কৃত সাহিত্য* সম্ভার– ২, (কলিকাতাঃনবপত্র প্রকাশন, ১৯৭৮), পৃ.৩১১।
১৮ কালিদাস, *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার- ১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।
১৯ (সংস্কারকৃত সাহিত্য পাঠে ধারণা করা হয় এই ক্রীড়া রমণীদের বেশ প্রিয় ছিল। দণ্ডী তাঁর দশকুমারচরিতে এই ক্রীড়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। অভিধানে অর্থ দেওয়া আছে, কন্দুকক্রীড়া অর্থ বল খেলা; কিন্তু কি ধরণের খেলা তা বলা হয়নি।) সংস্কৃত *সাহিত্য সম্ভার*– ২, ১/২৯, পৃ.২৮১।

২০ করুণাসিন্ধু দাস, সংস্কৃত *সাহিত্যে* সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।
২১ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. ৪/৪২, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮।
২২ কালিদাস, *ঋতুসংহারম্*, ৫/১৬, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার-১১, (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১), পৃ.৩৪৫।
২৩ কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার ২, প্রাগুক্ত, ৬/৩২, পৃ. ৩০৫।
২৪ "শৈলঃ সম্পূর্ণকামো'হপি মেনামুখমুদৈক্ষত। প্রায়েণ গৃহিণী-নেত্রা কন্যার্থেষু কুটুম্বিনঃ॥" তদেব, ৬/৮৫, পৃ.৩০৮।
২৫ "তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলমশ্যানকালেয় কৃতাঙ্গরাগাম্। ২৩ বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং নার্য্যশ্চতুাভিমুখং বানৈষুঃ॥" কালিদাস, কুমারসম্ভবম্, ৭/৯, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।
২৬ কালিদাস, *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ৭/৩৭ সতিনাথ আচার্য ও দেবকুমার দাস সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১১।
২৭ করুণাসিন্ধু দাস, সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।
২৮ কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ৭/৬২, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার- ২ প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৩।
২৯ তদেব, পৃ. ৪১।
৩০ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. প্রাগুক্ত, ৩/২৮, পৃ.১২৮।
৩১ বিদ্যা চার প্রকারের। যথা- আন্বীক্ষিকী, হেতুবিদ্যা, এয়ী (ঋকযজুঃ সামবেদাত্মক বেদ-বিদ্যাসমুদায়) বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা) এবং দণ্ডনীতি অর্থাৎ রাজনীতি) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, (কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪), পৃ. ১২।
৩২ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৫/২১, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ.২০০।
৩৩ করুণাসিন্ধু দাস, *সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব* ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, (কলিকাতাঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), পৃ. ১৩৬-১৩৭।
৩৪ তদেব, পৃ. ১৩৯।
৩৫ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৩/১৯, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা.পৃ. ১২৪।
৩৬ কালিদাস, *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*, ১/২১, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার -১১ (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১), পৃ.২০৭।
৩৭ তদেব, ১/৪, পৃ.২৬১।
৩৮ *Kalidasa's Kumara Sambhava*, 5/58, P.v Kulkarni & V.R. Nerurkar Edt. (Bombay, Narendra Pustkalaya, ১৯২৩), চ. ১০৮.
৩৯ কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ৬/৪২, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার-২, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৫।
৪০ তদেব, ৭/৬২, পৃ.৩১৩।
৪১ তদেব, ৮/৭৮, পৃ.৩২১।
৪২ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৯/৩৬, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলিকাতাঃ সদেশ, ১৮২০), পৃ৩০৬।
৪৩ কালিদাস, *মেঘদূতম্*, উত্তরমেঘ-৩৪ সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার-২, প্রাগুক্ত,পৃ.৪৫।
৪৪ রামেশ্বর শ, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে* সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন (কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৮৩), পৃ.২০৪।
৪৫ তদেব, পৃ.২০৭।
৪৬ কালিদাস, *মেঘদূতম্*, পৃ.২৪ কানাইলাল রায় সম্পা. পৃ.৭০।
৪৭ কালিদাস, *মেঘদূতম্*, পৃ.৩২, কানাইলাল রায় সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬।
৪৮ তদেব, পৃ.৩০, পৃ.৮১।
৪৯ কালিদাস, *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, সতিনাথ আচার্য ও দেবকুমার দাস সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ.১৯।
৫০ কালিদাস, *ঋতুসংহারম্*, ১/২, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার -১১, (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১), পৃ.৩৩৭।
৫১ তদেব, ১/৩, পৃ.৩৩৭।
৫২ তদেব, ৫/৫, পৃ.৩৪৫।
৫৩ কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ৮/৪, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার-২, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৬।
৫৪ তদেব, ৮/৭,পৃ.৩১৬।
৫৫ রামেশ্বর শ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত *সাহিত্যে* সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন (কলিকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৯৮৩), পৃ.২০৬।
৫৬ সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার- ২, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১।
৫৭ কালিদাস, *রঘুবংশম্*, ৩/১৩, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ.১২০।)
৫৮ তদেব, পৃ. ১৩৭-১৩৮
৫৯ করুণাসিন্ধু দাস, সংস্কারকৃত *সাহিত্যে* সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

উর্দু নাটকের উন্নয়নে রওনক বেনারসী : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. রশিদুল আলম*

Abstract: Raunak Banaresi was born in 1825 and died in 1886. Raunak Banaresi is one of the few playwrights involved in the development of Urdu drama. He started a new chapter in Urdu drama. His books include *Bay-Nazir Badr-a Munir* (بے نظیر بدرمنیر), *Lily Majnu* (لیلی مجنوں), *Anzam-a Ulfat* (انجام الفت), *Saiful Solaiman* (سیف السلیمان), *Sitam Haman* (ستم ہامان), *Aashiq Sadiq* (عاشق صادق), *Hatem Bin Tai* (حاتم بن طے), *Tilism Juhrah* (طلسم زہرہ), *Aashiq ka Khun* (عاشق کا خون), *Ajaibat Paristan* (عجائبات پرستان) and *Saniha-a Dilgir* (سانحۂ دلگیر) is particularly noteworthy.

রওনক বেনারসী (رونق بنارسی)

রওনক বেনারসী (رونق بنارسی) কে কিছু মানুষ বেনারসী হিসাবে জানে। কিন্তু উর্দু নাট্যজগতে তিনি রওনক হিসাবেই পরিচিত। পার্সী ভিক্টোরিয়া থিয়েটার কোম্পানীর তিনি একজন অন্যতম নাট্যকার ছিলেন। রওনক বেনারসী ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে বেনারসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মাত্র সতের বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে তিনি নানি বাড়িতে চলে আসেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জীবিকার সন্ধানে উত্তর ভারতে চলে আসেন। সেখানে তিনি স্থায়ী না হয়ে বোম্বে চলে আসেন। এর কিছুদিন পর তিনি পার্সী ভিক্টোরিয়া থিয়েটার কোম্পানীর প্রধান নাট্যকার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি একজন উচ্চমানের অভিনেতাও ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই কোম্পানীতে ছিলেন।[১] তার লেখা উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল:

১. বে-নজীর বদর-এ মুনীর (بے نظیر بدرمنیر) ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ।
২. লাইলী মজনু (لیلی مجنوں) ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ।
৩. আনযাম-এ উলফাত (انجام الفت) ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
৪. সাইফুল সোলাইমান (سیف السلیمان) ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
৫. সিতম্ হামান (ستم ہامان) ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
৬. আশিক সাদিক (عاشق صادق) ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
৭. হাতেম বিন তাঈ (حاتم بن طے) ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ।
৮. তিলিস্‌ম যুহরাহ (طلسم زہرہ) ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ।
৯. আশিক কা খুন (عاشق کا خون) ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
১০. ফাসানা-এ আজায়েব (فسانہ عجائب) ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।
১১. ইনসাফ মাহমুদ শাহ (انصاف محمود شاہ) ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।
১২. আজাইবাত পরীস্তান (عجائبات پرستان) ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।
১৩. যুলম-এ আযলাম (ظلم اظلم) ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।
১৪. খাব গাহ-এ ইশ্‌ক (خواب گاہ عشق) ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।
১৫. খাব-এ মাহাব্বাত (خواب محبت) ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।
১৬. ফরীব ফিতনা (فریب فتنہ) ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭. সংগীন বকাবলী (سنگین بکاؤلی) ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।
১৮. ফয়েয সুহবাত (فیض صحبت) ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ।
১৯. কাল কা ভুগ (کالکا بھوگ) ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ ।
২০. সানিহা-এ দিলগীর (سانحۂ دلگیر) ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ।[২]

বে-নজীর বদর-এ মুনীর (بے نظیر بدرمنیر)

বে-নজীর বদর-এ মুনীর (بے نظیر بدرمنیر) নাটকটি তিন অংঙ্কে বিভক্ত। নাটকটি ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার বোম্বেতে মঞ্চায়িত হয়। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে শাহজাদা বে-নজীর, মাহরুখ পরী, বদরে মনির, নাজমুন নেসা প্রভৃতি। নাটকে শাহজাদা বে-নজীর বাগানে ভ্রমন অবস্থায় পরী মাহরুখ তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরী মাহরুখ শাহজাদাকে খুব পছন্দ করত, কিন্তু শাহাজাদা, শাহজাদী বদরে মনিরকে ভালবাসত। পরী মাহরুখ এটা জানতে পেরে শাহজাদাকে বন্দী করে। শাহজাদীর বান্ধবি নাজমুন নেসা শাহজাদা অজনার সাহায্যে বে-নজীরকে মুক্ত করে। এভাবেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে।[৩]

লাইলী মজনু (لیلی مجنوں)

লাইলী-মজনু (لیلی مجنوں) নাটকটি ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত কিচ্ছা লাইলী-মজনুর কাহিনি উপর ভিত্তি করে লেখা। নাটকটিতে তিনি দু'জন প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম কাহিনি অন্যন্ত সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি অত্যন্ত বিরহের সাথে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। নাটকটি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। বেশ কয়েকবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।[৪]

আনযাম-এ উলফাত (انجام الفت)

আনযাম-এ উলফাত (انجام الفت) নাটকটি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই নাটকে বাদশাহ পুত্র হুমায়ুন এবং উজির পুত্র নাসের এর বন্ধুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের প্রথম দিকে উজির কন্যাকে অর্থাৎ মেহের আফরোজকে হুমায়ুন বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করে। অনেক ধুমধাম করে হুমায়ুনের সাথে উজির কন্যার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের রাতে মহলে যাওয়ার আগে যাত্রাপথে পথে ডাকাতরা উজির কন্যাকে তুলে নিয়ে যায় এবং তাকে কতোয়ালের কাছে দশ হাজার রুপিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। পরবর্তীতে শাহজাদা হুমায়ুন ও নাসের উজির কন্যাকে খোঁজার জন্য বের হয়। কিন্তু তারাও ডাকাতের হাতে আক্রান্ত হয়। সেই একই কতোয়ালের কাছে তাদেরকে নয় হাজার রুপিয়াতে বিক্রি করা হয়। উজির কন্যা মেহের আফরোজ এবং নাসের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কতোয়ালের কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং তারা বিয়ে করে। বেশ কিছুদিন পর হুমায়ুন জঙ্গলে শিকার করতে যায়। সেখানে তিনি এক অপরূপ সুন্দরীকে দেখে তাকে নিজের করে নিতে চায়, কিন্তু সে নিজের বুকে ছুড়ি মেরে হুমায়ুনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে। পরবর্তীতে হুমায়ুন জানতে পারে তাঁর প্রাণের বন্ধু নাসেরের স্ত্রী ছিল সেই অপরূপা সুন্দরী। নিজের ভুল বুঝতে পেরে হুমায়ুন আত্মহত্যা করে। এভাবেই নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটে।[৫]

সাইফুল সোলাইমান (سیف السلیمان)

সাইফুল সোলাইমান (سیف السلیمان) নাটকটি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই, সাদিক নামে এক ব্যক্তি অত্যন্ত অলস এবং খারাপ চরিত্রের ছিল। শয়তান তাকে তার শিষ্য করে নেয়। জাবেদার সাদিকের কাছ থেকে বাঁচতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঠিক সেই সময় খোশ সহর তার পুত্র গুলমান রুহ এর সাথে পরিভ্রমন করছিলেন। এমন সময় মাসুমার করুন কান্না শুনে খোশ সহর এর মায়া হয় এবং তাকে অসহায় মনে হয়। এ কারণে তিনি মাসুমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। শয়তান সাদিকের শিষ্য পাগল খানকে অর্থের লোভ দেখিয়ে তাকে মাসুমার পিতা সেজে মাসুমাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলে। পাগল খান খোশ সহরের মহল থেকে মাসুমাকে

মায়া করে নিয়ে আসে। খোশ সহরের ছেলে গুলমান রুহ তার প্রেমিকা হুরউশকে সাথে করে মাসুমাকে খুঁজতে বের হন। পথে আকাশ পরীর একটি আংটি খুঁজে পান গুলমান রুহ। আকাশ পরী খুশি হয়ে তাকে একটি সাইফুল সোলাইমান উপহার দেন।

শয়তান মানুষকে অসৎ বানানো কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতো। আর তাকে সাহায্য করছিল সাদিক ও তার শিষ্য। শয়তান তাদেরকে হুকুম দিল মাসুমাকে হত্যা করে তার রুহ বের করার জন্য। সাদিক ও তার শিষ্য পাগল খান মিলে মাসুমাকে যে সময় হত্যা করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে জাবেদা তার মায়া জাল থেকে বের হয়ে আসে তার মেয়েকে রক্ষা করার জন্য। ঠিক সেই সময় পাগল খান মাসুমাকে নিয়ে শয়তানের কেল্লার দিকে চলে যায়। পুনরায় সাদিক যখন মাসুমার দেহ থেকে রুহ বের করতে যায়, ঠিক তখনই আবার সাইফুল সোলাইমান এর সাহায্যে গুলমান রুহ মাসুমাকে বাঁচানো জন্যে এগিয়ে আসে। সাদিক এবং গুলমান রুহ এর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শয়তান রাগান্বিত হয়ে গুলমানকে আগুনের গভীর গর্তে ফেলে দেয়। হুরউশ গুলমানের এই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যায়। সে সময় আকাশ পরী তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। পুনরায় তারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়। আর এভাবেই নাটকটি পরিসমাপ্তি ঘটে।[৬]

সিতম্ হামান (ستم ہامان)

সিতম্ হামান (ستم ہامان) কাব্য ছন্দে লিখিত দু'ই অংঙ্কের একটি নাটক। নাটকটি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নাটকে হামান সবসময় আল্লাহ রাস্তায় চলার জন্য চেষ্টা করত। তিনি তার বিবি ও বাচ্চার খোঁজ-খবর খুব একটা নিতেন না। মাঝে মাঝে সে জঙ্গলে চলে যেত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে। হঠাৎ করে একদিন শয়তান সেখানে উপস্থিত হলো এবং নানা ভাবে তাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করল। এক সময় শয়তান এ কাজে সফল হলো। শয়তানের কথা অনুযায়ী সে চলতে শুরু করল। শয়তান হামান কে প্রচুর সম্পদ ও ক্ষমতা দিল । ফলে হামান শয়তানের কাছে বিক্রি হয়ে গেল। হামান তার বিবি ও বাচ্চাকে শয়তানের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করল কিন্তু তারা যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকতে চাইল। ধীরে ধীরে হামান নিজেকে শয়তানের কাছে সপে দিলেন। ফলে শয়তান বিজয়ের সুরে তার কাছে এসে তার রাজত্ব কায়েম করল এবং হামান তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলল।[৭]

আশিক সাদিক (عاشق صادق)

আশিক সাদিক (عاشق صادق) নাটকটি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নাটকটি দুই প্রেমিক-প্রেমিকা কে নিয়ে রচিত। এ নাটকে হীরক রাজার কন্যা স্বপ্নে রানঝা কে দেখে প্রেমে পড়ে যায়। অপর দিকে রানঝাও স্বপ্নে হীরক রাজার কন্যাকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায়। রানঝা ছদ্মবেশে রাজকন্যার খোঁজে পথে পথে ঘুরতে শুরু করে। একদিন সে রাজকন্যার সন্ধান পায়। সেখানে সে ছদ্মবেশে কাজ করতে শুরু করে। পরবর্তীতে তারা একে অপরকে চিনতে পারে এবং প্রেমে মশগুল হয়ে পড়ে। কিন্তু শেদা যার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে ঠিক করা ছিল, তিনি তাদের এই মিলামিশা দেখে ফেলে। ফলে রানঝাকে মহল থেকে বের করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে শেদা এবং রাজকন্যার বিবাহ হয়। রাজকন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ে। গোপনে রানঝা তাকে দেখতে আসে এবং তারা মহল থেকে পালিয়ে যায়। শেদা তাদের পিছু পিছু ছায়ার মত ঘুরতে থাকে। সময় মত সে রানঝাকে বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করে। কিন্তু রাজকন্যা শেদাকে ছদ্মবেশ চিনতে পারে এবং জানতে পারে রানঝাকে সেই বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে। রাজকন্যা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। এভাবেই নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটে।[৮]

হাতেম বিন তাঈ (حاتم بن طے)

হাতেম বিন তাঈ (حاتم بن طے) নাটকটি ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই নাটকে হাতেম তাঈ এর বীরত্বপূর্ণ কাহিনি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হাতেম তাঈ একজন পরোপকারী মানুষ ছিল। তিনি অন্যের বিপদ দেখলে তার সাহায্যের এগিয়ে আসতেন। তিনি কখনও নিজের জন্য চিন্তা করতেন না। যদিও তিনি একজন রাজা ছিলেন কিন্তু তিনি নিজেকে সবসময় সাধারণ ভাবতেন। তিনি একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। নাটকটি অনেক কাহিনিপূর্ণ।[৯]

তিলিস্‌ম যুহরাহ (طلسم زہرہ)

তিলিস্‌ম যুহরাহ (طلسم زہرہ) তিন অংঙ্কের একটি নাটক। নাটকটি ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। শাহজাদা বদ খুশান হর তালাত মেয়েদেরকে খুবই অপছন্দ করত। এক রাতে স্বপ্নে তিনি সুলতান কিমুশ শাহ এর কন্যা জহুরা পরীকে দেখতে পেল। ঠিক সেই মুহূর্তে এক দরবেশ তার সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে বলল, যদি তুমি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হতে চাও তাহলে ঘুম থেকে ওঠ এবং তাকে বিয়ে কর। রাস্তায় যতই বিপদ আসুক এই আয়নার সাহায্যে তার মোকাবিলা কর। ঘুম থেকে ওঠে শাহজাদা অস্থির হয়ে গেল। তার পাশে আয়না দেখতে পেল এবং স্বপ্নের কথাকে সে হুকুম মনে করে জহুরা পরীকে খুঁজার উদ্দেশ্যে মহল থেকে গোপনে বের হয়ে গেলেন।

অন্যদিকে এক পরী শাহজাদা হর তালাত এর একটি ছবি জহুরা পরীকে দেখালো। জহুরা পরী শাহজাদা হর তালাত এর প্রেমে পড়ে গেল। অনেক বাধা পেরিয়ে একদিন শাহজাদা হর তালাত তিলিস্‌ম রাজ্যে চলে এলো। সুলতান কিমুশ শাহ তার কন্যা জহুরা পরীকে হর তালাত এর সাথে বিবাহ দিল। এভাবেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে।[১০]

ফাসানা-এ আজায়েব (فسانہ عجائب)

ফাসানা-এ আজায়েব (فسانہ عجائب) নাটকটি ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। শাহজাদা জান এ আলম তার ভৃত্যের কাছ থেকে শাহজাদী আঞ্জুমান আরার রূপের সৌন্দর্য এবং তার কষ্টের কথা শুনে তার প্রেমে পড়ে যায়। শাহজাদীকে খুঁজার উদ্দেশ্যে তিনি মহল থেকে বেড়িয়ে পড়েন। পথে এক জাদুকরিনী সাথে তার দেখা হয়। তার সৌন্দর্য ও কমনীয়তা দেখে শাহজাদা তার প্রেমে পড়ে যায়। জাদুকরিনী সোলাইমান আসনে বসে বিভিন্ন হুকুম দিতেন। শাহজাদা জাদুকারিনীর সবকিছু বুঝতে পারে। একদিন শাহজাদা সোলাইমান আসনের সাহায্যে জাদুকরিনীর সকল জাদু নষ্ট করে শাহজাদী আঞ্জুমান আরাকে মুক্ত করে তার পিতার নিকট নিয়ে আসেন। বাদশা খুশি হয়ে তাদের দু'জনের বিয়ে দেন।[১১] নাটকটির মধ্যে ফার্সি কাব্যের নমুনা পাওয়া যায়। জাদুকরিনীর সাথে শাহজাদার যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন এক জায়গায় শাহজাদা সোলাইমান আসনকে বলে:

کس نہ آموخت علم تیرازمن   کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کرو[১২]

ইনসাফ মাহমুদ শাহ (انصاف محمود شاہ)

ইনসাফ মাহমুদ শাহ (انصاف محمود شاہ) নাটকটি দুই অংঙ্ক ও বিশ দৃশ্যে রচিত। নাটকটি ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে লেখা হয়। নাটকটি কাব্যাকারে লেখা। কিন্তু এখানে কিছু অংশ কৌতুকাবহ গদ্যাকারে লেখা। অর্থলোভী মহিলা মাস্‌ত নাজ একজন চিত্রশিল্পী কে ভালবাসত এবং তার সাথে বেশ কিছুদিন বসবাসও করে। অল্পদিনের মধ্যে এক ধনী লোকের সাথে তার পরিচয় হয়। সেই ধনী লোকটি মাস্‌ত নাজকে অর্থের লোভ দেখিয়ে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। মাস্‌ত নাজ তাকে মনে মনে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু ধনী লোকটি অন্য এক ধনীর মেয়েকে বিয়ে করে। ফলে মাস্‌ত নাজ বুঝতে পারে তাকে ঠকানো হয়েছে। পুনরায় সে চিত্রশিল্পীর কাছে ফিরে যায়। কিন্তু শর্ত দেয় ধনী লোকটিকে খুন করতে হবে কিন্তু চিত্রশিল্পীটি খুন করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং ধনী লোকটি বেঁচে যায়। মাস্‌ত নাজ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। আর এভাবেই নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৩]

আজাইবাত পরীস্তান (عجائبات پرستان)

আজাইবাত পরীস্তান (عجائبات پرستان) নাটকটি ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। এই নাটকটিও একটি প্রেমের উপর লেখা। শাহজাদা মাহ লাকা, শাহজাদী মাহেরু পরীকে স্বপ্নে দেখে ভালবেসে ফেলে। শাহজাদা মাহ লাকা ফকিরের ছদ্মবেশে মাহেরুর খুঁজে বের হয়। অন্যদিকে শাহাজাদীও স্বপ্নে মাহ লাকাকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায়। মাহেরু পরী তার স্বপ্নের কথা বান্ধবি উজির কন্যার কাছে প্রকাশ করে। উজির কন্যা শাহজাদীর কথা শুনে বলল, সেও একটি স্বপ্ন দেখেছে। সেখানে শাহজাদী এক মানুষ শাহজাদাকে পছন্দ করে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়।

শাহজাদা মাহ লাকার সাথে পথে এক দরবেশের দেখা হল। তিনি শাহজাদাকে একটি বল্লম দিয়ে বলল, এটির দ্বারা পথের সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তুই তোর লক্ষ্যে পৌছে যাবি। এ কথা বলে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। শাহজাদা দরবেশের কথা অনুযায়ী সকল বাধা পেরিয়ে শাহজাদী মাহেরু পরীর দেশে পৌছে যায়। মাহেরু শাহাজাদাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। স্বপ্নে যাকে দেখেছিল এ সেই রাজপুত্র। বাদশাহ খুবই খুশি হয় এবং মাহেরুর সাথে তার বিবাহ দেন। এভাবেই নাটকের সমাপ্তি টানা হয়।[১৪]

যুলম-এ আযলাম (ظلم اظلم)

যুলম-এ আযলাম (ظلم اظلم) নাটকটি দুই অংঙ্কে রচিত। নাটকটি ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ই জুন প্রথম বারের মত মঞ্চস্থ হয়। তাওরান উপদ্বীপে শামশ্ রুহ ও নুরুল নেসা নামে দুই ভাই-বোন বসবাস করত। সেখানে তারা শান্তি ও সচ্ছলতা সাথে জীবন অতিবাহিত করছিল। একদিন উপদ্বীপের শাসক আযলাম নুরুল নেসাকে দেখে তাকে বিয়ে করতে চাইল। শামশ্ রুহ ও নুরুল নেসা নিজেদের মান-সম্মান বাঁচানো জন্য বসরা নগরে উদ্দেশ্যে পলায়ন করল। কিন্তু জাহাজ বসরা যাওয়ার পূর্বেই পানিতে ডুবে গেল। আমির বসরা নামে একজন নুরুল নেসাকে বাঁচিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। আমির তাকে ইজ্জতের সাথে তার বাড়িতে রাখল। কিন্তু তার গাড়ি চালক নুরুল নেসার প্রেমে পড়ে গেল এবং তাকে প্রস্তাব দিল। নুরুল নেসা সে প্রস্তাব গ্রহণ না করে তাকে তিরস্কার করল।

আমির তাওরান এ কথা শুনে নুরুল নেসাকে নিয়ে আমির বসরা বাড়ি থেকে বসরার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। রাস্তায় তাদের জাহাজ ডুবে গেল কিন্তু কোনভাবে তারা বসরাতে পৌছে গেল। পুনরায় আযলাম নুরুল নেসাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, এবারও সে রাজি হলনা। আমির বসরা এ কথা শুনে খুবই রাগান্বিত হল এবং তাদেরকে নিলামে বিক্রি করে দিল। শামশ্ রুহ ঠিক সে সময়ে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ক্রয় করে নিলেন। তিনি আযলামকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু নুরুল নেসাকে ভুল বুঝে তাকে হত্যা করতে গেলেন। সেই মুহূর্তে শাম দেশের অধিকর্তা মনোয়ার নুরুল নেসাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল। মনোয়ার এবং শামশ্ রুহ এর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ করতে করতে তারা অনেক দূর চলে গেল। এ সময় আবার আযলাম এসে নুরুল নেসাকে তার ভালবাসার কথা জানালো। ঠিক সেই সময় আমির বসরা দু'জনকে গ্রেফতার করে তার সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। নাটকটি এভাবেই শেষ হয়।[১৫]

খাব গাহ-এ ইশ্ক (خواب گاه عشق)

খাব গাহ-এ ইশ্ক (خواب گاه عشق) নাটকটি চার অংঙ্কে রচিত। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। শাহজাদা খোরশেদ এবং শাহজাদী শোলা পরী একে অপরকে স্বপ্নে দেখে ভালবেসে ফেলে। তারা একে অপরকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহিরে বের হয়ে আসে। বিভিন্ন জায়গায় খুঁজাখুঁজি করার পর প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরকে দেখতে পায়। শাহজাদী শোলা পরী শাহজাদা খোরশেদকে কুহেকাফের জাদুর বাগানে লুকিয়ে রাখে। সেখানে পাহারাদার হিসেবে এক রাক্ষসকে রেখে দেয়।

অন্যদিকে জমরুদ পরীও স্বপ্নে শাহজাদাকে দেখে মনে-প্রাণে ভালবেসে ফেলে। বৈরাগিনী সেজে সে শাহজাদা খোরশেদকে খুঁজার জন্য বের হয়। পথে এক দরবেশের সাথে তার দেখা হয়। তিনি তাকে একটি জাদুর লাঠি উপহার দেয়। জাদুর লাঠির সাহায্যে সে কুহেকাফের জাদুর বাগানে শাহজাদাকে খুঁজে পায়। কৌশলে সে শাহজাদাকে সেখান থেকে তার কাছে নিয়ে যায়। এক রাক্ষসকে জাদুর লাঠি দিয়ে বলে সে যেন ঠিকমত শাহজাদাকে দেখে রাখে। শাহজাদী শোলা পরী শাহজাদা খোরশেদকে কুহেকাফের জাদুর বাগানে দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে পরে। সে জানতে পারে জমরুদ পরী শাহজাদাকে নিয়ে গেছে। শাহজাদাকে উদ্ধার করার জন্য গোপনে জমরুদ পরীর বাগানে শোলা পরী গমন করে। সেখানে সে রাক্ষসকে একা পেয়ে কৌশলে জাদুর লাঠি অদৃশ্য করে ফেলে এবং শাহজাদাকে নিয়ে চলে আসে। জমরুদ পরী শাহজাদাকে দেখতে না পেয়ে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে এবং আত্মহত্যা করে। অন্যদিকে শাহজাদী শোলা পরীর পিতা গুলজার শাহ তার মেয়ের প্রেমের কথা জানতে পারে। তিনি শাহজাদা খোরশেদের সাথে তার কন্যার বিবাহ দেন।[১৬]

খাব-এ মাহাব্বাত (خواب محبت)

খাব-এ মাহাব্বাত (خواب محبت) নাটকটি ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইরাকের অধিকর্তা শাহ্ যমান তার কন্যা জান-এ আলম এর বিয়ে পালিত পুত্র পরশুয়ারের সাথে দিতে চায়। কিন্তু জান-এ আলমের ভাই শাহজাদা মীর যবান এ বিয়েতে মত ছিলনা। তিনি মনে করেন দু'জনেই দুধ মাতার একই, এ কারণে বিয়ে সম্ভব নয়। মীর যবান এর সৎ মা অর্থাৎ পরশুয়ারের মা নূর জাহান বাদশা শাহ্ যমান এর কাছে অভিযোগ করে শাহজাদা মীর যবান এর বিরুদ্ধে। বাদশা তাকে হত্যা করার জন্য বলে। কিন্তু হত্যাকারির দয়া হয় এবং সে অর্থ-সম্পদ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। শাহজাদা শাম দেশে চলে যায়।

শাম দেশের অধিকর্তা রাহাত রুহ স্বপ্নে মীর যবানকে দেখে এবং তাকে ভালবেসে ফেলে। মীর যবানকে খুঁজার জন্য ইরাকে চলে যায়। সেখানে তিনি বাদশা শাহ যমান এর সাথে দেখা করেন। বাদশা মনে করেন রাহাত রুহ এর সাথে পরশুয়ারের সম্পর্ক রয়েছে। এ কারনে তিনি তাকে পরশুয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। পরশুয়ার এটিকে একটি ষড়যন্ত্র মনে করে বাদশাহ কে হত্যা করে। উজির নেক বখ্‌ত হত্যার দায়ে পরশুয়ার, নূর জাহান ও রাহাত রুহকে গ্রেফতার করে শাম দেশে রওনা হয়।

শাহজাদা মীর যবান তার পিতার হত্যার কথা শুনে ভেঙ্গে পড়ল। তিনি ইরাকে ফিরে এলো এবং শাসনকার্য গ্রহণ করল। কিছুদিন পর তিনি রাহাত রুহকে বিবাহ করলেন এবং জানতে পারলেন তার পিতাকে পরশুয়ার কিভাবে হত্যা করেছিল। মীর যবান পরশুয়ার ও নূর জাহানকে হত্যার হুকুম দিল। ছোট বোনের সাথে রাহাত রুহ এর ছোট ভাই জন-এ জাহান এর সাথে বিয়ে দিল। এভাবেই নাটকটি শেষ হয়।[১৭]

ফরীব ফিতনা (فریب فتنہ)

ফরীব ফিতনা (فریب فتنہ) নাটকটি প্রথম ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। পরবর্তীতে তৃতীয় বারের মত ১৮৯৯ সালে বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে দেখা যায়, মুক্তারের ছেলে খোদ পছন্দ বন্ধুর কাছে জানতে পারে পিতার সাথে তার প্রেমিকা ফিতনার সম্পর্ক রয়েছে। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়। মুক্তার ফিতনাকে বিয়ে করে খোদ পছন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। সেখান থেকে সে তার এক বন্ধু নেকবেন এর কাছে যায়। নেকবেন ও তার বোন দু'জন মিলে খোদ পছন্দকে সাহায্য করে। তাদের সাহায্যে ফিতনাকে হত্যা করে। নাটকটির শেষে দেখা যায়, খোদ পছন্দের সাথে নেকবেন এর ছোট বোনের বিয়ে হয়।[১৮]

সংগীন বকাবলী (سنگین بکاؤلی)

সংগীন বকাবলী (سنگین بکاؤلی) নাটকটি ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়। রাজা ইন্দর কন্যা বকাবলী শরকাস্তান এর শাহজাদা তাজউল মূলকে ভালবাসত। একদিন শাহজাদাকে গ্রেফতার করে রাজা ইন্দর এর নিকট নিয়ে আসে। রাজা রাগান্বিত হয়ে তাজউল মূলকে শরীরের নিচের অংশ পাথরের মূর্তি বানিয়ে দেয় এবং ১২ বছর তাকে বন্দি করে রাখার নির্দেশ দেয়। শাহজাদী বকাবলী তার পিতাকে চার বছরের মধ্যে বুঝানো চেষ্টা করে শাহজাদা কোন দোষ করেনি। রাজা ইন্দর মেয়ের কথা বিশ্বাস করে শাহজাদা তাজউল মূলকে ভালো করে দেন এবং তাদের মধ্যে বিবাহ দেন। এভাবেই নাটকটির সমাপ্তি ঘটে।[১৯]

ফয়েয সুহবাত (فیض صحبت)

ফয়েয সুহবাত (فیض صحبت) নাটকটি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নওয়াব আযমত খান তার পুত্র নওয়াব সোওলত খানকে খুবই অপছন্দ করতেন। নওয়াব সমস্ত সম্পদ তার ভাতিজী রাজিয়া বেগমকে দিয়ে যান। কিন্তু নওয়াব সোওলত খান সকল দলিল তার বন্ধু ফাযিহাতা, আব্বাসি ও আফরুয এর সাহায্যে গায়েব করে ফেলে। সে নওয়াব আযমত খান, আব্বাসিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে কিন্তু তারা বেঁচে যায়। এমন কি তার প্রেমিকা আফরুযকেও হত্যার পরিকল্পনা করে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। আফরুযার ভাই ফিরোজ হোসেন তাকে রক্ষা করে। আফরুযা সসস্ত কাহিনি তার কাছে বর্ণনা করে। ফিরোজ নওয়াব সোওলত খান ও তার বন্ধু ফাযিহাতাকে বন্দি করে তার বোনের সম্মানের প্রতিশোধ নিলেন। আসল দলিল উদ্ধার করে রাজিয়া বেগমকে তা ফিরিয়ে দিলেন। রাজিয়া ও ফিরোজ একে অপরকে ভালবাসতে শুরু করে। আব্বাসি নওয়াব আযমত খান কে হত্যা

করার পর পাগল হয়ে যায়। নওয়াব সোওলত খান ও তার বন্ধু ফাযিহাতা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে। রাজিয়ার সাথে ফিরোজের এবং নওয়াব সোওলত খান এর সাথে আফরুযার বিয়ে সম্পন্ন হয়। এভাবে নাটকটি সমাপ্তি ঘটে।[২০]

সানিহা-এ দিলগীর (سانحۂ دلگیر)

সানিহা-এ দিলগীর (سانحۂ دلگیر) নাটকটি মূল নাটক থেকে কিছুটা আলাদা করে রওনক বেনারসী ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। বোম্বের সাধারণ কোন ঘটনা নিয়ে তিনি নাটকটি রচনা করেননি। নাটকটি তিনি পাঞ্জাবের একটি ঘটনা নিয়ে রচনা করেন। নাটকে রাজা বেশ পরিবর্তন করে নিজ রাজ্যে ফিরে আসে। রাজ্যে ফিরে আসার পর নায়িকা সাথে তার যে প্রেমালাপ হয় তার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলঃ

رانجھا: تجھے کیا کروں اے باد بہار، گل و گلشن کو آگ لگے ، جب پاس نہ ہودے یار۔ گلوں سے بلبل کو پیار۔ تجھے کیا کروں اے باد بہار۔

ہیر: لے گیا دل جو مرا یہ تو وہی ہے دلبر! [২১]

পরিশেষে রওনক বেনারসীর (رونق بنارسی) নাটকগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি সে সময়ের প্রচলিত নিয়মের মধ্যেই নাটক লেখা শুরু করেন। তার নাটকগুলোর মধ্যে হাসি-তামাশা ও চিত্তবিনোদন দেখতে পাওয়া যায়। তার নাটকের শিল্পরূপ অত্যন্ত সার্থকতার দাবীদার। প্লট নির্মাণ, ঘটনার বর্ণনা ও চরিত্র বিন্যাসে রওনক বেনারসীর নাটকগুলো ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়।

তথ্যনির্দেশ

১ আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত* (করাচীঃ বুকল্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ৪০।
২ প্রফেসর সৈয়দ হোসেন, *মাহমুদ মিঞা রওনক* (বোম্বেঃ নয়া আদব, ১৯৪৫), পৃ. ৫৬।
৩ ড. আবদুল আলীম নামী, *উর্দু থিয়েটার (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
৪ ইশরাত রহমানী, *উর্দু ড্রামা তারীখ ওয়া তানক্বীদ* (আলীগড়ঃ মাকতুবা-এ আলফাজ শামশাদ মার্কেট, ১৯৮৭), পৃ. ১৬২।
৫ *তদেব*, পৃ. ১৬২।
৬ ড. আবদুল আলীম নামী, *উর্দু থিয়েটার (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৭ *তদেব*, পৃ. ৮৯।
৮ ড. আতীয়া নাশ্‌শাত, *উর্দু ড্রামা রেওয়ায়েত আওর তাজরিবাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
৯ ড. আবদুল আলীম নামী, *উর্দু থিয়েটার (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।
১০ প্রফেসর মুহাম্মদ আসলাম কুরাইশী, *ড্রামা নিগারী কা ফন* (লাহোরঃ মজলিস-এ তারাক্কী-এ আদব, ১৯৬৩), পৃ. ৪০।
১১ ড. সেলিম কোরায়েশী, *বররে সগির কা ড্রামা* (লাহোরঃ মাগরিবী পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১২১।
১২ ড. আবদুল আলীম নামী, *উর্দু থিয়েটার (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩।
১৩ প্রফেসর মুহাম্মদ আসলাম কুরাইশী, *ড্রামা নিগারী কা ফন* (লাহোরঃ মজলিস-এ তারাক্কী-এ আদব, ১৯৬৩), পৃ. ৪০।
১৪ ড. আবদুল আলীম নামী, *উর্দু থিয়েটার (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।
১৫ *তদেব*, পৃ. ৯৬।
১৬ *তদেব*, পৃ.৯৬।
১৭ ড. ফরমান ফতেহপুরী, *উর্দু নছর কা ফান্নী এরতেকা* (দেহলীঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪), পৃ. ১৭৬।
১৮ ড. আবদুল আলীম নামী, *উর্দু থিয়েটার (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।
১৯ *তদেব*, পৃ. ৯৬।
২০ *তদেব*, পৃ. ৯৬।
২১ *তদেব*, পৃ.৯৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৩১তম সংখ্যা, জুন-২০২১, ISSN 1813-0402

উর্দু সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃ একটি ঐতিহাসিক সারসংক্ষেপ

ড. মো. মোকাররম হোসেন মন্ডল*

Abstract: Urdu language and literature is one of the modern languages and literatures whose origin and development are both in the Indian subcontinent. It is known from the history of literature that the arrival of Arab Muslims and English in the Indian subcontinent, establishment of Fort William College, Sepoy Rebellion, Aligarh Movement, Progressive Literary Movement, Indian Independence Movement, and Pertition etc. played an important role in the origin and development of Urdu literature. Initially, Urdu literature was confined to fiction and religious ideology. But at present all branches of modern literature, including real life and social literature, exist here. Famous poets and writers like Mir, Sauda, Ghalib, Momin, Zauk, Iqbal, Fayez Ahmed Fayez, Sir Syed, Shibli, Hali, Azad, Premchand, Mantu, and Krishan Chandra etc. have enriched Urdu literature. In this article, an attempt has been made to give a brief history of the origin and development of Urdu literature.

ভূমিকা

পৃথিবীর আধুনিক ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দু হলো অন্যতম। যার উৎপত্তি এবং বিকাশ দু'টোই ভারতীয় উপমহাদেশে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সপ্তম শতকের পর বিভিন্ন সময় আরব মুসলমান, তুর্কি, পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর ভারতবর্ষে আগমন এবং এখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাঁদের সংযোগ স্থাপন থেকেই জন্ম হয় উর্দু ভাষার। মূলত বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন ও ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজন থেকেই একটি 'সম্পর্ক-ভাষা' হিসেবে এ ভাষার সৃষ্টি। বলা বাহুল্য যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সরকারি ভাষা হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের সকল দাপ্তরিক কাজকর্ম এবং লেখালেখি চলতো ফারসি ভাষায়। এছাড়া ফেরদৌসি [৯৩৫-১০২০ খ্রি.], ওমর খৈয়াম [১০৫০-১১২৩ খ্রি.], শেখ সাদি [১১৮৪-১২৯১ খ্রি.], জালালুদ্দিন রুমি [১২০৭-১২৭৩ খ্রি.], হাফিজ শিরাজী [১৩২৬-১৩৯০ খ্রি.] প্রমুখ মহাকবিদের অনুগ্রহে সুপ্রাচীন এই ভাষার সাহিত্যও ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরপুর। কিন্তু ফারসি ভাষার তুলনায় সে সময় উর্দু ভাষা ছিল নিতান্তই নবীন ও শিশুতুল্য। তাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠতে নবীন উর্দু ভাষাকে অনেক চড়াই-উৎড়াই এবং বিস্তর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে উর্দু ভাষায় পীর-মাশায়েখদের ধর্মপ্রচার, দক্ষীণ ভারতের শাসকগোষ্ঠীর [১৩৫০-১৬৮৭ খ্রি.] পৃষ্ঠপোষকতা, পঞ্চদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন, কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠা [১৮০০ খ্রি.], 'সিপাহী বিদ্রোহ' [১৮৫৭ খ্রি.], শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক 'আলীগড় আন্দোলন', 'প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন' [১৯৩৬ খ্রি.]-সহ বিভিন্ন আন্দোলন এবং যুগের একঝাঁক সূর্য সন্তানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মূলত এইসব পটভূমির প্রেক্ষাপটে সাময়িক প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে নবসৃষ্ট 'উর্দু' ভাষা পরবর্তীতে এতবেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, 'ফারসি' ভাষার স্থলে ১৮৩৭ সালে ভারতবর্ষের সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভসহ সার্বজনীন ও পরিপক্ক সাহিত্যের ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের পদচারণায় সমাজ ও বাস্তবজীবনকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য ও অকথাসাহিত্যনির্ভর গদ্য-পদ্যের সকল শাখা-প্রশাখা উর্দু সাহিত্যে বর্তমানে স্বমহিমায় বিদ্যমান। আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়েই একটি সুচারু রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

উর্দু সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময় [৫৪৪ খ্রি. পূ.-১১২০ খ্রি.] হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনসহ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী জাতি ও সম্প্রদায়ের শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।[১] কিন্তু মগধ সাম্রাজ্যের মৌর্য

* সহযোগী অধ্যাপক, উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বংশের শাসক মহামতি অশোক [২৭৩-২৩২ খ্রি. পূ.]-এর পরবর্তী সময়ের শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শীতার কারণে সপ্তম শতকের পর আরব মুসলমান ও পঞ্চদশ শতকে ইংরেজ জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আগমন করেন এবং নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাঁদের একধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই পারস্পরিক লেনদেন ও ভাব-বিনিময়মূলক সম্পর্কের কারণে ক্রমান্বয়ে এক নতুন ভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এই সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদেই উত্তর ভারতের (তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী) সাধারণ মানুষদের মধ্যে সর্বজনবোধ্য 'উর্দু' ভাষার সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, 'উর্দু' ভাষা সৃষ্টির পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রমান্বয়ে 'বৈদিক', 'সংস্কৃত' ও 'প্রাকৃত' ভাষার প্রচলন ছিল। মূলত এই 'প্রাকৃত' ভাষার সাথে 'আরবি', 'ফারসি', 'তুর্কি' ও 'ইংরেজি'সহ বিভিন্ন ভাষার শব্দের সংমিশ্রণের ফলেই 'উর্দু' ভাষার সৃষ্টি।[২] তবে যে সময় উত্তর ভারতে 'উর্দু' ভাষার জন্ম হয়, সে সময় 'ফারসি' ভাষার প্রতি সেখানকার শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বেশি। তাই দাপ্তরিক ও লেখালেখির কার্যক্রমও চলতো ফারসি ভাষায়। ফলে উত্তর ভারতে 'উর্দু' ভাষা সাধারণ জনগণের কথাবার্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ ভারতের শাসকগোষ্ঠী ও ধর্মপ্রচারকগণ ফারসির চেয়ে 'উর্দু' ভাষার চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে বেশি ভালোবাসতেন। উপরন্তু তৎকালীন দিল্লির সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক [১২৩৫-১৩৫১ খ্রি.] দিল্লির পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতকে হিন্দুস্থানের রাজধানী [১৩২৭ খ্রি.] ঘোষণা করলে তাঁর নির্দেশে দিল্লির সরকারি কর্মচারী, কবি-সাহিত্যিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, সুফি-দরবেশ, সাধারণ জনগণসহ বিভিন্ন পেশাজীবী দক্ষিণ ভারতে চলে আসেন। ফলে উত্তর ভারতের নবসৃষ্ট 'উর্দু' ভাষাটি দক্ষিণ ভারতের শাসকগোষ্ঠীর [১৩৫০-১৬৮৭ খ্রি.] পৃষ্ঠপোষকতা ও সুফি-দরবেশদের প্রচেষ্টায় সাহিত্যজগতে স্থান করে নিতে থাকে। ফলে উর্দু সাহিত্যের প্রাথমিক নমুনা দক্ষিণ ভারতেই সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়।[৩] বলা বাহুল্য যে, উর্দু ভাষা ও সাহিত্য প্রাথমিক অবস্থায় কাব্যকলানির্ভর ছিল। সমাজ ও জাতির সামগ্রিক চিত্র কবিতার মাধ্যমেই অঙ্কন করা হতো। তবে এসময় গদ্যসাহিত্যের নমুনা ছিল না বিষয়টি এমন নয়। সে সময়ের গদ্যসাহিত্য ক্বেচ্ছা-কাহিনি, প্রেম-প্রীতি, রূপকথা ও ধর্মীয় উপদেশাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে কখন এবং কার মাধ্যমে উর্দু ভাষা 'সাহিত্যে' স্থান করে নিয়েছে, সে ব্যাপারে রয়েছে যথেষ্ট বিতর্ক।

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ [১৮৩০-১৯১০ খ্রি.]-এর মতে, ওয়ালি দকনি [১৬৬৮-১৭০৮ খ্রি.] হলো উর্দু ভাষার আদি কবি।[৪] আর আধুনিক উর্দু ইতিহাসবিদগণ শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার [১২৪২-১৩২৫ খ্রি.] শিষ্য বিশিষ্ট সুফি-সাধক আমির খসরু [১২৫৫-১৩২৫ খ্রি.]-কে উর্দু সাহিত্যের জনক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মূলত ফারসি ভাষায় লেখালেখি করতেন। উর্দু তখনও পূর্ণাঙ্গ ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। কেননা, উর্দু নামটাই চালু হয়েছে অনেক পরে (১৬৬৬ খ্রি.)। তথাপি তার সময়ে উর্দুর যে প্রারম্ভিক রূপ ছিল, সেই উৎপাদ্যমান ভাষাকে তিনি 'হিন্দবি' নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৫] আমির খসরুর পর দক্ষিণ ভারতে উর্দু সাহিত্যের নিয়মতান্ত্রিক চর্চা শুরু হয়। দক্ষিণী কবিদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম হলো গোলকুন্ডার সুলতান মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ [১৫৬৬-১৬১২ খ্রি.]। তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন এবং কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর সমসাময়িককালে গযল, কাছিদা ও মাছনভি কবিতা লেখা হতো বেশি। উর্দু ভাষায় প্রকাশিত প্রথম কাব্যসংকলনটি তাঁরই। তাঁর পূর্বে যেটুকু বিক্ষিপ্ত উর্দু কবিতা লেখা হয়েছে, তার সবই ছিল মূলত আধ্যাত্মিক চরিত্রের ও সুফি-সাহিত্যবিশিষ্ট। তিনিই প্রথম কবি, যিনি উর্দু কবিতায় প্রথম প্রেম ও প্রকৃতির সম্মেলন ঘটান। কুলি কুতুব শাহের সভাকবি ছিলেন মোল্লা ওয়াজহি [১৫৫০-১৬৮১ খ্রি.]। যিনি কাল্পনিক প্রেমকাহিনি অবলম্বনে *কুতুব ও মুশতারি* [১৬০৯ খ্রি.] নামক একটি মাছনভি কাব্য লিখেছেন। শুধু কবি হিসেবেই নয়, গদ্য রচনায়ও তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর লিখিত *সব রস* [১৬৩৫ খ্রি.] উর্দু ভাষার প্রথম গদ্যরচনা। মোল্লা ওয়াজহী নিজেও তাঁর রচনাকে হিন্দুস্থানের প্রথম হিন্দি (উর্দু) গদ্য বলে গর্ববোধ করেছেন। যেমন গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন,

> آج لگن کوئی اس جہاں میں ہندوستان میں ہندی زبان سوں اس لطافت اس
> چھنداں سوں نظم ہور نثر ملا کر کلا کر نیں بولیا۔[6]

> "আজকের মুহুর্ত পর্যন্ত এ দুনিয়ায় হিন্দুস্থানের হিন্দি (উর্দু) ভাষায় এমন ছন্দ মাধুর্যে পদ্য ছাড়া গদ্য কেউ এমনভাবে বলতে পারেনি।"

এ গ্রন্থের পূর্বেও দক্ষিণ ভারতে উর্দু গদ্যের কিছু নমুনা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তা মূলত সূফীতত্ত্ববিষয়ক উপদেশাবলি মাত্র। যেমন- খাজা বান্দা নওয়াজ গেসু দরাজ [১৩২১-১৪২২ খ্রি.]-এর *মে'রাজুল আ'শেক্বীন* [১৪২৫ খ্রি.], শাহ মীরাঁ জী শামসুল এশশাক [১৪৯৭-১৫৬২ খ্রী.]-এর *শরহে মরগুবুল কুলুব;* শাহ বোরহান উদ্দীন জানমের [১৫৪৩-১৫৯১ খ্রি.] *কালেমাতুল হাক্বায়েক্ব,* শাহ আমিনউদ্দীন আলার [১৫৮২-১৬৭৫ খ্রি.] *গুফতার-এ শাহ-এ আমিন,* মীরাঁ ইয়াকুবের *সামায়েলুল আতকিয়া* [১৬৬৮ খ্রি.], শাহ মীরের *আসরারু তৌহীদ* প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭] এ গ্রন্থগুলো মূলত ধর্মীয় প্রচার, প্রসার ও মুরীদদের উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছিল। তবুও উর্দু গদ্যের আদি নমুনা হিসেবে এসব রচনার মূল্য অপরিসীম। তবে প্রাচীন উর্দু গদ্য নিমার্ণের সবচেয়ে সফল প্রয়াস হলো *সব রস* গ্রন্থ। কেননা, এর কাহিনি ও বর্ণনা স্টাইল দু'টোই আশ্চর্যজনক হওয়ার কারণে গদ্যসৃষ্টিতে গ্রন্থটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছিল।[৮] এছাড়া নুছরাতি [১৬০০-১৬৭৪ খ্রি.], রুস্তমি, গাওয়াছি, ইবনে নাশ্‌শাতি প্রমুখ মোল্লা ওয়াজহি'র সমসাময়িক কবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মারছিয়া ও গযল লিখলেও মূলত তাঁরা সবাই মাছনভি লেখক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। এপ্রসঙ্গে বিজাপুরের সুলতান আলি আদিল শাহের [১৫৫৮-১৫৭৯ খ্রি.] সঙ্গে মুঘল ও মারাঠাদের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে নুছরাতি'র মাছনভি *আলিনামা* [১৬৬৫ খ্রি.], *গুলশানে ইশক্ব* [১৬৫৭ খ্রি.]; ফারসি ভাষা থেকে দকনি উর্দুতে অনূদিত রুস্তমি'র দীর্ঘতম মাছনভি *খবরনামা*, গাওয়াছি'র মাছনভি *সাইফুল মুলক ওয়া বাদিয়ুল জামাল*, *তুতি নামা;* ইবনে নাশ্‌শাতি'র মাছনভি *ফুল বন* [১৬৬৬ খ্রি.] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় অধিকাংশ উর্দু রচনাই ফারসি ভাষার অনুবাদ ছিল।[৯]

অতঃপর উর্দু সাহিত্য দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতের দিকে মোড় নেয়। কেননা, মোগল সম্রাট শাহজাহান [১৫৯২-১৬৬৬ খ্রি.] ও আওরঙ্গজেব [১৬১৮-১৭০৭ খ্রি.]-এর ধারাবাহিক আক্রমণের ফলে দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলো (আহমদনগর, গোলকোন্ডা, বিদার, বিজাপুর, গুজরাত/বেরার,) একে একে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। সেইসাথে দকনি উর্দু সাহিত্যের গৌরবময় অধ্যায়ও প্রায় শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় দিল্লিকেন্দ্রিক উর্দু সাহিত্যের আলোকিত অধ্যায়। অথচ পূর্ব থেকেই দিল্লিতে জন্ম নেওয়া উর্দু ভাষার বহুল প্রচলন থাকা সত্ত্বেও এখানে উর্দু সাহিত্য ছিল দীর্ঘদিন অবহেলিত। কেননা, দিল্লির স্থানীয় সাহিত্যিকগণ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উর্দুর চেয়ে ফারসি ভাষাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। পরবর্তীতে তাঁরা যখন বুঝতে পারেন যে, ফারসির চেয়ে উর্দু ভাষা তাঁদের অধিক নিকটতম এবং এ ভাষায় দক্ষিণ ভারতের কবি-সাহিত্যিকগণ দীর্ঘদিন থেকে বেশ সুনামের সাথে সাহিত্য রচনা করে আসছেন। তখন তাঁরা ফারসি ভাষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং দক্ষিণ ভারতের কবি-সাহিত্যিকদের ওস্তাদ মনে করে তাঁদেরকে মনে-প্রাণে অনুসরণ এবং তাঁদের ন্যায় উর্দু সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন। উর্দু ভাষার সাহিত্যসৃষ্টির শক্তিমত্তার বিষয়টি উপলব্ধি করে একাজে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন ওয়ালি দকনি [১৬৬৭-১৭০৭ খ্রি.]। তিনি মাছনভি, কাছিদা, মুখাম্মাস, রুবাই'সহ বিভিন্ন আঙ্গিকের কবিতা লিখেছেন। তবে গযল লেখক হিসেবেই তিনি বেশি পরিচিত। দিল্লিতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষায় কবিতা লেখার প্রচলন তাঁর মাধ্যমেই হয় বলে তাঁকে উর্দু কবিতার জনক বা 'বাবা-এ উর্দু' বলা হয়ে থাকে।[১০] নিজের উচ্চ অবস্থান সম্পর্কে তিনি নিজেই গর্ববোধ করে বলেছেন,

ولی ایران و توران میں ہے مشہور * وطن گو اس کا گجرات و دکن ہے[11]

"অর্থাৎ- ওয়ালি ইরান এবং তুরানেও বিখ্যাত, যদিও তাঁর আবাসভূমি হলো গুজরাত।"

ওয়ালি'র উর্দু কাব্যের গ্রহণযোগ্যতা দেখে সমসাময়িক দিল্লির অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকগণ পুরোদমে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। এসমস্ত কবিদের মধ্যে প্রথমেই খান আরজু'র [১৬৮৯-১৭৫৬ খ্রি] নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি উর্দু ভাষায় সাহিত্যচর্চা করার জন্য বহু তরুণ কবিকে উৎসাহিত করেছেন। মীর তকী মীর [১৭২৩-১৮১০ খ্রি.], সওদা [১৭১৩-১৭৮১ খ্রি.] মীর দরদ [১৭২২-১৭৮৫ খ্রি.], মীর হাসান [১৭৩০-১৭৮৬ খ্রি.] ছিলেন সে সময়ের (আঠারো শতকের) সর্বশ্রেষ্ঠ উর্দু কবি। বিশেষকরে মীর তকী মীর সমসাময়িককালের সর্বাধিক উচ্চমানের কবি ছিলেন। তাঁর কবিতায় বিধ্বস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত দিল্লির বেদনা ফুঁটে উঠেছে। যেন ব্যক্তির বেদনা মিশে গেছে নগরের বেদনার সঙ্গে। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসবিদ রালফ রাসেলের [১৯১৮-২০০৮ খ্রি.] মতে, মীর ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর অধিকাংশ রচনাই গযল এবং গযলের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন। একারণে 'শাহনশাহ-এ গযল', 'খুদা-এ সখন',

‘উস্তাদ-উল-শোয়ারা’ প্রভৃতি উচ্চ আখ্যায় তাঁকে সম্বোধন করা হয়।[১২] বিশেষকরে মীর তাকী মীর সম্পর্কে বিখ্যাত কবি মির্যা গালিব [১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.] যে মন্তব্য করেছেন, তা মীরের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে সকল আখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। যেমন গালিব বলেছেন,

ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب * کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئ میر بھی تھا۔[13]

“অর্থাৎ- তুমি একাই উর্দু ভাষার উস্তাদ নও গালিব, লোকে বলে অতীতকালে মীর নামেও কেউ ছিলেন।”

আর সওদা ছিলেন মীরের পুরোপুরি বিপরীত চরিত্রের অধিকারী। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সর্বদা হাসিখুশি ও খোলামেলা মেযাজের মানুষ। যা তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে ফুঁটে তুলেছেন। তাঁকে উর্দু কাছিদার জনক বলা হয়। তিনি গযলও লিখেছেন, কিন্তু কাছিদাকে উচ্চমাত্রায় নিয়ে গেছেন। তাঁর কবিতায় রয়েছে বিষয় বৈচিত্র্যের বিচিত্রতা। উনিশ শতকের বিখ্যাত উর্দু কবি আমির মিনাই [১৮২৮-১৯০০ খ্রি.] মীর এবং সওদার কাব্যের তুলনা করে যথার্থই বলেছেন,

سودا و میر دونوں ہی استاد ہیں امیر * لیکن ہے فرق آہ میں اور واہ واہ میں۔[14]

“সওদা এবং মীর দু’জনই ওস্তাদ হে আমির, কিন্তু পার্থক্য হলো আহ্ (বিষাদ) এবং ওয়াহ্ ওয়াহ (আনন্দ) এরমধ্যে।”

যুগের এ দু’জন মহান কবির চরিত্র এবং জীবনবোধ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। যা তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ও লেখনির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁদের সমসাময়িক মীর দরদ ছিলেন সুফি স্বভাবের। প্রেমকে তিনি শারীরিক কামনার উর্দ্ধে নিয়ে গেছেন। অনেক সময় সাধারণ গযলের মতো প্রেমাস্পদের প্রতি নিবেদন হিসেবেও তাঁকে দেখা যায়। এছাড়া মীর হাসান সে সময় মাছনভিকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেছেন। তাঁর লিখিত মাছনভি *সেহরুল বয়ান* [১৭৮৫ খ্রি.] উর্দু সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। কেননা, ভাষার ছন্দময়তা, সহজ-সরলতা, কাহিনি ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে মাছনভিটি এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। এই মাছনভি সম্পর্কে গর্ব করে তিনি নিজেই বলেছেন,

نہیں مثنوی ، ہے یہ اک پھلجھڑی * مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی
نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں * نہیں مثنوی، ہےیہ سحرالبیاں
رہےگا جہاں میں مرا اس سے نام * کہ ہے یادگار جہاں یہ کلام
جو مصنف سنیں گے، کہیں گے سبھی * نہ ایسی ہوئ ہے، نہ ہوگی کبھی [15]

মূলত তাঁদের হাত ধরে উর্দু কবিতাচর্চার যে যুগের সূচনা হয়েছিল, তাকে উর্দু কবিতার ‘স্বর্ণযুগ’ বলা হয়। কেননা, এ সময়ে উর্দু পদ্যের সর্বাধিক উন্নতি হয়েছে। কবিতার সকল শাখা এ যুগেই ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে। উর্দু সাহিত্যে মীর হাসানের মাছনভি, সাওদার কাছিদা, মীর ও দরদের গযলের কোনো তুলনা নেই। পরবর্তী সময়ের উর্দু কবিগণ তাঁদেরকে মনে-প্রাণে অনুসরণ করেছেন। তাঁদের পূর্বে উর্দু কবিতা বাক্যালংকার ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দে ভারাক্রান্ত ছিল। এই সমস্ত কবি উর্দু কবিতাকে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর থেকে তুলে এনে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। দিল্লির অন্যান্য কবিদের মধ্যে নাজী [মৃ. ১৭৪৭ খ্রি.], আবরু [মৃ. ১৭৩৩ খ্রি.], মাযমুন [মৃ. ১৭৪৫ খ্রি.], শাহ হাতেম [১৬৯৯-১৭৮৩ খ্রি.], মাযহার [১৬৯৯-১৭৮১ খ্রি.], ফায়েয দেহলভী [১৬৯০-১৭৩১ খ্রি.], আনযাম [১৭৪৬ খ্রি.], রাসেখ [১৭৫৮-১৮২৩ খ্রি.] প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৬]এ সময় দিল্লিতে কবিতার পাশাপাশি উর্দু গদ্যেরও চর্চা আরম্ভ হয়। তবে এখানে গদ্যসাহিত্যের যে প্রাথমিক নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, তা ছিল মূলত দক্ষিণ ভারতের ন্যায় কেচ্ছা-কাহিনি, ধর্মীয় ভাবধারা এবং ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত কিছু গ্রন্থ। উত্তর ভারতের প্রথম গদ্যনিদর্শন হলো মৌলানা ফজলী’র *দহ মজলিস* [১৭৩৫ খ্রি.]। গ্রন্থটি ফারসি কবি মোল্লা হোসাইন ওয়ায়েজ কাশেফী’র *রওজাতুশ শুহাদা* নামক গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।[১৭] এছাড়া সওদা’র কুল্লিয়াতের ভূমিকা, *মাছনভি গুলা-এ ইশক্*-এর সারাংশ; শাহ আব্দুল কাদেরের [১৭৫৭-১৮২০ খ্রি.] *তরজমাতুল কোরআন* [১৭৯৫ খ্রি.], মীর আতা হোসাইন

তাহসীনের *নও তরয-এ মুরাচ্ছা* [১৭৮৯ খ্রি.], মহর চান্দের *নও আইন হিন্দি* [১৭৯৪ খ্রি.], সৈয়দ হায়দার বখশ হায়দারীর *কেচ্ছা-এ মহর ওয়া মাহ* প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রাথমিক যুগের উল্লেখযোগ্য নমুনা।[১৮] *নও তরয-এ মুরাচ্ছা* হলো এ যুগের সর্বাধিক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তবে গ্রন্থটি আমির খসরুর ফারসি ভাষায় লিখিত *কেচ্ছা-এ চাহার দরবেশ* থেকে অনুদিত, ধর্মীয় কাহিনি ও উপদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অত্যন্ত আলংকারিক ও কঠিন কঠিন আরবি-ফারসি শব্দে সমাদৃত হওয়ার কারণে এর দ্বারা উর্দু গদ্য তেমন ফলপ্রসূ হতে পারেনি।[১৯]

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক হামলায় ক্ষত-বিক্ষত দিল্লির আইন-শৃঙ্খলার নাজুক পরিস্থিতির কারণে মীর দরদ ও মাযহার ছাড়া এখানকার প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিক জীবন বাঁচানোর তাগিদে আওধের বাদশাহ নবাব আসাফউদ্দৌলার [১৭৪৮-১৭৯৭ খ্রি.] শাসন আমলে লক্ষ্ণৌ চলে যান। সে সময় দিল্লি এবং লক্ষ্ণৌ সমাজের কৃষ্টি-কালচার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। যার প্রভাব উভয় এলাকার সাহিত্যে সমানভাবে ফুঁটে উঠেছে। দিল্লির কবিতায় যে সংযম ও প্রেমের বর্ণনায় পবিত্রতা লক্ষণীয়, সেখানে লক্ষ্ণৌর অধিকাংশ স্থানীয় কবিদের রচনায় তা অনুপস্থিত। কেননা, সে সময় লক্ষ্ণৌ সমাজে ধর্ম ও ফুর্তি উভয়েরই আধিক্য ছিল বেশি। এখানে উচুঁ সমাজে নর্তকীদের নিয়ে চলতো আরাম-আয়েশ ও আমোদ-ফুর্তির লীলাখেলা। ফলে লক্ষ্ণৌর কবিতায় বিরহের চেয়ে মিলনের সুরই বেশি প্রবাহিত। আর সুরুচির জন্য দিল্লিকেন্দ্রিক উর্দু কবিতার যে খ্যাতি ছিল, অশ্লীলতা ও অসংযমীতার কারণে তাতে কিছুটা দাগ লাগে মাছহাফি [১৭৪৮-১৮২৪ খ্রি.], জুরুরত [১৭৪৯-১৮০৯ খ্রি.], ইনশা [১৭৫২-১৮১৭ খি.], রঙিন [১৭৫৮-১৮৩৪ খ্রি.], নাসেখ [১৭৭১-১৮৩৮ খি.], আতিশ [১৭৭৮-১৮৪৭ খ্রি.] প্রমুখ লক্ষ্ণৌর স্থানীয় কবিদের জন্য। তবে একথা সত্যি যে, কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলেও উর্দু ভাষা সংস্কার ও সাহিত্যে নতুন নতুন শব্দ এবং অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখিয়ে এসমস্ত কবিগণ উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।[২০] এছাড়া উর্দু সাহিত্যে লক্ষ্ণৌর সবচেয়ে বড় অবদান হলো কারবালার করুণ ঘটনা স্মরণে 'মারছিয়া' কবিতা সৃষ্টি। মীর খালিক, মীর দাহিক, মীর যমীরসহ মারছিয়ার সর্বাধিক সফল দুই কবি আনিস [১৮০২-১৮৭৪খ্রি.] ও দাবির [১৮০৩-১৮৭৫খ্রি.] হলো এখানকারই। তাঁদের বদৌলতেই উর্দু মারছিয়া জনপ্রিয় সাহিত্যের মর্যাদা অর্জন করে। যদিও তাঁদের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের পথিকৃৎ কবি কুলি কুতুব শাহের কাব্যে মারছিয়ার সরব উপস্থিতি ছিল, কিন্তু তখন সাহিত্য হিসেবে তা তেমন গুরুত্ব পায়নি। পরবর্তীতে এই দুই মনীষীর কোমল ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। কেননা, তাঁদের মারছিয়া শুধুমাত্র একটি শোকগাঁথা নয়, এরমধ্যে রয়েছে দুঃখ, মহত্ত্ব, শৌর্য, সাহস, নাটকীয়তা, প্রকৃতির প্রশংসা, বাগ্মিতাসহ মহাকাব্যের সকল বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা।[২১] এছাড়া দয়া শংকর নাসীম [১৮১১-১৮৪৩ খ্রি.]-এর *মাছনভি গুলযার-এ নাসীম* হলো লক্ষ্ণৌ স্কুলের অমর সৃষ্টি। মাছনভি কবিতার উন্নতিতে এই মাছনভির অভূতপূর্ব গুরুত্ব রয়েছে।[২২]

আঠারো শতকের দিল্লি ও লক্ষ্ণৌ স্কুলকেন্দ্রিক উর্দু সাহিত্যের এই সুপ্রতিষ্ঠিত দুইধারার বাইরে গিয়ে সাধারণ জনগণের কবি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন নাজির আকবরাবাদি [১৭৪০-১৮৩০ খ্রি.]। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বভাবের মানুষ। তাই কোনো ধরাবাধা নিয়ম ও রাজ-অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী না থেকে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নির্বাচন করেছেন কবিতার ভাষা, ভঙ্গি এবং বিষয়বস্তু। এজন্য তাঁর রচনা ছিল বর্ণনামূলক। একারণে গযলের সংকীর্ণ পরিসর ও প্রচলিত সাহিত্যধারায় না থেকে তিনি 'নযম'কে তাঁর কবিতার বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে উর্দু নযমের জনক বলা হয়।[২৩] তিনি সেই আমলের একমাত্র ভারতীয় কবি, যিনি ইউরোপীয় কবিতার ভাব-ভঙ্গিমার কাছাকাছি পৌছাতে পেরেছিলেন। আধুনিক যুগের সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁকে সময়ের আগে জন্মানো 'মার্কসবাদী' বলে প্রশংসা করেছেন। কাব্যরস নিয়ে তিনি কখনও বিশেষ মাথা ঘামাননি। বরং সাধারণ মানুষদের বাস্তব জীবনে যে সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, সে সব বিষয় নিয়েই তিনি লেখালেখি করতেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর কবিতা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়।[২৪] যেমন তিনি 'মুফলিসি' নযম কবিতাটিতে সমাজের দারিদ্রতা নিয়ে নিজের ভাবনা এভাবেই উপস্থাপন করেছেন,

جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی * کس کس طرح سے؟اس کو ستاتی ہے مفلسی

پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی * بھوکا، تمام رات سلاتی ہے مفلسی

یہ دکھ وہ جانے، جس پہ کہ آتی ہے مفلسی[25]

সমসাময়িককালে উর্দু গদ্যের উন্নতিতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তৎকালীন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী [১৭৬০-১৮৪২ খ্রি.] ইংরেজ অফিসারদের স্বদেশি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদেরকে শাসনকার্য পরিচালনা করার যোগ্য করে তোলা, বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং হিন্দুস্থানে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ [১৮০০ খ্রি.] প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬]প্রত্যক্ষভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণীত হলেও পরোক্ষভাবে এর দ্বারা উর্দু ভাষা ও গদ্যসাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সত্যিকারার্থে উর্দু গদ্যের বর্তমান রূপরেখা এ কলেজেরই অবদান।[২৭] এই কলেজের প্রচেষ্টায় উর্দু ভাষা থেকে আরবি-ফারসি ভাষার কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ বাদ দিয়ে সহজ-সরল উর্দু শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়। শুধু তাই নয়, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, আত্মজীবনী, অভিধান, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, কাহিনি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সহজ-সরল ও সর্বজনবোধ্য উর্দু ভাষায় গ্রন্থ রচিত হতে থাকে।[২৮] এছাড়া কলেজের অনুবাদ শাখায় হিন্দু-মুসলিম শিক্ষক ও পণ্ডিতদের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার উপদেশ ও কাহিনিমূলক গ্রন্থসমূহ সহজ-সরল উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হতো।[২৯] আর এসব গ্রন্থ রচনার কাজে দেশি-বিদেশি প্রায় শতাধিক লেখক জড়িত ছিলেন। দেশীয় লেখকদের মধ্যে মীর আম্মান দেহলভী [১৭৩২-১৮০৩ খ্রি.], হায়দার বখশ হায়দারী [১৭৬৮-১৮২২ খি.], মীর শের আলী আফসোস [১৭৩৫-১৮২২ খ্রি.], মীর বাহাদুর আলী হোসাইনী, কাযেম আলী জোয়ান, নেহাল চান্দ লাহোরী, মৌলভী আমানতুল্লাহ, শ্রী লাল্লুলালজী প্রমুখ সাহিত্যিকগণ আর বিদেশিদের মধ্যে জন গীলক্রীষ্ট [১৭৫৯-১৮৪১ খ্রি.], টমাস রোবাক, ক্যাপ্টেন টেলর, ডাক্তার হান্টার, গার্সন ডিতাসী, ডব্লিউ বার্টিন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এ কলেজের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লেখক হলেন মীর আম্মান দেহলভী। তাঁর লিখিত *বাগ ওয়া বাহার* [১৮০২ খ্রি.] গ্রন্থটি উর্দু সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। ঐ যুগে এমন কোনো গ্রন্থ ছিল না, যা এরসাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।[৩০] এ গ্রন্থ সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খান বলেছেন,

جو مرتبہ میر تقی میر کو نظم میں حاصل ہے وہی میر امن کو نثر میں ہے۔[31]

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর উর্দু গদ্য একটা সুনির্দিষ্ট ধারা লাভ করে এবং চারিদিকে তার চর্চা আরম্ভ হয়। এমনকি দিল্লি ও লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটে। লক্ষ্ণৌর গদ্য লেখকগণ কলেজের সাথে পাল্লা দিয়ে গদ্যচর্চা আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু পুরাতন অভ্যাস ছন্দময় ও আরবি-ফারসির কঠিন কঠিন শব্দের বহুল ব্যবহার, পায়েলার ঝংকার ইত্যাদি ছাড়তে পারেননি। এখানকার গদ্য লেখকদের তালিকা বেশ সুদীর্ঘ। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী গদ্যশিল্পী হলেন রজব আলী বেগ সরওয়ার [১৭৮৭-১৮৬৭ খ্রি.]। তাঁর লিখিত *ফাসানা-এ আজায়েব* সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য নিদর্শন। মীর আম্মানের *বাগ ও বাহারের* জনপ্রিয়তা দেখে তিনি ১৮২৪ সালে এ গ্রন্থ রচনা করে উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নিজেও সাহিত্যজগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।[৩২] তবে দিল্লির লেখকগণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহজ-সরলতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে সফল প্রয়াস চালিয়েছেন। এ কাজে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন উর্দু সাহিত্যের সর্বকালের সেরা কবি মির্যা গালিব [১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.]।[৩৩] পদ্য ও গদ্য উভয় অঙ্গনে তাঁর স্থান অনন্য উচ্চতায়। কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ভাষার সীমাকে অতিক্রম করেছে। আর আধুনিক উর্দু গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। সহজ-সরল ভাষায় পত্র লেখার মাধ্যমে তিনি আধুনিক উর্দু গদ্যের সূত্রপাত করেন।[৩৪] *অওদ-এ হিন্দি* [১৮৬৮ খ্রি.], *উর্দু-এ মুয়াল্লা* [১৮৬৯ খ্রি.] এবং *মাকাতীব-এ গালিব* হলো তাঁর পত্রসংকলন।[৩৫]

বলা বাহুল্য যে, বিশেষ প্রেক্ষাপটে দিল্লির অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকগণের দেশান্তরী হওয়ার কারণে আঠারো শতকে সাময়িককালের জন্য দিল্লিতে সাহিত্যচর্চা কিছুটা স্থমিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সকল মন্দা কাটিয়ে উনিশ শতকে মির্যা গালিবের মতো এখানে বহু প্রতিভাবান তরুণ কবির জন্ম হয়। যাঁদের মধ্যে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সভাকবি যওক [১৭৮৮-১৮৫৪ খ্রি.], মোমিন [১৮০০-১৮৫২ খ্রি.] ও বাহাদুর শাহ জাফর [১৭৭৫-১৮৬২ খ্রি.]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোমিন রোমান্টিক কবিতাকে খুবই উচ্চমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর একটি পংক্তির জন্য গালিব তাঁর পুরো কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।[৩৬]পংক্তিটি হলো,

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا * جب کوئ دوسرا نہیں ہوتا[৩৭]

অতঃপর উর্দু সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসেন মির্যা গালিব ও আল্লামা ইকবালের মধ্যবর্তী প্রজন্মের স্বনামধন্য কবি আমির মিনাই [১৮২৮-১৯০০ খ্রি.] ও নবাব মির্যা খান দাগ [১৮৩১-১৯০৫ খ্রি.]। তাঁরা উভয়েই মোগল শাসন এবং বৃটিশ শাসনের সন্ধিকালের কবি ছিলেন। ফলে পূর্ববর্তী কবিদের চেয়ে তাঁদের রচনা একটু আলাদা ধরনের। আমির মিনাই পদ্য রচনার পাশাপাশি গদ্যও রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি উর্দু অভিধান সংকলনের কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'খণ্ড প্রকাশের পর তা শেষ করতে পারেননি। আর দাগ শুধু নিজেই কবি ছিলেন না, অন্যান্য কবিদের গযলও সংশোধন করে দিতেন। আল্লামা ইকবাল [১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.], জিগর মোরাদাবাদি'র [১৮৯০-১৯৫৮ খ্রি.] মতো বিখ্যাত কবিগণও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। দাগ যদিও মোগল সাম্রাজ্যের পতন [১৮৫৭ খ্রি.] এবং সিপাহী বিদ্রোহের করুণ পরিণতি স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন, তথাপি তাঁর কবিতায় কোনো ধরনের হতাশা বা দুঃখ-কষ্টের স্থান নেই। তিনি ছিলেন স্বঘোষিত রোমান্টিক ভাবধারার কবি।[৩৮]

যাইহোক, সিপাহী বিদ্রোহের [১৮৫৭ খ্রি.] করুণ পরিণতিত্তোর মোগল শাসনের অবসান এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার কারণে ক্রমান্বয়ে আলঙ্কারিক ও ছন্দময় উর্দু শের-শায়েরির স্বর্ণালী যুগের অবসান ঘটতে থাকে এবং শুরু হয় আধুনিক ভাবধারা ও সহজ-সরল ভাষায় মানবজীবন এবং সমাজকেন্দ্রিক উর্দু গদ্যচর্চা। সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পূর্ব থেকেই কাব্যচর্চার পাশাপাশি কাঠিণ্যতা, প্রেম-প্রীতি, কল্পকাহিনি ও ধর্মীয় ভাবধারায় কিছুকিছু উর্দু গদ্যচর্চা শুরু হয়েছিল। গদ্যের সেই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে ১৮৫০ সালের পর সর্বপ্রথম মির্যা গালিব পত্র লিখনের মাধ্যমে আধুনিক ভাবধারায় উর্দু গদ্যচর্চার শুভ সূচনা করেন। পরবর্তীতে সেই ধারাকে পরিপূর্ণ রূপ দেন আধুনিক উর্দু সাহিত্যের জনক ও শিক্ষা-সমাজ সংস্কারমূলক আলীগড় আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান [১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.] এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা ডেপুটী নযীর আহমদ [১৮৩১-১৯১২ খ্রি.], মুহাম্মাদ হোসাইন আযাদ [১৮৩০-১৯১০ খ্রি.], আলতাফ হোসাইন হালী [১৮৩৭-১৯১৪ খ্রি.] ও শিবলী নো'মানী [১৮৫৭-১৯১৪ খ্রি.] প্রমুখ। তাঁদেরকে আধুনিক উর্দু সাহিত্যের "পঞ্চ স্তম্ভ" বলা হয়। তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব প্রতিভা ও স্বকীয়তার মাধ্যমে উর্দু গদ্যসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে উন্নতির চরমপর্যায়ে উপনীত করেন। মূলত তাঁদের নেতৃত্বে সাহিত্যের যে যুগ শুরু হয়, তাকে উর্দু সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলা হয়।[৩৯] তাঁদের পূর্বে উর্দু সাহিত্য একধরনের কল্পকাহিনি, ছন্দময় কাব্য ও রক্ষণশীলতার চাদরে আবৃত ছিল। স্যার সৈয়দ ও তাঁর সহচরগণ উর্দু সাহিত্যকে সেই কল্পকাহিনি, ছন্দময় কাব্য ও রক্ষণশীল পর্দার অন্তরাল থেকে আলোর পথে আনার সফল প্রয়াস চালান। ফলে তাঁদের হাত ধরে উর্দু সাহিত্য চিত্তাকর্ষক, সর্বজনবোধ্য ও সহজ-সরল হতে থাকে। শুধু তাই নয় উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, সমালোচনা সাহিত্য, পত্র সাহিত্য, পত্রিকা সাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, ইতিহাস সাহিত্য, রম্য সাহিত্য প্রভৃতিতে তাঁরা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্ম, রাজনীতি ভূগোল, অংক, ইতিহাস, সমাজ, নৈতিকতা, বিজ্ঞান, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব সর্বোপরি গদ্য-পদ্যের এমন কোনো বিষয় ছিল না যার ওপর তাঁরা গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন জাতিকে রক্ষা করতে হলে তাদেরকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের সাহায্য করতে পারে। তাঁদের এই ভাবনার মূলে ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিভিত্তিক আন্দোলন। এই আন্দোলনকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রথমে স্যার সৈয়দ আহমদ খান *তাহযীবুল আখলাক্ব* [১৮৭০ খ্রি.] পত্রিকা প্রকাশসহ 'সায়েন্টিফিক সোসাইটি' [১৮৬৪ খ্রি.], 'আলীগড় কলেজ' [১৮৭৭ খ্রি.]-সহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাশাপাশি প্রাচীন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে আধুনিক যুগোপযোগী সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়। এককথায় এই নবজাগরণের ফলে উর্দু ভাষা ও সাহিত্য প্রেম-প্রীতি, কল্পকাহিনি ও ছন্দময় কাব্যচেতনার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে সৃজনশীল সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। আর এভাবেই মূলত উর্দু সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত।[৪০] মুহাম্মদ হোসাইন আযাদের *আব-এ হায়াত* [১৮৮০ খ্রি.] গ্রন্থটি যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যাতে আধুনিক পদ্ধতিতে উর্দু সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচনার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।[৪১] উর্দু ভাষায় আধুনিক কাব্য-সমালোচনার আর এক পথিকৃৎ সাহিত্যিক হলেন আলতাফ হোসাইন হালী। *মুক্বাদ্দামা-এ শের-ও-শায়েরী* [১৮৯৩ খ্রি.] এই বিষয়ে তাঁর অনন্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও সহজ-সরল উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম কবিতার সকল অংশের ওপর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন।[৪২] তবে সৃজনশীল সমালোচনায় সর্বাধিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন আল্লামা শিবলী নো'মানী। আযাদ, হালি ও শিবলী কাব্য-সমালোচনায় যে সমাজসচেতনতা এবং ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, উর্দু সাহিত্যে তা অতুলনীয়। সমসাময়িককালের আকবর ইলাহাবাদি [১৮৪৬-১৯২১ খ্রি.] স্যার

সৈয়দ আহমদ খানের আলীগড় আন্দোলনের সাথে সহমত পোষণ না করলেও জাতীয়তাবাদী কবি হিসেবে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন গান্ধীজি'র অন্ধ ভক্ত। তাই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পক্ষে তাঁর প্রচুর কবিতা রয়েছে।[৪৩]

উর্দু উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেন আলীগড় আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক ডেপুটী নযীর আহমদ। তাঁর লিখিত *মিরাতুল উরুস* [১৮৬৯ খ্রি.] উর্দু সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। গল্পের মাধ্যমে তিনি সমাজ ও জাতির সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পূর্বে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কেউ উপন্যাস রচনা করেননি। এজন্য তাকে উর্দু প্রথম ঔপন্যাসিক বলা হয়।[৪৪] কথাসাহিত্যিক হিসেবে নযীর আহমদের পরই পণ্ডিত রতননাথ সরশার [১৮৪৬-১৯০৩ খ্রি.] ছিলেন অন্যতম। তাঁর লিখিত *ফাসানা-এ আযাদ* [১৮৮১-১৮৮৩ খ্রি.] উপন্যাসটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। উর্দু উপন্যাস জগতে এক ঐতিহাসিক নাম হলো মির্যা মুহম্মদ হাদি রুসওয়া [১৮৫৭-১৯৩১ খ্রি.]। লক্ষ্মৌর সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক বাইজির জীবনকাহিনি অবলম্বনে তাঁর লিখিত *উমরাও জান আদা* [১৮৯৯ খ্রি.] উপন্যাসটি আধুনিক যুগের এক ধ্রুপদী সৃষ্টি। যার জনপ্রিয়তা আজও চির অম্লান। বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া জনপ্রিয়তার কারণে এর কাহিনি অবলম্বনে সিনেমাও তৈরী হয়েছে।[৪৫] উর্দু-হিন্দি ছোটগল্পাকার হিসেবে মুনশি প্রেমচাঁদ [১৮৮০-১৯৩৬ খ্রি.] বেশ পরিচিত হলেও উপন্যাস রচনায়ও ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন, যারমধ্যে *বাযার-এ হুসন* [১৯২৪ খ্রি.] অন্যতম। আব্দুল হালিম শরর [১৮৬২-১৯২৬ খ্রি.] লক্ষ্মৌ শহরের এক মনোরম ইতিহাস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, ঔপন্যাসিক হিসেবেও সফল। কিন্তু তৎকালীন সময়ে জনপ্রিয়তায় সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন রাশেদুল খায়েরী [১৮৬৮-১৯৩৬ খ্রি.]। নারী ও শিশু চরিত্র অঙ্কনে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।[৪৬] এছাড়া উর্দু নাট্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হলো আহসান লক্ষ্মৌভি [১৮৫৯-১৯৩০ খ্রি.], আগা হাশর কাশ্মীরি [১৮৭৯-১৯৩৫ খ্রি.], ইমতিয়াজ আলী তাজ [১৯০০-১৯৭০ খ্রি.] প্রমুখ। তাজের *আনার কলি* [১৯৩২ খ্রি.] নাটক এতো পরিমাণ খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বারবার মঞ্চস্থ করা হয়।[৪৭]

প্রাচীন ও সিপাহী বিদ্রোহত্তোর উর্দু সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন উপমহাদেশীয়দের চিত্তবিনোদনের উপকরণ ছিল মূলত ক্বেচ্ছা-কাহিনি ও অবাস্তব কিছু কল্প-কাহিনির ঘটনাপ্রবাহ। যার কারণে প্রাচীন উর্দু গদ্যসাহিত্যে এসব কল্প-কাহিনির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও সভ্য জাতি হিসেবে ভারতীয়দের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন চাহিদা ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে তাঁদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের সংবাদপত্র ও সমালোচনামূলক সাহিত্য পত্রিকা। চিত্তবিনোদনের জন্য নির্মিত হয় রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার। আর একে কেন্দ্র করে লেখা হয় উপন্যাস ও নাটক। অতঃপর ১৯৩৫ সালের দিকে ভারতবর্ষে প্রগতিশীল আন্দোলন শুরু হলে উর্দু সাহিত্য অন্যদিকে মোড় নেয়। শুরু হয় জীবনের গভীরে পৌঁছে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়সহ জীবনের একেবারে ছোট ছোট ঘটনা নিয়েও সাহিত্য রচনা করা। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই গদ্য সাহিত্যের অতি আধুনিক ও সর্বকনিষ্ঠ শাখা ছোটগল্পে। সাহিত্যের এ আন্দোলনে বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক কার্ল মার্ক্স [১৮১৮-১৮৮৩ খ্রী.]-এর 'সাম্যবাদী আন্দোলন' ও সিগমণ্ড ফ্রয়েডের [১৮৫৬-১৯৩৯ খ্রী.] 'মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলনে'র প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মূলত এ সময় থেকেই ভারতবর্ষের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির চর্চা আরম্ভ হয়। ফলে অধুনা সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে সাথে জীবন ও সমাজের নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে নব উদ্যমে সাহিত্যচর্চা করতে থাকেন। এমনকি মনস্তত্ত্বমূলক বিষয়ের মতো স্পর্শকাতর ব্যাপারগুলোও তাঁদের সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। যার কারণে উর্দু গদ্য সাহিত্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিত্তাকর্ষক বিষয়াবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। যা ইতঃপূর্বে উপমহাদেশীয়দের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চার মূল বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় জনসাধারণদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম, জাতীয় চেতনাবোধ ও স্বাধীনতার স্বপ্ন সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশিদের গোলামী ও জমিদারশ্রেণির শোষণনীতির বিরুদ্ধে তাঁদেরকে সচেতন করে তোলা। এ ছাড়া এ সমস্ত সাহিত্যিকদের লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলন আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে ভারতীয়দের জীবনসংগ্রাম, নিত্যনৈমিত্তিক কার্যক্রম ও প্রয়োজনে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে থাকে এবং আভিজাত্যের অবক্ষয় ও জীবনদর্শনের জটিলতা নিরসনে মানুষের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যতা ও ব্যস্ততা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে পেছনে পড়ে থাকা ভারতীয় জনগণ বিশেষকরে ধ্বংসপ্রায় মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আত্ম সচেতন হয়ে ওঠে।[৪৮] অতঃপর উর্দু ছোটগল্পের পথিকৃৎ মুনশি প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে ১৯৩৬ সালে সর্বপ্রথম প্রগতি লেখক সংঘের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের ফলে পরবর্তী সময়ের কবি-সাহিত্যিকগণ ব্যাপক প্রভাবিত হোন। সে সমস্ত প্রগতি লেখকদের মধ্যে সা'দাত হাসান মান্টো

[১৯১২-১৯৫৫ খ্রি.], কৃষণ চন্দর [১৯১২-১৯৭৭ খ্রি.], রাজিন্দর সিংহ বেদী [১৯১৫-১৯৮৪ খ্রি.], ইসমত চুগতাঈ [১৯১৫-১৯৯১ খ্রি.], আজিম বেগ চুগতাঈ [১৮৯৫-১৯৪১ খ্রি.], উপিন্দরনাথ অশ্‌ক [১৯১০-১৯৯৬ খ্রি.], খাজা আহমদ আব্বাস [১৯১৪-১৯৮৭ খ্রি.], আহমদ নাদিম কাসেমী [১৯১৬-২০০৬ খ্রি.], কুররাতুল আইন হায়দার [১৯২৬-২০০৭ খ্রি.], সাজ্জাদ জহির [১৯০৫-১৯৭৩ খ্রি.], খাদিজা মসতুর [১৯২৭-১৯৮২ খ্রি.], রশিদ জাহান [১৯০৫-১৯৫২ খ্রি.], মমতাজ শিরিন [১৯২৪-১৯৭৩ খ্রি.], জামিলা হাশমী [১৯২৯-১৯৮৮ খ্রি.], সোহাইল আযীম আবাদী [১৯১১-১৯৭৯ খ্রি.], এম আসলাম, নাসীম হেজাযী, হায়াতুল্লাহ আনসারী, আখতার আনছারী, আযীয আহমদ, গোলাম আব্বাস প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁদের গল্পসমূহ বেশ সুনামের সাথে অনুবাদ করা হয়েছে। তৎকালীন সমাজে চলমান নানা ধরনের অনিয়ম, অন্যায়-অনাচার, দেশ-ভাগ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তাঁরা সাহসের সঙ্গে কলম ধরেছেন। এমনকি গল্পের প্রয়োজনে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যৌনতা ও মনস্তাত্ত্বিকের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় নিয়েও গল্প লিখেছেন। গল্পে অশ্লীলতার অভিযোগে অনেকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাও হয়েছিল। কিন্তু এটাই বাস্তবতা যে, তাঁদের গল্পে অশ্লীলতা থাকলেও তা উন্নত শিল্পে পরিণত হয়েছিল।

এসময় কথাসাহিত্যনির্ভর গদ্যের পাশাপাশি উর্দু নযম কবিতার দৌরাত্ম্যও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। আর একাজে সর্বাধিক চিন্তাশীলতা ও সমাজসচেতনার পরিচয় দিয়েছেন মহাকবি আল্লামা ইকবাল [১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রি.]। তিনি গযলের সীমাবদ্ধ পরিসর ছেড়ে নযম কবিতা লিখতে বেশি পছন্দ করতেন। কেননা, তিনিই একমাত্র উর্দু কবি, যার রচনার বিষয় বৈচিত্র্যে ছিল বহুমাত্রিকতা। দেশপ্রেম, নবী প্রেম, মানব প্রেম, ধর্ম, রাজনীতি, ইসলাম প্রেম, একাত্মবাদ, সুফিবাদ, মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধসহ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর তিনি তাঁর ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর আগমনে উর্দু পদ্যসাহিত্যে নব অধ্যায়ের সূচনা হয়।[৪৯] তাঁর সমসাময়িক ব্রজনারায়ণ চকবস্ত [১৮৮২-১৯২৬ খ্রি.], তিলকচাঁদ মহরুম [১৮৮৭-১৯৬৬ খ্রি.] এবং জোশ মালিহাবাদী [১৮৯৮-১৯৮২ খ্রি.] খুব উচুঁ মানের নযম কবি ছিলেন। বিশেষকরে চকবস্তের কবিতা প্রখর দেশপ্রেম ও মানবতাবোধে ভরপুর। ইকবালের মতো তিনিও নযমের প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন। আর তিলকচাঁদ হিন্দু হলেও বড় হয়েছেন পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলিম পরিবেশে। দেশ ভাগের পর সাম্প্রদায়িক হিংসার কারণে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। দেশান্তরির জন্য সারাজীবন তিনি একধরনের মন-বেদনা নিয়ে কাটিয়েছেন। আর এই মন-বেদনার কারণে তাঁর কবিতায় একইসাথে ব্যাপকভাবে দেশপ্রেম ও বিষাদের সুর প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কবিতার মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতির আহবান জানিয়েছেন।[৫০] আর জোশ মালিহাবাদী ছিলেন ইকবালের মতোই উচ্চকণ্ঠী। তাঁকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ভাষা ও ব্যাকরণে তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন বলে তাঁকে উর্দুর বাদশাও বলা হয়ে থাকে। তিনি নযম ও গযল দু'ধরনেরই কবিতা লিখেছেন। সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী হলেও তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে রয়েছে বৈচিত্র্যতা। যেখানে প্রেম ও প্রতিবাদ একইসাথে লক্ষ্য করা যায়। তিনি মালিহাবাদের বাসিন্দা ছিলেন, কিন্তু দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান চলে যান। তবে এই দেশান্তরি তাঁকে কখনও স্বস্তি দিতে পারেনি। জন্মভূমির স্মৃতি তাঁকে শেষ জীবন পর্যন্ত অনুশোচনা ও কষ্ট দিয়েছে।[৫১] এছাড়া সে সময় কবি হিসেবে হাফিজ জলন্ধরি [১৯০০-১৯৮২ খ্রি.] ও সিমাব [১৮৮০-১৯৫১ খ্রি.] যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁরা দু'জনেই নযম কবিতা লিখেছেন। যাতে প্রকৃতির বর্ণনা, জাতীয়তাবাদী আবেগ, ইসলামের গৌরবগাঁথা ইত্যাদি বিদ্যমান।

সিপাহী বিদ্রোহের পর নযম কবিতার দৌরাত্ম্য ও চর্চা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হচ্ছিল যে, বোধহয় উর্দু গযলের সৃষ্টি আর সম্ভব নয়। কিন্তু হাসরত মোহানি [১৮৮১-১৯৫১ খ্রি.], জিগর মোরাদাবাদি [১৮৯০-১৯৫৮ খ্রি.], ফিরাক গৌরখপুরী [১৮৯৬-১৯৮২ খ্রি.], ফানি বদায়ুনি [১৮৭৯-১৯৪১ খ্রি.], মির্যা ইয়াগানা [১৮৮৩-১৯৫৬ খ্রি.], আসগর গোণ্ডবি [১৮৮৪-১৯৩৬ খ্রি.] প্রমুখ প্রতিভাবান সাহিত্যিকগণ গযল চর্চা অব্যাহত রেখে শুধুমাত্র উর্দু গযলের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেননি বরং এর অভূতপূর্ব উন্নতি করেছেন। বিশেষকরে উর্দু গযলাঙ্গনে হাসরত মোহানি এমন এক নাম, যাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে 'গযলের যুবরাজ', 'গযলের গুরু' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর বিচরণ ও কর্মকান্ড দেখলে মনে হয়, যেন তাঁর মধ্যে তিনজন আলাদা স্বত্ত্বার বসবাস। কেননা, **তাঁর** প্রথম স্বত্ত্বা ছিল বেশ নিষ্ঠাবান ও দৃঢ় স্বভাবের মৌলানা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর দ্বিতীয় স্বত্ত্বা রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় প্রগতি লেখক-সংঘের অন্যতম উদ্যোক্তা। আর তাঁর তৃতীয় স্বত্ত্বা বিরামহীন প্রেমের গযল লিখে গেছে, যা রাজনীতি ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এধরনের বহুমুখী প্রতিভাবান ও ব্যক্তিত্বসম্পূর্ণ কবি-সাহিত্যিক উর্দু

সাহিত্যে বিরল।[৫২] দেশভাগের নির্মম পরিণাম ও গ্রাম-বাংলার নিদারুণ কষ্টের প্রতিচ্ছবি জিগর মোরাদাবাদিকে ব্যাপক প্রভাবিত করে। ফলে তাঁর লেখায় আস্তে আস্তে বাস্তব সমাজের গভীর ভাবনা ফুঁটে উঠে। ফানি বদায়ুনি ছিলেন একজন দুঃখবাদী কবি। তাঁর গযলসমূহ হতাশা ও নৈরাশ্যতায় ভরপুর। এজন্য তাঁকে ‘সাহেব-এ গম’ বলা হয়। তিনি ছিলেন মূলত মীর তকী মীরের যোগ্য উত্তরসূরী। কেননা, মীর তকী মীরের গযলও দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত। সমসাময়িক মির্যা ইয়াগানা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ উল্টো চরিত্রের। কেননা, তিনি ছিলেন আশাবাদী মানুষ। নৈরাশ্যবাদ কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। যার প্রতিচ্ছবি কবিতায় ফুঁটে উঠেছে। উর্দু সুফি কবিতার সর্বশেষ প্রতিনিধি আসগর গোণ্ডবিকে মনে করা হয়। কেননা, তাঁর কাব্য সুফি-দর্শনে ভরপুর। এসমস্ত কবিগণ উর্দু গযলকে অন্তিম দশা থেকে পুনরুদ্ধার করে তার অতীত ঐশ্বর্যে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীতে উর্দু সাহিত্যে এমন একদল প্রগতিবাদী কবির আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা উর্দু গযলের সমৃদ্ধিতে আরও একমাত্রা যোগ করেন। এসমস্ত প্রগতিপন্থী কবিদের মধ্যে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের [১৯১১-১৯৮৪ খ্রি.] নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কবিতায় তার কোনো খারাপ প্রভাব পড়তে দেননি। গযল ও নযম উভয় ধরনের কবিতায় তাঁর সমান বিচরণ ছিল। তিনি যে সমস্ত রাজনৈতিক কবিতা লিখেছেন, সেগুলোও গযলের মাধুর্যে ভরপুর ছিল। বলতে গেলে আপন ধ্যান-ধারণায় নতুনত্ব এনে তিনি গযলকে নিজের বিষয়ের উপযোগী করে নিয়েছিলেন। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে গযলের মধ্যে এক নতুন ধারা তৈরী হয়।[৫৩] এছাড়া আধুনিক যুগের আরও বেশকিছু কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন, যাঁরা প্রচলিত রোমান্টিক কবিতার দিকে না হেঁটে মানবতাবাদ, বিশ্বশান্তি, সমাজের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষায় কবিতা লিখেছেন। গল্প-কাহিনি লেখনির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের এরূপ দরদি মনোভাব পোষণের জন্য তাঁরা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার মার্কসবাদী আদর্শেও বিশ্বাসী ছিলেন। এসমস্ত কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে মাখদুম মহিউদ্দিন [১৯০৮-১৯৬৯ খ্রি.], আলী সর্দার জাফরি [১৯১২-২০০০ খ্রি.], কইফি আজমি [১৯১৮-২০০২ খ্রি.], মাজাজ [১৯০৯-১৯৫৫ খ্রি.], জান নিসার আখতার [১৯১৪-১৯৭৬ খ্রি.], আখতার-উল-ইমান [১৯১৫-১৯৯৫], মজরুহ সুলতানপুরী [১৯২০-২০০০ খ্রি.], সাহির লুধিয়ানভী [১৯২১-১৯৮০ খ্রি.], শাকিল বদায়ুনি [১৯১৬-১৯৭০ খ্রি.], রাহি মাসুম রাজা [১৯৭-১৯৯২ খ্রি.], রাজা মেহদি আলী খান [১৯২৮-১৯৬৬ খ্রি.] প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, উর্দু সাহিত্য পৃথিবীর আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম। সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে এ ভাষার জন্ম হলেও বর্তমানে এর মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের সকল শাখা ও উপাদান স্বমহিমায় বিদ্যামান। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে উর্দু সাহিত্য ধর্মীয় নীতিকথা, কাঠিণ্যতা, কল্পকাহিনি ও ছন্দময় কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে কথাটি উর্দু সাহিত্যের জন্য মোটেও প্রযোজ্য নয়। কেননা, আধুনিক যুগের উর্দু সাহিত্য বাস্তবজীবন ও সমাজের পরিভাষা হিসেবে পরিগণিত। ভাষার সহজ-সরলতা যার প্রাণশক্তি। মীর, দরদ, গালিব, মোমিন, স্যার সৈয়দ, হালী, শিবলী, আযাদ, ইকবাল, জোশ, ফায়েয, প্রেমচাঁদ, কৃষণ চন্দ্র, মান্টু, ইসমত চুগতাঈ এর মতো একঝাঁক পৃথিবী বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের কোমল ছোঁয়ায় আধুনিক উর্দু পদ্য ও গদ্যের সকল শাখা সুশোভিত হয়েছে। যাইহোক, এই স্বল্প পরিসরে উর্দু সাহিত্যের বৃহৎ পরিমণ্ডলের পরিপূর্ণ পরিচয় ফুঁটে তোলা খুবই কঠিন। হয়তোবা প্রয়োজনীয় অনেক কবি-সাহিত্যিক এবং উর্দু সাহিত্যের বিকাশকেন্দ্রীক বিভিন্ন ঘটনার আলোচনা এখানে বাদ পড়েছে, তথাপি এখানে উর্দু সাহিত্যের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় এবং বেশকিছু যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে একটা রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। যা উর্দু সাহিত্যের জ্ঞানপিপাসুদের পিপাসা নিবারণে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আমরা মনে করি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. **বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর নামের তালিকা:** বিম্বিসারীয় বংশ [৫৪৪-৪১৩ খ্রি. পূ.], শৈশুনাগ বংশ [৪৩১-৩৪৫ খ্রি. পূ.], নন্দ বংশ [৩৪৫-৩২৪ খ্রি. পূ.], মৌর্য বংশ [৩২৪-১৮৭ খ্রি. পূ.], শুঙ্গ বংশ [১৮৭-৭৫ খ্রি. পূ.], কাণ্ব বংশ [৭৫-৩০ খ্রি. পূ.], অন্ধ্র বংশ, কুষাণ বংশ, গুপ্ত বংশ [৩২০-৪৯৫ খ্রি.], পাল বংশ [৭৫০-১১২০ খ্রি.], রাষ্ট্রকুট বংশ [৭৫৩-৮৯২ খ্রি.] প্রভৃতি

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্র. ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাসকথা* (কলিকাতাঃ মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৮৫), পৃ. ৯-৩২৪।

২ ড. আবুল লাইছ ছিদ্দীকী, *আদবীয়াত-এ উর্দু* (করাচীঃ উর্দু একাডেমী, সিন্ধ, ১৯৬৩), পৃ. ১০-১১।

৩ নাছীরুদ্দীন হাশেমী, *দকণ মে উর্দু* (নয়ী দেহলীঃ কৃওমী কাউন্সিল বরা-এ ফুরুগ-এ উর্দু যবাঁ, ১৯৮৫), পৃ. ৩৬-৩৭; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত* (করাচীঃ বুকল্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ১৮।

৪. মুহাম্মদ হুসাইন আযাদ, *আব-এ হায়াত* (আলীগড়ঃ এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৭৫), পৃ. ৮৮।

৫ মির্যা মুহাম্মদ আসকরী (অনুবাদক), *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, পদ্যাংশ (লক্ষ্ণৌঃ মাতবা-এ মুনশি তেজকুমার, ১৯৮৬), পৃ. ১৭।

৬ মোল্লা ওয়াজহী (সম্পাদক-নূরুল হাসান হাশেমী), *সব রস* (লক্ষ্ণৌঃ উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ০৯।

৭ মৌলভী আব্দুল হক, *উর্দু কী এবতেদায়ী নশুনুমা মে সূফীয়া-এ কেরাম কা কাম* (নয়ী দেহলীঃ আঞ্জুমান-এ তারাক্কী-এ উর্দু, ১৯৮৮), পৃ. ৪-৪৯।

৮. ড. সৈয়দ এজায হোসাইন, *মুখতাছর তারীখ-এ আদব-এ উর্দু* (দেহলীঃ উর্দু কিতাব ঘর, ১৯৬৪), পৃ. ২০২।

৯ প্রফেসর নূরুল হাসান নকভী, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু* (আলীগড়ঃ এজুকেশনাল বুক হাউস, ২০১১), পৃ. ৭৪-৭৭।

১০. আযীমুল হক জুনাইদী, *উর্দু আদব কী তারীখ* (আলীগড়ঃ এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯০), পৃ. ৬২; প্রফেসর নূরুল হাসান নকভী, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫।

১১. মুহাম্মদ জামীল, *উর্দু শায়েরী কী তারীখ* (আগ্রাঃ জামেআ উর্দু, ১৯৪০), পৃ. ২১।

১২ আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯; প্রফেসর নূরুল হাসান নকভী, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

১৩ আযীমুল হক্ব জুনাইদী, *উর্দু আদব কী তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১।

১৪. মুহাম্মদ জামীল, *উর্দু শায়েরী কী তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

১৫ মীর হাসান দেহলভী, *মাছনভি সেহরুল বয়ান* (আলীগড়ঃ এজুকেশনাল হাউস, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৯-১৬০।

১৬ মির্যা মুহাম্মদ আসকরী (অনুবাদক), *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, পদ্যাংশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৭ *তদেব*, পৃ. ৩।

১৮. ড. ছগীর আফরাহীম, *নছরী দাস্তানুঁ কা সফর* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪), পৃ. ২৬; মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ, *আরবাব-এ নছর* (হায়দারাবাদঃ মাকতাবা-এ ইবরাহীমীয়্যাহ, ১৯৩৭), পৃ. ৫-৬।

১৯ মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ, *আরবাব-এ নছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

২০. প্রফেসর নূরুল হাসান নকভী, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬; আযীমুল হক্ব জুনাইদী, *উর্দু আদব কী তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬।

২১. প্রফেসর হামেদ হাসান কাদেরী, *তারীখ-এ মারছিয়াগুয়ী* (লাহোরঃ উর্দু একাডেমী, ১৯৬৪), পৃ. ১০৪-১০৬।

২২ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরওয়ারি, *উর্দু মাছনভি কা এরতেকা* (আলীগড়ঃ এজুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৭), পৃ. ১২৫।

২৩ প্রফেসর হামেদ হাসান কাদেরী, *তারীখ-এ মারছিয়াগুয়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৫।

২৪. ড. সৈয়দ এজায় হোসাইন, *মুখতছর তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১।

২৫ *ইন্তেখাব-এ মানযুমাত*, প্রথম খণ্ড (লক্ষ্ণৌঃ উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ৬।

২৬ *ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, তীফ-এ নছর* (লাহোরঃ লাহোর একাডেমী, ১৯৬৭), পৃ. ৬৮; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

২৭ মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ, *আরবাব-এ নছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।

২৮. আবেদ আলী আবেদ, *ইনতিক্বাদ* (লাহোরঃ এদারা-এ ফুরুগ-এ উর্দু, ১৯৫৬), পৃ. ১৪০-১৪২; *ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, তীফ-এ নছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

২৯ ড. ছগীর আফরাহীম, *নছরী দাস্তানুঁ কা সফর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৩০. *ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, তীফ-এ নছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; ড. ছগীর আফরাহীম, *নছরী দাস্তানুঁ কা সফর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; হামিদ হাসান কাদেরী, *দাস্তান-এ তারীখ-এ উর্দু* (করাচীঃ উর্দু একাডেমী সিন্ধ, ১৯৬৬), পৃ. ১০১।

৩১. মির্যা মুহাম্মদ আসকরী (অনুবাদক), *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, গদ্যাংশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৩২ আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; ড. সৈয়দ ওয়াকার আজীম, *হামারী দাস্তানী* (নয়ী দেহলীঃ এতেক্বাদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮০), পৃ. ৩৫৯।

৩৩ শেখ মুহাম্মদ একরাম, *গালিব নামা* (বোম্বেঃ তাজ অফিস, তা.বি), পৃ. ৭।

৩৪. ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ, *তীফ-এ নছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৩৫ মুহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবী শাখছীয়্যাতী* (ঢাকা: পাক কিতাব ঘর, ১৯৭০), পৃ. ১৪-১৪২; শেখ মুহাম্মদ একরাম, *গালিব নামা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৩৬ মুহাম্মদ জামীল, *উর্দু শায়েরী কী মুখতাছর তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

৩৭ *ইন্তেখাবে মানযুমাত*, ২য় খণ্ড (লক্ষ্মৌ: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. ২৮।

৩৮ মুহাম্মদ জামীল, *উর্দু শায়েরী কী মুখতাছর তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৯ আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২৩।

৪০. ড. নজীর আহমদ ও ড. এবাদুল্লাহ, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, তা.বি.), পৃ. ৯৩-৯৪; মির্যা মুহাম্মদ আসকরী (অনু.), *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৪০।

৪১. আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৪২ মুহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবী শাখছীয়্যাতী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৪২।

৪৩ আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪।

৪৪. ড. ফরমান ফতেহপুরী, *উর্দু নছর কা ফান্নী এরতেকা* (দেহলী: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪), পৃ. ১০৬।

৪৫ মুজতবা হোসাইন, *আদব ওয়া আগাহী* (করাচী: মাকাতাবা-এ আফকার, ১৯৬৪), পৃ. ১৯৭।

৪৬ ড. ফরমান ফতেহপুরী, *উর্দু নছর কা ফান্নী এরতেকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৪৭ সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী তাজ, *আনার কলি* (লক্ষ্মৌ: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৫।

৪৮ খলিলুর রহমান আজমী, *উর্দু মে তারাক্কী পসন্দ তাহরীক*, পৃ. ৩০-৪০; মুজতবা হোসাইন, *আদব ওয়া আগাহী*, পৃ. ২১১-২৪৫।

৪৯ প্রফেসর নুরুল হাসান নকভী, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২-৫২৩।

৫০. মুহাম্মদ জামীল, *উর্দু শায়েরী কী মুখতাছর তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫-২৯৬।

৫১. প্রফেসর নুরুল হাসান নকভী, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৯;

৫২ মুহাম্মদ জামীল, *উর্দু শায়েরী কী মুখতাছর তারীখ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২-২৫৩; প্রফেসর নুরুল হাসান নকভী, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৬; আল্লামা সৈয়দ মুনীর আলী জাফরী, *জাদীদ উর্দু আদবীয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০-৩৪১।।

৫৩ প্রফেসর নুরুল হাসান নকভী, *তারীখ-এ আদব-এ উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২১৫।